a pictorial directory of birds of bengal

by

AJOY HOME

CHENA ACHENA PAKHI

Price : £ 6.00
$ 10.00

Supplementary volume of
BANGLAR PAKHI

প্রকাশক :
রবীন বল
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৯৫

মূল্য : দুইশত টাকা

লেজার টাইপসেটিং :
পেজমেকার্স
২৩বি, রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা-৭০০ ০২৬

মুদ্রাকর :
লক্ষ্মীনারায়ণ প্রসেস
১৯, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

কৈশোর ও যৌবনের নিত্যসঙ্গী
দুই পক্ষিপ্রেমিক ও ক্রিকেটার
প্রয়াত কার্তিক ও বাপী বসুর
স্মরণে

নাহং মন্যে সুবেদেতি
নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ
নো ন বেদেতি বেদ চ ॥ কেন : ১০

*

I do not think I know very well
nor that I do not know.
He knows who knows this
I do not know and I know. kena : 10

প্রকাশকের নিবেদন

ভূমিকা যে কোন গ্রন্থেরই অপরিহার্য অঙ্গ—বিশেষতঃ সীরিয়াস বইয়ের ক্ষেত্রে তো বটেই। 'চেনা-অচেনা পাখি' সীরিয়াস বই না জনপ্রিয় বিজ্ঞান-গ্রন্থ সে বিচার পাঠকরাই করবেন। লক্ষ্মীর বাহন পেঁচাকে আমরা সবাই চিনি। হয়তো সন্ধ্যের অন্ধকারে পেঁচার চলা-ফেরা ও অদ্ভুত ডাকও আমরা শুনেছি। পাখিদের মধ্যে পেঁচা যে অন্যতম মাংসভুক প্রাণী এবং মাটির উপর দিয়ে বেশ জোরেই দৌঁড়াতে পারে এ তথ্য হয়তো আমরা অনেকেই জানি না। সাধারণ পাঠকদের কৌতূহল হয়তো বা এতেই মিটতে পারে। কিন্তু পক্ষি-প্রেমিক-গবেষকগণ হয়তো আরও তথ্য জানতে আগ্রহী হবেন। তাই পক্ষি-বিজ্ঞানী অজয় হোম শুধু লক্ষ্মী পেঁচার কথাই লেখেন নি। লিখেছেন ঘাসপেঁচা, ভূতুম পেঁচা, হুতোম পেঁচা, কালপেঁচা, কোটরে পেঁচা, কণ্ঠী পেঁচা ও আরও রকমারি পেঁচার কথা গল্পের মতোই শুনিয়েছেন চেনা-অচেনা পাখিতে। পেঁচার ক্ষেত্রে যেমন, হরিয়াল বা ঘুঘুর ক্ষেত্রেও তাই! গল্পের ঢংয়ে পরিবেশিত পক্ষিকূলের স্বভাব, চলাফেরা, ঘর-সংসারের কথা সাধারণ পাঠকদেরই শুধু নয়, পক্ষি-বিশেষজ্ঞগণেরও অনেক কৌতূহল নিরসন করবে।

বাংলার পাখিতে অজয় হোম শুধুমাত্র দণ্ডচারী পাখিদের কথাই বলেছেন। হয়তো দণ্ডচারী পাখিদের সংখ্যা বেশি বলেই তিনি একটি খণ্ডে সব দণ্ডচারী পাখিদের কথা বলেছেন। কিন্তু বাংলার পাখি প্রকাশের পর থেকেই লেখকের এই ধারণাই হয়েছিল যে, অন্যান্য বর্গের পাখিদের নিয়ে তিনি একটি বাংলার পাখি-র পরিপূরক গ্রন্থ লিখবেন। পক্ষি-প্রেমিক, বেশ কিছু পাঠক এবং অনেক লেখকও আমাকে এই মর্মে অজয় হোমকে অনুরোধ করতে বলেছিলেন। আমি সে কথা অজয়দাকে বলেও ছিলাম। নিজস্ব তাগিদেই হোক বা পাঠকদের অনুরোধে, অজয় হোম অন্যান্য বর্গের পাখিদের নিয়ে 'চেনা-অচেনা পাখি' লেখা শুরু করেছিলেন বেশ কয়েকবছর আগে। এই গ্রন্থের বেশ কিছু লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকায়। কিছুলেখা আজকাল পত্রিকাতেও বেরিয়েছিল। সেই সব লেখা গুছিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশের উপযোগী করে আমাকে দিয়েছিলেন প্রকাশ করতে। এ বইয়ের ভূমিকা তিনি লিখে যান নি। কিম্বা হয়তো লেখার প্রয়োজন মনে করেন নি। তবে বাংলার পাখির ভূমিকায় তিনি বলেছিলেন, 'বাংলা ভাষায় কোনও আধুনিক বই বর্তমানে না থাকাতে সাধারণ মানুষ তার প্রতিবেশী অপর এক প্রাণীর সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারে না।' প্রয়াত অজয় হোমের এই বক্তব্যকেই তো সর্বজনীন ভূমিকা হিসেবে আমরা গ্রহণ করতে পারি। যেখানে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার প্রশ্নে আজ সবাই আমরা উদ্বিগ্ন। পাণ্ডুলিপিটিকে আদ্যোপান্ত দেখেশুনে মুদ্রণ যোগ্য করে তোলার জন্য লেখক-কন্যা শ্রীমতী সুতপা রায়চৌধুরী ও অজয় হোমের অন্যতম সুহৃদ শ্রীঅধীর চক্রবর্তী প্রচুর শ্রম করেছেন। বিশেষ করে পাখির বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট প্রণয়ন করার ব্যাপারে শ্রীমতী সুতপা রায়চৌধুরী আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

আবার অজয় হোমের কথাতেই বলছি, যদি বইখানির সমাদর হয় ..... ।—ইতি **প্রকাশক**

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

কাঠকুট বর্গ
Order Piciformes

নীলকণ্ঠ বর্গ
Order Coraciiformes

ক্রৌঞ্চ বর্গ

Order Gruiformes

ক্রৌঞ্চ বর্গ

Order Gruiformes

কর্ষক বর্গ

Order Galliformes

শ্যেন বর্গ

Order Falconiformes

মন্থরক বর্গ

Order Anseriformes

দীর্ঘজঙ্ঘ বর্গ

Order Ciconiiformes

বজ্জুল বর্গ

Order Podicipediformes

কাষ্ঠকুট্ট বর্গ

পৃথিবীর সমস্ত পাখিকে 27টি বর্গে বা গোত্রে (অর্ডার) ভাগ করা হয়েছে। এই 27টি বর্গে 155টি বংশ (ফ্যামিলি) আছে। প্রতিটি বংশের মধ্যে নানাগণ (জিনাস)। 155টি বংশ 8592 প্রজাতিতে (স্পিসিস) বিভক্ত। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ নিয়ে প্রায় 70টি বংশে 1200 প্রজাতির পাখি দেখা যায়। জগতে পাখির যত প্রজাতি (স্পিসিস্) আছে তার অর্ধেকের বেশিই দণ্ডচারী বর্গের (অর্ডার পাস্‌সেরিফরমেস) মধ্যে পড়ে।[1]

কাষ্ঠকুট্ট বর্গে (অর্ডার পাইকিফরমেস) মাত্র তিনটি বংশ—কাষ্ঠকুট্ট (পাইকিদি), মধুমাক্ষিক (ইনডিকেটরিদি) এবং পিপ্পল (কাপিটোনিদি)। একমাত্র মধুমাক্ষিক কোনো বঙ্গেই সমতলের পাখি নয়। খুবই দুষ্প্রাপ্য পাহাড়ী পাখি। হিমালয়ের বান্নু, হাজারা, মারি থেকে নেপাল, ভূটান, সিকিম, আসামের নাগা পাহাড়, মার্গারিটা এবং উত্তর ব্রহ্মদেশে মিচিনা জেলায় এদের দেখা যায়। ভারতের মধুমাক্ষিকরা আফ্রিকার পাখির মতো মানুষ এবং মধুভুক-কে (র‍্যাটেল ; মেল্‌লিভোরা কাপেনসিস) নানারকম ডাক ডেকে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে মৌচাকের কাছে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় কিনা তা এখনও জানা যায় নি। আসামে একবার মাত্র আমার চোখে পড়েছে। হয়তো কোনো কারণে নেমে এসেছিল। তখন চিনতে পারি নি, চেহারা লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলাম, পরে বই মিলিয়ে জানি ওটা মধুমাক্ষিক।[2]

কাষ্ঠকুট্ট বংশ

কাষ্ঠকুট্ট বংশের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই বংশের পাখিদের দুটো আঙুল সামনে, দুটো পিছনে এবং প্রথম ও চতুর্থ আঙুলের নখরের মুখ পিছন দিকে। পরভৃত, শুক ইত্যাদি বংশের মতো কাষ্ঠকুট্ট বৃহৎ যুগ্মাঙ্গুল গোষ্ঠীর (জাইগোড্যাকটাইলাস) অন্তর্ভুক্ত হলেও উপরোক্ত দুই বিশিষ্টতার জন্যে পৃথক।

এই বংশের পাখিদের জিভ লম্বা লিকলিকে এবং আঠাযুক্ত। জিভের ডগা করাতের মতো কাঁটাযুক্ত। লেজের পালকের সংখ্যা 12। লেজের বাইরের এক জোড়া পালক খুব ছোটো। চঞ্চু সুদৃঢ় ; অনেক প্রজাতির কীলকাকার।

কাষ্ঠকুট্ট বংশে 15টি গণ (জিনাস)— ধাম্মি (ডাইনোপিয়াম), লঘুপর্ণিক (মাইক্রপটেরনাস), দারকুট্ট (পাইকয়েডস্), ক্ষুদ্রপুচ্ছ (হেমিকিরকাস), কাষ্ঠকুট্ট (পাইকাস), সাচিগ্রীব (জাইংকস্), কাষ্ঠকুট্টিকা

1. বাংলার পাখি, অজয় হোম, 1380, 1399

2. মৌ-সন্ধানী, দেশ 22 বর্ষ 23 সংখ্যা, 26 চৈত্র 1361, পৃঃ 709-13

(পাইকুমনাস), কীচকি (সাসিয়া), ত্রয়ঙ্গুলি (গেকিন্যুলাস), ভস্মশিতপত্র (ম্যালেরিপাইকাস), কুঙ্কুমচূড় (ড্রাইওকোপাস) বিচূড় (হাইপোপাইকাস), কৃষ্ণপাট (পাইকয়িডেস), রক্তপাট (ব্লাইথিপাইকাস) এবং দৃঢ়পার্দ (ক্রাইসোকোলাপটেস)।

এই 15টি গণের মধ্যে একমাত্র ব্যাঘ্নি গণের প্রজাতিই পশ্চিমবঙ্গের সমতলে সবচেয়ে বেশি লোকচক্ষে পড়ে। আর দু-তিনটিকে সমতলে দেখা গেলেও বাকি সবই হিমালয়ের পাদদেশ দার্জিলিঙ জেলা ও তরাই অঞ্চলবাসী।

কাঠঠোকরা (Black-rumped Flameback)

ছুটির দিনে কলকাতা ছেড়ে কিছু দূরে কোথাও যখন আর পাখি দেখতে যাবার জায়গা থাকে না, তখন হয় যাই আলিপুরের চিড়িয়াখানায়, না হয় শিবপুরের বটানিক্যাল গার্ডেনে।

সেদিন বেশ সকালে বটানিকস্‌-এ পৌঁছেছি। গেটে ঢুকেই ডানহাতি রাস্তা দিয়ে চলেছি। শীতের মরসুম নয় তাই দর্শক আর চড়ুইভাতির ভিড় নেই। লোকজনের মধ্যে বাগানের মালিরাই যা কিছু কাজ করছে। রাস্তাটা বেশ নির্জন।

হঠাৎ নির্জনতা ভঙ্গ করে উচ্চগ্রামে কর্কশ গলায় কি-কি-কি-খি-খি—' ভূতুড়ে হাসি। অন্যমনস্ক ছিলাম তাই ভূতুড়ে হাসিতে চমকে উঠে লক্ষ্য করতে লাগলাম শব্দটা কোথা থেকে আসছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমার চোখের সামনে দিয়ে সোনালি-হলুদ, লাল আর কালোর ছটা ছড়িয়ে অদ্ভুত হাসি উড়িয়ে উড়ে গেল একটা পাখি।

ওড়ার কায়দাতে নতুনত্ব আছে। পাখাজোড়া খুব জোরে কয়েক দফা চালিয়েই বন্ধ করে ফেলে। সেই গতিবেগে খানিকটা সোজা গিয়েই নিজের ভারে শূন্য পথে ডুব দেয়; সঙ্গে সঙ্গে আবার দ্রুত পাখা সঞ্চালনে নিজেকে উত্তোলন তারপর আবার ডুব। সমস্ত ওড়াটাই কিরকম যেন স্বচ্ছন্দের নয় বলে মনে হল। মনে হল উড়তে এদের বেশ কষ্ট হচ্ছে।

এভাবে উত্থান-পতন ওড়ার মাধ্যমে রাস্তা পার হয়ে এক মাঝারি সাইজের গাছের প্রায় গোড়া ঘেঁষে আঁকড়ে ধরল কাণ্ডটাকে। মাটি থেকে বড়জোর চার-পাঁচ ফুট উঁচু হবে। দু'পা আর দেহের অনুপাতে ছোটো লেজের উপর ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে এদিক-ওদিক তাকাল। মাথায় লাল ঝুঁটি। কর্কশ স্বরে আবার ডেকে উঠল— কি-কি-কি- খি-খি-খি—।' তারপরেই লম্বা চঞ্চু দিয়ে গাছের গায়ে হাতুড়ির মতো ঠুকতে লাগল। কখনও সরসর করে কাঠবেড়ালির মতো ওপরে ওঠে, কখনওবা পিছু হঠে নেমে আসে। ওঠা-নামা দুই-ই দ্রুত এবং ঝাঁকি দেওয়া।

চঞ্চু-হাতুড়ি ঠোকার বিরাম নেই। ডাইনে-বাঁয়ে সামনে ঠুকেই চলেছে। এই করতে করতে কাণ্ডটার উপরে উঠতে লাগল। দেখলাম, চঞ্চুর আঘাতে ছোটো ঘুণপোকা বেরিয়ে আসছে আর সেগুলো জিভের আগায় ধরে উদরে চালান দেওয়াতেই পাখিটা ব্যস্ত। থেকে থেকে ওই ভূতুড়ে হাসির ডাক। হঠাৎ ডাকের জবাব দিয়ে আর একটা পাখি কোথা থেকে উড়ে এসে গাছের কাণ্ডটার উল্টো দিকে আমার চোখের আড়ালে বসল। উড়ে আসার সময় মাথাটা কালো দেখলাম। ওরই সঙ্গিনী।

(পাইক্যুমনাস), কাঁচকি (সাসিয়া), রামঘুর্লি (গেকিনুলাস), ভস্মিবর্ণঠোকর (মুলারিপিকাস), কুঙ্কুমচূড় (ডাইওকোপাস) বিচূড় (হাইপোপাইকাস), কৃষ্ণপটি (পাইকয়িডেস), রক্তপাটি (ব্লাইথিপাইকাস) এবং দড়পার্দ (ক্রাইসোকোলাপটেস)।

এই 15টি গণের মধ্যে একমাত্র বাকি গণের প্রজাতিই পশ্চিমবঙ্গের সমতলে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। আর দু-তিনটিকে সমতলে দেখা গেলেও বাকি সবই হিমালয়ের পাদদেশ দার্জিলিং জেলা ও তরাই অঞ্চলবাসী।

কাঠঠোকরা (Black-rumped Flameback)

ছুটির দিনে কলকাতা ছেড়ে কিছু দূরে কোথাও যখন আর পাখি দেখতে যাবার জায়গা থাকে না, তখন হয় যাই আলিপুরের চিড়িয়াখানায়, না হয় শিবপুরের বটানিক্যাল গার্ডেনে।

সেদিন বেশ সকালে বটানিকস্‌ে পৌঁছেছি। গেটে ঢুকেই ডানহাতি রাস্তা দিয়ে চলেছি: শীতের মরসুম নয় তাই দর্শক আর চড়ুইভাতির ভিড় নেই। লোকজনের মধ্যে বাগানের মালিরাই যা কিছু কাজ করছে। রাস্তাটা বেশ নির্জন।

হঠাৎ নির্জনতা ভঙ্গ করে উচ্চগ্রামে কর্কশ গলায় কি-কি-কি-খি-খি—' ভূতুড়ে হাসি। অন্যমনস্ক ছিলাম তাই ভূতুড়ে হাসিতে চমকে উঠে লক্ষ্য করতে লাগলাম শব্দটা কোথা থেকে আসছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমার চোখের সামনে দিয়ে সোনালি-হলুদ, লাল আর কালোর ছটা ছড়িয়ে অদ্ভুত হাসি উড়িয়ে উড়ে গেল একটা পাখি।

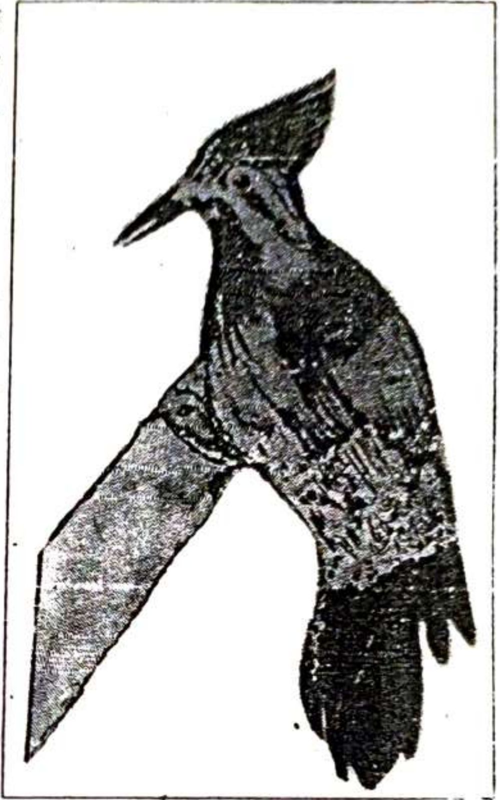
ওড়ার কায়দাতে নতুনত্ব আছে। পাখাজোড়া খুব জোরে কয়েক দফা চালিয়েই বন্ধ করে ফেলে। সেই গতিবেগে খানিকটা সোজা গিয়েই নিজের ভারে শূন্য পথে ডুব দেয়; সঙ্গে সঙ্গে আবার দ্রুত পাখা সঞ্চালনে নিজেকে উত্তোলন তারপর আবার ডুব। সমস্ত ওড়াটাই কিরকম যেন স্বচ্ছন্দের নয় বলে মনে হল। মনে হল উড়তে এদের বেশ কষ্ট হচ্ছে।

এভাবে উত্থান-পতন ওড়ার মাধ্যমে রাস্তা পার হয়ে এক মাঝারি সাইজের গাছের প্রায় গোড়া ঘেঁষে আঁকড়ে ধরল কাণ্ডটাকে। মাটি থেকে বড়জোর চার-পাঁচ ফুট উঁচু হবে। দু'পা আর দেহের অনুপাতে ছোটো লেজের উপর ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে এদিক-ওদিক তাকাল। মাথায় লাল ঝুঁটি। কর্কশ স্বরে আবার ডেকে উঠল— কি-কি-কি- খি-খি-খি—।' তারপরেই লম্বা চঞ্চু দিয়ে গাছের গায়ে হাতুড়ির মতো ঠুকতে লাগল। কখনও সরসর করে কাঠবেড়ালির মতো ওপরে ওঠে, কখনওবা পিছু হঠে নেমে আসে। ওঠা-নামা দুই-ই দ্রুত এবং ঝাঁকি দেওয়া।

চঞ্চু-হাতুড়ি ঠোকার বিরাম নেই। ডাইনে-বাঁয়ে সামনে ঠুকেই চলেছে। এই করতে করতে কাণ্ডটার উপরে উঠতে লাগল। দেখলাম, চঞ্চুর আঘাতে ছোটো ঘুণপোকা বেরিয়ে আসছে আর সেগুলো জিভের আগায় ধরে উদরে চালান দেওয়াতেই পাখিটা ব্যস্ত। থেকে থেকে ওই ভূতুড়ে হাসির ডাক। হঠাৎ ডাকের জবাব দিয়ে আর একটা পাখি কোথা থেকে উড়ে এসে গাছের কাণ্ডটার উল্টো দিকে আমার চোখের আড়ালে বসল। উড়ে আসার সময় মাথাটা কালো দেখলাম। ওই সঙ্গিনী।

পাখি দুটি কাষ্ঠকুট্ট বর্গের অন্তর্গত কাষ্ঠকুট্ট বংশে ব্যঙ্গি গণের (ডাইনোপিয়াম) *এক প্রজাতি* ; নাম— কাঠঠোকরা (ডাইনোপিয়াম বেংঘলেনস্)। হিন্দি— *কাঠফোড়া*। ইংরেজি— *গোল্ডেনব্যাকড় উডপেকার। ব্যঙ্গি গণে 3টি প্রজাতি।*

কাঠঠোকরা লম্বায় 29 সেমি (11 $^{1}/_{2}$ ইঞ্চি)। পুরুষ-পাখির মাথার উপর এবং ঝুটি উজ্জ্বল টুকটুকে লাল : ওই লালের উপর কয়েকটি কালো ছিট। মাথা ও ঘাড়ের দু'পাশ সাদা। নাকের উপর থেকে চোখ পার হয়ে কালো চওড়া রেখা ঘাড় পর্যন্ত। ঘাড়, পিঠের শেষাংশ ও লেজ কালো। উপরের পিঠ ও কাঁধ গাঢ় সোনালি-হলুদ। ডানার আচ্ছাদক ঘাড়ের দিকে কালো, ক্রমে সোনালি জলপাই-হলুদ। ওড়ার পালক পাটকিলে-কালো, তার উপর সাদা ছোপ, বাকি ডানার পালক সোনালি জলপাই-হলুদ। চিবুক, গলা ও ঘাড়ের দু'পাশ কালো, তার উপর অসংখ্য ছিট। এইভাবে নেমে এসেছে বুকের উপর দিয়ে। পেট ও তলপেটে সাদার উপর কালো কাটাকুটি দাগ, ক্রমে তলপেটের শেষে এসে প্রায় সাদা। স্ত্রী-পাখির কেবল মাথার সামনেটা কালো এবং প্রতিটি পালকে ত্রিকোণাকার সাদা রেখা। কনীনিকা লালচে-পাটকিলে, চোখের গোল পাতা সবুজাভ-সীসে। চঞ্চু স্লেট-সীসে। পা গাঢ় সবুজাভ-সীসে, নখর ছাই-রঙা।



চি ।. কাঠঠোকরা

বাসস্থান— পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ,নেপাল এবং শ্রীলঙ্কা। 6টি *উপজাতি। প্রথম* —'ডি বেং বেংঘলেনস্'— পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, নেপাল, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, আসাম ; দক্ষিণে মধ্য ভারত এবং ওড়িশায় এক হাজার মিটারের ভিতর। *দ্বিতীয়*— 'সিন্দ্ গোল্ডেনব্যাকড্' (ডি বেং ডাইল্যুটাম)— পাকিস্তান, বেলুচিস্তান, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র ও নিম্ন পাঞ্জাব। *তৃতীয়*— 'সাদার্ন গোল্ডেনব্যাকড়' (ডি বেং পাংকটিকোললে)— গোদাবরী নদীর পূর্ব এবং দক্ষিণাংশে। *চতুর্থ*— 'কেরালা গোল্ডেনব্যাকড' (ডি বেং তেহমিনি)— ভারতের পশ্চিম উপকূল ধরে কেরালায়। *পঞ্চম*— 'সিলোন গোল্ডেনব্যাকড়' (ডি বেং জ্যাফনেনসে)— উত্তর শ্রীলঙ্কা ; দক্ষিণে ত্রিণকোমালী এবং পুট্টালামে। *ষষ্ঠ*— 'সিলোন রেডব্যাকড়' (ডি বেং প্সারোডেস)— শ্রীলঙ্কার মধ্য ও দক্ষিণাংশে 1700 মিটারের ভিতর।

খাদ্য— গাছের গায়ে এবং বল্কলের অভ্যন্তস্থ যাবতীয় ছোটবড়ো কীট, শূক, উই এবং কাঠ বা ডেঞ্চে পিঁপড়ে। এ ছাড়া পাকা ফলের শাঁস এবং ফুলের মধু।

স্বভাব— কাঠঠোকরা গ্রাম বাংলার অতি সাধারণ পাখি। কলকাতার উপকণ্ঠে যে কোনও বাগানে এদের আগমন ঘটে। আম, নারকেল অথবা বুড়ো গাছ এবং কিছুটা ঝোপঝাড় যে বাগানে আছে, সেখানে একটি বা দুটি সোনালি-পিঠ কাঠঠোকরাকে দেখা যাবেই এবং এদের কর্কশ ডাকও কানে আসবে। এদের ডাকের সঙ্গে মাছরাঙার ডাকের খুবই সাদৃশ্য। এরা ঘন জঙ্গল পছন্দ করে না বরং এড়িয়ে চলে।

কাষ্ঠকুট্ট বংশের মধ্যে পল্লীবাংলার এই কাঠঠোকরার যেমন রঙ তেমন আর কোনও প্রজাতিতে নেই। সাহসও এদের বেশ। লুকিয়ে-চুরিয়ে কিছু করে না। বাগান কাঁপিয়ে ডেকে, রঙের ছটা উড়িয়ে অন্য প্রাণীর সামনেই সে তার খাদ্যান্বেষণ করে চলে। কোনও ভ্রূক্ষেপ করে না। নিজের এলাকাতেই বসবাস করে। দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে এরা মোটেই ভালোবাসে না।

কাঠঠোকরার শিকার বা খাদ্যান্বেষণ প্রণালীটি বড়োই কৌতূহলোদ্দীপক। যে গাছটিকে তার খাদ্যভূমি বলে বাছে, সেগাছে প্রায় গুঁড়ি থেকে খাবার খোঁজা শুরু করে।

অন্যান্য পাখিরা সচরাচর যেভাবে আড়াআড়িভাবে গাছের ডালে বসে সেভাবে এরা কখনই বসে না। কাণ্ড বা ডাল যাই হোক না কেন, এরা বসে লম্বালম্বিভাবে নখরের সাহায্যে কীলকাকার লেজের উপর সম্পূর্ণ ভর দিয়ে আঁকড়ে ধরে। তারপর লম্বা গলাসমেত মাথা উঁচু করে ঝাঁকানি দিয়ে দিয়েও ওপরে ওঠে, ঘুরে ঘুরে পাশে যায়; আবার কখনওবা মোটরগাড়ির ব্যাকগিয়ারের মতো ওই অবস্থায় ঝাঁকানি দিয়ে পিছনে নেমে আসে, কোথাও একটা শিকার ছেড়ে গেছে তার অবস্থান যখন বুঝতে পারে। নখর দিয়ে গাছ আঁকড়ানো মানে গাছের ছালে চঞ্চুর আঘাতে চাকলা উঠিয়ে কীট অন্বেষণ বা আওয়াজে কীট বার হয়ে আসার অপেক্ষা। সামান্যতম ফাঁকের মধ্যে লুকিয়ে থাকলেও এদের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। আগায় বুরুশের মতো কাঁটাওয়ালা আঠামাখানো লকলকে লম্বা জিভ দিয়ে ঠিক গেঁথে বের করে আনবে। গাছের গায়ে খুঁটিসমেত চঞ্চুর আঘাত দেখলে মনে হয়, ছোট গাঁইতি দিয়ে কে যেন গাছের গায়ে মেরেই চলেছে— ঠকাঠক্ ঠকাঠক্....। এই আওয়াজ বেশ জোরেই হয় এবং দিনের বেলা বাংলার পল্লীকাননে প্রায়ই শোনা যায়।

কাঠঠোকরাকে মাঝে মাঝে মাটিতে নেমেও খাদ্যসংগ্রহ করতে দেখা যায়। এটা ঘটে বড়ো লাল ডেঞ্জে বা কাঠপিঁপড়ের বেলায়। কাঠঠোকরাদের দেহের গঠন, নখর, আঙুল সবই গাছের উপর থাকা বা গাছকে আঁকড়ে ধরার উপযোগী। তা সত্ত্বেও তারা মাটিতে নামে। কোনও কারণে তাদের এই বিবর্তন ঘটছে। হয়তো একদিন সম্পূর্ণ ভূমিকীটভোজী হয়ে যাবে। অবশ্য তা হতে কয়েকশ' বছর নিশ্চয়ই লাগবে। এই স্বভাব প্রথম লক্ষ করেন ইংল্যাণ্ডের সাফোক অঞ্চলের ই. সেলাস 1900 খ্রিস্টাব্দে, কাষ্ঠকুট্ট গণের (পাইকাস) বড়ো সবুজ কাঠঠোকরার ভিতর।

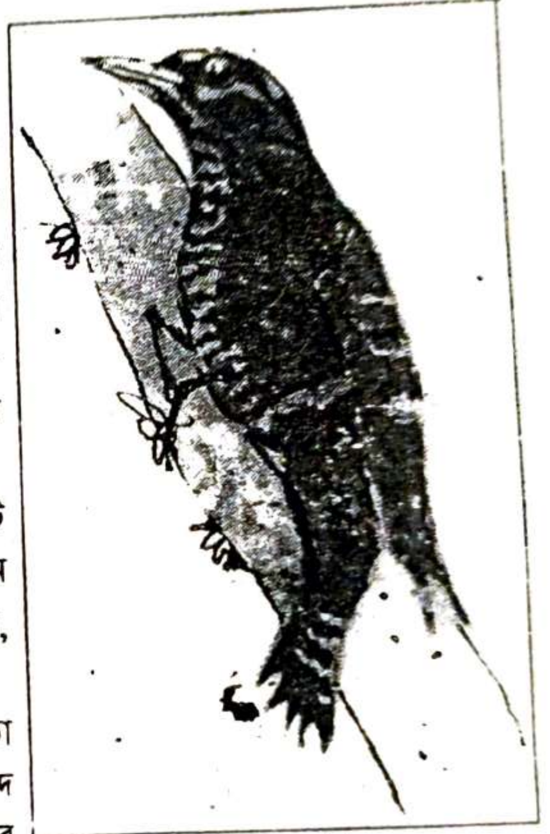
প্রজননকাল— মার্চ থেকে আগস্ট। গাছের কাণ্ডে বা ডালের গায়ে 3 থেকে 10 মিটারের মধ্যে কাঠঠোকরা- দম্পতি চঞ্চুকে কুড়ুলের মতো ব্যবহার ক'রে বারবার আঘাত ক'রে অতি পরিপাটি সুগোল প্রায় 7–8 সেমি ব্যাসের এক প্রবেশ দ্বার বানিয়ে খুঁড়ে চলে। গোলাকার গর্তমুখটি এমন নিখুঁত যে মনে হয় কোনও দক্ষ ছুতোর বানিয়েছে। গর্তমুখ থেকে ভিতরে বেশ কয়েক সেমি সোজা খোঁড়ে, তারপর কিছুটা নিচের দিকে নামে। সেই নিচে 5 সেমি ব্যাসের ডিম্বাকৃতি ডিম পাড়ার ঘর তৈরি করে। অন্যান্য পাখিরা যেমন কোনও কিছু বিছিয়ে শয্যা রচনা করে, ওরা কিন্তু কিছুই বিছায় না। ওরই উপর 3টি খুব চকচকে-ধবধবে সাদা উপরদিকটা কিছু সূঁচলো ডিম পাড়ে। ঘর-গেরস্তালীর সকল কাজে স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই পরস্পরকে সাহায্য করে। ডিমের গড় মাপ 28.1 × 20.9 মিমি।

অন্যান্য কাঠঠোকরা

পশ্চিমবঙ্গের সমতলে আরও কয়েকটি কাঠঠোকরা আছে। তাদের মধ্যে দু'একটি পার্বত্যবাসী হলেও সমতলে নামতে দেখেছি। তারা হল—

(Rufous Woodpecker)

1. **লাল কাঠঠোকরা**— (মাইক্রপটেরনাস ব্রাকাইউরাস)। হিন্দি— *কাঠফোড়া*। সব কাঠঠোকরারই হিন্দি নাম এই। ইংরেজি— *রুফাস উডপেকার*। লঘুপর্ণিক গণের (মাইক্রপটেরনাস) প্রজাতি। এই গণে *একটি মাত্র প্রজাতি*।



চি 2. লাল কাঠঠোকরা

লম্বায় 25 সেমি (10 ইঞ্চি))। দেহের সমস্ত পালক বাদামী-পাটকিলে, নিম্নাংশ নিষ্প্রভ এবং গাঢ়। এই বাদামী-পাটকিলের উপর মাথায় ছাই- রঙের আভা, প্রতিটি পালকের ধার খুব অল্প ফিকে, পিঠে, ডানায়, লেজে এবং তলার পালকে আড়াআড়ি কালো ছোটো ছোটো টানা দাগ। ঠিক চোখের তলায় কিছুটা পালক টুকটুকে লাল। চিবুক ও গলার পালকের ধার জরদাভ। কেবল স্ত্রী-পাখির চোখের তলায় লাল ছোপটা নেই। কনীনিকা পাটকিলে-লাল। চঞ্চু কালচে-পাটকিলে ; তলার চঞ্চুর গোড়া সীসে-রঙা, পা এবং নখর ধূসরাভ-পাটকিলে।

বাসস্থান— হিমালয় থেকে দক্ষিণে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত ; 3টি *উপজাতি*। যেটিকে (মা ব্রা ফাইওকেপস্) দেখি তার বাসস্থান নেপাল থেকে হিমালয়ের পাদদেশ ধরে বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা এবং অন্ধ্রের বিশাখাপত্তনম।

স্বভাব— লাল কাঠঠোকরা গভীর জঙ্গলের পাখি নয়। তা সত্ত্বেও সুন্দরবনের বুড়ির ডাবরির জঙ্গলে দেখা যায়। পছন্দ করে কলাবাগান, চা-বাগান, খোলামেলা চাষের জমি যার পাশে ঝোপঝাড় এবং বাঁশবন। সাধারণত একাই বিচরণ করে বেশি। খুব বড়ো দলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কখনও বিচরণ করে না। গাছের খুব উঁচুতে কখনও শিকার করে না। খুব নিচের কাণ্ডেই খাদ্য অন্বেষণ করে, সময়ে সময়ে মাটিতে নেমেই পিঁপড়ে ধরে। এদের ডাকটা উচ্চগ্রামে— 'কি-ই-ইঙ্ক..... কি-ই-ঙ্ক.... কি-ই-ইঙ্ক'। অনেকটা শালিকের ডাকের মতন।

প্রজননকাল— ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল। কাঠপিঁপড়ের বাসায় চঞ্চু দিয়ে গর্ত করে বাসা বানায়। খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ হলেও ওই জ্যান্ত যারা একবার কামড়ে ধরলে আর সহজে ছাড়ে না সেই ভীষণ হিংস্র পিঁপড়ের সঙ্গে কি করে যে বাস করে, ভাবলে এটাই খুব আশ্চর্য লাগে। এমনকি ডিম বা সদ্যোজাত ছানারও কোনো অনিষ্ট করে না। ডিম পাড়ে 2-3টি ধবধবে সাদা কিন্তু চকচকে নয়। ডিমের গড় মাপ— 28.1 × 20.1 মিমি।

(Fulvous-breasted Woodpecker)

2. **জরদ কাঠঠোকরা**— (পাইকয়েডস্ মাসেই)। হিন্দি— *কাঠফোড়া*। ইংরেজি— *ফালভাস-ব্রেস্টেড-পায়েড উডপেকার*। দারুকুট্ট গণের (পাইকয়েডস্) একটি *প্রজাতি*। এই গণে 12টি *প্রজাতি*।

লম্বায় 19 সেমি (7 1/2 ইঞ্চি)। মাথার চাঁদি ও ঝুঁটি টুকটুকে লাল, ঘাড় ও পিঠের উপরের অংশ এবং লেজের আচ্ছাদক কালো, বাকি উপরের পালক চওড়া সাদা ও কালোর ডোরা কাটা। ডানা কালো, তার উপর সাদা ছিট। লেজ কালো, তার উপরে সাদা ছিট, কয়েকটি পালকে সাদা-কালোর ডোরা। চোখের চারপাশ, গাল এবং ঘাড়ের দু'পাশ জরদাভ-সাদা। চোখের উপর দিয়ে কালো টান কানের উপর পর্যন্ত। চিবুক ও গলা ফিকে-জরদাভ থেকে ক্রমে বুকের উপরাংশে গাঢ়। বুকের নিম্নাংশ, উদর ও তলপেটে জরদাভর উপর কালো-পাটকিলে ও ধূসরের সরু দাগ। লেজের তলা টুকটুকে লাল। কনীনিকা পাটকিলে। চঞ্চু সীসে-রঙা। পা ও নখর নিষ্প্রভ সবুজাভ। স্ত্রী-পাখির মাথা ও ঝুঁটি সব কালো।

বাসস্থান— ভারত, নেপাল, বাংলাদেশ ও ব্রহ্মদেশ। 2টি *উপজাতি*। *যেটিকে* দেখতে পাই (পা মা মাকেই) পশ্চিম হিমালয়ের মারী থেকে পূর্বে নেপাল হয়ে পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, আসাম, ভূটান এবং উত্তর ব্রহ্মদেশ ; দক্ষিণে মাদ্রাজের পূর্বঘাটে। *অপরটি* আন্দামানের (পা মা আন্দামানেনসিস), 'স্পটেড-ব্রেস্টেড পায়েড-উডপেকার'।

স্বভাব— জরদ কাঠঠোকরা একটু চুপচাপ থাকতে ভালবাসে। পছন্দ বড়ো বাঁশঝাড়। আমার নজরে পড়ে বর্ধমান জেলায় শক্তিগড় ও মসাগ্রামের মাঝে। ডাকে অদ্ভুত 'চিক্‌চিক্' স্বরে, যার তুলনা হতে পারে একমাত্র ইঁদুরের সঙ্গে। পিঁপড়েই প্রধান খাদ্য এবং তা সংগ্রহ করে মাটি ও গাছ দু'জায়গা থেকেই।

প্রজননকাল— এপ্রিল থেকে জুলাই। পুরুষ-পাখি প্রায় সারাদিন ডিমে তা দেয়। মনে হয় স্ত্রী-পাখির ডিউটিটা রাত্রিতেই। ডিম পাড়ে 3 থেকে 5টি সাদা।

3. **ছোটো কাঠঠোকরা**— (পাইকয়েডস্ নানুস)। হিন্দি— *কাঠফোড়া*। ইংরেজি— *পিগমি উডপেকার*। দারুকুট্ট গণের *একটি প্রজাতি*। (Brown capped pigmy woodpecker)

লম্বায় 13 সেমি (5 ইঞ্চি)। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। মাথা ফিকে হলুদ-পাটকিলে। উপরের পালক ফিকে— পাটকিলে, সাদার ভাবটা একটু বেশি বিশেষত উপরের লেজের আচ্ছাদকে, যার উপর কালো ডোরা দাগ। চিবুক ও গলায় একটু কালো ভাব, বাকি তলার পালক সাদাটে তার উপর ফিকে কালচে-পাটকিলের ডোরা দাগ। কনীনিকা ফিকে হলুদ ; চোখের পাতা লালচে। চঞ্চু, পা ও আঙুল সীসে-রঙা।

বাসস্থান— পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা। 4টি *উপজাতি*। *যেটিকে* দেখতে পাই তার বাসস্থান (পা না নানুস)— পাকিস্তান থেকে নেপাল, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে।

স্বভাব— ছোটো কাঠঠোকরা খুব চটপটে এবং সাধারণত জোড়ায় বিচরণ করে। গাছের উঁচু ডালের দিকেই ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। বড়জাতের কাঠঠোকরাদের মতো সরসর করে উপরে উঠতে বা পিছু হটতে পারে না। ওড়াটা অবশ্য বংশানুযায়ী। কিন্তু এরা খাদ্যান্বেষণের সময় এক

ডাল থেকে অন্য ডালে ঘনঘন যাওয়া-আসা করে যা বড়োরা করে না। ডাকে একটু ইঁদুরে তীক্ষ্ণস্বরে—'চিপ্... চিপ্'। মেদিনীপুর এবং বীরভূমে একটু বেশি দেখা যায়। বিহারে সবচেয়ে বেশি। হাজারিবাগ জেলার গিরিডিতে আমগাছে বাসা বাঁধতে দেখেছি। রোজ সকালে উড়ে এসে বসতো আমগাছ ছেড়ে হরতুকী গাছের মাথায়। বাসার ছ্যাঁদাটা করেছিল প্রায় 5মি. উঁচুতে, একটা সরু ডাল ভেঙে গিয়েছিল, সেখানে যে দাগ ছিল তাই ছ্যাঁদা করে। কারণ, এরকম জায়গা অন্য জায়গা থেকে নরম বলে গর্ত করার সুবিধে। ছ্যাঁদার মুখটা ছিল 3সেমি-র মতো।

প্রজননকাল— ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই। বাসা বানায় 2 - থেকে 12মি-র ভিতর। ডিম পাড়ে 3 - 4টি ধবধবে সাদা।

(Greater Flameback)

4. **সোনালি কাঠঠোকরা**— (ক্রাইসোকোলাপটেস ল্যাকিডাস)। হিন্দি— *কাঠফোড়া*। ইংরেজি— *লার্জার গোল্ডেনব্যাকড্ উডপেকার*। দৃঢ়পাদ গণের (ক্রাইসোকোলাপটেস) *এক প্রজাতি*। এই গণে 2টি *প্রজাতি*।

লম্বায় 33 সেমি (13½ ইঞ্চি)। কপালের ধার ও চোখের পাশ পাটকিলে ; মাথা ও ঝুঁটি টুকটুকে লাল, ধারে কালো একটা টান, চোখের কোণ থেকে কানের পালকের উপর দিয়ে চওড়া কালো এক টান। পিঠ ও ডানার বেশ কিছু অংশ সোনালি-জলপাই-হলুদ, পালকের ধার ধাতব-সোনালি, বাকি পাটকিলে। বস্তিপ্রদেশ টকটকে লাল। লেজ কালো। গাল, চিবুক এবং গলা সাদা, তার উপর পাঁচটি সরু কালো টান পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়েছে ঘাড়ে। বাকি তলার পালক ময়লা-সাদা, প্রতিটি পালকের ধার কালো যা বুকের কাছে চওড়া আর পেটের দিকে খুব সরু। স্ত্রী-পাখির কেবল মাথা ও ঝুঁটির কালোর উপর সাদা ফুটকি। কনীনিকা হলুদ। চঞ্চু নীলচে-পাটকিলে। পা সবুজাভ-পাটকিলে।

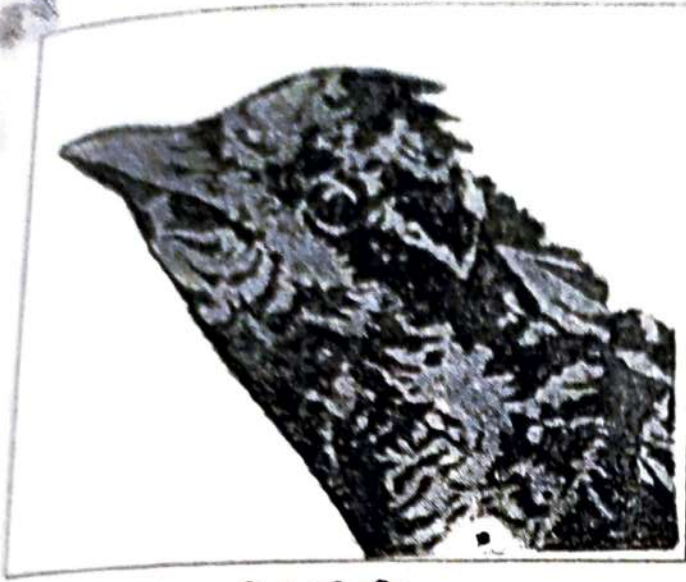
বাসস্থান— ভারত, বাংলাদেশ থেকে পূর্বে ইন্দোচীন, মালয়েশিয়া থেকে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। 4টি *উপজাতি*। যেটিকে দেখতে পাই (ক্রা ল্যু গুট্টাক্রিস্টাটাস)— নেপাল থেকে আসাম, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ; অন্ধ্রে বিশাখাপত্তনম এবং মধ্যপ্রদেশের বস্তার অঞ্চলে।

স্বভাব— সোনালি কাঠঠোকরা গভীর জঙ্গলের পাখি। কখনও কখনও অতটা জঙ্গল না হলেও যেখানে ঝোপঝাড়ের মধ্যে বাঁশবন আছে সেরকম সাধারণ জঙ্গলেও জোড়ায় বিচরণ করতে দেখা যায়। গাছে গাছেই শিকার ধরে বেড়ায়। তবে মাটিতে নেমেও পিঁপড়ে আর উই খায়। গলার স্বর কর্কশ। এক গাছ থেকে অপর গাছে উড়ে যেতেও যেমন ডাকে, তেমনি গাছ আঁকড়ে বসেও ডাকতে ডাকতে চলাফেরা করে।

প্রজননকাল— মার্চ থেকে জুলাই। বাসা বানাবার জন্যে 5 থেকে 11 মিটারের মধ্যেই গাছের গায়ে প্রায় 11 সেমি ব্যাসের ছ্যাঁদা করে। সুড়ঙ্গটা 15 থেকে 46 সেমি পর্যন্ত লম্বা হতে দেখা গেছে। ডিম পাড়ে 5টি সাদা রঙের। (Eurasian Wryneck)

5. **বঙ্কিমগ্রীব**— (জাইংকস টরকিলা)। নামটি দেওয়া প্রদ্যোৎ কুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের।[1] হিন্দি— *গর্দান আঁয়ধা*। ইংরেজি— *রাইনেক*। সাচিগ্রীব গণে (জাইংকস্) একটি *প্রজাতি*।

1. Sen Gupta, P. K., Birds around Santiniketan, Visvabharati News, Vol. XXIII No. 12, June 1955, P. 15



চি 3. বঙ্কিমগ্রীব

লম্বায় 19 সেমি ($7\frac{1}{2}$ ইঞ্চি)। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। লেজসমেত উপরের পালক ধূসর-পাটকলে, কিছু পালকে সাদা ছিট ও কালো সরু টান। ঘাড়ের কাছ থেকে পিঠের নিচে তিনটে ভাঙা লম্বা কালো টান, ভাঙা জায়গায় উপরের অন্যান্য পালকের চেয়ে একটু লালচে ভাব বেশি। পিঠের মতো ডানার আচ্ছাদকে ছিট কিছু বেশি এবং প্রকট। মাথার দু'পাশ, চিবুক, গলা এবং বুকের উপরাংশ ফিকে বাদামী, তার উপর খুব সরু কালো ডোরা। বাকি তলার পালক ফিকে-হলুদাভ সাদাটে, তার উপর তীরের ফলার মতো কালো দাগ। কনীনিকা পাটকিলে। মাঝারি আকারের সরু চাপা চঞ্চু, পা এবং আঙুল ফিকে পাটকিলে-সীসে।

বাসস্থান— ইউরোপ থেকে এশিয়া, জাপান। ভারতে 2টি *উপজাতি*। যেটিকে শীতকালে পরিযায়ী হয়ে আসতে দেখা যায় তার বাসস্থান (জা ট চাইনেনসিস)— বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে কাশ্মীর। শীতে পরিযায়ী হয় ভারতের পূর্বাংশ বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ এবং আসামে।

স্বভাব— বঙ্কিমগ্রীব অন্যান্য কাঠঠোকরার মতো একই ভাবে খাদ্য সংগ্রহ করে এবং মাটিতে নামে। প্রধান খাদ্য পিঁপড়ে এবং উই। সবচেয়ে আশ্চর্য এর ঘাড়-গলা ফেরানোর ভঙ্গিমা। যার জন্যে এদের চিনতে কখনও ভুল হয় না। বঙ্কিমগ্রীবের সঠিক পরিচয় দিয়েছেন ভারতীয় পক্ষিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম এডওয়ার্ড ব্লাইথ। তিনি বলেছেন, 'প্রকৃতিগতভাবে নিজের দেহবর্ণের সঙ্গে যতদূর মিল সম্ভব সেই রকম স্থানে নেমে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে শুয়ে থাকে। ভাবটা যেন খুব অসুস্থ। সে সময়ে যদি কেউ হাতে তুলে নেয় তাহলেও কিছু বলে না, যেন অন্তিমকাল উপস্থিত। এরকম অবস্থায় অদ্ভুতভাবে চোখ উলটে ঘাড় ঘোরাতে-ফেরাতে থাকে, গলা এবং মাথার পালক খাড়া করে মাঝে মাঝে লেজ তুলে এমন হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি করতে থাকে যে মানুষ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। আর সেই অবসরে তীরের বেগে হঠাৎ উড়ে চম্পট মারে।

Order : Piciformes
Family : Capitonidae
Genus : Megalaima
(11)

পিপ্পল বংশ

কাষ্ঠকুট্ট বর্গের (অর্ডার পাইকিফরমেস) অন্তর্গত পিপ্পল বংশের (কাপিটোনিদি) পাখিদের চঞ্চু সুদৃঢ়, মোটা এবং ঈষৎ বাঁকা। উপরের চঞ্চুর আগা সূঁচলো এবং তলার চঞ্চু ছাপিয়ে ঈষৎ বার করা। উপরের চঞ্চুর গোড়ায় লম্বা সরু খোঁচা খোঁচা গোঁফ কয়েকটি যেমন থাকে, তেমনই থাকে চিবুক ও তলার চঞ্চুর সন্ধিস্থলে অনুরূপ কয়েকটি বেশ বড়ো খোঁচা দাড়ি। প্রাচ্যের প্রায় সব স্থানেই এই বংশের পাখির বসবাস। এমনকি দক্ষিণ আমেরিকাতেও এর নিকটতম দুই জ্ঞাতিকে দেখা যায়।

এই বংশে একটিমাত্র গণ পিপ্পল (মেগালাইমা) এবং প্রজাতি 10টি। তার মধ্যে 4টি পশ্চিমবঙ্গের সমতলে দেখা যায়।

বসন্ত বউরি (Blue-throated Barbet)

গ্রীষ্মের ভরা দুপুর। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর।

রিষড়ার গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড থেকে হাঁটা দিয়েছি রেল স্টেশনের দিকে। কোনো কারণে বাস চলাচল বন্ধ।

পথ চলেছি। কয়েকটা আমগাছ ইতস্তত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গাছগুলির দূরত্ব খুব বেশি না হলেও ঠিক আমবাগানও বলা যায় না। একটা গাছের তলা দিয়ে আসছি, কানে এল সামনের গাছের উপর পাতার আড়াল থেকে কে যেন একমনে ডেকে যাচ্ছে— 'ত-গ-রু-ক.... ত-গ-রু-ক...ত-গ-রু-ক্।'



চি 4 বসন্ত বউরি

সেই গাছটার তলায় এসে দাঁড়ালাম। দেখব পাখিটা কোথা থেকে ডাক দিচ্ছে। আমার আগমন টের পেয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর আবার— 'ত-গ-রু-ক্'... করে ডেকে চলল। আমি এদিক-ওদিক উঁকিঝুঁকি মারতে থাকি। সেটা তার পছন্দ হল না, সবুজ কালো-নীল ও টুকটুকে লালের ছটা উড়িয়ে দূরের একটা গাছের ভিতর পাতার আড়ালে লুকালো। ওড়ার

কায়দাটা কয়েকটা দ্রুত পাখার ঝাপট, একটু থামা, একটু নামা, আবার পাখার ঝাপট।

পাখিটা পিপ্পল বংশের *এক প্রজাতি*, নাম— বসন্ত বউরি, বসন্তবৈরী, বসন্ত বুড়ী, বড়ো বসন্তবৈরী (মেগালাইমা এশিয়াটিকা)। হিন্দি— *নীলকন্‌ঠ্‌ বসনত্‌*। ইংরেজি— *ব্লু-থ্রোটেড বারবেট*।

আমাদের দেশে পাখিদের নামের অর্থ অনেক সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। এরা বসন্তের বৈরী বা শত্রু যে কিসে তা বুঝি না। বসন্তের বুড়ী, যাকে বলে 'দি ওল্‌ড ওম্যান অফ দি স্প্রিং' তাই বা কেন, তারও মানে খুঁজে পাই না। বসন্ত বউরিরই বা অর্থ কি! এক হতে পারে বসন্ত বাউরা অর্থাৎ 'বসন্ত পাগল' এবং তারই অপভ্রংশ বসন্ত বউরি। বসন্তের আগমন বার্তা যে জানায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সরস্বতী পুজোর সময় থেকেই এদের ডাকটা কানে আসতে শুরু করে।

বসন্ত বউরি লম্বায় 23 সেমি (9 ইঞ্চি)। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। কপাল, মাথার চাঁদি ও ঘাড় টুকটুকে লাল ; কপাল ও চাঁদির মাঝে আড়াআড়িভাবে সরু হলুদের এক টান। চোখের উপর দিয়ে একটা কালো পটি, মাথার লালের ধার ঘেঁষে পটিটার টান। বাকি উপরের সব পালক ঘাস-সবুজ। ডানার ওড়ার পালক কালচে-পাটকিলে। লেজের তলার শেষাংশ ফিকে নীল। মাথার দু'পাশ, চিবুক, গলা ও বুকের উপরাংশ এবং ঘাড়ের পাশ ফিকে সবজেটে-নীল। 'চঞ্চুর গোড়ার দু'পাশে এবং ঘাড়ের দু'পাশে দুটো লাল ফোঁটা এবং চঞ্চুর গোড়ার উপরে ও নিচে খোঁচা খোঁচা কালো পালক। বাকি তলার পালক হলদেটে-সবুজ। কনীনিকা পাটকিলে, চোখের গোল পাতা কমলা। চঞ্চু মোটা ত্রিকোণাকার সবুজাভ-হলুদ, উপরটা কালচে। পা ময়লা-সবুজ, নখর কালচে।

বাসস্থান— ভারত থেকে ইন্দোচীন হয়ে দক্ষিণ চীন, উত্তর বোর্ণিও। ভারতে *একটি উপজাতি* (মে এ এশিয়াটিকা)— কাশ্মীর থেকে পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামে 2000মি. ভিতর।

খাদ্য— নানা ধরনের ফল-পাকুড়, তার মধ্যে বট-পাকুড়ই প্রিয় এবং উড়ন্ত উই বা পিঁপড়ে।

ডাক— 'তগরুক-তগরুক-তগরুক, শেষ করে 'কুর্‌-র-র-র' দিয়ে।

স্বভাব— বসন্ত বউরি খুব ঘন জঙ্গলে বসবাস করে না। খেত-খামার, মানুষের বসতির কাছে নানা ধরনের ফল-পাকুড়ের গাছ যেখানে বেশি সেখানেই এদের দেখা যায়। গাছেই বাস করে, ভুলেও মাটিতে নামে না। গায়ের রঙ এমন যে ঘন পাতার আড়ালে বেশ মানিয়ে যায়, নজরে পড়ে না। কেবল ডাকই শোনা যায়, বিশেষত বসন্তকালে এবং গ্রীষ্মে। সাঁওতালদের দেখেছি এদের মাংস পুড়িয়ে খেতে।

বসন্ত বউরি কখনও দলবদ্ধ হয়ে বাস করে না।

প্রজননকাল— মার্চ থেকে জুলাই। জ্ঞাতি কাঠঠোকরার মতোই 3 থেকে 8 মিটারের মধ্যে গাছের কাণ্ডে বা কাণ্ডসংলগ্ন মোটা ডালে গর্ত করে বাসা বানায়। সাধারণত গর্তের সুবিধের জন্য গাছের ফাঁপা স্থানই বাছে। সবসময়ে অবশ্য ফাঁপা জায়গা পায় না। তখন গর্তের মুখ থেকে বাসা পর্যন্ত প্রায় একফুট লম্বা সুড়ঙ্গটা ত্রিকোণাকার মোটা চঞ্চুর আঘাতে বেশ নিপুণ ছুতোরের মতো অতি পরিপাটি করে খোঁড়ে। বাসা তৈরি করার একটা বিশেষত্ব দেখতে পাই যে, এরা কখনও ডালের উপরের অংশে গর্ত করে না। বাসার প্রবেশপথ থাকে ডালের তলদেশে। বড়ো বড়ো গাছের মাঝারি ডালগুলোর নিচের দিকে যে ফুটোগুলো আমাদের চোখে পড়ে তা সবই বসন্ত বউরির বাসা। বৃষ্টির

জল যাতে বাসার মধ্যে না ঢোকে সেইজন্যে এরা ডালের তলার দিকে কোটরে ঢোকার পথ তৈরি করে। অনেক সময় দেখা যায় একই কোটরে প্রতি বছর বাসা বাঁধতে। কাঠখোদাইয়ের পরিশ্রম প্রতি বছর কে আর করে ! ছানারা বড়ো হয়ে বাসা ত্যাগ করলেও বসন্ত-দম্পতি কোটর পরিত্যাগ করে না। ওখানেই রাত কাটায়।

গর্তের শেষে বাসায় সাধারণত আবর্জনাই বিছায়। কখনও দেখা যায় গাছের আঁশ, ঘাস বা অন্যান্য কিছু ডিমের তলায় দিতে। ডিম পাড়ে 3-4টি অমসৃণ সাদা রঙের। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই ঘর সংসারের সব কাজে পরস্পরকে সাহায্য করে। ডিমের গড় মাপ 27·8 × 20·5 মিমি।

সেকরা-পাখি (Coppersmith Barbet)

মে মাসের দুপুর। কড়া রোদ। গরমে চারিদিকে কেমন একটা যেন ঝিমঝিমভাব। আমাদের বরানগরে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট অফিসের এক বিভাগ থেকে অপর বিভাগে চলেছি। হঠাৎ মাথার উপরে উঁচু একটা আমগাছের উপর থেকে আওয়াজ পেলাম— 'ঠুক্-ঠুক্-ঠুক্'। সেকরা হাতুড়ি ঠুকছে। গাছের উপর সেকরা ? এদিক-ওদিক তাকাই, কিছুই দেখতে পাই নে। তার উপর প্রচণ্ড রোদের ঝাঁঝ। তিষ্ঠতে দিচ্ছে না। আবার কানে সেকরার হাতুড়ির আওয়াজ এল। মনে হল, দু'জন সেকরা একজনের পর আর একজন একটা নেহাইয়ের উপর ছোট হাতুড়ি ঠুকে চলেছে।



চি 5. সেকরা-পাখি

অনেক চেষ্টায় পাতার ফাঁকে একটা সবুজ ছোটো পাখি চোখে পড়ল। ঠুক্ ঠুক্ করে সেকরার হাতুড়ির আওয়াজ মুখ দিয়ে বার করছে আর মাথা দোলাচ্ছে বেশ একটা তালেমানে। মাথাটা এদিক-ওদিক করাতে মনে হচ্ছে দু'জন সেকরা বুঝি একটা নেহাইতে হাতুড়ি ঠুকছে। পাখিটা একেবারে পাকা 'ভেনট্রিলোকুইস্ট'। অদ্ভুত ধাতব শব্দ মুখে। কার সাধ্য বোঝে পাখি না সেকরা !...

পাখিটা পিপ্পল বংশের *এক প্রজাতি* ; নাম— সেকরা-পাখি, ছোটো বসন্ত বউরি, ছোটো বসন্তবৈরী, ভগীরথ (মেগালাইমা হিমাকেফালা)। হিন্দি— *ছোটা বসনত্*। ইংরেজি— *ক্রিমসনব্রেস্টেড বারবেট, কপারস্মিথ*।

সেকরা-পাখি লম্বায় 17 সেমি (সাড়ে 6 ইঞ্চি)। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। কপাল ও বুক টুকটুকে লাল। চোখের দু'পাশ, চিবুক ও গলা উজ্জ্বল হলুদ। চোখের পাতা ফিকে লাল, কনীনিকা পিঙ্গল।

নাকের গর্তের পাশ থেকে চোখের উপর পর্যন্ত কালো একটা পটি, মোটা ত্রিকোণাকার চঞ্চুর গোড়া থেকে গালের উপর দিয়ে ঘুরে মাথায় উঠে গেছে আর একটা কালো টান। চঞ্চু কালো. চঞ্চুর গোড়ায় খুব সরু শক্ত খোঁচা লোম কয়েকটা খাড়া, আর কয়েকটা ঝুলে চঞ্চুর পাশ দিয়ে নিচে নেমেছে। ঘাড়ের পাশ ও পিঠ জলপাই-সবুজের উপর ধূসর ছাপ, অল্প কয়েকটা হলুদ টানও পিঠে। ওড়ার পালকের লুকানো অংশ কালচে। বুকে টুকটুকে লালের পরেই সোনালি-হলুদের একটা পটি। এই পটির পর থেকে তলার পালক ফিকে হলুদ, তার উপর জলপাই-সবুজের সরু সরু টান। লেজ চৌকো, শেষপ্রান্ত সবুজাভ-নীল। পা প্রবাল-লাল. নখর কালো।

বাসস্থান— পাকিস্তান. ভারত, সিংহল, ইন্দোচীন ও মালয়েশিয়া থেকে ইউনান এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। একটি *উপজাতি* (মে হি ইন্ডিকা)— পাঞ্জাব ও কচ্ছ (ক্বচিৎ), নেপাল, বাংলাদেশ, সিংহল এবং সমগ্র ভারতে 6 হাজার ফুটের ভিতর।

খাদ্য— নানাবিধ ফল-পাকুড় ; মথ, ডানা-ওঠা পিঁপড়ে বা উই এবং অন্যান্য উড়ন্ত পোকা।

স্বভাব— বেঁটে-খাটো, গাঁট্টা-গোট্টা, সেকরা-পাখিকে চোখে দেখতে পাওয়ার চেয়ে ডাকের সঙ্গে পরিচয় হয় মানুষের অনেক বেশি। যেখানেই বড়ো বড়ো গাছ সেখানেই এদের আস্তানা। গাছ থেকে মাটিতে নামে না। এমনকি ছোটখাটো ঝোপেও নয়। সদা উচ্চে আসীন। ঘন পাতার আড়ালেই শয়নং, ভোজনং ইত্যাদি।

সেকরা-পাখি ওড়ে সোজাসুজি। ওড়ার সময় ডানার উত্থান-পতন দ্রুত এবং তালে পড়ে। এক গাছ থেকে অপর গাছের দূরত্ব খুব বেশি হলেও উড়তে আপত্তি নেই। ডাকটাই এদের অদ্ভুত ধাতব। গাছের উপর দিকে বসেই ডাকে। কখনও দেখেছি সরু ডাল ধরে ঝুঁকে পড়ে ডাকছে। সকালেও ডাকে কিন্তু দুপুরে যত গরম পড়ে এদের ডাকও তত বাড়ে। যখন কাছাকাছি চার-পাঁচটি পাখি একসঙ্গে ডাকতে থাকে তখন খুব খারাপ শোনায় না। মনে হয়, কোথায় যেন ঘণ্টা বাজছে। সাধারণত সন্ধ্যে হলেই আর ডাক শোনা যায় না। কিন্তু প্রজননকালে জ্যোৎস্নারাতে এদের ডাক দু'একবার শুনেছি।

প্রজননকাল— জানুয়ারি থেকে জুন। মাঝে মাঝে একই বছরে দু'বার পরপর ডিম ফুটিয়ে ছানা প্রতিপালন করে। বাসার জন্যে জায়গা খুঁজতে গাছের কাণ্ড বা ডাল আঁকড়ে বসে ঠিক কাঠঠোকরার মতো, তার চৌকো ছোট্ট লেজের উপর ভর দিয়ে। আবার কাঠঠোকরার মতোই গাছের কাণ্ডে বা ডালে কোথায় নরম অংশ আছে তাই দেখতে ঠুকতে ঠুকতে বেয়ে ওঠে।

বাসার উচ্চতা হয় 2 থেকে 13 মিটারের মধ্যে। কাণ্ড অপেক্ষা গাছের মোটা ডালের তলায় 15 থেকে 20 সেমি সুড়ঙ্গ করে বাসা বানায়। পাতার আড়ালে সুড়ঙ্গের মুখটা 2 ইঞ্চি গোলাকার ব্যাসের। প্রতি বছর সুড়ঙ্গ বাড়িয়ে চলে। 2 মিটার পর্যন্ত সুড়ঙ্গ লম্বা হতে দেখা যায়। সুড়ঙ্গ যখন বেশি বড়ো হয়ে যায়, তখন সুড়ঙ্গের শেষে ডিম পাড়ার জায়গাটার কাছে যাবার জন্যে যতটা কাছে হয় ততটা পর্যন্ত গর্ত বাইরে থেকে আবার নতুন করে বানিয়ে আসে। ডিমের শয্যায় থাকে খড়কুটো। এছাড়া আর কোনও উপকরণ ব্যবহার করে না। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই গাছের গায়ে গর্ত করে সুড়ঙ্গ তৈরি থেকে ডিমে তা' এবং ছানা প্রতিপালন করে থাকে। ডিম পাড়ে 2-4টি অমসৃণ ভঙ্গুর ছোপহীন সাদা। ডিমের মাপ— 25.2 × 17.5 মিমি অর্থাৎ লম্বায় 0.99, চওড়ায় 0.69 ইঞ্চি।

রেখা বসন্ত (Lineated Barbet)

শিবপুরের বটানিক্যাল গার্ডেনে ঘুরছি শীতের শেষে। পিকনিকের মরশুম আর নেই বললেই হয়। সুতরাং ভিড়টা বেশ কম। বড়ো বটগাছটার তলা থেকে ফিরছি বাঁদিকের রাস্তা দিয়ে। নার্সারি পার হয়েছি। বেশ বড়ো বড়ো গাছ। নির্জন পরিবেশ। রাস্তা ছেড়ে গাছের তলা দিয়ে চলেছি। হঠাৎ কানে এল— 'কটুর-কটুর-কটুর-কটুর... পাকড়াও-পাকড়াও' ডাক। কর্কশ নয় কিন্তু কোনো পাখি যেন একনাগাড়ে বেশ জোরে জোরে ডেকে চলেছে। মাঝে মাঝে অবশ্য থামছে।

ডাক শুনে পাখিটাকে চিনলাম। হাতিবাগান বাজারের পাখির হাট থেকে কিনে এনে একবার পুষেছিলাম। 'কটুর-কটুর' ডাক ছাড়াও কোনো কিছুতে অপছন্দ হলে রাগ প্রকাশ করতো পালক ফুলিয়ে, ডানা নামিয়ে, চঞ্চু ফাঁক করে 'ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ' শব্দে।



চি 6. রেখা বসন্ত

পাখিটা পিপ্পল বংশের অপর এক *প্রজাতি*; নাম— রেখা বসন্ত (মেগালাইমা লিনিয়েটা)। বাংলায় কোনো নাম না থাকাতে এই নামকরণ করি। নেপালী— *খোটুর*। কাছাড়ি— *দাও টাকরা*। হিন্দি— *কোটার, বড়া বসনত্*। ইংরেজি— *লিনিয়েটেড বারবেট*।

রেখা বসন্ত লম্বায় 28 সেমি (11 ইঞ্চি)। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। মাথা, ঘাড় ও বুক পাটকিলে কিন্তু প্রতিটি পালকের উপর ছোটো ছোটো ফিকে সাদা রেখা। উপরের বাকি পালক ডানা সহ ঘাস-সবুজ। ডানার ওড়ার পালকে একটু পাটকিলের ছাপ। বুকের শেষের অংশ ও তলার সব পালক ফিকে সবুজ। লেজের পালকের ভিতরের অংশ নীলাভ। কনীনিকা পাটকিলে, চোখের পাতা ও তার পাশের পালকহীন অংশ হলুদ। চঞ্চু শিঙে-হলুদ। পা ও আঙুল ফিকে কমলা-হলুদ।

বাসস্থান— হিমালয়ের পাদদেশ ধরে পুবে নেপাল, পূর্ব ভারত, বাংলাদেশ, ইন্দোচীন থেকে মালয়, জাভা, বলিদ্বীপ। ভারতে 2টি *উপজাতি*। *প্রথম* (মে লি হজসনি)— পশ্চিম-মধ্য নেপাল থেকে উত্তর বিহার, সিকিম, আসাম, পশ্চিমবঙ্গে তরাই-ডুয়ার্স থেকে দক্ষিণে ওড়িশায়। *দ্বিতীয়* (মে লি রানা)— পশ্চিম এবং পশ্চিম-মধ্য নেপালে।

খাদ্য— বট-পাকুড় জাতীয় ফল, কীটপতঙ্গ ও তাদের শূক্, ছোটো গিরগিটি-টিকটিকি, গেছো ব্যাঙ এবং বাসা থেকে পড়ে যাওয়া অন্য পাখির ছানা।

স্বভাব— রেখা বসন্ত পিপ্পল বংশের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো। এদের জঙ্গলে যেমন দেখা যায়, তেমন দেখা যায় যে কোনো বাগানে, শহরের পাশে বা বুকেরবট-পিপুল কিংবা আমগাছে। রেখা বসন্ত কটুর-কটুর ডাক আরম্ভ করার আগে অনেক সময় একটা কর্কশ আওয়াজ করে নেয়। গলাটা

যেন সাফ করে নিল, এমন ভাব। ডাক মধ্যাহ্নের সবচেয়ে গরম সময়ে যেমন, তেমনি ডাকে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রে। খুশি হলে তারা ভাব প্রকাশ করে গাছের ডাল থেকে শূন্যে অল্প লাফিয়ে গলা দিয়ে একটা আওয়াজ বার করে। এছাড়াও আর একটা জোর শিস্ দেয় সুরে যা পিপ্পল বংশের অন্য কোনো পাখির গলায় শোনা যায় না। এই শিস্-এর মতো ডাকটা বার করে যখন পরিবারের অপর পাঁচজন ইতস্তত ছড়িয়ে আছে, তাদের এক জায়গায় জড়ো করতে হবে তখন।

প্রজননকাল— মার্চ থেকে জুলাই। গাছের ডালেই সুড়ঙ্গ করে ডিমঘর বানায় অন্যান্য বসন্ত বউরির মতো। উচ্চতা হয় 3 থেকে 12 মিটারের মধ্যে, গর্তের মুখের ব্যাস 8 সেমি, লম্বায় 50 সেমি। তারপর ডিমঘর। ডিম পাড়ে অন্যান্যদের মতো 2 থেকে 4টি সাদা, একটু লম্বাটে। ডিমের মাপ— 32 × 23 মিমি. অর্থাৎ লম্বায় 1.20, চওড়ায় 0.87 ইঞ্চি।

জোকারে পাখি (Brown headed barbe

পাখি দেখতে বেরিয়েছি। মার্টিন কোম্পানির ছোটো ট্রেন তখনও চালু। পাতিপুকুর স্টেশন ছাড়িয়ে লাইন ধরে চলেছি। পাশের পিচঢালা রাস্তাটা বাঁদিকে বাঁক খেয়ে চলে গেল দমদম-নাগের বাজারের দিকে। নন্দীগ্রাম স্টেশন পার হয়েছি। চারিদিকে ঘন গাছপালা। আম, জাম, লিচু, জামরুল, বট, অশ্বত্থ, পাকুড় এবং আরও নানা গাছের সমাবেশ। গাছের উপর দিকে রোদ, মাঝে বা তলায় নেই। সঙ্গে আছে পাখি ধরা বেদে সতীশ আর চারু। তাদের পাতিপুকুরের ঝোপড়ি থেকে ডেকে নিয়েছি।



চি 7. জোকারে পাখি

হঠাৎ একটা গাছ থেকে কর্কশ গলায় একটি পাখি ডাক শুরু করল 'কর্-র-র....কর্-র-র', তারপরেই একঘেয়ে উত্থান-পতনহীন 'কাট্রু-কাট্রু.... কাটরাক— কাটরাক-কাটরাক'। ওর দেখাদেখি আর-একটা ওই ভাবে ডেকে উঠল, তারপর আরও একটা। এমনি করে পরপর কম করে 15 - 16টা হবে, তার বেশিও হতে পারে। ওদের ওই ঐকতানে কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। অদ্ভুত ধ্বনিতে বনানী মুখর হয়ে উঠল। এভাবে কোনো পাখির ছন্দতালহীন কান ঝালাপালা ডাক কখনও শুনি নি।

এ কোন্ পাখিরে বাবা! আমার অবস্থা দেখে সতীশ আর চারু দু'জনেই হেসে অস্থির। চারু হাসতে হাসতে বলল, দেখছেন না কেমন জোকার দিচ্ছে। এর নাম 'জোকারে পাখি'— বসন্ত বউরির জাতভাই।

সতীশই একটা পাখিকে দেখাল বটগাছের উঁচু ডালে বসে ডেকে চলেছে। সবুজ দেখতে, মাথাটা পাটকিলে, চঞ্চু একটু ফোলা আর বড়ো। অনেকটা রেখা বসন্তের মতো দেখতে।

পাখিটা পিপ্পল বংশের *একটি প্রজাতি* ; নাম— জোকারে পাখি (মেগালাইমা জেইলানিকা)। হিন্দি— *বড়া বসনত্*। বিহারে বলে— *সাণ্টেরার*। ইংরেজি— *গ্রীন বারবেট*। ভারত ও সিংহলে 3টি *উপজাতি*।

জোকারে পাখি লম্বায় 27 সেমি (সাড়ে 10 ইঞ্চি)। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। মাথা গলা ও বুক পাটকিলের উপর বিবর্ণ লম্বাটে টান উপর থেকে নিচে। উপরের পালক উজ্জ্বল সবুজের উপর বিবর্ণ লম্বাটে টান শেষ হয়েছে সাদা ফুটকিতে। ডানা ছোটো এবং গোলাকার। ওড়ার পালক পাটকিলে, ধারের দিকটা ফিকে। লেজ উজ্জ্বল সবুজ, নিচের দিক অর্থাৎ লেজের তলা ফিকে নীল। নাক উন্মুক্ত, কোনো পালক নেই। খোঁচা খোঁচা গোঁফ ও দাড়ি বংশের যা বৈশিষ্ট্য তা আছে। কনীনিকা লালচে-পাটকিলে, চোখের চারপাশ পালকহীন ত্বক, চঞ্চুর গোড়া পর্যন্ত কমলা। চঞ্চু ফিকে কমলা-পাটকিলে। পা ও আঙুল হালকা হলদেটে-পাটকিলে, নখর ধূসর।

বাসস্থান— প্রথম উপজাতি (মে জে কানিসেপস্) পশ্চিম হিমালয়ের 800 মিটারের ভিতর হিমাচল প্রদেশের কাংড়া থেকে কুমায়ুন, পশ্চিম নেপালের তরাই অঞ্চল, পূর্ব গুজরাট, আবু পর্বত, উত্তর মহারাস্ট্র, মধ্যপ্রদেশ থেকে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা থেকে গোদাবরীর তীর পর্যন্ত। *দ্বিতীয়*— 'ওয়েস্টার্ন গ্রীন বারবের্ট (মে জে ইনর্নাটা)— পশ্চিম ভারতে মহারাষ্ট্রের গোদাবরীর তীর থেকে দক্ষিণে গোয়া, মহীশূর ও কুর্গ্ জেলায়। *তৃতীয়* (মে জে জেইলানিকা)— কেরালা, দক্ষিণ তামিলনাড়ু ও শ্রীলঙ্কায়।

খাদ্য— বট-পাকুড়, জলপাই জাতীয় আঁটিযুক্ত শাঁসাল ফল, বৈঁচিজাতীয় যে-কোনো ছোটো সরস ফল, কীট-পতঙ্গ, উড়ন্ত পিঁপড়ে বা উই, কখন-সখন টিকটিকি-গিরগিটি। বাড়ির পিছনে লাগানো সব্জি-বাগান অর্থাৎ কিচেন গার্ডেনের টমাটো ধ্বংস করতেও দেখা যায়।

স্বভাব— জোকারে পাখি গাছের বেশ উঁচু ডালে বাস করে। গাছের পাতার আড়ালে থাকে বলে সহজে নজরে পড়ে না, তবে ডাকের সঙ্গে মানুষের পরিচয় বেশি। ফল-পাকুড়ই প্রিয় খাদ্য। সাধারণত একাই বিচরণ করে। বট-অশ্বত্থ গাছের যেখানে ঘন সমাবেশ সেখানে খাদ্যান্বেষণে 20 কি তারও বেশি পাখি জমায়েত হয়। বুলবুল, হরিয়াল ইত্যাদি ফলাশী পাখির সঙ্গেও বিচরণ করতে দেখা যায়। শীতে চুপচাপই থাকে। বসন্তের আগমনে এদের সরব ছন্দহীন ঐকতান শুরু হয় এবং গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারাদিনই জোকার দিয়ে চলে। মাঝে মাঝে রাতেও ডাকে। ওড়াটা অবশ্য বসন্ত বউরিরই মতো— ডানার ঝাপট, ভেসে নিচে নামা, আবার ডানার ঝাপটে ওঠা।

প্রজননকাল— ফেব্রুয়ারি থেকে জুন, মার্চ থেকে মে মাসই প্রশস্ত সময়। 3 থেকে 15 মিটারের মধ্যে নরম কাঠের গাছের মোটা ডালে সুন্দর করে গোলাকার প্রবেশ-মুখ তৈরি করে সুড়ঙ্গ বানায়। বাসা বানাতে স্ত্রী-পুরুষ অক্লান্ত পরিশ্রম করে যতক্ষণ না শেষ হয়। ডিম-ঘরে কোনো আস্তরণ বিছায় না। সুড়ঙ্গ খোঁড়া বাবদ কাঠের টুকরো কয়েকটা দেখা যায়।

ডিম পাড়ে সাধারণত 3টি, তবে 2 বা 4টি ডিমও দেখা গেছে। সাদা লম্বাটে অল্প মসৃণ গোলাকার ভঙ্গুর ডিম। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই ডিমে তা' দেয় এবং সন্তান প্রতিপালন করে। ডিমের গড় মাপ— 29.3 × 22.3 মিমি. অর্থাৎ লম্বায় 1.20, চওড়ায় 0.82 ইঞ্চি।

অপর প্রজাতি

পিপ্পল বংশের অপর একটি প্রজাতি একবার মাত্র আমার চোখে পড়েছিল দার্জিলিঙ যাবার পথে। সুকনার জঙ্গলে গাড়ি খারাপ হয়ে যাবার জন্যে সারাইয়ের অপেক্ষায় জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করতে করতে পাখিটাকে দেখি। 'কুউ-টার ....কুউ-টার টুউ-বুক.... টুউ... বুক' এই ডাকই আমায় আকর্ষণ করে। গাছের প্রায় মগডালে বসে ডাকছে। ডাক অনেকক্ষণ ধরে চলে প্রায় জোকারে পাখির মতন। কাছে-পিঠে অন্য কোনও সঙ্গী-সাথী ছিল না। আকারে সেকরা-পাখির মতন। নাম—

(Blue - eared Barbet)

নীলকান বসন্ত বউরি— (মেগালাইমা অস্ট্রালিস)। কাছাড়— *দাও টাকরা কাশিবা*। ইংরেজি— *ব্লু-ইয়ার্ড বারবেট।*

লম্বায় 17 সেমি (গাড়ে 6 ইঞ্চি)। ঘাস-সবুজ দেহ, মাথায় অনেক রঙের সমাবেশ। খোঁচা খোঁচা দাড়ি চঞ্চুর ডগা ছাড়িয়ে। এই দাড়ি দেখে খুব মজা লেগেছিল। কপাল ও মাথার সামনের অংশ কালো,তার মাঝে মাঝে ফিকে নীল পালক ; মাথার পিছনের অংশ চকচকে নীল। কানের দু' পাশ তামাটে-নীল, উপরে ও নিচে একটি করে টুকটুকে লালের রেখা। চিবুক ও গলা তামাটে-নীল। চোখের ঠিক নিচে হলুদ আর উজ্জ্বল লাল, তারপরেই লম্বা কালো দাড়ি যা চিবুকের রঙকে আলাদা করে রেখেছে।

বাসস্থান— দক্ষিণ ব্রহ্মদেশ থেকে টেনাসেরিয়াম, থাই ও ইন্দোচীন। ভারতে পূর্বে— নেপাল, সিকিম, উত্তরবঙ্গ, ভূটান, আসাম, অরুণাচল, মণিপুর, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে।

খাদ্য— প্রধানত ফল-পাকুড় ; কখনও কখনও পোকামাকড়।

স্বভাব গভীর জঙ্গলের পাখি। আচার-ব্যবহার সেকরা-পাখির মতোই। ডাকটা ধাতব এবং খানিকটা জোকারে পাখির মতো একঘেয়ে 'কুউ-টারর্ কুউ-টারর্ .... টুউ-বুক টুউ-বুক'।

প্রজননকাল— এপ্রিল থেকে জুনের প্রথমার্ধ। অন্যান্য বসন্ত বউরির মতো গভীর জঙ্গলে গাছের ডালে সুড়ঙ্গ করে বাসা বানায়। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই ডিমে তা' দেওয়া থেকে সন্তান প্রতিপালনে পরস্পরকে সাহায্য করে। ডিম পাড়ে 2 - 4টি সাদা রঙের। ডিমের গড় মাপ— 24.5 × 18.3 মিমি. অর্থাৎ লম্বায় 0˙96, চওড়ায় 0˙72 ইঞ্চি।

নীলকণ্ঠ বর্গ

নীলকণ্ঠ বর্গে (অর্ডার কোরাসিয়িফর্মেস) পৃথিবীতে 10টি বংশ এবং 192টি প্রজাতি আছে। তার মধ্যে ভারত ও তৎসংলগ্ন স্থানে দেখা যায় 5টি বংশ— মৎস্যরঙ্গ (আলসেডিনিদি), শার্ঙ্গ (মেরোপিদি), নীলকণ্ঠ (কোরাসিয়িদি), প্রিয়াত্মজ (বুসেরোটিদি) ও পুত্রপ্রিয় (উদুপিদি) এবং 60টি প্রজাতিকে। এরা সবাই যুক্তাঙ্গুল গোষ্ঠীর (সিনড্যাকটাইলাস) পাখি।

মৎস্যরঙ্গ বংশ

নীলকণ্ঠ বর্গের অন্তর্গত মৎস্যরঙ্গ বংশের (আলসেডিনিদি) গঠনবৈশিষ্ট্য হল চঞ্চু লম্বা, মোটা এবং সূঁচাল। উপরের চঞ্চু হয় গোল, না হয় কিঞ্চিৎ চ্যাপটা। লম্বা চঞ্চু সোজা ; শার্ঙ্গ বংশীয়দের মতো বাঁকা নয়। পা দুর্বল। চতুর্থ বা বাইরের আঙুল তৃতীয়ের সঙ্গে অর্ধেকের বেশি জোড়া এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের মধ্যে কেবল তলার দিকটা যুক্ত।

ভারতে মৎস্যরঙ্গ বংশে 5টি গণ— মণিচক (আলর্সেডো), বকতুণ্ডী (পেলারগপসিস), কপর্দিক (কেরাইল), কিকীদিবি (হালসিওন) এবং দিদিবি (কেয়িকস্)।

মাছরাঙা (Common Kingfisher)

পাখি চেনা, তাদের জানা, তাদের লক্ষ্য করার প্রথম যুগে শিকারের সঙ্গে মাছ ধরার নেশাও ছিল।

শেয়ালদা-ডানকুনি লাইনে দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত মাটি কেটে উঁচু করা হয়েছে, লাইনও পাতা হয়েছে। যাত্রী চলাচল অর্থাৎ লোকাল তখনও চালু হয় নি। এই লাইনের দু'দিকে ছিল বড়ো বড়ো জলা। বলা হতো সি সি আর কাটিং। এখন বসতি হয়ে চেনা যায় না। ছিটেফোঁটা দু-একটা পুকুর হয়ে আছে। বেশির ভাগই ভরাট হয়ে গেছে। ওই সব জলায় মাছ ধরার জন্য পাস দিত চার আনায় (পঁচিশ পয়সা) একটা হুইল আর একটা হাত ছিপ। কোথাও যাবার না থাকলে বাসে করে দক্ষিণেশ্বর ও বরানগরের ডানলপ ব্রিজের কাছে নেমে যেতাম সেই বিরাট বিরাট জলায়। মাছও উঠত মন্দ নয়। মাছ না উঠলেও জলার ধারে হোগলা ও নলখাগড়ার বনের পাশে বসে প্রকৃতির নিস্তব্ধতার বানীতে আর তার মাঝে যে সংগীত উঠত তাতেই মন ভরে যেত। সেই আকর্ষণও টেনে নিয়ে যেত বারে বারে সেই পরিবেশে।


চি ৪. মাছরাঙা

চার-টার করে বেশ গুছিয়ে বসেছি। ফাতনার দিকে দৃষ্টি। মনে হচ্ছে চারে মিরগেল এসেছে। বিজকুড়ি কাটছে বড়ো বড়ো ঝাঁকে।

পরিষ্কার দিন। আকাশে সাদা মেঘের সঙ্গে কিছু ধূসর মেঘের মেলামেশা। দু'পাশেই নলখাগড়ার ঝোপ কিন্তু খুব ঘন নয়। ঝিমে টোপ ফেলে বসে আছি। বেলা এগারোটা কি সাড়ে এগারোটা হবে, হঠাৎ পিছনে একটা 'চি-চিই....চি-চি চিচিচি ই-ই' শব্দ শুনছি। কে যেন ঝড়ের বেগে আসছে। আমার বাঁ-পাশে হাত ছয়-সাত দূরে নলখাগড়ার একটা ডাল জলের দিকে হেলে আছে, তার উপর এসে বসল একটা পাখি। আহা, কি তার রঙ। সবুজ, নীল, বাদামী। শরীরের চেয়ে চঞ্চুটাই বড়ো। বেঁটেসোটা গড়ন, মাথাটা নিচু করে চুপ করে একদৃষ্টে জলের দিকে তাকিয়ে আছে, ঠিক আমি যেমন ফাতনার দিকে। মাথাটা থেকে থেকে ঝাঁকি দিয়ে উপর-নিচ, এপাশ-ওপাশ করছে। সেই সঙ্গে চলছে বেঁড়ে লেজটির নাচন এবং মুখে আওয়াজ 'ক্লিক'। দুই মৎস্য শিকারী বসে আছে। একজনের জলের দিকে দৃষ্টি, অপর জনের ফাতনায়।

আমার ফাতনা না উপর দিকে উঠছে, না চাপ পড়ে অল্প নামছে, না কাঁপছে, একেবারে নট নড়ন-চড়ন নট কিচ্ছু। হঠাৎ পাখিটা ঝপ্ করে সোজা ডাইভ দিয়ে জলের মধ্যে পড়ে জল ছিটিয়ে দিল ডুব। মুহূর্ত মধ্যে উঠে এল চঞ্চুর ফাঁকে ধরা আড়াআড়িভাবে একটা ছোটো মাছ। ঝড়ের বেগে উড়ে গিয়ে বসল একটু দূরে আর একটি শরের উপর। মাছটা ঝটপট করছে। পাখিটার ভ্রূক্ষেপ নেই। ডালের উপর গোটা কয়েক ঠোকা দিয়ে কাবু করে মাথাটা গলার মধ্যে আগে নিয়ে গিলে ফেলল একগ্রাসে। তারপরেই জল ঘেঁসে প্রায় ছুঁয়ে উড়ে গেল— 'চিচি-চিচি ই-ই' করতে করতে। ব্যর্থ শিকারী আমিই কেবল ফাতনার দিকে চেয়ে বসে রইলাম।

সার্থক-শিকারী পাখিটা মৎসরঙ্গ বংশের মণিচকগণের (আলসেডো) এক *প্রজাতি*; নাম— মাছরাঙা, ছোটো মাছরাঙা (আলসেডো অ্যাটথিস্)। হিন্দি— *ছোটা কিলকিলা, নিকা কিলকিলা*। ইংরেজি— *কমন কিংফিশার, ইন্ডিয়ান স্মল ব্লু কিংফিশার*।

মাছরাঙা লম্বায় 18 সেমি (7 ইঞ্চি)। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। মাথার উপর সরু কালো-নীলের টানা টানা দাগ। লম্বা ভারী সূঁচল চঞ্চুর গোড়া থেকে চোখের নিচ হয়ে ঘাড়ের দু'পাশে উজ্জ্বল বাদামী টান, তার শেষে সাদা ছোপ। চোখের সামনে কালো দাগ, চওড়া গোঁফের মতো টানা উজ্জ্বল নীল। উপরের পালক উজ্জ্বল নীল, ধারে এবং ডানায় সবুজ ভাব। ডানার লুক্কায়িত অংশ

ও লেজের তলা পাটকিলে। চঞ্চু কালো ; স্ত্রী এবং অপরিণত পুরুষের তলার চঞ্চুর গোড়া কমলা-লাল। পা প্রবাল-লাল, দুর্বল তৃতীয় ও চতুর্থ আঙুলের কিছু অংশ জোড়া। নখর ছাই-রঙা।

বাসস্থান— মেরু অঞ্চল ছাড়া সমগ্র ইওরোপ ও এশিয়া ; দক্ষিণে মালয়েসিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়া, সলোমন দ্বীপপুঞ্জে পর্যন্ত। ভারতের *3টি প্রজাতির* মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের যে *প্রধান প্রজাতি* তার *3টি* উপজাতি। *প্রথম* (আ অ্যা বেঙ্গলেনসিস)— পাকিস্তান, নেপাল, সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে 1800 মিটারের ভিতর। *দ্বিতীয়* 'সেন্ট্রাল এশিয়ান স্মল ব্লু' (আ অ্যা পাললাসিয়ি)— পাকিস্তান, কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে। শীতে বা খরার সময় দক্ষিণে নেমে আসে রাজস্থান, উত্তর মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের সমতলে। গ্রীষ্মে 1850 মিটারেও দেখা যায়। *তৃতীয়*— 'সিলোন স্মল ব্লু' (আ অ্যা টাপ্রবানা)— দক্ষিণ ভারত, মধ্য বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশের ভূপাল, রাজস্থানের আবু পাহাড়, ওড়িশা এবং শ্রীলঙ্কায়। এদের নীল অংশ আরও গাঢ়। *দ্বিতীয় প্রজাতি* (আ মেনিনটিংগ) 'নীলকান মাছরাঙা'— নেপাল, সিকিম, ভূটান, আসাম, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, পশ্চিমঘাট, মহীশূর, কেরালা, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ও শ্রীলঙ্কায় : ঘন জঙ্গলের বাসিন্দা। *তৃতীয় প্রজাতি* (আ হারকিউলিস),— 'বুড়ো নীল মাছরাঙা'। —সিকিম, ভূটান, পূবে অরুণাচল, আসামের কাছাড় ও শ্রীহট্ট, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, বাংলাদেশ থেকে ব্রহ্মদেশ, উত্তর ভিয়েতনাম ও হাইনান দ্বীপপুঞ্জে গাঢ় চিরসবুজ জঙ্গলে গাছে ঢাকা স্রোতস্বতীর ধারে। লম্বায় 20 সেমি (8 ইঞ্চি)।

খাদ্য— ছোটো মাছ, ব্যাঙাচি এবং জলজ কীট ও তাদের শূক।

স্বভাব— ছোটো মাছরাঙা বা মাছরাঙা বাংলার অতি পরিচিত জলের ধারের পাখি। যেখানেই পুকুর, বিল, খাল, নালা, জলাশয় সেখানেই মাছরাঙা। সময়ে সময়ে সমুদ্রের বা খাঁড়ির কাছেও এদের দেখা যায়। সাধারণত খাদ্য সংগ্রহ করে জলের উপর ঝুলে থাকা গাছের ডাল, জলে পোতা বাঁশ বা নলখাগড়ার শর ইত্যাদির উপর বসে। বসে থাকে চুপ করে শিকারের আশায় কখন জলের উপর কিছু ভেসে উঠবে। কখনও কখনও 2 বা 3 মি. উঁচু থেকে জলের উপর খাড়া দাঁড়ায়, ঘনঘন ডানা সঞ্চালন করে এবং সেখান থেকে মাথা নিচু করে ডাইভ দিয়ে শিকার ধরে।

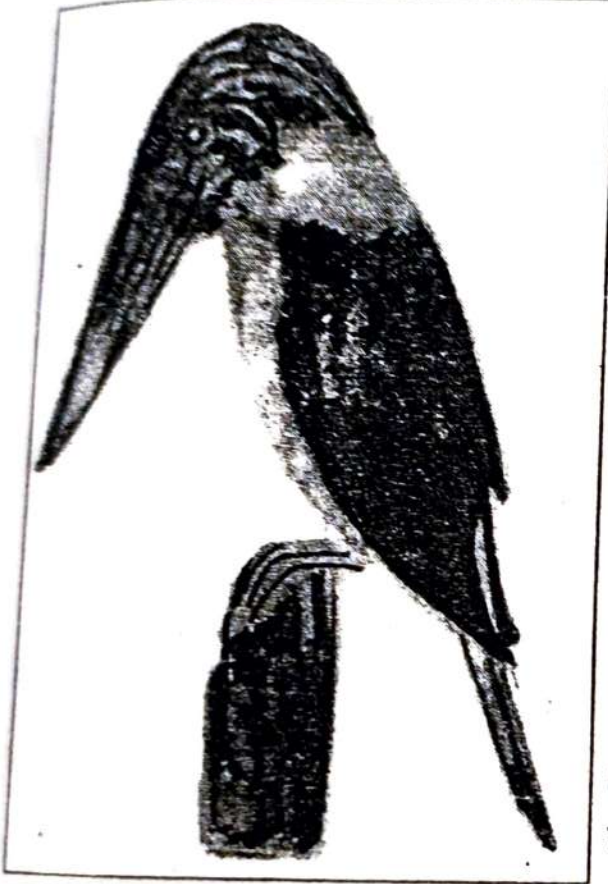
মাছরাঙার ওড়া খুব দ্রুত এবং সোজাসুজি। 'চি-চি....চি-চি-ই' ডাকতে ডাকতে জল ঘেঁষে ওড়ে। এই সময় ওদের রঙের বাহার চোখে পড়ে। ভয়ঙ্কর ঝগড়াটে পাখি। যে-জলের ধারে যে-জোড়া খাদ্য সংগ্রহের স্থান বেছে নেয় তার ধারে-কাছে অপর কোনও জাতভাইকে একদম ঘেঁষতে দেয় না। নিজের চৌহদ্দি সম্বন্ধে এরা খুব সচেতন।

প্রজননকাল— প্রধানত মার্চ থেকে জুন হলেও অনেক সময় সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডিম পাড়তে দেখা গেছে। বাসা বাঁধে সাধারণত জলের ধারে খাড়া পাড়ের মধ্যে গর্ত করে। সেই সুড়ঙ্গ বাসার মুখের ব্যাস 5 সেমি., লম্বায় 25 থেকে 100 সেমি., তার পরে 13 - 16 সেমি., চওড়া ডিম-ঘর।

ডিম পাড়ে 5 থেকে 7 টি চকচকে সাদা। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই সুড়ঙ্গ কাটে, ডিমে তা' দেয়। সন্তান প্রতিপালন করে। মনে হয় 19-21 দিনেই ডিম ফোটে। ডিমের গড় মাপ 20.9×17.6 মিমি।

গুড়িয়াল (Stork-billed Kingfisher)

বর্ষাকালে ছুটির দিনে পাখি লক্ষ্য করতে শিবপুরে বটানিকসেই বেশি যাই। সেদিন সকালে বাস থেকে নেমে ধরেছি গঙ্গাকে বাঁয়ে রেখে যে রাস্তা গেছে সেটাকে। খুবই নির্জন। এসময় লোকজন প্রায় থাকে না বললেই চলে। চলেছি। দু'দিকে গাছের বেশ ঘন সমাবেশ। ডানদিকে গাছপালার মাঝে বড়ো লম্বাটে ডোবা। হঠাৎ বাঁ পাশে গাছাপালার ভিতর থেকে কর্কশস্বরে 'কেএ-কে-কে-কে...' আওয়াজে চমকে উঠে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে পড়লাম। প্রথম 'কে-এ'-টা হঠাৎ এত জোরে যে এই নির্জন পরিবেশে গাটা ছমছম করে উঠল মুহূর্তের মধ্যে। তারপরেই দেখলাম চোখের উপর দিয়ে উড়ে গেল রক্তরাঙা বড় চঞ্চুওয়ালা নীল গা ফিকে বাদামী মাথা এক পাখি— 'কেএ-কে-কে...' ডাকতে ডাকতে। বসল গিয়ে ডোবার কিনারার পাতার আড়ালে একটা গাছে।



চি 9. গুড়িয়াল

পাখিটাকে দেখা যাচ্ছে না। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছি পাখিটা কি করে। আরও কাছে যাবার ইচ্ছে থাকলেও সেটা সম্ভবপর নয়, কারণ পাখিটা ডোবার ওপারে পাতার আড়ালে। পাখিটা ওখান থেকে উড়ে অন্য কোথাও যায়, না মাছ ধরে, তাই লক্ষ্য করার জন্যে ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে চললাম। আধ ঘণ্টাটাক হবে নিশ্চয়ই, বেশিও হতে পারে, জলের উপর ঝুঁকে পড়া ডাল থেকে ঝপ্ করে জলে পড়ে পাশের আর-একটা গাছের পাতার আড়ালে চলে গেল। তড়িৎগতিতে ঘটনাটা ঘটল। মাছ ধরল কিনা বুঝতে পারলাম না। অল্প পরেই পাখিটা 'কেএ-কে-কে...' ডাকাতে ডাকতে চলে গেল সম্পূর্ণ উলটো দিকে।

পাখিটা মৎস্যরঙ্গ বংশের অন্তর্গত বকতুণ্ডী গণের (পেলারগপসিস্) *এক প্রজাতি* ; নাম— গুড়িয়াল, ঢোঁসা (পেলারগপসিস্ ক্যাপেনসিস্), হিন্দি— *বড়া কিলকিলা, বাদামী কৌরিলা*, ইংরেজি— *স্টর্কবিলড্ কিংফিশার, ব্রাউনহেডেড স্টর্কবিল্ড কিংফিশার।*

গুড়িয়াল বা ঢোঁসা চঞ্চু সমেত লম্বায় 38 সেমি (15 ইঞ্চি)। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। মাথা, ঘাড় ও মাথার দু' পাশ গাঢ় পাটকিলে ; পিঠ, ডানা ও লেজ সবজেটে-নীল, সবুজের ভাগটাই বেশি। চিবুক ও গলা সাদাটে, বাকি তলার পালক পাটকিলে-হলুদ। কনীনিকা গাঢ় পিঙ্গল ; চঞ্চু

টুকটুকে রক্তরাঙা লাল, একদম ডগায় একটু কালো-ভাব ; পা এবং আঙুল প্রবাল-লাল।
টুকটুকে রক্তরাঙা লাল, একদম ডগায় একটু কালো-ভাব ; পা এবং আঙুল প্রবাল-লাল। ভারত, বাংলাদেশ থেকে ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন, মালয়েশিয়া, সুন্দা, ফিলিপাইন, সেলিবিস,

বাসস্থান— ভারত, বাংলাদেশ থেকে ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন, মালয়েশিয়া, সুন্দা, ফিলিপাইন, সেলিবিস, সুলা দ্বীপপুঞ্জ। ভারতে *2টি প্রজাতি। প্রথম প্রজাতির 3টি উপজাতি।* *প্রথম* (পে ক্যা ক্যাপেনসিস্)— উত্তরপ্রদেশ থেকে হিমালয়ের নিম্নাংশ ধরে নেপাল, আসাম, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ থেকে খান্দেশ, দক্ষিণে মহীশূর, মাদ্রাজ, কেরালা এবং শ্রীলঙ্কায়। *দ্বিতীয়* ((পে ক্যা অসমাস্টোনি)— আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। *তৃতীয়* (পে ক্যা ইণ্টারমিডিয়া)— নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। *দ্বিতীয় প্রজাতি* (পে আমাউরোপটেরা) 'বাদামী-ডানা ঢোঁসা,' ব্রাউন-উইংগড্ স্টর্কবিলড্ কিংফিশার— দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, দক্ষিণ আসাম থেকে দক্ষিণে সমুদ্রতীরবর্তী আরাকান, টেনাসেরিয়াম, মালয় উপদ্বীপ থেকে লাংগকায়ি দ্বীপপুঞ্জে। লম্বায় 36 সেমি. (14 ইঞ্চি)। যারা সমুদ্র উপকূলের বাসিন্দা তাদের লোনাজলই পছন্দ। এদের লাল চঞ্চুটা একটু বেশি বড়ো।

স্বভাব— গুড়িয়াল বা ঢোঁসা জল এবং ঘন গাছপালার সমন্বয় এমন যে জায়গা তার অধিবাসী। জঙ্গলের মধ্যে গাছে ঢাকা ছোটো নদী, জঙ্গলের মাঝে ডোবা বা পুকুর এমনকি জলা বা বাদার ধার পছন্দ করে বেশি। সেইজন্য মরুভূমি সদৃশ অঞ্চলে এদের কখনও দেখা যায় না। সমুদ্রের ধারে ঝাঁড়ির আশেপাশেও দৃষ্টিগোচর হয়। সাধারণত জোড়েই থাকে কিন্তু দু'জনে বেশ তফাতে বিচরণ করে। কেউ কারুর শিকারভূমির বিশেষ জায়গায় পদার্পণ করে না। একমাত্র এক স্থান থেকে অপর স্থানে যাবার সময় দেখা যায় দু'জনে উড়ে চলেছে।

গুড়িয়ালকে দেখা যায় কম, ডাকই শোনা যায় বেশি। কর্কশ প্রথম 'কেএ'-র উপর জোরটা দেয় বেশি, তারপর চলে 'কে-কে-কে....'। আপন মনে কোনও জায়গায় বসে যখন গলা ভাঁজতে থাকে— 'পি-ই-র... পিইর... পার,' তখন সেটা শুনতে মধুরই লাগে।

জলের ধারে ঝুলেপড়া গাছের ডালে বা জলের কাছেই কোনও ঘন পাতা সমৃদ্ধ গাছের ডালে লুকিয়ে বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কখন একটা মাছ জলের উপরে আসবে। দেখতে পেলেই হল, ঝাঁপিয়ে পড়বেই, তার জন্যে জলের মধ্যে ডুবে যেতে আপত্তি নেই, কিন্তু ফিরবে যখন, তখন মুখে একটা মাছ থাকবেই। ছোটো মাছরাঙা বা অন্যান্য মাছরাঙাদের মতো এরা জলের উপর উঁচুতে খাড়া দাঁড়িয়ে থেকে তারপর সোজা ডাইভ দিয়ে কখনও শিকার ধরে না। পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে এদের টেলিগ্রাফ তারের উপরও বসে থাকতে দেখা যায়।

গুড়িয়ালের ওড়াটা সোজাসুজি এবং দ্রুত। সময়ে সময়ে দেখা যায় এরা খুব লাজুক। মানুষ দেখলেই সরে পড়ে। আবার কখনও কখনও তাদের লক্ষ্য করছে দেখলেও ভ্রূক্ষেপ করে না।

প্রজননকাল— জানুয়ারি থেকে জুলাই। কোথাও কোথাও আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত গড়ায়। কখনও কখনও দু'বার ডিম পাড়ে। নদীর ধারে খাড়া পাড়ে গর্ত খোঁড়ে 10 সেমি. চওড়া এবং 1-2 মিটার লম্বা। গর্তের শেষে আস্তরণহীন ডিম-ঘর। ডিম পাড়ে 4-5টি গোলাকার চকচকে সাদা। স্ত্রী-পুরুষ ঘরগেরস্তালীর কাজে পরস্পরকে সাহায্য করে। ডিমের গড় মাপ— 36.6 × 31.2 মিমি. (লম্বায় 1.45, চওড়ায় 1.23 ইঞ্চি)।

কড়িকাটা (Pied Kingfisher)

সেদিনও সি সি আর কাটিং-এর সবচেয়ে বড়ো যে ঝিল তাতে মাছ ধরতে বসেছি। পিছনে রেল লাইনের উঁচু পাড়। এই ঝিলটা খুব পরিষ্কার, কোথাও হোগলা বা নলখাগড়ার ঝাড় নেই। মাছও বেশ বড়ো বড়ো ধরা পড়ে। তারই অন্তত একটির আশায় চার করে খুব ঝিমে টোপ ফেলে বসে আছি। দুপুর গড়িয়ে গেছে। চারে মাছ আছে, টোপের আশে পাশে ঘুরছে, অল্প চাপ দিয়েই ছেড়ে দিচ্ছে। ছিপটি চেপে ধরে ফাতনার দিকে সমস্ত দৃষ্টি-মন লাগিয়ে বসে আছি। এমন সময় কানে এল 'চির্‌রুক... চির্‌রুক...' ডাক। কর্কশ নয়, বেশ জীবন্ত। যেখানে ঝিমে টোপ তার থেকে কিছু দূরে একটা কালো-সাদা জেব্রা-পাখি উড়ে এসে লেজটাকে নিচু করে গলাটা বের করে নিচুদিকে ঝুঁকে দুই ডানা সজোরে ঝাপটে শূন্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। প্রায় 8-10 মি. উঁচুতে কালো-সাদা ডোরাকাটা পাখিটা লেজের উপর ভর দিয়ে শূন্যে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফাতনা ছেড়ে দৃষ্টি ওর দিকেই গেল। হঠাৎ মাথা নিচু করে ওই অত উপর থেকে ডানা বন্ধ করে সোজা ডাইভ। ঝপাৎ করে জলে শব্দ, মুহূর্তমধ্যে জল থেকে উঠল, মুখে মাছ।



চি 10. কড়িকাটা

ফাতনার দিকে দৃষ্টি পড়তেই দেখি ফাতনা নেই, জলের তলায়। উত্তেজিত হয়ে সজোরে মারি টান।.... হুইলের মিষ্টি কড়ড়র শব্দ তুলে মাছ ছুটতে থাকে। পাখির দিকে নজর দেবার আর সময় নেই। শিকার ধরে উড়ে চলে যাচ্ছে সে। আমিও শিকার ধরেছি কিন্তু করায়ত্ত করার অনেক বাকি। শুধু কানে আসছে স্ফূর্তির তীব্র ডাক— 'চির্‌রুক...চির্‌রুক...।' ডাকটা কিন্তু কর্কশ নয়, প্রাণের স্পর্শ আছে।

কালো-সাদা ডোরাকাটা পাখিটা মৎস্যরঙ্গ বংশের অন্তগর্ত কপর্দিক গণের (কেরাইল) এক *প্রজাতি* ; নাম— কড়িকাটা, ফটকা মাছরাঙা, চিতে মাছরাঙা[1] (কেরাইল রুডিস্), হিন্দি— *কড়িয়ালা, কিলকিলা।* ইংরেজি— *পায়েড কিংফিশার। ভারতে 2 টি প্রজাতি।*

কড়িকাটা বা ফটকা মাছরাঙা লম্বায় 31সেমি. (12 ইঞ্চি)। পুরুষ পাখির মাথায় ঝুটি কালো, তার উপর সাদা ছিট। ঝুঁটির ঠিক নিচে চোখের উপরভাগ দিয়ে সাদা একটা টানা লাইন। ছোরা-আকারে কালো মোটা চঞ্চুর গোড়া থেকে চোখের উপর দিয়ে একটা কালো লাইন ঘাড়ের উপর দিয়ে এসে বুকে মালার আকার নিয়েছে। এই কালো চওড়া মালাটার একটু নীচে আর একটি অপেক্ষাকৃত সরু কালো লাইন মালার মতো। পিঠের উপরের পালক কালো-সাদায় মেশানো। ওড়ার

[1] চিতে মাছরাঙা— নামকরণ— Sen Gupta, P. K, Brids around Santiniketan -6, Visvabharati News, August 1957, p 13.

পালক সাদা, তার উপর গোটাকতক কালো টান। লেজ সাদা, লেজের ডগার একটু উপরে চওড়া কালো পট্টি। তলার সব পালক রূপোলি-সাদা ওই দুটি মালা ছাড়া ; বুকের দু'পাশে আর গলায় কয়েকটা করে কালো দাগ। স্ত্রী-পাখির গলায় দ্বিতীয় কালো মালাটা থাকে না, প্রথমটারও মাঝখানটা ভাঙা। উভয়ের কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু ও পা পাটকিলে-কালো। পায়ের বাইরের আঙুল মাঝেরটার সঙ্গে অনেকটা জোড়া।

বাসস্থান— সমগ্র ভারত, একমাত্র কেয়ালা ছাড়া, নেপাল, সিকিম, ভূটান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ। দেখা যায় যে কোনও জলের ধারে। ভারতের বাইরে পশ্চিমে আফগানিস্তানের পুবে ভিয়েতনাম, বর্মা থেকে টেনাসেরিয়াম, থাইদেশ।

খাদ্য— প্রধানত মাছ, সেই সঙ্গে ব্যাঙাচি ও জলজ পোকামাকড়।

স্বভাব— সাধারণত জোড়ায় থাকে, কখনওবা একা, আবার মাঝে মাঝে পারিবারিক 4-5-এর দলে। বেশি দেখা যায় জলের উপরে বা ধারে পাথর বা বাঁশের খোঁটার উপর বসে লেজটা উপর-নিচ করে নাড়াচ্ছে। শান্ত নদীর বুক, জলা, কাদা, দীঘি ইত্যাদির উপর 8-10মি. উঁচুতে আসা-যাওয়া করছে, চঞ্চুটাকে নিচের দিকে করে বাতাসের বিরুদ্ধে দ্রুত ডানা ঝাপটিয়ে, আর দেখছে জলের কত গভীরে তার শিকার— মাছ আছে। যখন বোঝে জলের ওই গভীরে শিকার ধরতে কোনো অসুবিধে হবে না, তখনই মাথা নিচু করে, ডানা মুড়ে, সোজা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত নেমে এসে জলের মধ্যে ডুবে শিকার ধরে। ধরেই মুহূর্তমধ্যে জল থেকে উঠে উড়ে গিয়ে বসে কাছের কোনো জায়গায়। কয়েকটা ঠোক্কর মেরে তাকে কবজা করে মাথাটা মুখের মধ্যে আগে চালান করে গিলে খায়। ছোটো মাছ হলে শূন্যে উড়তে উড়তেই গলার মধ্যে চালান করে।

প্রজননকাল— সারা বছরই, মনে হয়, একমাত্র ঘোরতর বর্ষাকাল ছাড়া, তবে ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিলেই বেশি ডিম পাড়ে। নদী বা স্রোতস্বতীর খাড়া পাড়ে 7 - 8 সেমি. ব্যাসের 1.5 থেকে 2 মিটার লম্বা গর্ত খোঁড়ে স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই, তার শেষে ডিম-ঘর। কোনো আস্তরণ বিছায় না। 5-6 টি সাদা চকচকে ডিম পাড়ে। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই ঘর-গেরস্তলি কাজ করে। ডিমের গড় মাপ 29.9 × 21.4 মিমি.।

সাদাবুক মাছরাঙা (White-throated kingfisher)

পাখি দেখতে বা লক্ষ্য করতে বেরিয়েছি। সেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বরের দিকে চলেছি রেলের লাইন ধরে, রাস্তা দিয়ে নয়। দিয়ারা পার হয়ে নসিবপুরের দিকে যেতে হঠাৎ টেলিগ্রাফের তারের উপর একটি পাখির দিকে নজর পড়ল। মোটা লম্বা চঞ্চু ; বুকটা সাদা। স্যুটপরা কোটের বোতাম লাগানো লোকের শুধু গলা ও বুকে সাদা সার্টটা যেমন দেখা যায় ঠিক তেমন। ওই সাদাকে ঘিরে আছে বাদামী-লাল রঙ। পাখিটাকে মাছখেকো বলেই জানি এবং পুকুরপাড়ে গাছের উপরও



চি ।।. সাদাবুক মাছরাঙা

দেখেছি। বংশের ধরায় মাছই প্রধান খাদ্য বলে জানি। কিন্তু ধারে-কাছে পুকুর নেই, তেমন কিছু জলের জায়গাও দেখছি না, অথচ বসে আছে নীলকণ্ঠ পাখির মতো টেলিগ্রাফের তারে। দাঁড়িয়ে পড়ে দেখতে থাকি।

পাখিটা থেকে থেকে ঝুলন্ত লেজটাকে দোলাচ্ছে। সেই ছন্দে মাথাটাকেও উপর-নিচ সামনে-পেছনে করছে।... দোলানি বন্ধ করছে। দেখি স্থির হয়ে মুখটাকে নিচু করে মাটির দিকে কি যেন দেখছে। খানিক বাদেই ঝপ্ করে মাটিতে নেমে এসে ধরলো একটা বড়ো- গোছের ঘাসফড়িং। ধরেই উড়ে গিয়ে বসলো কাছেই একটা গাছে।

দেখলাম স্বভাবে নীলকণ্ঠ পাখির সঙ্গে খুবই মিল। বংশগত বৈশিষ্ট্য ছেড়ে ফড়িং খাচ্ছে দেখে প্রথমটা খুবই অবাক লেগেছে। তারপর মনে পড়লো, আরে! এ তো নীলকণ্ঠ-বর্গের পাখি, গোত্রের স্বভাব তো কিছু থাকবেই।

ঘাসফড়িং খেতে দেখলাম যে পাখিকে, সে হল মৎস্যরঙ্গ বংশের অন্তর্গত কিকীদিবি গণের (হালসিওন) *এক প্রজাতি*; নাম— সাদাবুক মাছরাঙা (হালসিওন স্মাইরনেনসিস্)। হিন্দি— *কিলকিলা, কৌড়িলা।* ইংরেজি— *হোয়াইট ব্রেস্টেড কিংফিশার।* ভারতে *4টি প্রজাতি।*

সাদাবুক মাছরাঙা লম্বায় 28 সেমি (11 ইঞ্চি)। মাথা, ঘাড় এবং পেট গাঢ় বাদামী-পাটকিলে। চিবুক, গলা ও বুকের মাঝ বরাবর ধবধবে সাদা। বাকি উপরের পালক গাঢ় উজ্জ্বল নীল, তার উপর সবুজের আভা। একটা কালচে পট্টি ডানার পাশে। ওড়ার পালক কালো, গোড়ার দিকের উপর সাদা ছোপ। কনীনিকা পাটকিলে; লম্বা ভারী সূঁচলো চঞ্চু গাঢ় নিষ্প্রভ লাল; পা প্রবাল-লাল, নখর ধূসর। পায়ের দ্বিতীয়-তৃতীয় আঙুল অংশত জোড়া।

বাসস্থান— মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইন্দোচীন, হাইনান দ্বীপ, ফরমোজা এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। ভারতে *4টি উপজাতি। প্রথম* (হা স্মা পেরপান্দ্রা)— পূর্ব মধ্যপ্রদেশ থেকে অন্ধ্র, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং বাংলাদেশে, 6 হাজার ফুটের ভিতর। *দ্বিতীয়* (হা স্মা স্মাইরনেনসিস্)— পাকিস্তান থেকে উত্তরপশ্চিম ভারতের কাছে, সৌরাষ্ট্র, পূর্বে উত্তরপ্রদেশ, নেপাল; দক্ষিণে বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ এবং অন্ধ্র। *তৃতীয়* (হা স্মা ফুসকা)— মহীশূর, গোয়া, পশ্চিম মাদ্রাজ, কেরালা এবং শ্রীলঙ্কায়। *চতুর্থ* (হা স্মা সাটুরাটিওর)— আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে।

খাদ্য— ঘাসফড়িং, ঝিঁঝিঁ পোকা, গঙ্গাফড়িং, পিঁপড়ে, উই ইত্যাদি কীটপতঙ্গ, কাঁকড়াবিছে, তেঁতুলেবিছে, কেন্নো, কাঁকড়া, ব্যাঙ, ব্যাঙাচি, টিকটিকি-গিরগিটি, ইঁদুর এবং ছোটখাটো অসুস্থ দুর্বল ও ছানা পাখি। মাছ প্রধান তালিকায় পড়ে না।

স্বভাব— সাদাবুক মাছরাঙা অন্যান্য মাছরাঙাদের মতো জলের ধারে থেকে কেবল মাছ মেরেই খায় না। এদের খাদ্যতালিকায় মাছটা গৌণ। এমনকি উড়ন্ত অবস্থাতেও কীটপতঙ্গ ধরে থাকে। অবশ্য মাছও মাঝে মাঝে ধরে অন্যান্য মাছরাঙাদের মতো জলের মধ্যে পড়ে। কাঁকড়া জলের

(Colla
Kingf

মধ্যে পেলে ছাড়ে না। ডাঙায় এনে ঠুকে ঠুকে থেঁতো করে গিলে খায়।

সাদাবুক মাছরাঙাকে মানুষের বাসস্থানের কাছে অথবা দূরে একা বা জোড়ায় দেখা যায়, জলে-ডোবা ধানখেত, পুকুর, ডোবা বা কাঁচা কুয়োর আশেপাশে এবং সমুদ্রের বালুতীরে। আর দেখা যায় জল থেকে অনেক দূরে জঙ্গল ঘেঁষে অথবা অন্যান্য স্থানে পোকামাকড় বা ছোটি-খাটো সরীসৃপ ইত্যাদি ধরে খেতে।

প্রত্যেকটি সাদাবুকের খাদ্যসংগ্রহের নিজস্ব এলাকা থাকে। সেখানে অপর কোনও মাছরাঙার একদম প্রবেশাধিকার নেই। কোনও রকম চেষ্টা করা সেখানে চলে না। নিজ এলাকা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন।

ডাক কর্কশ— 'ক্যা.... ক্যা.... ক্যা' খানিকটা ভূতুড়ে হাসির মতো। কিন্তু প্রজননকালে সাধারণত প্রতিটি সকালে তার পছন্দ মতো গাছের মাথায় বসে, যেখান থেকে তাকে স্পষ্ট দেখা যায়। পুরুষ-পাখি সেখানে ব'সে গান গায় মিষ্টি করে— 'কিলিলিলি...'। বারবার একই গান গায়। প্রায়ই দেখা যায় তার অল্প কিছু দূরে বসে আর-একটি অমন পুরুষ অমন সুরে গেয়ে চলেছে। কিলিলিলি চালাবার পর একটা 'ফ্যাঁচ' করে আওয়াজ করে, তারপর আবার শুরু করে গান। গাইবার সময় নিজেকে টান করে বসে, লেজটাকে যে সরু ডালে বসেছে তার তলায় যতদূর যায় বেঁকিয়ে রাখে, আর দু-এক সেকেন্ডের জন্য দুই ডানা ঈষৎ ফাঁক করে কাঁপাতে থাকে। এই সময় ডানার উপর সাদা ছোপটাকে দেখাতে থাকে, যদি কোনও স্ত্রী-পাখি তার সৌন্দর্যে এবং সংগীতে আকৃষ্ট হয়। মিলিত হবার জন্যে স্ত্রী-পাখি একটু দূরত্ব রেখে এসে দুই ডানা ফাঁক করে কাঁপায় আর মুখে আওয়াজ করে 'কিট-কিট-কিট কিট...' অর্থাৎ আমি এসেছি। এই ডাক বা আওয়াজটার সঙ্গে বিরক্ত-হওয়া কালো বুলবুলের আওয়াজের সাদৃশ্য দেখা যায়।

প্রজননকাল— জানুয়ারি থেকে আগস্ট, তবে মার্চ থেকে জুলাই প্রশস্ত সময়। বাসা বানায় শুকনো নালার খাড়া পাড়ে, রাস্তা বানাবার জন্যে খাড়া পাড়ের গায়ে, খানা বা খোঁদলের পাশে অথবা কাঁচা কুয়োর ভিতর সুড়ঙ্গ করে। সুড়ঙ্গ-মুখের ব্যাস প্রায় 3 ইঞ্চি, লম্বায় 6-7 ফুট, সুড়ঙ্গ শেষে ডিম-ঘর 8-9 ইঞ্চি চওড়া। ডিম-ঘরে কোনও আস্তরণ নেই, কিন্তু দুর্গন্ধময় কাঁটা-কোঁটা ও উদগারে পূর্ণ। ডিম পাড়ে 4 থেকে 7টি চকচকে— ধবধবে সাদা প্রায় গোলাকার শক্ত খোলার। বাসা বানানো থেকে সন্তানপালনের সব দায়িত্ব স্ত্রী-পুরুষ সমানভাবে পালন করে। ডিমের গড় মাপ— 2.9 × 2.6 সেমি. (লম্বায় 1.15, চওড়ায়, 1.05 ইঞ্চি)।

অন্যান্য মাছরাঙা

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে লোকের চোখে খুব কম পড়লেও আরও কয়েকটি মাছরাঙাকে দেখা যায়। তারা হল—

Todiramphus chloris.

1. **কণ্ঠী মাছরাঙা**— (হালসিও ক্লোরিস)। বাংলা- হিন্দি কোনো নামকরণ কখনও হয় নি। ইংরেজি— *হোয়াইট কলার্ড কিংফিশার*। কিকীদিবি গণের (হালসিওন) *দ্বিতীয় প্রজাতি*।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 1967 [illegible]

[illegible]



চি 12. কণ্ঠী মাছরাঙা

লম্বায় 24 সেমি. (সাড়ে 9 ইঞ্চি)। স্ত্রী-পুরুষ একই রকম দেখতে। মাথা, ঘাড় ও উপরের সব পালক সবুজাভ আকাশী-নীল, চিবুক ও গলার মাঝে সাদা কণ্ঠী। এক চোখ থেকে অপর চোখে মাথা ঘুরে কালো এক পট্টি। চোখের ঠিক নিচে সাদা ছোপ। গলার তলা থেকে বাকি তলার পালক সাদা। কনীনিকা গাঢ় পিঙ্গল ; চঞ্চু সবুজাভ-কালো। পা ও আঙুল স্লেট-কালো বা সীসে।

বাসস্থান— ভারতে 4টি উপজাতি। *প্রথম* (হা ক্লো হিউমিআই)— সুন্দরবন, পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্রতীরবর্তী স্থানসমূহ ও 24 পরগনার কিছু অংশ ও বাংলাদেশে। *দ্বিতীয়* (হা ক্লো ভিডালি)— মহারাষ্ট্রের সমুদ্রতীরবর্তী রত্নাগিরি জেলায়। *তৃতীয়* (হা ক্লো ডেভিডসনি)— আন্দামান ও কোকো দ্বীপপুঞ্জে। *চতুর্থ* (হা ক্লো অকসিপিটালিস)— নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে।

খাদ্য— কাঁকড়া, মনুমাছ (মাডস্কিপার, পেরিওফথালমাস), ঘাসফড়িং, ঝিঁঝিপোকা, গিরগিটি, বিছে এবং অন্যান্য কীটপতঙ্গ।

স্বভাব— সাদাবুক মাছরাঙার মতন। জেলেদের মাছধরার পর জাল ছাড়াবার সময় এদের ধারে-কাছে উড়তে দেখা যায়। ডাক দেয় কর্কশ— 'ক্রেরক্ ক্রেরক্-ক্রেরক্ ক্রেরক্'। প্রজননকালে ডাকাডাকিটা বেশি করে। পরস্পরের পিছনে তাড়া করে বেড়ায় এগাছ থেকে সেগাছে, আর মুখে এই কর্কশ ডাক দেয়।

মাঝে মাঝে কলকাতার শিবপুরে বটানিক্যাল গার্ডেনে এদের দেখা যায়। 1967 সালে স্বর্গত প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত ও লেখক বড়ো বটগাছটার কাছে ঝিলের ধারে গাছের ফোকরে এদের বাসা করতে দেখেছেন। সুন্দরবনে এদের দেখা যায় বেশ। কাকদ্বীপ থেকে নৌকোয় কচুবেড়িয়া, সেখান থেকে বাসে 19 মাইল বেগুয়াখালি বা গঙ্গাসাগরে গিয়েছি কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধুর সঙ্গে। পৌঁছেছি সন্ধ্যেবেলায়। ঝড় এবং স্টীমার উল্টে যাবার দিন কয়েক পরে। পরের দিন 24 জানুয়ারি 1969 সকাল বেলায় সাগরসঙ্গমে কপিলমুনির আশ্রম দেখতে বেরিয়েছি কজনে।[1] পথে ডানপাশে রাস্তা থেকে নেমে হেঁতালঝোপের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে ঝড়ে চাল উড়ে-যাওয়া, ভেঙেপড়া মাটির দেওয়ালের এক অংশ। সেই দেওয়াল থেকে বেরিয়ে আছে উপরে-নিচে দুটি বাঁশের খণ্ড। উপরেরটায় বসে আছে কণ্ঠী মাছরাঙা। ঠিক নিচের বাঁশে বসেছিল অপর একটি মাছরাঙা, যার আলোচনা এরপরেই করব। এত কাছে এই দুই প্রজাতির দেখা পাওয়া খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। সকালের আলোয় এদের নীলের বাহার ছিল দেখবার মতো।

[1] সর্বশ্রী নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, সন্তোষকুমার অধিকারী ও দেবকুমার বসু।

প্রজননকাল— মার্চ থেকে আগস্ট। গাছের গায়ে ফোকরে, গেছো পিঁপড়ের মেটে বাসার ভিতর, কখনওবা উইটিপির ভিতর বাসা বানায়। ডিম পাড়ে 3-4 টি প্রায় গোলাকার সাদা। ডিমের গড় মাপ— 29 × 24 মিমি. (লম্বায় 0.11, চওড়ায় 0.09 ইঞ্চি)।

(Black - capped Kingfisher)

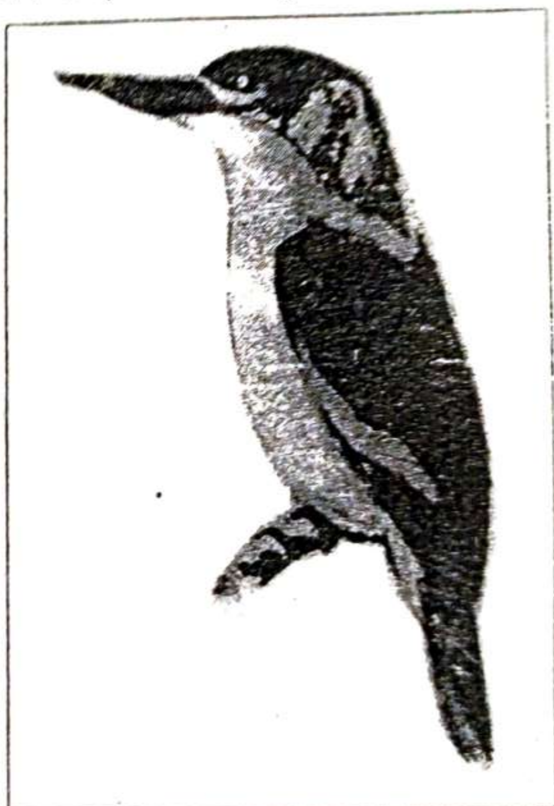
2. **কালোমাথা মাছরাঙা**— (হা পাইলেয়াটা)। বাংলা নামকরণ হয় নি। হিন্দি— *আবলক টিঙিক, কৌড়িলা* (সাধারণত সব মাছরাঙারই এই নাম)। ইংরেজি— *ব্ল্যাক-ক্যাপড কিংফিশার।* কিকীদিবি গণের *তৃতীয় প্রজাতি।* একেই দেখেছিলাম কণ্ঠী মাছরাঙার সঙ্গে।

লম্বায় 30 সেমি. (12 ইঞ্চি)। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। মাথার চাঁদি ভেলভেট-কালো, ঘাড়ে সাদা কলার, বাকি উপরের পালক উজ্জ্বল বেগুনি-নীল, কেবল ডানায় সাদা ছোপ। নিচের সমস্ত পালক ফিকে লালচে-হলুদ। কনীনিকা গাঢ় পিঙ্গল, চঞ্চু প্রবাল লাল, পা ও আঙুল গাঢ় লাল।

বাসস্থান— সমুদ্রতীরবর্তী স্থান, বোম্বাই থেকে পশ্চিমঘাট ধরে দক্ষিণে, পুবে পূর্বঘাট ধরে সুন্দরবন পর্যন্ত, বাংলাদেশ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। সমুদ্রের ধার, খাঁড়ি ইত্যাদি ছাড়াও বড়ো বড়ো নদী ও তার উপনদীর তীর ধরে উত্তরপ্রদেশ (বিশেষত গোন্দা জেলায়), বিহারের মুঙ্গের, মধুবাণী, ত্রিহুত, অঙ্গ, রাজস্থানের ভরতপুর, আসামের উত্তর লখিমপুর, নাগা পর্বত এবং মণিপুরের উত্তরাংশে।

খাদ্য— প্রধানত মাছ, ব্যাঙ, কাঁকড়া ; কীটপতঙ্গ টিকিটিকি-গিরগিটি এবং ছোটো প্রাণী।

স্বভাব— প্রায় সাদাবুক মাছরাঙার মতন। কর্কশ ডাক 'ক্যা-ক্যা' অনেকটা সাদাবুকের মতো হলেও আওয়াজের জোর কম, একটু তীক্ষ্ণ। সাধারণত ওড়ে নিঃশব্দে। একাই বিচরণ করে। নিজ এলাকার শিকার-ভূমির মধ্যে কয়েকটা বিশেষ খুঁটি বা ডাঙা থাকে। সেগুলিতেই দিনের পর দিন এসে বসে।



চি 13. কালোমাথা মাছরাঙা

প্রজননকাল—মে থেকে জুলাই। জঙ্গলের মধ্যে নদীর খাড়া পাড়ে সুড়ঙ্গ করে বাসা বানায়। ডিম পাড়ে 4-5 টি, প্রায় গোলাকার সাদা। ডিমের গড় মাপ— 29.6 × 26.3 মিমি. (লম্বায়— 1.26, চওড়ায় 1.03 ইঞ্চি)।

(Ruddy Kingfisher)

3. **লাল মাছরাঙা**— (হা কোরোমাণ্ডা)। বাংলা- হিন্দি নামকরণ হয় নি। কাছাড়ি— *দাও-নাটু-গাজাও,* ইংরেজি— *রাডি কিংফিশার।* কিকীদিবি গণের *চতুর্থ প্রজাতি।*

লম্বায় 26 সেমি. (সাড়ে 10 ইঞ্চি)। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। মাথা, ঘাড়, পিঠের উপরের অংশ

ফিকে লালচে-বাদামী। পিঠের মাঝখান থেকে বস্তিপ্রদেশ ফিকে নীলচে-বেগুনি, বস্তিপ্রদেশ সাদা। নিচের সব পালক ফিকে লালচে। কনীনিকা গাঢ় পিঙ্গল, চঞ্চু ও পা উজ্জ্বল লাল।

বাসস্থান— নেপাল, সিকিম, ভূটান, আসাম, নাগাভূমি, মণিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ।

খাদ্য— মাছ, কাঁকড়া, ঘাসফড়িং ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ, ছোটখাটো প্রাণী।

স্বভাব— লাল মাছরাঙা স্বভাবত লাজুক। প্রধানত উত্তরবঙ্গের জঙ্গলের বাসিন্দা। জঙ্গলের মধ্যে দেখা যায় দ্রুত লাল পাখি উড়ে যেতে। দেখার চেয়ে এদের ডাক শোনা যায় বেশি। ডাকে সাদাবুকের মতন, তবে অনেক জোরে, কিন্তু কর্কশ নয়, মোটামুটি মিঠে।

আসামে উত্তর কাছাড়ের জাতিঙ্গা গ্রামের যে পাখির জহরব্রতর কথা জানা যায়, সেইসব পাখির মধ্যে লাল মাছরাঙাই প্রধান। বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন কালো রাতে দক্ষিণ থেকে উত্তর-পশ্চিমে হাওয়া বইলে এই ঘটনা ঘটে। শুধু জাতিঙ্গায় নয়, আরও অনেক স্থানে জঙ্গলের মধ্যে বাংলোর পেট্রম্যাক্সের আলো দেখে এবং প্রায়ই লাইটহাউস ও আলোকময় জাহাজে (বিশেষত মালাক্কা প্রণালীতে) অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরে এইভাবে পাখিদের ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যায়। কেন যে আলো বা আগুন দেখে এরা আকৃষ্ট হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, তার সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এখনও স্থির হয় নি। কারো মতে ঘন বর্ষার রাতে এরা পরিযায়ী হয় এবং আলো দেখে দিগ্‌ভ্রম হয়ে এই কাণ্ডটি করে। আমার মনে হয়, হরমোন গ্রন্থির কোনো স্ফুরণ বা ক্ষরণের ফলে এটা ঘটে থাকে। কেননা এরা একটা ঘোরের মধ্যে এই কাণ্ডটা করে। সবই পরীক্ষাসাপেক্ষ।

প্রজননকাল— মার্চ-এপ্রিল। চিরহরিৎ জঙ্গলে, জঙ্গলাকীর্ণ গিরিখাতের গায়ে সুড়ঙ্গ করেই বাসা বানায়। কখনও দেখা যায় জঙ্গলের মধ্যে গাছের বেশ উঁচুতে কাণ্ডের মধ্যে গর্ত করে বাসা বানাতে। ডিম পাড়ে 5-6 টি চকচকে সাদা। ডিমের গড় মাপ— 27.3 × 23.2 মিমি. (লম্বায় 1.07, চওড়ায় 0.91 ইঞ্চি)।

(Blue - eared Kingfisher)

4. নীলকান মাছরাঙা— (আলসেডো মেনিনটিং)। বাংলা-হিন্দি নাম নেই। ইংরেজী— *ব্লু-ইয়ার্ড কিংফিশার।* মনিচক গণের (আলসেডো) এক *প্রজাতি।*

লম্বায় 16 সেমি (6 ইঞ্চি)। মোটামুটি ছোটো মাছরাঙার মতো দেখতে, তবে আকারে ছোটো। সেইজন্য সাধারণ লোকে তফাৎ ধরতে না পারায় নামকরণ হয় নি। চোখের নিচে কানের উপর ছোটো মাছরাঙার বাদামী টানের জায়গায় এদের নীল। কনীনিকা পাটকিলে, উপরের চঞ্চু শিঙে-পাটকিলে, নিচের চঞ্চু পাটকিলে, মুখের ভিতর কমলা-প্রবাল, পা ও নখর কমলা-প্রবাল।

বাসস্থান— নেপাল, সিকিম, ভূটান, আসাম, নাগাভূমি, মণিপুর, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ; পশ্চিমঘাট অঞ্চলে গোয়া, মহীশূর, নীলগিরি পর্বত। কেরালা ; শ্রীলঙ্কা ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ।

খাদ্য— মাছ ও জলজ কীট।

স্বভাব— মোটামুটি ছোটো মাছরাঙার মতন। একেবারে জঙ্গলের বাসিন্দা। একাই বিচরণ করে। পাহাড়ী নদীর কিনারে ঝুলেপড়া ঝোপের উপর বসে থেকে মাথা ও লেজ নাড়ায়। শিকার দেখতে

পেলেই জলের উপর সশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সময়ে সময়ে জলের তলায় গভীরে চলে যায় এবং ছোটো একটি মাছ মুখে করে উঠে পাশের একটা ঝোপের ভিতরে চলে যায়। ডাকও ছোটো মাছরাঙার মতো, তবে কিছুটা জোর।

প্রজননকাল— এপ্রিল থেকে আগস্ট, কিন্তু মে-জুন মাসেই বেশি। নদীর পাড়ে গর্ত করে বাসা বানায়। ডিম পাড়ে 5-7টি প্রায় গোলাকার চকচকে সাদা। ডিমের গড় মাপ— 20.3 × 17.6 মিমি. (লম্বায় 0.80, চওড়ায় 0.70 ইঞ্চি)।

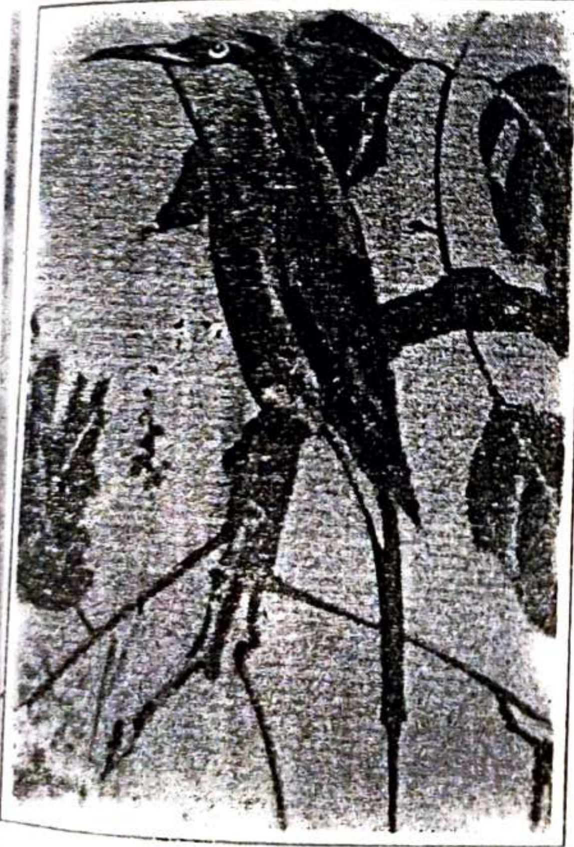
শার্ঙ্গ বংশ

(European Bee-eater)

নীলকণ্ঠ বর্গের অন্যতম বংশ শার্ঙ্গের (মেরপদি) অন্তর্গত পাখিদের চঞ্চু লম্বা, সরু, গোড়া থেকে বাঁকা এবং উপর-নিচ দুয়েরই অগ্রভাগ সূঁচলো। পা এবং আঙুল দুর্বল। বাইরের এবং মাঝের আঙুলের গোড়া ঝিল্লী দিয়ে জোড়া ; মাঝের ও ভিতরের আঙুলের গোড়ার অংশ যুক্ত। ভারতে শার্ঙ্গ বংশে 2টি গণ— শার্ঙ্গ (মেরপস্) ও নীলশ্মশ্রু (নাইকটাইঅরনিস)।

বাঁশপাতি (Green Bee-eater)

শরতের শেষ, হেমন্তের গোড়া। পাখি লক্ষ্য করতে বার হয়েছি গোবরডাঙ্গা থেকে চাঁদপাড়ার দিকে। রেল লাইন ধরেই চলেছি। গাছগাছালির উপর রোদ পড়ে ঝিকমিক করছে। চারিদিকে সবুজের সুষমা।



চি 14. বাঁশপাতি

টেলিগ্রাফের তারের উপর লক্ষ্য করলাম একটা পাখি। কচি ঘাসের রঙ তার গায়ে। রোগা ছিপছিপে। কালো চঞ্চু থেকে কালো কাজল টান চোখের উপর দিয়ে গেছে। উড়লো শূন্যে ডানা মেলে। আহা ! ডানার তলায় কি রঙ ! যেন সোনা ঝরে পড়ছে। লেজের মাঝখান দিয়ে দুটো পালক লম্বা হয়ে বেরিয়ে আছে। উড়ন্ত অবস্থায় ঢেউ খেলে ধরলো একটা পতঙ্গ। ফড়িং বলেই মনে হলো। গা ভাসিয়ে উড়ে এসে বসলো নিজের জায়গায়। অর্থাৎ ওই টেলিগ্রাফের তারের উপর। ধরা ফড়িংটাকে তারের উপর মারলো ঝাঁকানি বার দুই, তারপরেই মুখের ভিতর দিল পুরে।

পাখিটা শার্ঙ্গ বংশের (মেরপদি) অন্তর্গত এই নামের এক গণের (মেরপস্) *প্রজাতি* ; নাম— বাঁশপাতি, নরুনচেরা (মেরপস্ ওরিয়েন্টালিস) হিন্দি— *পত্রিঙ্গা* ; ইংরেজি— *গ্রীন বী-ঈটার*। ভারতে *5টি প্রজাতি*।

(chestnut Headed bee eater)

প্রথম প্রজাতি— 'লালশির পত্রিঙ্গা' (মেরপস্ লেসচেনলটি)— দেরাদুন থেকে কুমায়ুন, নেপাল, সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ, ভূটান, আসাম, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, বাংলাদেশ, ওড়িশা, আন্দামান এবং পশ্চিমঘাটে গোয়া থেকে দক্ষিণে পশ্চিম মহীশূর, তামিলনাড়ু, কেরালা ও শ্রীলঙ্কায়। *দ্বিতীয়*— 'বড়ো হরিয়াল' (মে এপিয়াস্টার)— পরিবাহী হয়ে আসে এবং বাসাও বাঁধে কাশ্মীর, উত্তরপশ্চিম ভারত, পাকিস্তান, হিমাচল প্রদেশ, গাড়োয়াল, পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং পূর্ব রাজস্থানে। *তৃতীয়*— 'বড়া পত্রিঙ্গা' (মে স্যুপার সিলিওসাস)— পাকিস্তান, পশ্চিম রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র ও দিল্লিতে। *চতুর্থ*— 'বড়ো বাঁশপাতি' (মে ফিলিপিনাস) এবং *পঞ্চম*— আমাদের সাধারণ বাঁশপাতি।

(opean bee eater) (blue tailed bee eater)

বাঁশপাতি লম্বায় 21সেমি. (8 ইঞ্চি)। তার মধ্যে লেজের মাঝখান দিয়ে যে পালকের জোড়া বেরিয়ে থাকে সেটাই প্রায় 2 ইঞ্চি। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। সমস্ত পালকই বাঁশপাতার মতো উজ্জ্বল সবুজ। চোখের সামনে ও পিছনে কালো এক টান। চিবুক ও গলায় নীলের ছোপ, গলার নিচেই কণ্ঠহারের মতন একটা কালো টান। মাথার চাঁদি থেকে পিঠের উপরের অংশে লালচে-সোনালি আভা। ডানার তলা সোনালি-তামাটে। ওড়ার পালক লালচে, সেটা সবুজে-ধোওয়া এবং আগায় কালচে ছোপ। কনীনিকা রক্ত-লাল। লম্বা সরু ঈষৎ বাঁকানো চঞ্চু কালো। পা গাঢ় সীসে। হলদেটে-পাটকিলে পায়ের আঙুল দুর্বল এবং সামনের তিনটি আঙুলের গোড়া পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত।

বাসস্থান— পশ্চিমবঙ্গে যে প্রজাতিকে সাধারণত দেখি তার *4টি উপজাতি। প্রথম উপজাতি* (মে ও ওরিয়েন্টালিস) —উত্তর রাজস্থান ছাড়া ভারতের সর্বত্র, পশ্চিমবঙ্গ, নেপাল এবং বাংলাদেশে 2 হাজার মিটার উচ্চতার ভিতর। *দ্বিতীয়*— 'সিন্ধু বাঁশপাতি' (মে ও বেলুডশ্চিক্যস)— দক্ষিণপূর্ব ইরান, পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, সিন্ধু, পাঞ্জাব এবং খুব সম্ভবত উত্তর ও পশ্চিম রাজস্থানে। *তৃতীয়*— 'বর্মী বাঁশপাতি' (মে ও বিরমানাস)— পূর্ব আসামের কাছাড়ের পূর্বাংশ এবং বর্মার নিম্নভূমিতে। *চতুর্থ*— 'শ্রীলঙ্কার বাঁশপাতি' (মে ও সিলোনেনসিস)— শ্রীলঙ্কায় 300 মি. উচ্চতার ভিতর শুষ্কভূমিতে।

খাদ্য— মৌমাছি, বোলতা, মথ, প্রজাপতি, ফড়িং ও উড়ন্ত কীটপতঙ্গ।

ডাকে— মিষ্টি করে চাবি নাড়ার মতন— ত্রি-ত্রি-ত্রি.... তিরপ্-তিরপ্-তিরপ্...... টিট-টিট-টিট..... উড়তে উড়তে ডাকে বেশি। বসেও ডাক দেয়।

স্বভাব— বাঁশপাতি পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের একটি সাধারণ পাখি। লক্ষ্য পথে পড়বেই, ট্রেনে যেতে যেতে টেলিগ্রাফের বা রেলের বেড়ার তারে বসে লেজ দোলাচ্ছে, না হয় সোনালি-তামাটে ডানার তলা দেখিয়ে ঘুরে এসে বসছে যেখান থেকে উড়েছিল সেখানে। কিংবা কোনও গাছের ডালে বা ঝোপের মাথায় বসছে বা উড়ছে, কখনওবা পাঁচিলের উপরে, এমনকি গরু-মহিষের পিঠেও।

ঘন জঙ্গল বা জলা জায়গা পছন্দ করে না। বর্ষাকালে এদের দেখতে পাওয়া বেশ মুশকিল। যেখানে কম বর্ষণ সেখানেই সরে যায়। সেইজন্য খোলামেলা স্থানে, খেতের আশেপাশে বা খরা জায়গায় এদের দেখা যায় খুব বেশি। সাধারণত একটি বা দুটিকে দেখা গেলেও 15-20 বা আরও বড়ো দলে সময় সময় দেখা যায়। ওড়াটা বড়ো সুন্দর। গোটা-কয়েক ডানার ঝাপট, তারপরেই ডানা ছড়িয়ে ভাসা, মৌমাছি বা অন্যান্য পতঙ্গ দেখলেই নিমেষের মধ্যে উপর দিকে ঝাঁকি মেরে সাবলীল ভঙ্গিতে উড়ে সেটিকে শূন্যে ধরে ঘুরে-ফিরে আসে, যেখান থেকে উঠেছিল সেখানে।

চঞ্চুতে ধরা শিকারটিকে তারে বা ডালে ঠুকে মেরে সেটিকে খায়।

বাঁশপাতি বা নরুনচেরা রাত কাটায় দলবদ্ধ হয়ে ঘন পাতার গাছে। এই দল সময় সময় 200 থেকে 300 -র পর্যন্তও হয়। দেখা যায়, নিম, জামরুল, বাঁশবন প্রভৃতিতে সন্ধ্যে হলেই এসে জড়ো হচ্ছে। রাতের বিশ্রামের আগে পর্যন্ত চেঁচামেচি ধাক্কাধাক্কি খুবই হয়। থেকে থেকে চেঁচামেচি করতে করতে সবাই উড়ে আবার ঘুরে এসে বসে। এইভাবে চলতে থাকে বেশ কিছুক্ষণ। খুব ভোরে ওঠার রেওয়াজ এদের নেই, বেশ বেলা পর্যন্ত ঘুময়। ঘুমনোটা বেশ মজার। সবাই পাশাপাশি গা ঘেঁষে একদিকে মুখ করে। তারপর মুখটা ঘুরিয়ে ডানার মধ্যে মাথা গুঁজে ঘুম দেয়। সেই ঘুম ভাঙে রোদ ওঠার খানিক পরে।

ধূলাস্নান-ই ভালোবাসে। মাঝে মাঝে জলের উপর ছোঁ মারতে দেখা যায়, তা সেটা স্নান, না জলখাওয়া, না পোকা ধরা বোঝা যায় না। সম্ভবত পোকা খাওয়া। মৌমাছি খাবার যম বলে যাঁরা মৌমাছি পালন করেন তাঁদের এদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া খুবই দুরূহ হয়ে ওঠে।

প্রজননকাল— ফেব্রুয়ারি থেকে জুন। বাসা বানায় মাটিতে সুড়ঙ্গ করে প্রায় আধ থেকে দু'মিটার পর্যন্ত লম্বা এবং ব্যাস 3-4 সেমি। সেই সুড়ঙ্গের শেষে ডিমপাড়ার ঘরটা হয় গোলাকার। নদীর উঁচু পাড় বা উঁচু মাটির ঢিবিতে বাসা বানাবার স্থান প্রশস্ত বলে মনে করে। প্রবেশপথটা গোলাকার। খুব সুন্দর করে কাটা। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই সুড়ঙ্গ কাটে। ডিমঘরে কোনও আস্তরণ বা বিছানা বিছয় না। সুড়ঙ্গ পথে কিছু পতঙ্গাদির ভুক্তাবশেষ দেখা যায়। ডিম পাড়ে 4 থেকে 7টি চকচকে সাদা শক্ত খোলার, কোনও ছিট বা ছোপ তার উপর নেই। ডিমের গড় মাপ— 19.3 × 17.3 মিমি. (লম্বায় 0.75, চওড়ায় 0.7 ইঞ্চি)।

অন্যান্য বাঁশপাতি

পশ্চিমবঙ্গে আরও যে কয়টি বাঁশপাতি দেখা যায় তারা হলো—
(Chestnut headed Bee-eater)

1. লালমাথা বাঁশপাতি— (মে লেশচেনঅলটি)। হিন্দি— *লালশির পত্রিঙ্গা*। ইংরেজি— *চেস্টনাটহেডেড বী-ঈটার*।

লম্বায় 21 সেমি. (সাড়ে 8 ইঞ্চি)। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। চোখের তলা দিয়ে কানের উপর পর্যন্ত একটা কালো লাইন। মাথা, ঘাড় ও পিঠের নিম্নাংশ পর্যন্ত বাদামী লাল। লেজের উপর দিকের আচ্ছাদক পালক ফিকে নীল। ডানা ও লেজে সবুজের উপর কালো ছোপ। চৌকো লেজ, কিন্তু মাঝের পালক দুটি লম্বা নয়। গলা ফিকে হলুদ, বুকের সঙ্গে আলাদা করা আছে গাঢ় বাদামী পটি দিয়ে এবং ওই পটির তলায় শেষাংশে কালো টানা দাগ। বুক, পেট এবং লেজের আচ্ছাদক ঘাস-সবুজ। কনীনিকা টুকটুকে লাল, চঞ্চু শিঙে-কালো। পা, আঙুল ও নখর ভুষো-কালো।

বাসস্থান— পশ্চিম ভারতে মহীশূরের বেলগাঁও অঞ্চল থেকে দক্ষিণে কেরালা, পুবে মাদ্রাজ, পূর্ব মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরবঙ্গ, আসাম, নেপাল, বাংলাদেশ। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, এবং শ্রীলঙ্কায় দেড় হাজার মিটারের ভিতর।

স্বভাব— ঘন জঙ্গলের বাসিন্দা। 8 থেকে 30-এর দলে গাছের মাথায় নেড়া ডালে বসে থাকতে এবং সেখান থেকে উড়তে দেখা যায়। জঙ্গলের মধ্যে যেখান দিয়ে টেলিগ্রাফের তার গেছে সেখানে বসে। বাঁশপাতির মতো উড়ে আবার শিকার ধরে ফিরে আসে নিজের জায়গায় এবং খাদ্যও তাদের মতোই ; জল ঘেঁষে উড়তে উড়তে বা জলের উপর কোনও গাছের ডাল থেকে লাল মাথা বাঁশপাতি জলের মধ্যে ঝপ্ করে পড়ে, জল ছিটিয়ে স্বস্থানে উড়ে গিয়ে বসে গা পরিষ্কার করে। রাতে বাস করে দলবদ্ধ হয়ে কোনও গাছে বা নদীর ধারে নলখাগড়ার উপর। সন্ধ্যা হবার আগে থাকতেই সবাই এসে জড়ো হতে থাকে। লালমাথা খুব ভোরে ওঠে, বাঁশপতির মতো দেরিতে নয়। সেসময় মিষ্টি ডাক দিতে থাকে। ডাক এবং আর সব স্বভাব বাঁশপাতির মতোই।

প্রজননকাল— ফেব্রুয়ারি থেকে জুন। নদীর ধারে বালির পাড়ে বা খাড়া শক্ত জমিতে একটু নিচুমুখো ঢালু গর্ত খোঁড়ে ; গর্তের মুখটার ব্যাস 2 ইঞ্চির মতো, সুড়ঙ্গ 3 থেকে 8 ফুট এবং তার শেষে ডিমঘর লম্বায় প্রায় 6 ইঞ্চি, চওড়ায় 8 ইঞ্চি। কোনও আস্তরণ বিছয় না। ডিম পাড়ে 5-6 টি চকচকে সাদা, কিছুটা গোলাকার। ডিমের গড় মাপ— 21.7 × 19.00 মিমি., (লম্বায়— 0.87, চওড়ায়— 0.75 ইঞ্চি)। (Blue-tailed Bee-eater)

2. বড়ো বাঁশপাতি— (মে ফিলিপ্পিন্যাস)। হিন্দি— *বড়া পত্রিঙ্গা*, ইংরেজি— *ব্লু-টেইলড বী-ঈটার।* লম্বায় 12 ইঞ্চি, তার মধ্যে 2 ইঞ্চি লেজের মাঝের সূঁচলো পালক যা বার হয়ে থাকে। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। চঞ্চুর গোড়া থেকে চোখের উপর দিয়ে চওড়া কালো টান। এই কালো টানের উপরের অংশে খুব সরু করে এবং নিচে চওড়া করে নীল পাড়। উপরের পালক বস্তিপ্রদেশ পর্যন্ত সবুজ, তার উপর লালচে আভা, তারপর সবুজাভ-নীল। ডানার রঙ পিঠের চেয়ে গাঢ় লালচে-সবুজ, ডগা কালচে। লেজ সবুজাভ-নীল, তলা গাঢ় বাদামী, লেজের মাঝের লম্বা পালকের ডগায় কালো ছোপ। গলা লালচে-বাদামী, ক্রমে বুকে সবুজ, তারপর লেজের কাছ পর্যন্ত নীল। কনীনিকা টুকটুকে লাল, লম্বা বাঁকানো চঞ্চু কালো, পা ছাই-সীসে ; বাইরের 3টি আঙুল পরস্পরের সঙ্গে তলার দিকে জোড়া।

বাসস্থান— পাকিস্তানে উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাব, ভারতে পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, অন্ধ্র, দক্ষিণ বোম্বাই, মহীশূরের কুর্গ, নেপাল, বাংলাদেশ। শীতকাল কাটায় শ্রীলঙ্কা, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে।

স্বভাব— বড়ো বাঁশপাতি অল্প কয়েকের একদলে জঙ্গলের ধারে শিকার করে বেড়ায়। বসে উঁচু গাছের মগডাল বা বাঁশগাছের শেষ প্রান্তে। সেখান থেকে স্বভাব-সুন্দর ভঙ্গিমায় উড়ে ভেসে পতঙ্গ ধরে ফিরে আসে স্বস্থানে। বড়ো ঝিল, জলা, এবং বাঁধের ধারেও দেখা যায়। টেলিগ্রাফের তার পেলে বসবেই। এটা শার্ঙ্গ বংশের ধারা। ডাকটাও বাঁশপাতির মতো, তবে জোর বেশি। ওড়ার ভঙ্গী অনেকটা হাওয়াশীলের মত, সেইসঙ্গে 'তিরিপ্ .... টি-টিউ ? ...টি-টিউ ?' ডাকটাও ঘনঘন। পতঙ্গ সবই খায়, তবে পছন্দ করে মৌমাছি আর ফড়িং।

প্রজননকাল- মার্চ থেকে জুন। কলোনি বাসা, অনেকগুলো কাছাকাছি। গাং-শালিকের সঙ্গে এদের দেখা যায় বাসা বানাবার সময়। বাসা বাঁধে নদীর উঁচু পাড়ে গর্তের ভিতর, না হয় ইঁটের পাঁজা যেখানে পোড়ায় তার পাশে মাটির বড়ো ঢিবির মধ্যে গর্ত খুঁড়ে। সুড়ঙ্গটা হয় 4 থেকে

7 ফুটের ভিতর। সুড়ঙ্গটা সোজা কাটে না, একটু টেরাবেঁকা করে। ডিম পাড়ে শক্ত খোলা4-5টি চকচকে সাদা। ডিমের গড় মাপ— 26.2 × 20.9 মিমি. (লম্বায়— 0.88, চওড়ায়— 0.77 ইঞ্চি)।

(Blue-bearded Bee-eater.)

3. নীলদাড়ি **বাঁশপাতি, বুকচেরা**— (নাইকটাইঅরনিস আথেরটনি) : কাছাড়ি— দাও হুকুরু ! ইংরেজি— *ব্লু-বেয়ার্ডেড বী-ঈটার।* নীলশ্মশ্রু গণের (নাইকটাইঅরনিস) প্রজাতি। ভারতে *একটিমাত্র প্রজাতি।*

লম্বায় 36 সেমি. (14 ইঞ্চি)। স্ত্রী পুরুষ একই দেখতে। লম্বা সরু ঈষৎ বাঁকা কালো চঞ্চু। উপরের পালক উজ্জ্বল ঘাস-সবুজ। চিবুক, গলার মাঝের পালক উজ্জ্বল মলিন নীল, এর মাঝে বড়ো বড়ো গাঢ় নীল পালক ঝুলে আছে দাড়ির মতো। বাকি তলার পালক গাঢ় পাটকিলে-হলুদ, তার উপর সবুজের ছিট বুক ও তলপেটে। লেজ চৌকো, মাঝের পালক বার করা নয়। কনীনিকা উজ্জ্বল সোনালি-কমলা। চঞ্চু শিঙে-পাটকিলে, একদম ডগায় প্রায় স্বচ্ছ সাদাটে, তলায় চঞ্চুর গোড়াটা ফিকে শিঙ-রঙা। পা ফিকে হলদেটে-সবুজ, নখর শিঙে-পাটকিলে।

বাসস্থান— পশ্চিমঘাটের দক্ষিণাংশ, পশ্চিম মহীশূর, পশ্চিম মাদ্রাজ, কেরালা, অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ, আসাম, মণিপুর, নেপাল, ও বাংলাদেশে দেড় হাজার মিটারের ভিতর।

স্বভাব— বুকেচেরা বা নীলদাড়ি বাঁশপাতি পুরোপুরি জঙ্গলের পাখি। এদের দেখা যায় চিরসবুজ জঙ্গলে একা বা জোড়ায় সর্বোচ্চ গাছের মাথায়। একটু লাজক প্রকৃতির। উড়ে পতঙ্গ বিশেষ ধরে না, ধরলেও নিজের জায়গায় সবসময় ফিরে আসে না, কীট খোঁজে পাতার ফাঁকে আর ফুলের ভিতর। ফুলের মধুও খায়। জঙ্গলে শিমূল যখন ফোটে তখন এদের দেখা যায় চার-পাঁচ জোড়ায় মধু খেতে আর পোকা ধরতে। ওড়ার ধরনটা বড়ো বসন্ত বউরির মতো। ডাকে কর্কশ গলায়— 'কড়-র-র্....কড়-র-র্....কড়-ক্'। প্রথম ডাকটা দেবার সময় নীল দাড়ি ফুলিয়ে মাথা নিচু করে, তারপর এক-এক ডাকে আস্তে আস্তে মাথা তুলতে থাকে, শেষ ডাক দেয় মাথা-চঞ্চু একেবারে আকাশের দিকে তুলে।

প্রজননকাল— ফেব্রুয়ারি থেকে আগস্ট। জঙ্গলের ভিতর পার্বত্য স্রোতস্বতী, সংকীর্ণ গিরিখাত, ধ্বসা পাহাড়ের গায়ে বা পাহাড়ী রাস্তার ধারে যে খাড়াই তার গায়ে সুড়ঙ্গ করে বাসা বানায়। সুড়ঙ্গের শেষে ডিম-ঘর। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই ডিমপাড়ার এক মাস আগে থাকতেই সুড়ঙ্গ খুড়তে আরম্ভ করে। ডিম ফোটানো ও সন্তান প্রতিপালনে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে। ডিম পাড়ে 4 থেকে 6টি গোলাকার ধবধবে সাদা, অল্প চকচকে, অনেকটা সাদাবুক মাছরাঙার সঙ্গে তুলনীয়। ডিমের গড় মাপ— 30 × 28 মিমি. (লম্বায়— 1.18, চওড়ায়— 1.10 ইঞ্চি)।

নীলকণ্ঠ বংশ

নীলকণ্ঠ বর্গের অন্যতম বংশ নীলকণ্ঠর (কেরোসিইদি) চঞ্চু বড়ো এবং কাকের সঙ্গে আকারে সাদৃশ্য দেখা যায়। উপরের চঞ্চু গোলাকার এবং একদম ডগার তলায় একটু খাঁজ কাটা। চক্ষুর গোড়ায় নাকের ছিদ্র। বাইরের ও মাঝের আঙুল গোড়ার প্রান্তে যুক্ত। ভিতরের এবং মাঝের আঙুল প্রান্তদেশের গাঁটের কাছে জোড়া। শৈশবাবস্থা থেকে স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। এই বংশে ভারতে দুটি গণ— নীলকণ্ঠ (কোরাসিয়াস) এবং হেমতুণ্ড (Dollar bird) (ইউরাইসটোমাস)।

নীলকণ্ঠ (Indian Roller)

ছুটির দিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। বাঁদিকে বাগানবিলাস বা বোগেনভিলিয়ার ঝাড়। সামনে খানিকটা গিয়ে রাস্তা। রাস্তার পর কিছুটা খোলা জায়গা। তারপর রেল লাইন, ইলেকট্রিকের তার, টেলিগ্রাফের পোস্ট।



চি ।১ নীলকণ্ঠ

শীতের শেষ বলাটা ঠিক নয়। কারণ ফাগুনের মাঝামাঝি হলেও শীতের রেশটা আছে। অন্তত সকাল বেলা সেটা অনুভব করা যায়। বসন্ত ঋতুর আগমন-বার্তা জানান দেবারও উপক্রম করছেন প্রকৃতিদেবী। এই রকম এক সন্ধিকাল। টেলিগ্রাফের পোস্টের উপর আমার দিকে ফিরে স্থির হয়ে বসে আছে একটা পাখি। একটু মোটাসোটা, দূর থেকে মনে হচ্ছে বুকটা যেন খয়েরী, তলাটা ফিকে নীল।

বেশ চুপ করে বসে ধ্যান করছিল। হঠাৎ ঝুপ করে নিচে নামলো প্রায় প্যারাশুটারের কায়দায়। এই সময় দেখলাম ডানায় আর লেজে কী অপরূপ নীলের বাহার! এই নীলকে ইংরেজিতে বলে অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ-ব্লু। পাখিটা আড়ালে পড়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছি না। বুঝতে পারছি ঘাসফড়িং বা অন্য কোনও পোকা খেতে নেমেছে।

অল্প পরেই মাটি থেকে উড়ে আবার বসলো স্থির হয়ে যেখানে বসেছিল সেখানে। দৃষ্টি তার মাটির দিকে। ঠিক যেমন জ্ঞাতিভাই মাছরাঙা তাকিয়ে থাকে জলের দিকে! হঠাৎ তীব্র কর্কশ এক ডাক— 'ট্‌জক' দিয়ে উড়লো উপর দিকে। বাতাসে ভর দিয়ে সোজা মুখটি নীল আকাশের দিকে তুলে নীলের বাহার উড়িয়ে উপরে উঠে গিয়ে খেলো এক ডিগবাজি। অপরূপ পাখিটার উৎপতন ভঙ্গী। আবার ডাক দিল কর্কশ 'ট্‌জক....ট্‌জক...কাক....কাক....কাক....কাক...'।

পাখিটা নীলকণ্ঠ বংশের এবং ওই নামের এক *প্রজাতি*। নাম নীলকণ্ঠ (কোরাসিয়াস বেংঘলেনসিস), হিন্দি— *সবজ্‌ক, নীলকণ্ঠ*, ইংরেজি— *ইন্ডিয়ান রোলার, ব্লু জে*। নীলকণ্ঠ গণে (কোরাসিয়াস) *2টি প্রজাতি*। অপর *প্রজাতি*— বিলিতি নীলকণ্ঠ, কাশ্মীরী নীলকণ্ঠ (কো গ্যাররুলাস), ইংরেজি— *ইওরোপীয়ান রোলার*। বাস করে উইরোপ, উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্র্যাচ্য, তুর্কিস্তান, ইরান, বেলুচিস্তান, গিলগিট ও কাশ্মীর। পরিযায়ী হয় রাজস্থান, কচ্ছ, সৌরাস্ট্র, পাকিস্তান থেকে আরবে।

নীলকণ্ঠ লম্বায় 31 সেমি. (12 ইঞ্চি)। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। মাথার চাঁদি নীলচে-সবুজ। ঘাড় গাঢ় খয়েরী। উপরের পালক নিষ্প্রভ সবজেটে-পাটকিলে ; বস্তিপ্রদেশের কাছে লেজের গোড়ায় নীলের ছোপ। ডানা নীল আর সবুজ মিশানো, ওড়ার পালক গাঢ় বেগুনি-নীল, তার উপর ফিকে নীলের পটি, লেজ গাঢ় নীল, তার উপর ফিকে নীলের পটি, কিন্তু মাঝখানে এক জোড়া পালক নিষ্প্রভ সবজেটে। মাথার দু'পাশ ও গলা বেগুনি-খয়েরি, তার উপর সাদার ছিট। বুক ঈষৎ গোলাপী আভাযুক্ত খয়েরি, তার উপর সাদাটে ছিট, বাকি তলার পালক ফিকে নীল। কনীনিকা ধূসর-পাটকিলে : চোখের চারপাশ গোলাকার পালকহীন-স্থান সবজেটে-হলুদ : চঞ্চু কালচে-পাটকিলে ; পা পাটকিলে-হলুদ ও আঙুল, নখ কালো।

বাসস্থান— পূর্ব আরব, ইরান, ইরাক, পাকিস্তান, ভারত থেকে পুবে ইন্দোচীন ও তৎসংলগ্ন স্থান। ভারতে *3টি উপজাতি*। *প্রথম উপজাতি* (কো বেং বেংঘলেনসিস)— পাকিস্তান, ভারতে সর্বত্র 1500 মি-র ভিতর এবং বাংলাদেশ। *দ্বিতীয়*— 'দক্ষিণী নীলকণ্ঠ' (কো বেং ইন্ডিকা)— উপদ্বীপাত্মক ভারত ও সিংহলে 1 হাজার মিটারের মধ্যে। *তৃতীয়*— 'কমী নীলকণ্ঠ' (কো বেং অ্যাফিনিস)— সিকিম, নেপাল, ডুয়ার্স, ভূটান ডুয়ার্স, উত্তরবঙ্গ, আসাম এবং বাংলাদেশে 600 মি-র ভিতর। অপর গণ হেমতুণ্ড-এ *একটিমাত্র প্রজাতি* ; নাম— ডলার পাখি (ইউরাইসটোমাস ওরিয়েন্টালিস), ইংরেজি— *ব্রডবিলড্ রোলার*। বাসস্থান— হিমালয়ের পাদদেশ ধরে কুমায়ুন, নেপাল, উত্তরবঙ্গ, আসাম ও বাংলাদেশে 1হাজার মি-র ভিতর এবং পশ্চিম মাদ্রাজ, পশ্চিম মহীশূর, কেরালা, সিংহল ও দক্ষিণ আন্দামানে চিরসবুজ গভীর জঙ্গলে।

খাদ্য— নানাবিধ ছোটোবড়ো কৃষির অপকারী কীটপতঙ্গ ও ফড়িং, উচ্চিংড়ে, ঝিঁঝিঁপোকা, ঘুরঘুরে, গুবরে, শুঁয়োপোকা এবং এদের শূককীট। সময়বিশেষে টিকটিকি, গিরগিটি, ব্যাঙ, মেঠো ইঁদুর, বিছে ও ছোটো সাপ। ক্কচিৎ শূন্যে মথ ও ডানাওঠা পিঁপড়ে।

স্বভাব— নীলকণ্ঠের কণ্ঠে কোথাও নীল না থাকাতে সকলেরই নামটার জন্যে কেমন একটা ধাঁধাঁ লাগে। কেবল মনে প্রশ্ন জাগে, এই নাম কেন হলো? আমারও তাই হতো। পরে দেখলাম নামটা সার্থক, কারণ দেবাদিদেব মহাদেবের হলাহলপানের মতো কৃষির পক্ষে হলাহলসম কীটপতঙ্গাদি উদরসাৎ

করে অবলীলাক্রমে। সেই কারণে নীলকণ্ঠ অবধ্য। শিব নীলকণ্ঠ বলে ভারতের কোনো কোনো স্থানে দশেরার সময় এবং দুই বাংলায় দুর্গাপ্রতিমা ভাসানের মুহূর্তে এই পাখি উৎসবের আগে ধরে বা কিনে খাঁচায় রেখে ওই সময়ে ছেড়ে দেওয়ার রীতি আছে। দক্ষিণ ভারতে তেলেগুভাষীরা বলে পালুপিটা' অর্থাৎ দুধপাখি ; তাদের বিশ্বাস গরুর দুধ কমে গেলে নীলকণ্ঠের পালক কয়েকটা জাবনার সঙ্গে মিশিয়ে দিলে গরু নাকি প্রায় দ্বিগুণ দুধ দেয়।

নীলকণ্ঠকে দেখা যায় খোলামেলা জায়গায় এবং খেতের আশেপাশে। ঘন জঙ্গল খুব বেশি পছন্দ করে না। প্রজননকাল ছাড়া অন্য সময়ে একাকী বিচরণ করতেই দেখা যায়। যে কোনও গাঁয়ে বা শহরতলিতে এদের দেখা না যাওয়াটাই আশ্চর্যের। দেখা যাবে বসে আছে প্রাচীন কোনও গাছের মরা ডালে, কুয়োর লাটাখাম্বার মাথায়, ভাঙা বাড়ির ছাদ বা কার্নিসে, টেলিগ্রাফ বা ইলেকট্রিকের তার বা পোস্টে। এও যদি না জোটে, তবে দেখা যায় পাথরের চাংড়া বা ঘন কাঁটাঝোপের উপরে। লেজটা উঠছে-নামছে প্রায় খঞ্জনের মতো, তবে খুব ধীরে ধীরে। কিন্তু সবসময়ে বড়ো বড়ো চোখ দুটো জমির উপর প্রতিটি দিকে ঘুরছে। দেখছে কোথায় একটা ঘাসফড়িং নড়লো ঘাসের ডগার উপর। মাটি ফুঁড়ে ওটা কি বার হলো ? ঝিঁঝিঁ না মেঠো ইদুঁর ? ব্যস, ঝাঁপিয়ে পড়লো নীলকণ্ঠ ঠিক তার উপরে। ওখানেই মাটিতে বসে ভোজনপর্ব সেরে স্বস্থানে ফিরে আবার শিকারের আশায় অপেক্ষা করে। কোনও কারণে বাধা পেলে অন্যত্র গিয়ে বসে এবং প্রায়ই দেখা যায় সেটা প্রথম বসার কাছাকাছি।

একবার বিহারে ছোটোনাগপুরের গিরিডিতে নজরে পড়েছিল রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের মতো নীলকণ্ঠ ও কোটরে-পেঁচার একাঙ্কিকা। সূর্য অস্ত গেছে। পশ্চিম আকাশ গোধূলির আলোয় লাল ; সন্ধ্যা হব হব। কিছুটা আলো আছে। হর্তুকীগাছের পাতাঝরা এক ডালে নীলকণ্ঠ বসে লেজ দোলাচ্ছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। এই অবসরে বাগানে ফুলগাছের গোড়া এবং ঘাসের চাপড়ার ফাঁক থেকে ঝিঁঝিঁপোকারা বার হওয়া শুরু করতেই নীল ডানা উড়িয়ে ঝপ করে পড়ে একটিকে মুখে পুরলো। যতক্ষণ আলো ছিল ততক্ষণ নীলকণ্ঠ একাই মঞ্চ মাতিয়ে তার অতীব সুখাদ্য খেয়ে গেল একের পর এক। রোয়াকে ইজিচেয়ারে বসে এই দৃশ্য দেখলাম মন্ত্রমুগ্ধের মতো। শেষ আলো যখন চলে গেল, দৃষ্টি আর যখন চলে না, নীলকণ্ঠ তখন উড়ে চলে গেল রাস্তা পার হয়ে আমবাগানের ভিতরে।

রঙ্গমঞ্চের নায়ক চলে যাওয়াতে ঝিঁঝিপোকারা মনের আনন্দে মাটি ফুঁড়ে বার হতে লাগলো নিশ্চয়ই ; কারণ দেখতে পাচ্ছি নে কিছুই। হঠাৎ পাশের বাড়ির ঝাঁকড়া মহুয়াগাছের ভিতর থেকে উড়ে এলো দস্যু এক কোটরে পেঁচা। রঙ্গমঞ্চ আবার মাতিয়ে তুললো টপাটপ ঝিঁঝিঁগুলোকে ধরে। তার ডাকে মহুয়াপাতার আড়াল থেকে নেমে এলো সঙ্গিনী। দু'জনের ওড়া আর খাওয়া দেখলাম যবনিকা পর্যন্ত।

নীলকণ্ঠের ওড়ার কায়দাটা অদ্ভুত। যখন বসে থাকে, মোটামুটি ভারিক্কী চেহারাটা অসুন্দরই লাগে। ওড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেজ আর ডানার সৌন্দর্য মানুষকে আকৃষ্ট না করে পারে না। ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতেই তার জবুথবু ভাবটা যেন দূর হয়ে যায়। শূন্যমার্গে কায়দার ওড়াটা কেবলমাত্র

দয়িতার মনোরঞ্জনের জন্যে নয়, নিজের আনন্দেও। আকাশে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো দোল খেতে খেতে ডিগবাজি খায় কতভাবে। সোজা মুখ তুলে উপরে উঠে আবার মুখ নিচু করে পড়ে। যাকে বলে 'নোজ ডাইভ'। ডিগবাজি— 'লুপ ইন দ্য লুপ', পাশে গড়িয়ে কেমন ঘুরে যাওয়া। সবসময়ে মুখে আওয়াজ 'ট্‌জক'! সূর্যের কিরণে নীলের ছটা অপরূপ ফুটে ওঠে। কখনও কখনও জোড়ায় যখন সার্কাসের ট্রাপিজের খেলা দেখায় তখন সে দৃশ্য হয় অবর্ণনীয়!

প্রজননকাল— মার্চ থেকে জুলাই। বাসা বানায় কোনো মরা গাছের কাণ্ড বা ডালের গায়ে, প্রাকৃতিক কারণে গর্তে, কাঠঠোকরার পরিত্যক্ত কোটরে অথবা নেড়া খেজুর, নারকেল বা তালগাছের মাথায়, গর্তের ভিতর ঘাস, খড়, ছেঁড়া নেকড়া ও আবর্জনা দিয়ে। ভাঙা বাড়ির কার্নিসের তলায় বা দেওয়ালের গায়ে গর্তেও বাসা বানাতে দেখা যায়। কোনওরকমে উপকরণগুলি গর্তের মধ্যে রাখে। ডিম পাড়ে 3-4টি শক্ত খোলার চকচকে ধবধবে সাদা। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই তা দেয় এবং ছানাদের খাওয়ায়। ডিম ফুটে ছানা বার হতে 17 থেকে 19 দিন সময় নেয়। ডিমের গড় মাপ— 34.3 × 28.1 মিমি. (লম্বায়— 1.30, চওড়ায়— 1.05 ইঞ্চি)।

প্রিয়াত্মজ বংশ

নীলকণ্ঠ বর্গের অন্তর্গত প্রিয়াত্মজ বংশের (বুসেরোটিদি) পাখিদের পক্ষিজগতের সঙ বা ভাঁড় বললে অত্যুক্তি হবে না। চেহারাটার মধ্যেই কেমন যেন একটা হাস্যকর ভাব। দেহের অনুপাতে চঞ্চু বিশাল এবং মাথার চাঁদির প্রায় উপর থেকে ঠিক চঞ্চুর উপরে মাঝামাঝি পর্যন্ত এসেছে এক শিরস্ত্রাণ। এই বংশের কিছু প্রজাতির শিরস্ত্রাণরূপ অতিরিক্ত চঞ্চুর মত বস্তুটি এত ছোটো যে প্রায় দেখাই যায় না। কয়েকটির আবার চঞ্চুর মতই প্রকাণ্ড।

প্রিয়াত্মজদের চঞ্চু বিশালাকার হলেও তার ভার অতি সামান্য। যতটা পুরু তার সবটাই মৌচাকের মতো খোপকাটা এবং ভিতর ও বাইরের আবরণ কাগজের মতো পাতলা হলেও বেশ শক্ত। নেত্রলোম বা পক্ষ্ম খুব বড়ো এবং কালো। তলার দিকের ডানার আচ্ছাদক পালক ওড়ার পালকগুলিকে পুরো না ঢাকার জন্যে ওড়ার সময় পাখার খুব শব্দ হয়। পায়ে তিনটি আঙুল সামনে, পিছনে একটি। অনেক প্রজাতির সামনের তিনটি আঙুলের মধ্যে দু'টি খুব কাছাকাছি। এজন্যে এদের যুক্তাঙ্গুল গোষ্ঠীর (সিনড্যাকটাইলাস) মধ্যে ধরা হয়।

ডিম ফুটে ছানা যখন বার হয় তখন গায়ে একবিন্দুও পালক থাকে না। পরে পালক গজাতে শুরু করে। ছানাদের প্রথম পালকরাজির রূপ কিন্তু পুরুষের মতন, অন্যান্য পাখিদের যেমন স্ত্রী-পাখিদের মতন হয় তেমন নয়।

প্রিয়াত্মজ বংশে 6টি গণ— বাধ্রীনস (আনথ্রোকোসেরস), দীর্ঘবাল (টোক্কাস), বলিচঞ্চু (রাইটিসেরস), প্রিয়াত্মজ (বুসেরস), মাতৃনিন্দক (এসিরস) এবং পত্রকণ্ঠ (টিনোলিমাস)। পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায় বাধ্রীনস, দীর্ঘবাল ও বলিচঞ্চু গণের প্রজাতিকে। ভারতে প্রিয়াত্মজ গণের পাখিই (গ্রেট পায়েড হর্নবিল) আকারে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। লম্বায় 130 সেমি. (52 ইঞ্চি)। এই রাজ ধনেশদের দেখা যায় পশ্চিমঘাট, মহীশূর, কেরালা, পশ্চিম মাদ্রাজ, নেপাল থেকে আসাম ও বাংলাদেশে 2 হাজার মিটারের ভিতর শাল ও চিরহরিৎ জঙ্গলে।

ধনেশ

সারারাত ট্রেনটা দৌড়েছে। মাঝেমাঝে থেমেছে আবার দৌড়েছে। ঘুম যখন ভাঙলো তখন দেখি জংশন শিলিগুড়ি। সবে ভোর হচ্ছে। একসময় শিলিগুড়িও ছাড়ল। গুলমা, গুলমাখোলা পার হয়ে সেবকে এলাম। এখানে তিস্তা পার হতে হবে রেলপুলের উপর দিয়ে। অদূরেই দুই পাহাড়ের মাঝে তিস্তারই উপর পদাতিক ও যানবাহনের কংক্রিট সড়কপুল— করোনেশন ব্রিজ।

ট্রেনের দরজা খুলে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক শোভা দেখছি। সকালবেলার আলোয় লাগছে বেশ। হঠাৎ একটা গাছের মাথা থেকে উড়ল সাদা-কালো বিশাল চঞ্চু এক পাখি। ওকে অনুসরণ করে উড়ল আরও কয়েকটা ওই পাখি। উড়ে গিয়ে বসল কাছেই একটা গাছে। অপ্রত্যাশিতভাবে সকালের আলোয় প্রাকৃতিক পরিবেশে এই পাখিগুলিকে দেখে বড়োই ভালো লাগল।

পাখিগুলি নীলকণ্ঠ বর্গে প্রিয়াম্বজ বংশে বাগ্রীনস গণের (আনথ্রাকোসেরস) *এক প্রজাতি* ; নাম— ধনেশ, বাগমা ধনেশ (আনথ্রাকোসেরস মালবারিকাস), হিন্দি— *ধান চিড়ি, সুলেমানি মুরগী*, ইংরেজি— *ইন্ডিয়ান পায়েড হর্নবিল*। A. coronatus

ধনেশ লম্বায় ৪৭ সেমি. (35 ইঞ্চি), অর্থাৎ আকারে গোদা-চিলের চেয়ে কিছু বড়ো। স্ত্রী-পুরুষ প্রায় একই দেখতে। আকারে স্ত্রী-পাখি কিছুটা ছোটো। স্ত্রী-পুরুষের বুকের নিম্নাংশ থেকে পেট, তলপেট, লেজের মাঝের জোড়া বাদে, ডানার ধার ও ডগা সব সাদা ; বাকি পালক সবুজাভ-কালো। পুরুষের কনীনিকা কমলা-লাল বা লাল, স্ত্রীর পাটকিলে অথবা নীলচে-পাটকিলে। চঞ্চু মোম-হলুদ ; চঞ্চু ও শিরস্ত্রাণের গোড়া কালো এবং শিরস্ত্রাণের মাঝখানটাও কালো। স্ত্রী-পাখির চঞ্চু ও শিরস্ত্রাণে অতটা কালো নেই। পুরুষের চোখের চারপাশের চামড়া কালো বা নীলচে-কালো, স্ত্রীর সাদা বা মাংসল সাদা। উভয়ের গলার কাছে পালকহীন চামড়া ফিকে গোলাপী বা মাংসল। পা ও আঙুল সীসে-ধূসর, সবুজাভ-ধূসর অথবা গাঢ়-ধূসর।



চি 16. ধনেশ

বাসস্থান— ভারত থেকে পূবে ইন্দোচীন, মালয়েশিয়া এবং দক্ষিণ চীন। ভারতে *2টি প্রজাতি*। *প্রথম* (আ মালাবারিকাস)— উত্তরপ্রদেশ, নেপাল, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং বাংলাদেশে তরাই ও সমতলের ধার ঘেঁষে 350 মিটার উচ্চতার ভিতরে। *দ্বিতীয়*— 'মালাবার পায়েড হর্নবিল' (আ কোরোনাটাস)— মধ্যভারত, বিহার (বিশেষত ছোটনাগপুরে) ; দক্ষিণে অন্ধ্র (গঞ্জাম), পশ্চিম উপকূলে বোম্বাই থেকে কেরালায় 300 মিটারের ভিতর এবং শ্রীলঙ্কায়।

খাদ্য— প্রধানত ফলভোজী ; কিন্তু টিকটিকি, গিরগিটি, নেংটি ইঁদুর এবং পাখির ছানাতেও আপত্তি নেই।

স্বভাব— ধনেশ প্রজননকাল ছাড়া অন্যসময়ে দলবদ্ধ হয়ে বড়ো এবং ছোটো দু'রকমের গাছের ফল যেমন খায়, তেমনি মাটিতে নেমে শামুক, কীটপতঙ্গ এবং ছোটোখাটো সরীসৃপ ধরেও খায়।

পক্ষিতত্ত্ববিদ চার্লস ইংগলিস মাছ ধরেও খেতে দেখেছেন। সুতরাং এক কথায় বলা যায় ধনেশ সর্বভুক। অনেককে আবার দেখা যায় কি ফল, কি ফড়িং বা কি কোনও সরীসৃপ অর্থাৎ যে কোনো খাদ্যকে চঞ্চুতে ধরে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে তারপর বিকট হাঁ করে সেটিকে গলাধঃকরণ করতে।

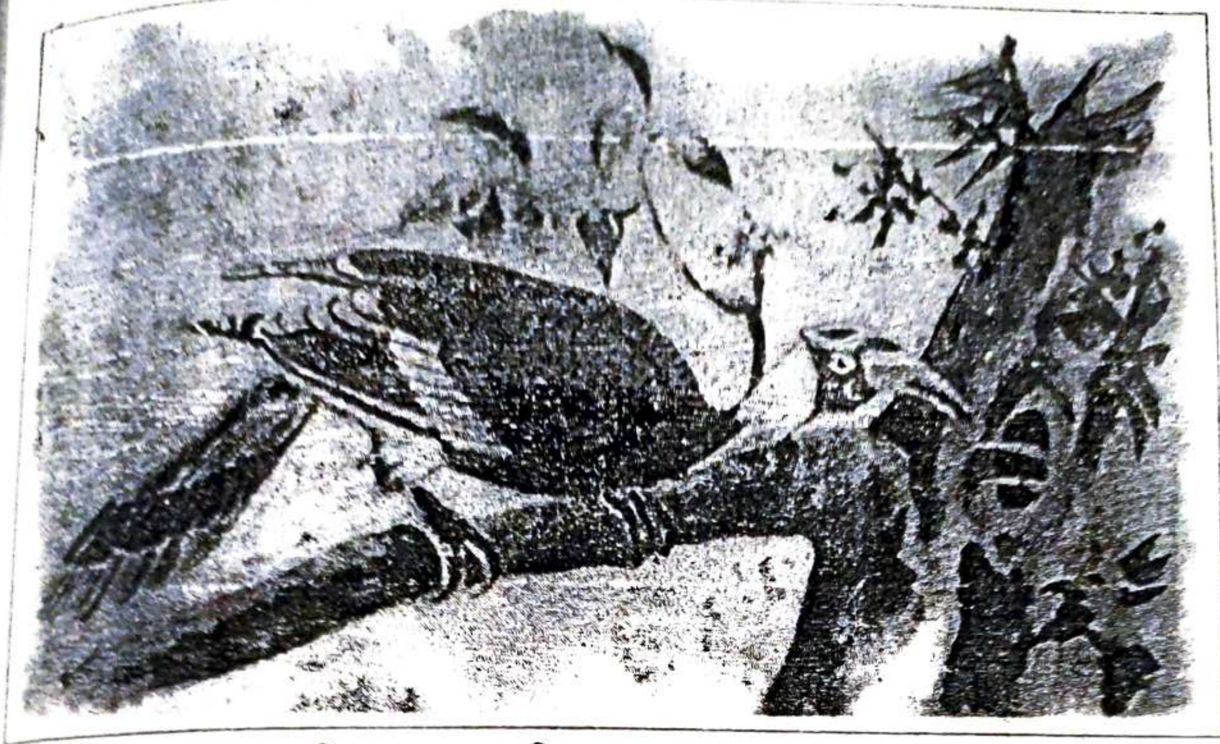
ধনেশের ওড়াটা কয়েকটা ডানার ঝাপট, পাখা ছড়িয়ে ডানার ডগা একটু তুলে ভেসে চলা, আবার ডানার ঝাপট। ওড়ার সময় ডানার ঝাপটে বেশ শব্দ হয়। মাটিতে হাঁটাটা সৌন্দর্যহীন। কদর্য ক্যাবলামার্কা। খানিকটা লাফানো তারপর অল্প হেলেদুলে দৌড়ানো, তারপর আবার লাফিয়ে চলা। ভয় পেলে বা তাড়া খেলে সঙ্গে সঙ্গে মাটি থেকে সোজা উড়তে পারে।

ডাকটা অদ্ভুত। খানসামা বা বাবুর্চির হাতে জবাইয়ের আগে মুরগী আপত্তি জানিয়ে যে আর্তনাদ করে তার সঙ্গে কুকুরছানার ডাকের ও চিলের চেঁচানোর মিশ্রণ। দলবদ্ধ অবস্থায় সবসময়ে কিছু না কিছু আওয়াজ করে চলে। দলের একজন যদি কিছু কর্কশস্বরে বলে তখন বাকি সবাই এক একজন করে ওই বিষয়ে নিজের মতামত ততোধিক কর্কশস্বরে প্রকাশ করে।

ধনেশ খুব সহজেই পোষ মানে। সবকিছু খেতে অভ্যস্ত বলে বাঁচানো মোটেই শক্ত নয়। বন্দীদশায় 25-30 এমন কি তারও বেশি বছর বাঁচে। 'বোম্বে' ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি'র প্রতীক-চিহ্ন ধনেশ এবং সংস্থার বাড়িটির নামও 'হর্নবিল হউস'। এই ধনেশটি ছিল সংস্থার পোষাপাখি। 26 বছর বেঁচে ছিল। বর্তমানে বোম্বাইয়ের প্রিন্স অফ ওয়েলস মিউজিয়াম-এ পাখির গ্যালারিতে মৃতদেহটিকে খড় পুরে রাখা আছে। নাম ছিল উইলিয়ম। উইলিয়ম টেনিস-বল লুফতে শিখেছিল। তার দিকে যত জোরেই বল ছোঁড়া হোক না কেন উইলিয়ম অবলীলাক্রমে সেই বল ধরতে পারত। একটাও ফসকাতো না। ভাব দেখাত এ আর এমনকি শক্ত ক্যাচ! সত্যি এত ভালো স্লিপ ফিল্ডার আর দেখি নি।

কলকাতার গড়ের মাঠে অকটারলোনি মনুমেন্ট অর্থাৎ শহীদ মিনারের ধারেকাছে, শিয়ালদা বা চিৎপুর-বড়বাজারের কাছাকাছি দেখা যায় জড়িবুটির ব্যাপারীদের। তাদের নানা জিনিসের মধ্যে থাকে ধনেশের চঞ্চু, তেল, নখ, হাড় ইত্যাদি। কখনও কখনও পোষা ধনেশও তাদের কাছে থাকে। কিম্বদন্তী, ধনেশের তেল বাতের অব্যর্থ ওষুধ। এমনকি হাতের তালুতে কয়েক ফোঁটা ঢাললে চুঁইয়ে অপর দিকে বেরিয়ে আসে। ব্যক্তিগতভাবে আমি কিন্তু এ ঘটনা ঘটতে দেখি নি, হাতের তালুতে তেল নিয়েও।

প্রজননকাল— মার্চ থেকে জুন। স্ত্রী-ধনেশ কোনো বড়ো গাছের কাণ্ডে স্বাভাবিকভাবে কোনো গর্ত পেলে বাসা হিসাবে সেটাকেই বেছে নেয়। দেখা যায় বছরের পর বছর এইরকম গর্তে একই জায়গায় বাসা বানিয়ে ডিম ফুটিয়ে ছানা তুলতে। এই পুরোনো গর্তে বসে স্ত্রী-পাখি নিজের বিষ্ঠা ও পুরুষের আনা ভিজে মাটি মিশিয়ে এক প্লাস্টার তৈরি করে। নিজেকে ভিতরে রেখে চঞ্চুর চেপ্টা দিকটা কর্ণিকের মতো করে ওই প্লাস্টার দিয়ে গর্তের মুখ বোজায়। কেবল একটা খুব ছোট ছ্যাঁদা রাখে পুরুষের আনা খাদ্য সেই ফোকরের ভিতর দিয়ে গ্রহণ করার ও নিজের বিষ্ঠা বাইরে ফেলে দেবার জন্যে। ওই প্লাস্টারের দেওয়াল সিমেন্টের মতো এমন শক্ত হয় যে অন্য কোনো অনিষ্ঠকারী জন্তুর পক্ষে তা ভেঙে প্রবেশ করা অসম্ভব। দেওয়াল তৈরি করতে দুই থেকে তিন দিন সময় লাগে।



চি 17. ধনেশ তার স্ত্রীর জন্য খাবার এনেছে

স্ত্রী-ধনেশ এইভাবে স্ব-ইচ্ছায় বন্দীজীবন বরণ করে নিয়ে ডিম পেড়ে তা' দিতে থাকে। ডিম পাড়ে 2 থেকে 5টি, সাদা তার উপর কিছুটা ফিকে পাটকিলের আভা। ডিমের গড় মাপ— 49.9 × 34.9 মিমি. (লম্বায়— 1.96, চাওড়ায়— 1.39 ইঞ্চি)।

ডিম থেকে ছানা ফুটতে 28 থেকে 40 দিন লাগে। ততদিন পুরুষ বট-পিপুলের ফল, টিকটিকি-গিরগিটি এবং যা কিছু খাদ্যবস্তু সবই এনে স্ত্রীকে সেই ফোকরের মধ্যে দিয়ে চালান দেয়। অতিরিক্ত খাটা-খাটুনিতে পুরুষ বেশ হাড় জিরজিরে রোগা হয়ে পড়ে। ওদিকে স্ত্রীটি বড়োলোকের গিন্নীর মতো শুয়ে-বসে খেয়ে-দেয়ে দিনে দিনে মোটা হয়। মনে হয়, অনেক জাতের স্ত্রী-ধনেশ এই সময় নির্মোচন বা কুরিচ (মোল্ট) খায় অর্থাৎ তার পুরাতন পালক পড়ে গিয়ে নতুন পালক গজায়। স্ত্রী-পাখির কুরিচ খাওয়া বা না-খাওয়া অবস্থাটা গবেষণাসাপেক্ষ।

ছানাদের বড়ো হতে 15 থেকে 21-22 দিন লাগে। এই সময়ের মধ্যে পুরুষকে স্ত্রী এবং সন্তানদের ভরণপোষণ একা বহন করতে হয়। মুখে করে আনে 15-20 টা বটফল, ফোকরের ফাঁক দিয়ে অল্প বের করা স্ত্রী-পাখির চঞ্চুতে ঢেলে দেয় সেই ফলগুলি। এ-সময় পুরুষের নিষ্ঠা দেখবার মতো। কি অক্লান্ত পরিশ্রমটাই না করে।

ছানারা একটু বড়ো হলেই স্ত্রী-পাখি চঞ্চু দিয়ে হাতুড়ি ঠোকার মতো করে ভাঙতে থাকে প্লাস্টার করা দেওয়াল। ধৈর্য ধরে সেটা ভাঙতেও বেশ সময় লাগে। স্ত্রী-পাখি বেরিয়ে এসেই আবার দেওয়াল তুলে দেয় ফোকর রেখে। ওই গর্তের মধ্যে বাচ্চাদের বসে থাকতে হয় লেজটি সোজা খাড়া করে তুলে। এইসময় যদি কেউ দেওয়াল ভেঙে ছানাদের বাইরে বের করে আনে তখন দেখা যাবে

লেজটি তাদের খাড়া করা। বেশ কিছুক্ষণ সময় নেয় বৃহত্তর পৃথিবীর অন্দের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে লেজটা নামাতে।

গর্তের মধ্যে ছানাদের রেখে বাবা-মা দু'জনকেই খাই-খাই সন্তানদের খাওয়া যুগিয়ে চলতে প্রাণপাত করতে হয়। কিছুদিন পর যখন বোঝে দুনিয়ার সঙ্গে সন্তানরা নিজেরাই বোঝাপড়া করার মতো শক্ত-সমর্থ হয়েছে, তখন তাদের দেওয়াল ভেঙে মুক্ত করে দেয়।

অন্যান্য ধনেশ

পৃথিবীতে 45টি প্রজাতির ধনেশ আছে। ভারতে 6টি গণে মাত্র *৪টি প্রজাতি।* খাদ্যে ও স্বভাবে প্রায় একরকম। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে যাদের দেখা যায়, তারা হলো–

1. **পুটিয়াল ধনেশ**— (টোক্‌কাস বিরসট্রিস)। হিন্দি— *চালোত্রা, ধানমারি ধনেল, ধানদ, লামভার,* ইংরেজি— *কমন গ্রে হর্নবিল।* দীর্ঘবাল গণের (টোক্‌কাস) এক *প্রজাতি।*



চি ।৪ পুটিয়াল ধনেশ

পুটিয়াল ধনেশ লম্বায় 61 সেমি। (24 ইঞ্চি)। স্ত্রী-পুরুষ প্রায় একই দেখতে। উপরের পালক ফিকে পাটকিলে-ধূসর ; চোখের উপর সরু সাদাটে টান ; গাল ও কানের উপরের পালক কালচে-ধূসর। ওড়ার পালক গাঢ় পাটকিলে, প্রতিটি পালকের ধার ও ডগা ধূসর বা সাদা। পাটকিলে লেজ লম্বা, সরু থেকে মোটা, প্রতিটি পালকের প্রায় শেষাংশে সবুজ আভার গাঢ় পাটকিলে পটি এবং ডগায় সাদা ছোপ। চিবুক থেকে বুক ধূসর, তারপর ক্রমে পেটে সাদায় পরিণত। কনীনিকা লালচে-পাটকিলে ; পা গাঢ় সীসে। কালো ডগায় একটু সাদা, বাকিটা হলুদ, চঞ্চু বড়ো ও বাঁকানো এবং চাপা। কালো বা কালচে-পাটকিলে শিরস্ত্রাণ ছোটো সূঁচলো। চোখের পাতায় কালো পক্ষ, স্ত্রী-পাখির শিরস্ত্রাণ কিছুটা ছোটো, কনীনিকা পাটকিলে।

বাসস্থান— ভারতে *2টি প্রজাতি। প্রথম* (টো বিরসট্রিস)— পাকিস্তান, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, নেপাল, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, অন্ধ্র, মাদ্রাজ, মহীশূর, গুজরাট আবুপর্বত থেকে কুনুরঘাট, এবং পালনি শহরে হাজার ফুটের ভিতর। *দ্বিতীয়*— 'মালাবার গ্রে হর্নবিল' (টো গ্রিসিউস)— পশ্চিমঘাট, বোম্বাই, কেরালা এবং সিংহলে 1600 মিটারের মধ্যে।

স্বভাব— পুটিয়াল ধনেশ খুব গভীর জঙ্গলে বাস করে না। ভিজে স্যাঁতসেতে জায়গাও পছন্দ করে না। শহর বা গাঁয়ের কাছেই দেখা যায়। মেদিনীপুর এবং সুন্দরবন অঞ্চলের খোলামেলা জায়গায়

আমার নজরে পড়েছে। দলপতির সঙ্গে ছোটো দলেই ঘোরাফেরা করে। ডাক বেশ জোর— 'ক-ক-ক-কিই' এবং এর সঙ্গে চিলের ডাকের কিছুটা মিশ্রণ। ওড়ায় পাখার আওয়াজ হলেও খুব জোরে হয় না।

প্রজননকাল— মার্চ থেকে জুন। ডিম পাড়ে 2-3টি অমসৃণ ভঙ্গুর মলিন-সাদা। ডিমের গড় মাপ— 41.0 × 30.0 মিমি. (লম্বায়— 1.7, চওড়ায়— 1.22 ইঞ্চি)।

2. **ঝুঁটি ধনেশ**— (রাইটিসেরস আনডিউলেটাস)। অসমিয়া— *মাহ-ডো-লা*, কাছাড়ি— *দাও রাই*, ইংরেজি— *রিদড্ হর্নবিল*। বলিচঞ্চু গণের (রাইটিসেরস) *প্রজাতি*।

লম্বায় 114 সেমি (45 ইঞ্চি)। কপালের উপর থেকে একটা গাঢ় (বেগুনি-বাদামী) লালের লাইন খানিকটা ঝুঁটির মতন মাথার চাঁদির উপরে চওড়া হয়ে ঘাড়ের কাছ পর্যন্ত। ঘাড় কালো। চাঁদি, মাথা ও ঘাড়ের দু'পাশ সাদা এবং কিছুটা জরদাভ, বিশেষত যেখানে বাদামী-লালের সঙ্গে মিশেছে। লেজ সাদা এবং হলুদাভ। চিবুক ও গলা পালকহীন ; উজ্জ্বল হলুদের উপর কালো টান, চামড়ার থলির মতন। ইচ্ছা করলে ফুলোতে পারে। বাকি পালক কালো, তার উপর ইস্পাত-সবুজের আভা। কনীনিকা কমলা-লাল। চঞ্চুর উপর মলিন হলুদ শিরস্ত্রাণ খুবই ছোটো এবং করুগেটেড টিনের মতন ঢেউখেলানো, ঢেউয়ের মাঝের রঙ গাঢ় লালচে। উপর ও নিচের চঞ্চুর গোড়ায় উঁচু-নিচু খোদল করা। মোম-হলুদ চঞ্চুর উপর নিষ্প্রভ কমলার আভা। পা ও আঙুল সবুজাভ-স্লেট। স্ত্রী-পাখির কেবল লেজ সাদা এবং গলার চামড়া উজ্জ্বল নীল, তার উপর কালো টান। চঞ্চু হলুদ, কোনো লালের আভা নেই।

বাসস্থান— পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ারস্ এবং আসাম থেকে ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন ও মালয়েশিয়া। ভারতে 2টি প্রজাতি। *প্রথম* (রা আনডিউলেটাস)— পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও বাংলাদেশে 2400 মি. পর্যন্ত ভিজে চিরহরিৎ জঙ্গলে। *দ্বিতীয়*— 'নারকনডাম হর্নবিল' (বা নারকনডামি)— নরকনডাম দ্বীপ (আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে)। বর্তমানে এই প্রজাতি প্রায় লুপ্ত হওয়ার মুখে।

স্বভাব— ঝুঁটি-ধনেশ খুব বড়ো দলে বাস করে। সংখ্যায় দেখা গেছে এই দল 40 থেকে 80-র। দল অনুপাতে হাঁকাহাঁকি খুবই অল্প। ভাঙা গলার গম্ভীর 'ক ক্কঃ' ডাক। আসামের পার্বত্যাঞ্চলে ঝুঁটি ধনেশের মাংস বিক্রি হয় ওষুধ হিসেবে।

প্রজননকাল— মার্চ থেকে জুন। ডিম পাড়ে 2-3 টি সাদা। ডিমের গড় মাপ— 63 × 43.2 মিমি. (লম্বায়— 1.95, চওড়ায়— 1.5 ইঞ্চি)।

পুত্রপ্রিয় বংশ

নীলকণ্ঠ বর্গের অন্তর্গত পুত্রপ্রিয় বংশের (উপপিদি) পাখির আভ্যন্তরীণ শারীর, স্থান ও অস্থির সংস্থানের সঙ্গে প্রিয়াম্বজ বংশ বা ধনেশের খুবই সাদৃশ্য আছে। পুত্রপ্রিয়দের পা সুষ্ঠুভাবে যুক্তাঙ্গুল নয়। তৃতীয় ও চতুর্থ আঙুল একদম গোড়ায় সংযুক্ত। একটি মাত্র গণকে বাংলাদেশ ও ভারতে দেখা যায়। এদের চঞ্চু খুব লম্বা, সরু এবং গোড়া থেকে সবটা বাঁকা। জিভ খুব ছোটো। ডানা গোল। লেজ লম্বায় মাঝারি ধরনের এবং মাথায় বেশ ভালো ঝুটি। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

মোহনচূড়া (Common Hoopoe)

শান্তিনিকেতন থেকে সকাল বেলায় কঙ্কালীতলা বা কাঞ্চীদেশে পাখি লক্ষ্য করার নেশায় হেঁটে পাড়ি দিয়ে এসেছি। কঙ্কালীতলা একান্ন পীঠস্থানের অন্যতম। পঞ্জিকায় লেখা আছে দেবী— বেদ-বা দেবগর্ভা, ভৈরব— রুরু।

আশেপাশে চারিদিকে পাখির সন্ধানে ঘুরছি। ভাবছি কুরুম্বা-তিলুটিয়ার দিকে যাব কিনা। আকাশের কোণে একটু মেঘের আভাস। হঠাৎ 'ক্ষ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এল আশ্বিনেরই আঙিনায়'। ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিলাম এক বট গাছের তলায়। বেশ খানিকক্ষণ ঝরঝর ধারে ঝরিয়ে দিয়ে কালো মেঘ কোথায় যেন পালিয়ে গেল। 'নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা' আবার দেখা গেল।

গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছি। ঝরাপাতা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে আছে। কাছের কোনো গাছ থেকে একটা ফিকে বাদামী পাখি এসে মাটিতে বসল। তার পিঠে, ডানায় ও লেজে কালো-সাদা টানা দাগ, ঠিক যেমন জেব্রাদের গায়ে থাকে। সরু লম্বা বাঁকানো চঞ্চু দিয়ে একটা ঝরা পাতা ওলটাল। কোনও পোকার



চি 19 মোহনচূড়া

শূক বলে মনে হল, সেটা টেনে বার করে খেল। সবচেয়ে অদ্ভুত তার মাথার ঝুঁটি। তালপাতার পাখার মতো ছড়ানো। মাটি থেকে পোকাটাকে যখন টেনে বার করছিল তখন সেটা গোটানো ছিল। চঞ্চু সমেত সেই গোটানো ঝুঁটিকে মনে হচ্ছিল যেন একটা গাঁইতি, তা দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। হাঁটা-চলা, দৌড়নো সবেতেই একটা ছন্দ আছে।

পাখিটাকে চিনি। পাখিটার ডাক অনুকরণ করে ইংরেজি নামটাই বাংলায় চালু। নামটা আমার পছন্দ নয়। সুসাহিত্যিক বনফুলের দেওয়া নামটিতেই একে মানায় ভালো— মোহনচূড়া। পাখিটার সৌন্দর্য ও রকম-সকম দেখতে দেখতে মনে পড়ল পুরনো এক কাহিনী।

কথিত আছে, রাণী শেবা রাজা সলোমনের মনোহরণ করতে অনেক উপহার পাঠিয়েছিলেন। নানাবিধ উপঢৌকনের মধ্যে রাজা সলোমন এই পাখিটিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করেছিলেন।

রাজা সলোমন ও এই পাখি নিয়ে আরও একটি উপাখ্যান আছে। রাজা বিক্রমাদিত্যের মতো ডেভিডের পুত্র রাজা সলোমনও ছিলেন বেতালসিদ্ধ এবং পশুপাখির ভাষা-জ্ঞান ইত্যাদি যাবতীয় ভৌতিক ও আধিভৌতিক ক্ষমতা সম্পন্ন।

একদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙতে রাজা সলোমনের ইচ্ছে হল তাঁর সীমাহীন রাজ্যের কী অবস্থা তা দেখার। তিনি একটা বড়ো কার্পেটের উপর তাঁর হাঁতির দাঁতের সিংহাসনটি চাপিয়ে মনে মনে স্মরণ করলেন তাঁর চারজন আজ্ঞাবহ অশরীরী প্রেত বা বেতালদের। তারা হাজির হতেই রাজা আদেশ দিলেন কার্পেটের চারকোণ ধরে সিংহাসন সমেত তাঁকে নিয়ে দেশদেশান্তরে ভ্রমণে যেতে।

বেলা বাড়তেই সূর্যের তেজ প্রখর হল। মাথা ঢাকবার কিছু সঙ্গে আনা হয় নি। ছত্রধারীও সঙ্গে নেই। সূর্যদেব যেন ইচ্ছে করেই রাজাকে জব্দ করার জন্যে তেজটা বাড়িয়ে দিলেন! রাজার ঘাড়, পিঠ, মাথা পুড়ে যাবার দাখিল। উপায়ান্তর না দেখে আকাশ পথে উড়ে যাচ্ছিল এক ঝাঁক শকুন, তাদের ডেকে রাজা বললেন, তাঁর মাথার উপর দিয়ে উড়তে, যাতে সূর্যের তেজ তাঁর সিংহাসন সহ কার্পেটকে স্পর্শ করতে না পারে। শকুনরা জবাব দেয় তারা তাঁর কথা রাখতে পারবে না, কারণ তাদের গন্তব্য পথ সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। রাজাজ্ঞা অমান্য করায় রাজা তাদের অভিসম্পাত দেন, কিন্তু সে অন্য গল্প।

এদিকে রোদের তেজে রাজা অস্থির হয়ে উঠেছেন। এমন সময় দেখলেন একটি ছোটো দলে কয়েকটি ছোটো পাখি উড়ে যাচ্ছে। রাজা তাদেরও ডেকে বললেন মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে, সূর্যের কিরণে তাঁর যাতে কষ্ট না হয়। ওই পাখির দলে ছিল ওদের রাজা। সে জবাব দিল, তারা মাত্র ক'জন। তবে ওই ক'জনেই যতটা পারে আড়াল করছে। আর খবর নিয়ে বিশেষ দ্রুত যাচ্ছে যাতে অবিলম্বে তাদের গোটা জাত এসে হাজির হয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই পাখির ঝাঁককে-ঝাঁক এসে মেঘের মতো আকাশ ছেয়ে ফেলল। রাজা আর সূর্যতাপে কষ্ট পেলেন না। দেশভ্রমণের পর হাতির দাঁতের তৈরি প্রাসাদে ফিরে এসে রাজা পাত্রমিত্র নিয়ে সোনার রাজসিংহাসনে বসলেন। সেই প্রাসাদের দরজাগুলি পান্নাখচিত, জানালা হীরের। এক-একটা হীরে কোহিনূরকেও হার মানায়। রাজার হুকুমে সেই পাখির রাজা রাজসমীপে দণ্ডায়মান হল। সসাগরা পৃথিবীর রাজা সলোমনের প্রতি এমন আনুগত্য

ও বশ্যতা স্বীকার করার জন্যে অত্যন্ত প্রীত হয়ে রাজা কোনও বর দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

ওই ছোট্ট পাখিরাজ হঠাৎ এভাবে সম্মানলাভে খুবই মশকিলে পড়ল। সে কি বর চাইবে তা ভেবে পেল না। শেষে ডান পা বুকে ঠেকিয়ে ঘাড় হেঁট করে জবাব দিল, 'মহারাজ! চিরজীবি হোন! আপনার এই অধম ভৃত্যকে অন্তত একদিন সময় দিন, তাহলে সে গিয়ে তাদের জাতের কি প্রয়োজন তা তার রানী এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে জেনে আসতে পারে।' রাজা সলোমন বললেন, 'তথাস্তু'।

পাখিরাজ উড়ে গিয়ে সমস্ত ঘটনা প্রথমে তার বুদ্ধিমতী সুন্দরী রানীকে ব্যক্ত করে পরামর্শ চাইল কি করা উচিত। রানীকে ভাবতে দিয়ে গাছের ডালে সপারিষদ মন্ত্রণা সভা বসিয়েও কিছুই স্থির হল না। কেউ বলে, খুব লম্বা লেজ চাওয়া যাক। কারুর মত, আমাদের পালক নীল আর সবুজ হোক। এক মন্ত্রী বলে, উটপাখির মতো বড়ো হওয়ার বর চাইলে মন্দ হয় না। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কিছুই স্থির হয় না। কারুর সঙ্গে কারুর মতের মিল হল না। কোনও সিদ্ধান্তে যখন আসা গেল না, তখন পাখিরানী রাজাকে ডেকে বলল, 'মহারাজ, আমার কথা শুনুন। রাজা সলোমনের মাথা যখন সূর্যতাপ থেকে আমরা বাঁচিয়েছি, তখন আমাদের প্রত্যেকের মাথায় সোনার মুকুট হোক এই বর চাওয়া যাক; তাহলেই আমরা সমস্ত পক্ষিকূলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হব এবং তার ফলে হব পাখিদের সম্রাট।'

রানীর এই যুক্তি সকলেরই খুব পছন্দ হল। পরদিন সকালে সেই ছোট্ট পাখিরাজ রাজা সলোমনের দরবারে গিয়ে তার প্রার্থনা জানাল। রাজা সলোমন মৃদু হেসে বললেন, 'খুব বুঝে-শুনে চিন্তা করেই স্থির করেছ তো?'

পাখিরাজ খুব বিনীত হয়ে বলে, 'হ্যাঁ মহারাজ! আমাদের সকলেরই খুব ইচ্ছে আমাদের মাথায় সোনার মুকুট হোক।'

জবাবে সলোমন বলেন, 'এই মুহূর্তেই তোমাদের সকলের মাথায় সোনার মুকুট হোক। কিন্তু তুমি মূর্খ। এই বরের ফলে যখন তোমাদের উপর অভিসম্পাত নেমে আসবে এবং অদূর ভবিষ্যতে সেটা আসবেই, উপায়বিহনী হয়ে নিজেদের মূর্খামির কথা মনে পড়বে, তখন কিন্তু আমার কাছে আসতে দ্বিধা করো না। আমি তোমাদের সাহায্য করব, বিপদ থেকে মুক্ত করব।'

ছোট্ট পাখিরাজ নিজের আস্তানায় ফিরে এসে দেখে তাদের সকলের মাথায় সোনার মুকুট বসে গেছে। এর ফলে তারা ক্রমে অত্যন্ত অহঙ্কারী ও দুর্মুখ হয়ে উঠল। নিজেদের রূপ দেখবার লোভে খালি ঘুরে বেড়ায় নদী, পুকুর, হ্রদের ধারে ধারে। আয়নার বদলে জলের ছায়ায় মুখ দেখে নিজেরাই আত্মহারা হয় আর গর্বে ফুলে ওঠে। রানী তো গরবে আর বাঁচে না। অহঙ্কারে ফেটে পড়ে। কারণ, তার বুদ্ধিতেই আজ সবার মাথায় সোনার মুকুট। গাছের উঁচু ডালে বসে সকলকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে বেড়ায়। এমনকি জ্ঞাতি শার্ঙ্গবংশের বাঁশপাতিদের তো যাচ্ছেতাই বলে। সুন্দরী মিষ্টভাষী রানী এখন মুখরা দুর্বিনীতা।

একদিন এক ব্যাধ তার ফাঁদের ভিতর এক টুকরো আয়নার ভাঙা কাচ দিয়ে ফাঁদ পেতেছিল।

কী হয় তাই দেখার বাসনাটাই তার ছিল। এদিকে এক সোনার মুকুট পাখি দূর থেকে আয়নার কাছে নিজের রূপে আত্মহারা হয়ে উঠল। কাছে গিয়ে কিরকম দেখাচ্ছে তাই দেখতে গিয়ে ফাঁদের ভিতরে ধরা পড়ল। ব্যাধ জ্বলজ্বলে মাথা দেখে মুকুটটা ছিঁড়ে জেকবের ছেলে তামা-পেতলের কাজ করে ইশাচরের কাছে গেল। জানতে চাইল, এটা কোন ধাতু। ইশাচর জবাবে বলল, ওটা কিছু নয়। পেতলের মুকুট একটা। দাম দিল পঁচিশ পয়সা। ইশাচর ব্যাধকে বলল আর যদি এরকম পায় তবে যেন সে তার কাছেই নিয়ে আসে। প্রতিদিনই আয়নার ফাঁদে ফেলে বেশ কিছু ওই বোকা অহঙ্কারী পাখিদের ধরে ব্যাধ বিক্রি করল জেকবপুত্র ইশাচরের কাছে।

এইভাবে দিন যায়। হঠাৎ একদিন ইশাচরের বাড়ি যাবার পথে এক সেকরার সঙ্গে ব্যাধের দেখা। কি ভেবে ব্যাধ তাকে সেই পাখির কয়েকটা মাথা দেখাল। সেকরা বলল এগুলো মোটেই পেতল নয়, একেবারে খাঁটি গিনি সোনা। সে চারটে পাখির মাথার জন্যে এক মোহর (দিনার) দাম দিল।

এসব খবর মুখে মুখে হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ল। সারা ইস্রায়েল জুড়ে শোনা যেতে থাকল ধনুকের টঙ্কার না হয় গুলতির শব্দ। পাখি ধরা সামান্য ফাঁদেরও দাম অসম্ভব বেড়ে গেল। কাতারে কাতারে সোনার মুকুটওয়ালা পাখি মরতে লাগল। যে কটি পাখি বেঁচে রইল তারা আর ভয়ে পাতার আড়াল থেকে মাথা বার করে না। দিনরাত তাদের চোখ দিয়ে জল ঝরে আর রানীকে অভিসম্পাত দেয়। কোনও উপায় না দেখে ওই পাখিদের রাজা গভীর জঙ্গল ও লোকালয়বিহীন জায়গা দিয়ে অনেক ঘুরে আপদবিপদ পার হয়ে রাজা সলোমনের সামনে হাজির হল। দুঃখের কথা বলতে গিয়ে সে কেঁদেই ফেলল। কয়েকটা অব্যক্ত আওয়াজ ছাড়া মুখ দিয়ে আর কিছুই বার হল না।

রাজা সলোমন সব বুঝলেন। দয়া পরবশ হয়ে বললেন, 'সোনার মুকুট প্রার্থনার সময়েই তোমার এই মূর্খামির জন্য সাবধান করেছিলাম। তুমি তা শোন নি। অহঙ্কার আর গর্বই তোমাদের এই ধ্বংসের কারণ। যাই হোক, তুমি আমার উপকার করেছিলেন সেকথা আমি ভুলি নি। তোমাদের মাথায় সোনার মুকুট আর থাকবে না, এখন থেকে মাথায় পালকেরই মুকুট হবে। সেই মনমুগ্ধকর মোহনচূড়া নিয়ে এখন থেকে তোমরা বিনা বিপদে পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াতে পারবে।'

এই যে পাখি যাকে দেখলাম কঙ্কালীতলায়, রাজা সলোমনের বরে মাথায় সোনার মুকুট নিয়ে যে পক্ষিকূলের রাজা সেজেছিল, সে হল পুরপ্রিয় বংশের (উপুপিদি)। ওই নামে একটি মাত্র গণের (উপুপা) প্রজাতি ; নাম— হুপো, মোহনচূড়া (উপুপা এপপস)। হিন্দি— হুদহুদ, ইংরেজি— হুপো।

মোহনচূড়া বা হুপো লম্বায় 31 সেমি. (12 ইঞ্চি)। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। মাথার উপর হাতপাখার মত ফিকে বাদামী চূড়া ; সামনে থেকে পিছনে পালকগুলি এসে লম্বা হয়েছে ; চূড়ার প্রতিটি পালকের ডগায় কালো-সাদা দাগ। ঘাড় ও গলার দু'পাশ এবং কাঁধের উপর থেকে ডানার বাঁক পর্যন্ত নিষ্প্রভ ফিকে ছাই-বাদামী। বাকি পিঠের পালকে চওড়া কালো-সাদা পটি। ওই পটি ডানার উপরেও। ডানা গোলাকার। লেজের ডগায় বেশ চওড়া কালো পটি, তারপর সাদা, আবার কালো। চিবুক সাদাটে, গলা এবং বুক খুবই ফিকে বাদামী ; বুকের দু'পাশে ছাইভাব। বাকি তলার পালক সাদা, তার উপর কালো এবং ধূসর-ছাইয়ের বড়ো বড়ো টান। কনীনিকা লালচে-বাদামী। সরু বাঁকানো

ছোটো জিভ সহ লম্বা চঞ্চু শিঙে-কালো, গোড়াটা ফিকে গোলাপী। পা ও আঙুল সীসে-রঙা।

বাসস্থান— ইওরোপ, এশিয়া, দক্ষিণে আফ্রিকা, মাদাগাস্কার ; মধ্যপ্রাচ্য, চীন, ইন্দোচীন, মালয় ও সুমাত্রা। ভারতে *4টি উপজাতি। প্রথম* (উ এ এপপস্)— পাকিস্তানে বেলুচিস্তান ; কাশ্মীর থেকে হিমালয়ের পাদদেশ ধরে পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশে। পাকিস্তান থেকে শীতে পরিযায়ী হয় রাজস্থান, কচ্ছ, সৌরাস্ট্র, উত্তর বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ এবং বিহারে 5790 মি-র. ভিতর। *দ্বিতীয়* (উ এ স্যাটুরাটা)— তিব্বত এবং হিমালয়ের 4400 মি-র. উপর নেপাল ও সিকিমে। শীতে পরিযায়ী হয় নেপালের সমতল, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, আসাম এবং বাংলাদেশে। *তৃতীয়* (উ এ সিলোনেনসিস)— নেপাল, পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম, দক্ষিণে নামে মধ্যভারত থেকে বোম্বাই, পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ থেকে সিংহলে 5 থেকে 1700 মি-র. মধ্যে। *চতুর্থ* (উ এ লংগিরসট্রিস)— আসাম ও বাংলাদেশে। 1600 মি-র. ভিতর।

খাদ্য— যাবতীয় ভূমিজ পোকামাকড়। ক্বচিৎ শূন্যে অথবা গাছের কাণ্ড বা শাখা থেকে সংগ্রহ করে। ভালোবাসে শুঁয়োপোকা, ঝিঁঝিঁ, ঘুরঘুরে, ঘাসফড়িং, কেঁচো এবং শস্যের অনিষ্টকারী সবরকম পোকা।

স্বভাব— মোহনচূড়া বা হুপো ঘন জঙ্গল পছন্দ করে না। একটু খোলামেলা জায়গা, বিশেষত গাঁয়ের ধারে-কাছে বড়ো বড়ো গাছের বাগান, ঝোপঝাড়ই পছন্দ করে। মেটে বাড়ির দেয়াল বা পরিত্যক্ত পুরোনো পাকা বাড়িতেই আস্তানা গাড়ে। মানুষের আবাসের কাছে খাদ্য সংগ্রহ বা বাসা বানাতেও দেখা যায়। একা বা জোড়ায় চরতে বেশি দেখি।

খাদ্য সংগ্রহ করে মাটি থেকেই বেশি। রাস্তার আশপাশে, ঘাসের মাঠে বা ওই ধরনের স্থান যেখানে ঘুরঘুরে, কেঁচো বা ভূমিজ পোকার শূককীট পাবার সম্ভাবনা সেখানেই মোহনচূড়াকে দেখতে পাওয়া যায়। কৃষির খুব উপকারী পাখি। লম্বা চঞ্চু দিয়ে কৃষির অনিষ্টকারী পোকাদের মাটির ভিতর থেকে টেনে বার করে। হাঁটা ও দৌড়ানো এদের খুব সাবলীল। মাটিতে এইভাবে চলাফেরার মাঝে ঘাসের গোড়া, ঝরাপাতা বা জঞ্জাল উলটে বা সরিয়ে দেখে কোনো পোকা সেখানে আশ্রয় নিয়েছে কিনা। সামান্যতম বিপদের আশঙ্কা বা কারোর আগমনের সম্ভাবনা আছে বুঝতে পারলেই উড়ে গিয়ে গাছে বা বাড়ির দেয়াল অথবা পাঁচিলে আশ্রয় নেয়।

খাদ্য সংগ্রহের সময় মোহনচূড়া তাঁর ঝুটি নামিয়ে বন্ধ করে রাখে। উড়ে গিয়ে কোথাও বসলে বা কোনও কারণে উত্তেজিত হলে সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁটি খাড়া করে পাখা মেলে দেয়। সাধারণত ওড়ার মধ্যে কেমন যেন ধীর ভাব এবং কোনদিকে যাবে তা যেন ঠিক করতে পারছে না বলে ওঠাপড়া ঢেউয়ের ভাবটা একটু প্রকট। এইভাবে উড়তে উড়তে হঠাৎ বাঁ বা ডানদিকে এমন বোঁ করে ঘুরে যায় যে, তখন মনে হয় কে যেন পিছন থেকে হুকুম দিয়েছে 'লেফট' বা 'রাইট' হুইল কুইক টার্ন করার।

ডাকটা কর্কশ নয়, খুব সুরেলাও নয়, একটু জোরে— 'উপ্ উপ্...হু-পো-পো...হুট হুট...হুদ'। আরও একটি কর্কশ শব্দ গলা দিয়ে বার হয় যখন বাসার মধ্যে থাকে। এছাড়া অন্য কোনও আওয়াজ বা সংগীত নেই। এই কণ্ঠধ্বনি থেকেই হুপো বা হুদ হুদ নামের উৎপত্তি।

পোষ মানালে মোহনচূড়া বা হুপো বেশ পোষ মানে। ভূমিজকীট প্রধান খাদ্য বলে ছাতু ও পিঁপড়ের ডিম একটু বেশি পরিমাণে খাওয়াতে হয়। ধূলি-স্নানে এদের আনন্দ। ওলট-পালট খেয়ে ধুলো মেখে, তারপর গা ঝাড়া দিয়ে ধুলো ওড়াবার পর যখন লম্বা বাঁকানো চঞ্চু দিয়ে গাত্রমার্জনা করে তখন তা দেখবার মতন। বন্দী অবস্থাতেও বাসা বানাবার উপকরণ পেলে বানায় এবং ডিম ফুটিয়ে ছানা তোলে।

সভ্যতার সঙ্গে মোহনচূড়ার একটা সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায়। আদি সভ্যযুগে মিশর ও ক্রিটদ্বীপের দেয়ালের গায়ে দেখি এদের ছবি। সেযুগ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগের সাহিত্য এবং চিকিৎসাশাস্ত্রেও এর পরিচয় পাই। ক্রিটদ্বীপের রাজা জেরেউস এই পাখির দেহ ধারণ করেছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যে মহম্মদীয়দের উপাখ্যানে পাই রাজা সলোমনের প্রিয় বন্ধু, সহচর এবং বিশেষ দূত হিসেবে ; আর সেই সঙ্গে মুকুট লাভের উপকথা। বাইবেলে হট্টিমা পাখির (ল্যাপউইং) যা বর্ণনা তা এই মোহনচূড়ার। সবচেয়ে বড়ো গুণের খবর পাওয়া যায় তার দেহের বিভিন্ন অংশের মাংসের উপকারিতার। মিশরীয় যুগ থেকে শুরু করে 1752 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ডাঃ আর জেমস-এর চিকিৎসাশাস্ত্র 'ফার্মাকোপিয়া ইউনিভার্সালিস'-এ উল্লেখ পাওয়া যায় যে, এর মাংসে মানুষের দৃষ্টি-শক্তি যেমন বাড়ে তেমনই বাড়ে স্মৃতি-শক্তি। ভারতেও অনেকের এসব গুণের পরিচয় থাকায় কোথাও কোথাও মোহনচূড়ার মাংস খাওয়ার রীতি চালু আছে।

প্রজননকাল— ফেব্রুয়ারি থেকে মে। কোথাও কোথাও জুন-জুলাই পর্যন্ত দেখা যায়। বাসা বানায় কোনো গর্তের মধ্যে। এ গর্ত নিজে খুঁড়ে তৈরি করে না। আপনা থেকেই যদি গর্ত থাকে গাছে, দেয়ালে বা বাড়ির ছাদে, এমনকি পরিত্যক্ত মাটির ঘরের মেঝেতেও, সেখানেই বাসা বানায় কিন্তু সর্বত্র অন্ধকার চাই। অন্ধকার হল বাসার প্রধান উপাদান। সেই অন্ধকার গর্তে যেমন-তেমন করে বিছনো থাকে কিছু ঘাস, লোম, পাতা বা পালক।

ডিমে তা' দেবার সময় স্ত্রী-পাখির গা থেকে এক রকম দুর্গন্ধ বার হতে থাকে। এই গন্ধ প্রীন গ্ল্যাণ্ডের ক্ষরণের ফলে ঘটে থাকে। বাসা থেকে সে এই সময় বার হয় না বললেই চলে। পুরুষ-পাখিই খাদ্য সংগ্রহ করে এনে তাকে খাওয়ায়। ডিম থেকে ছানা ফুটে বার হবার আগে ও পরে বাসার ভিতরের কোনও ময়লা কখনও পরিষ্কার করে না। সেইজন্যও দুর্গন্ধ ছড়ায়। দুর্গন্ধ ও নোংরামির জন্যে ইহুদী-আইনে শূয়োরের মতন এর মাংসও অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত হয়। ওদিকে টেস্টামেণ্টে হুপো সুখাদ্য হিসেবে গণ্য। ইওরোপে খ্রিষ্টিয় ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এই মাংসের চলন খুব বেশি।

মোহনচূড়া ডিম পাড়ে 3 থেকে 5টি। সেইজন্য বাসার ভিতর প্রথম থেকে ষষ্ঠ সংখ্যক ছানার আকারে পরস্পরের মধ্যে অনেক তফাৎ হয়। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই সন্তানদের খাদ্য সংগ্রহ করে খাওয়ায়। এই সময় সন্তানদের প্রতি একটা মমতা লক্ষ্য করা যায় যা মানবিক পর্যায়ে পড়ে। মোহন-চূড়ার ডিম একটু লম্বাটে ধরনের। খোলা মসৃণ ও শক্ত। ডিমের উপর ছিট বা ছোপ, কিন্তু চকচকে ভাবটা একদম নেই। প্রথম অবস্থায় ডিমের রঙ সাদাটে সবুজাভ-নীল থেকে সাদাটে জলপাই-পাটকিলে, পরে তা' দিতে দিতে ওই রঙ বদলে হয় ময়লাটে-পাটকিলে। ডিমের গড় মাপ— 25 × 17 মিমি. (লম্বায়— 100, চওড়ায়— 0·55 ইঞ্চি)।

লোহচটক বর্গ

লোহচটক বর্গের (অর্ডার ট্রগোনিফরমেস) পাখিদের যেমন এশিয়া, ইওরোপ অর্থাৎ পূর্ব গোলার্ধে দেখা যায়, তেমনই দেখা যায় পশ্চিম গোলার্ধ বা আমেরিকায়। এই বর্গে একটি মাত্র বংশ। এই বর্গকে অন্যান্য বর্গ থেকে তফাৎ করা হয়েছে আঙুলের গঠনের জন্য। এদের যুগ্মাঙ্গুল গোষ্ঠীর (জাইগোড্যাকটাইলাস) অর্থাৎ কাঠকুট্ট, শুক, পরভৃত ইত্যাদি পাখিদের মতো পায়ের দুটো আঙুল সামনে, দুটো পিছনে। কিন্তু তফাৎ হচ্ছে কাঠকুট্ট বর্গের (পাইকিফরমেস) পাখিদের প্রথম ও চতুর্থ আঙুলের নখরের মুখ পিছন দিকে, আর এদের প্রথম-দ্বিতীয় সামনে, তৃতীয়-চতুর্থ পিছনে। সেই কারণে এই পাখিদের আলাদা বর্গের মধ্যে ধরা হয়েছে।

লোহ বংশ

লোহ বংশে (ট্রগোনিদি) বেশ কয়েকটা গণ। প্রতিটি গণের পাখিই দেখতে খুব সুন্দর। আমাদের ভারতে একটিমাত্র গণে *তিনটি প্রজাতি।* এই বংশের সবচেয়ে সুন্দর পাখিকে দেখা যায় মেক্সিকো থেকে দক্ষিণ আমেরিকায়। তার নাম— কোয়েটজাল (ফারোম্যাকরাস মকিন্নো)। দেহ উজ্জ্বল-ধাতব ব্রোঞ্জ-সবুজ, মাথায় ঝুঁটি, পুরুষের লেজের লোম-পালক ছাড়িয়ে যায় এক মিটারের উপর। বুক, পেট ও তলপেট উজ্জ্বল লাল এবং সাদা। কোয়েটজাল সবচেয়ে জনপ্রিয় গোয়েতেমালায়। সেখানকার ডাকটিকিট, মুদ্রা, এমনকি, রাষ্ট্রীয় সিলমোহরেও এদের মূর্তি।

সদাসোহাগী (Red-headed Trogon, ♂)

দার্জিলিং গেলেই সিকিম যাওয়া-আসা করাটা আমার বাতিক। ঐ পথে নানারকম পাখি দেখি, যা আর কোথাও সহজে নজরে পড়ে না। 1979 সালে সিকিম থেকে ফিরতি পথে একটি পাখিকে দেখি, যা একমাত্র ছবিতে ছাড়া আর দেখি নি।

বিকেল হয়ে গেছে। আকাশে পাহাড়ে গাছের মাথায়, এমনকি মাটিতে ঝোপেও গোধূলি তার রক্তিম স্বর্ণাভ আলোয় এক অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে। চালকের পাশেই বসেছি। ফিরতি পথে যাত্রী বেশি নেই। আসার সময় চালককে জঙ্গলের মাঝে বার কয়েক গাড়ি থামাতে হয়েছে। নেমেছি, দূরবীন চোখে লাগিয়ে খুঁজেছি। এই পথে অনেকে দেখলেও আমি তখনও দেখি নি।



চি 20. সদাসোহাগী

সেদিন যাকে দেখলাম তার কথা চিন্তাও করি নি। একটু দূরে একটা নেড়া গাছ, শুধু কাণ্ডটাই আছে, ডালপালা কিছু নেই, মাটি থেকে 3-4 মিটারের বেশি হবে না, তার উপর নিথর হয়ে বসে আছে একটি পাখি। গোধূলির আলোয় পাখির দেহের বর্ণচ্ছটা স্বর্গীয় শোভা ধারণ করেছে। দেহ শালিকের চেয়ে একটু বড়ই হবে কিন্তু লেজ বেশ চওড়া ও বড়ো। গাড়ি থেকে নেমে খুব সন্তর্পণে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখছি। কানে আসছে চালক ও অন্যান্য যাত্রীদের মন্তব্য। যার অর্থ লোকটা এক আস্ত পাগল। চিড়িয়া দেখার এত কি আছে? পাগল লোকের পাল্লায় পড়ে দার্জিলিঙ ফিরতে রাত হয়ে যাবে। আসার সময় এই পাগলামি যাবার সময়েও তাই। হাত পঁচিশেক দূর থেকে ঝোপের আড়ালে বসে দূরবীন লাগিয়ে দেখছি। মাথা, ঘাড়, বুক টকটকে লাল। পিঠ এবং তলাটা লালের উপর পাটকিলের আভা। ডানার আচ্ছাদক এবং তৃতীয় সারির পালকের উপর সাদা-কালো-আঁকিবুঁকি কাটা। লম্বা-চওড়া চৌকো লেজ পড়তে পড়তে নেমে এসেছে। লেজের একদম বাইরের পালকের ধার সরু করে কালো আর সাদা। তলাটা উজ্জ্বল এবং হালটা টকটকে লাল। ছবিতে দেখেছি বুকের উপর দিয়ে মালার মতো একটা সাদা সরু লাইন। এই পাখিটার তা নেই। হয়তো আরও বয়েস হলে এই সাদা লাইনটা দেখা যায়, কনীনিকা লাল, চোখের চারপাশে অক্ষিকোটরের চামড়া বেগুনি-নীল। উপরের চঞ্চু বেগুনি-নীল, চঞ্চুর ধারটা উপর-নিচে খুব সরু করে কালো ডগাটাও তাই। তলার চঞ্চুর গোড়াটা বেগুনি, বাকি কালো। দুই চঞ্চুতেই করাতের মতো ছোটো ছোটো দাঁত। পা ও আঙুল খুব হালকা বেগুনি। পাখিটা চুপ করে বসেছিল। হঠাৎ উড়ে শূন্যে একটা পোকা ধরে আবার সেই জায়গায় এসে বসল। তখন দেখলাম ডানার তলায় একটা সাদা ছোপ আর লেজের একদম ধারের সাদাটা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চালকের হাঁকাহাঁকিতে পাখিটা ডানায় ফটফট শব্দ তুলে গভীর জঙ্গলের মধ্যে উড়ে চলে গেল। আমি যাকে দেখলাম তা লোহ বংশের (ট্রেগোনিদি) *এক প্রজাতি*। নাম— পুরুষ— সদাসোহাগী, স্ত্রী— কুচকুচিয়া (হারপাকটেস এরাইথ্রকেফালাস), ইংরেজি— *নেপাল রেডহেডেড ট্রগোন*। গোটা দুয়েক উপজাতি আছে। তাদের একটিকে (হা, এ এরাইথ্রকেফালাস) দেখা যায় বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার পার্বত্যভূমিতে 1800 মি-র উচ্চতার মধ্যে।

সদাসোহাগী লম্বায় 35 সেমি। স্ত্রী-পাখি কুচকুচিয়ার মাথা, ঘাড়, বুক নিষ্প্রভ কমলা-পাটকিলে, বাকিটা পুরুষ সদাসোহাগীর মতো।

বাসস্থান— হিমালয়ের কুমায়ুন থেকে নেপাল, সিকিম, ভূটান, উত্তরবঙ্গ, মধ্য আসামে খাসি, গারো

ইত্যাদি পাহাড়ী অঞ্চল, নাগাল্যান্ড ও মণিপুর। তরাই, ডুয়ার্সের গভীর জঙ্গলের 1800 মি-র উচ্চতার মধ্যে বসবাস করে।

খাদ্য— শুঁয়োপোকা, নানারকম পোকা, ঘাসফড়িং ও অন্যান্য পতঙ্গ, গাছের পাতা ও ছোট ফল।

স্বভাব— ডাকে গলার ভিতর থেকে হঠাৎ কিছুটা সুরে অনেকটা বেনেবৌ-কাজল পাখির মত 'কিউ' বা 'মিউ' স্বরে, সাধারণত তিনবার 'কিউ কিউ কিউ' কখনও বা পাঁচবার খুব তাড়াতাড়ি। ভয় পেলে বা সচকিত হলে একটা আওয়াজ বার করে 'কবর-র-র'।

সদাসোহাগী জঙ্গলের পাখি। ভিজে পর্ণমোচী ও বাঁশবন মেশান জঙ্গল পছন্দ করে বেশি। বৃক্ষবাসী। নড়াচড়া কম, কিছুটা সকাল-সন্ধ্যের গোধূলিতে খাদ্য খোঁজে। সূর্যাস্তের পরেও শিকার ধরতে দেখা যায়। সাধারণত একাই বিচরণ করে। জোড়েও করে তবে দু'জনের মধ্যে তফাত থাকে অনেকটা। বহুক্ষণ ধরে বসে থাকে চুপচাপ স্থির হয়ে গাছের নিচের ডালে, তারপর হঠাৎ উড়ে পোকা ধরে আবার এসে বসে সেইখানে। পড়তে পড়তে নেমে আসা লম্বা লেজ গাছের ডালের সঙ্গে এমনভাবে মিশে থাকে যে অনেক সময় বোঝাই যায় না। জঙ্গলের মধ্যে ওদের ডাকেই উপস্থিতি বোঝা যায়। বসা অবস্থা থেকে ওড়ার আগে আস্তে 'কিড়ু-কিউ' ডাক, তারপরেই ওড়ে ঘুঘুর মতো ফটফট আওয়াজে এদিক-ওদিক বাঁক খেয়ে। নামার সময় ঘুঘুর মতোই নামে পোকার পিছনে পিছনে. উড়ে যখন তাকে ধরে তখন শা-বুলবুল বা দুধরাজের মতো ধাওয়া করে। এই পোকা ধরতে গিয়ে মাঝে মাঝে হুস করে মাটিতেও নেমে আসে।

প্রজননকাল— ফেব্রুয়ারি থেকে মে। গভীর জঙ্গলে গাছের গায়ে স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠা গর্তে, সাধারণত কাঠিকুটোর আস্তরণ না বিছিয়ে 2 থেকে 4টি মলিন হলদেটে-সাদা চকচকে ছিটছোপহীন ডিম পাড়ে। ডিমের গড় মাপ— 26·7 × 23·4 মিমি। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই ডিম ফোটানোতে পরস্পরকে সাহায্য করে, কিন্তু কতদিনে ডিম ফোটে তা এখনও জানা যায় নি।

অপাদ বর্গ

অপাদ অর্থে পা নেই এমন নয়, তবে পায়ের কাজ অন্যান্য পাখিদের যেমন এদের তা নয়। এরা শুধু পায়ের বাঁকানো নখ দিয়ে একমাত্র দেওয়াল আঁকড়ে ধরতে পারে।

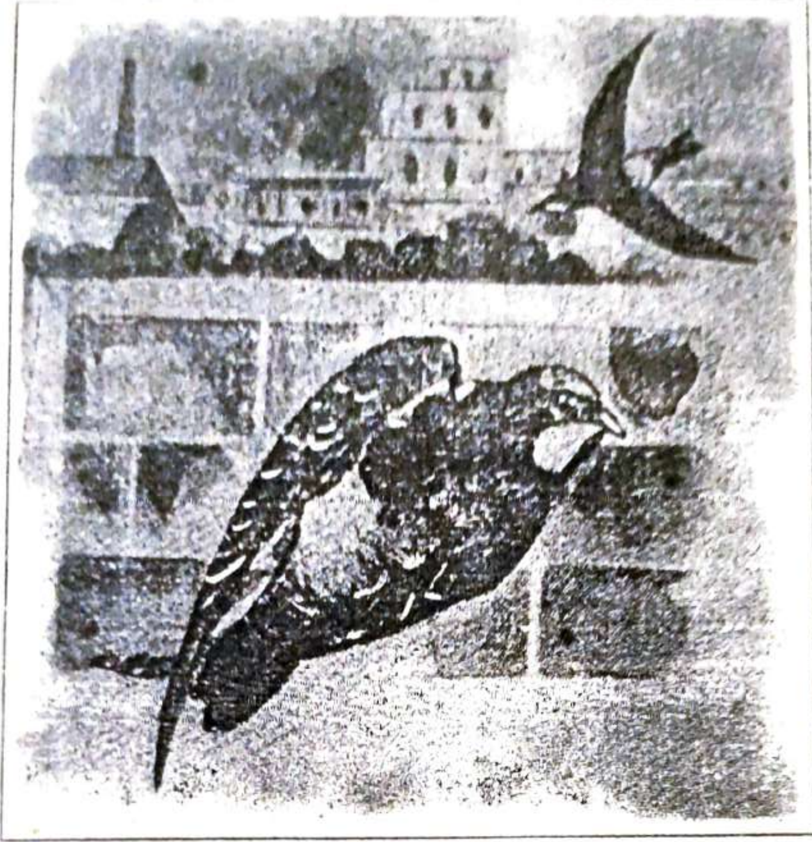
অপাদ বংশ

এই অপাদ বর্গে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম পাখি মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার গুঞ্জনপক্ষী বংশ ট্রাকিলিদি হামিং বাডস্।

অপাদ বংশে 5টি গণ— জীর্বি (আপুস), তালচটিকা (সাইপসিউরাস), শল্যপুচ্ছ (ছায়েটুরা), গিরিশা (কললোকালিয়া) এবং একপুত্রক (হেমিপ্রকনে)। একমাত্র একপুত্রক গণের পাখিদের ডানা লেজ ছাড়িয়ে যায় নি, বাকি সকলের ডানা এত লম্বা যে লেজ ছাড়িয়ে যায়। সেইজন্য একপুত্রক গণের পাখিদের ওই নামেই একটি উপবংশের (হেমিপ্রকনিনি) মধ্যে ধরা হয়। গিরিশা গণের পাখিদের পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায় না। সমুদ্র উপকূলস্থিত বা নিকটবর্তী কোনও পাহাড়ের গুহায় তারা বাস করে। দক্ষিণ ভারতে এই গণের পাখিদের দেখা যায়। প্রজননকালে ললাস্রাবী গ্রন্থির (স্যালিভারি গ্ল্যান্ডস্) স্ফীতি খুবই বেশি হয় এবং থুতু বা লালা হাওয়ার স্পর্শে জমে যায়। এই লালা দিয়ে ওরা পাথরের গায়ে বাসা বানায়। প্রায় অস্বচ্ছ কাচের (আইসিংগ্লাস) মতো বাসার সুরুয়া চীনবাসী ও অন্যান্যদের খুব প্রিয়। সেই কারণে ওই পাখিদের নাম— এডিবলনেস্ট সুইফটলেটস্। দক্ষিণ ভারতীয় বাসাগুলি একটু কালচে রঙের হয়। ভারতে একমাত্র আন্দামানের পাখিদের বাসা সাদা। চীনবাসীদের বিশ্বাস এই বাসার সুরুষা হজমী এবং বলবর্ধক। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এতে যবক্ষারজনীয় (নাইট্রজেনাস) পদার্থ ছাড়া শতকরা 50 ভাগ দেহসার বা প্রোটিন এবং শতকরা 7 ভাগ খনিজ (মিনারেল্) পদার্থ আছে।

বাতাসী (House Swift)

সকালে বা বিকেলে বারান্দায় দাড়ালেই দেখতে পাই ধনুকের মতো ডানা ছড়িয়ে ঝাপটিয়ে কয়েকটা পাখি চক্কর খেয়ে খেয়ে নানা কায়দায় উড়ছে, ভাসছে। এদের বুক-পেট সাদা, পিঠ কালো এবং বস্তিপ্রদেশ সাদা, মুখে সমানে ডাক দিয়ে চলেছে তীব্রস্বরে 'চাক-চাররর'... চাক-চাররর্...।' মাঝে



চি 21. বাতাসী

মাঝে ডাকছে শিসের মতন 'ৎসিক-ৎসিক... সিক্‌সিক্‌সিক্‌...'।

একদিন দেখলাম তিনটি পাখি তাদের ডানা প্রজাপতির মতো পিঠের উপর তুলে উড়ছে। ডানার ডগাটুকু শুধু কাঁপছে। পরস্পরকে ওই অবস্থায় তাড়া করে ফিরছে।

বেশ দেখতে লাগে এই দ্রুতগতির পাখিদের। অনেকেরই নজরে পড়ে, কিন্তু ভালো করে কেউই লক্ষ্য করেন না। একজনকে জিজ্ঞেস করাতে জবাব পেয়েছিলাম, ওটা এক ধরনের চামচিকে। বুঝলাম, ভালো করে লক্ষ্য না করার জন্যে ওটা যে পাখি এটাই অনেকে জানেন না।

বাতাসের বেগে ওড়া এই পাখিগুলি অপাদ বর্গের (আপডিফরমেস) অন্তর্গত জীর্বি গণের (আপুস) *এক প্রজাতি*; নাম— বতাসী (আপুস অ্যাফিনিস্) ; হিন্দি— *বাবীলা, আবাবিল*; ইংরেজি— *হাউস সুইফট্*।

জীর্বি গণের *5টি প্রজাতির* মধ্যে একমাত্র বাতাসীকেই পশ্চিমবঙ্গের সমতলে দেখা যায়। আর একটিকে দেখা সেটি হল তালচটিকা গণের *একটিমাত্র প্রজাতি*— তালচড়াই (সাইপসিউরাস পারভাস) ; হিন্দি— *তাড়ি আবাবিল*; ইংরেজি— *পাম সুইফটস্*।

বাতাসী লম্বায় 15 সেমি (6 ইঞ্চি)। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। চিবুক, গলা এবং বস্তিপ্রদেশ সাদা। বাকি পালক গাঢ় ছাই-কালো, কিছু অংশ চকচকে। মাথা ও লেজের তলার পালক কিঞ্চিৎ ফিকে। চোখের সামনে একটা গাঢ় কালো দাগ। কালো চঞ্চু বেঁটে, ডগা বাঁকা এবং গোড়া চওড়া। ডানা

শর, আকারে কাস্তের মতো চৌকো লেজ ছোটো। কনীনিকা পিঙ্গল, চঞ্চু শিঙে কালো ; মুখগহ্বর গোলাপী ; পা গোলাপী পাটকিলে এবং নখর শিঙে-কালো।

বাসস্থান— আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত থেকে ইন্দোচীন, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ চীন ও ফরমোসা। পশ্চিমবঙ্গে যে প্রজাতিকে দেখা যায় তাদের স্থানভেদে ৫টি উপজাতি।

খাদ্য— উড়ন্ত ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ।

স্বভাব— বাতাসী পুরোমাত্রায় সংঘচারী। ছোট দলে যেমন দেখা যায় তেমনি দেখা যায় পঞ্চাশ থেকে একশ' বা তারও উপরের দলে। সংঘচারী বলে এরা নিজেদের কলোনি করে বাসা করে। কলোনি-বাসা থেকে ওরা খুব দূরে যায় না। উড়ন্ত পোকামাকড় সংগ্রহ করতে অনেক সময় দেখা যায় খুব উঁচুতে উঠতে। সকাল-সন্ধ্যে ছাড়াও দিনের অন্য সময়েও দেখা যায় পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরতে, আর মুখে থাকে 'চাক-চারর্...চাক-চারর্..,ৎসিক-ৎসিক...ৎসিক-ৎসিক...তীব্র আওয়াজ। ওরা খুব দ্রুত ওড়ে বলেই ইংরেজিতে 'সুইফট' বলে। কয়েকটা খুব তাড়াতাড়ি সরু ডানার ঝাপট, তারপরেই ভাসা, ভাসতে ভাসতে বাঁক খাওয়া, পাক খেয়ে ছোট উড়ন্ত পোকামাকড়ের পিছনে ছোটা। এইই ওদের জীবন।

সন্ধ্যের সময় বেশি দেখা যায়। আকাশে আনন্দধ্বনি জাগিয়ে উঁচুতে উঠছে স্রেফ প্রাণের আনন্দে, বিন্দু হয়ে ছোট্ট বিন্দুতে পরিণত হতে। জোরে বাতাস বইতে থাকলে ডানা নামিয়ে দেয় দু'পাশে ঢালু টিনের বা টালির ছাদের মতন, এভাবে স্থির হয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত বাতাসের বিরুদ্ধে, কখনও বা বাতাসের বেগে পিছিয়ে যায় ওই অবস্থায়। আবার দেখা যায় সবাই একজোট হয়ে বলের আকারে উপরে উঠছে ধ্বনি দিতে দিতে। এই-ই ওদের খেলা।

বাতাসীর কলোনি-বাসা কাঁচা বা পাকা বাড়ির আনাচে-কানাচে, কার্নিসের তলায়, দেওয়ালের কোণে তা শহর বা গ্রামে যেখানেই হোক না কেন। পছন্দ পুরোনো প্রাসাদ, অট্টালিকা, মন্দির, মসজিদ, গির্জা, দুর্গ, পুল, খাড়া পাহাড় বা উঁচু নালার গায়ে বাসা বানানোতে। কলকাতার বিবাদী বাগের অফিসমহল্লাতেও ওদের কলোনি-বাসা দেখা যায়। আর সেখানে তাদের কাকলীতে আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে থাকে।

পালক, ঘাস ও খড় এই তিনকে জিভের লালা দিয়ে সিমেন্টের মতো শক্ত করে কতকগুলো গোলাকার বাসা বানায়। কখনো দেখা যায় পাথর বা ছাদের তলায় এক-একটি বাসা দূরত্বে রাখা, কখনও বা ঘেঁষাঘেঁষি করে একটার পর আর-একটা। আবার দেওয়ালের গায়ে গর্তের মধ্যেও বাসা দেখা যায়, তবে গর্তের প্রবেশ পথে থাকে পালক, ঘাস ও খড় সিমেন্ট করা। বাসার সমস্ত উপকরণ কিন্তু উড়তে উড়তেই সংগ্রহ করে।

শীতকালটা এদের পছন্দ নয়। হয়তো সেই সময় পোকামাকড় কম পাওয়া যায় তাই। শীতে বা জলো ঠাণ্ডা দিনে এরা বাসার মধ্যে ঝিম মেরে পড়ে থাকে।

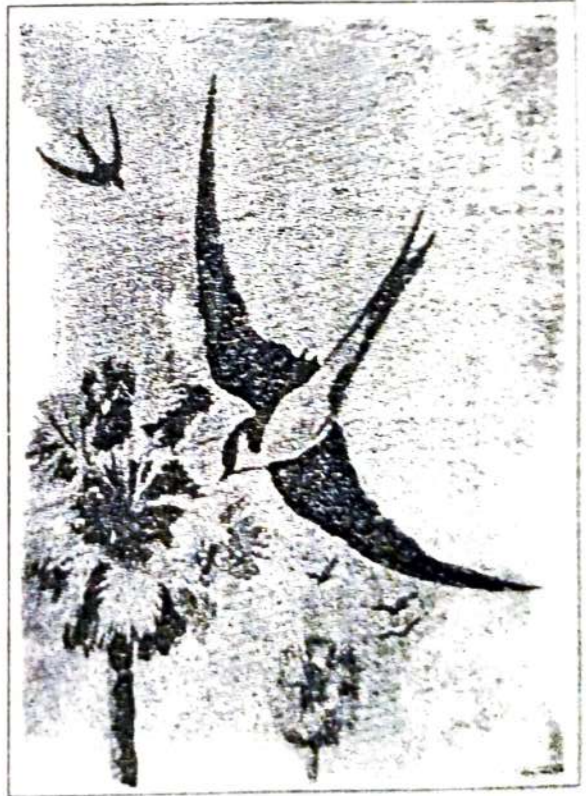
প্রজননকাল— কোনো ঠিক নেই। একমাত্র নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি ডিম পাড়তে দেখা যায় না, না হলে বছরের অন্য সময়ে কোনো না কোনো বাসায় হয় ডিম না হয় ছানা পাওয়া যায়।

বাসার ব্যবহার ওদের কাছে কেবল ঘুমানোয়, স্বল্পকালীন বিশ্রামে এবং ডিমে তা' দেওয়ায়, তাছাড়া বাকি জীবনটা বাতাসে ভেসেই। বাসা বানানোয়, ডিমে তা' দেওয়ায় এবং সন্তান প্রতিপালনে স্ত্রী পুরুষ দু'জনে দু'জনের সহযোগী।

ডিম পাড়ে সাধারণত 2-3টি, মাঝে মাঝে 4টি লম্বাটে সরু আকারের। সরু দিকটা বেশ সুঁচলো। ডিমের খোলা পাতলা, অমসৃণ এবং ধবধবে সাদা। ডিমের গড় মাপ— 22.2 × 14.2 মিমি. (লম্বায়- 0.85, চওড়ায়- 0.55 ইঞ্চি)।

তালচড়াই

রোজ সকালে পার্ক সার্কাস মার্কেটে যাবার পথে দিলখুসা স্ট্রীট দিয়ে যেতে বাঁদিকে পড়ে কাসিয়াবাগানের বড়ো পুকুর, আর ডানদিকে ট্র্যাফিক গার্ডদের আস্তানা। সেই আস্তানার গা ঘেঁষে আছে তিনটি উঁচু তালগাছ। বর্তমানে সেই তিনটি গাছ আর নেই। দুটিকে কেটে ফেলে তার বাসিন্দাদের বাস্তুহারা করা হয়েছে।



চি 22. তালচড়াই

সেদিন মার্চের গোড়াতেই নজরে পড়ল কতকগুলো পাখি চক্কর দিতে দিতে কাসিয়াবাগানের পুকুরের দিকে যাচ্ছে, ফিরছে, ঘুরছে আর ডাকছে তীব্রস্বরে— টিটিটিই... টিটিটিই...'।

পাখিগুলো রোগাটে, হালকা কালচে-পাটকিলে, বেশ সরু চেরা লেজ। বাঁকানো খুব সরু ডানা দেখে মনে হচ্ছিল ধনুক, গলা আর দেহ যেন সেই ধনুকে তীর সংযোজন করা হয়েছে। বাতাসীর মতো অত দ্রুত এবং কায়দার না হলেও মোটামুটি উড়ছিল বেশ। বাতাসীর চেয়ে আকারে ছোটো এবং কোমরে সাদা ছোপ নেই। তাসত্ত্বেও বাতাসীর সঙ্গে যে একটা সম্বন্ধ আছে তা বুঝতে কষ্ট হয় না। দাঁড়িয়ে ওদের দেখতে লাগলাম। দেখলাম মাঝেমাঝে তালগাছে এসে বসছে, আবার পরমুহূর্তে উড়ে যাচ্ছে।

পাখিগুলো অপাদ বংশের (আপডিফরমেস) অন্তর্গত তালচটিকা গণের (সাইপসিউরাস) এক *প্রজাতি*; নাম— তালচড়াই। (সাইপসিউরাস পারভাস); হিন্দি— *তাড়ি আবাবিল, তালচট্টা*; ইংরেজি— *পাম সুইফট্*। এই গণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লেজ বেশ ভালো করে চেরা; আঙুল জোড়ায় সাজানো। তৃতীয় ও চতুর্থ আঙুল বাইরের দিকে, প্রথম ও দ্বিতীয় ভিতর দিকে। ভারতে *একটিমাত্র প্রজাতি*।

তালচড়াই লম্বায় 13 সেমি (5 ইঞ্চি)। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। উপরের পালক মলিন পিঙ্গল, মাথা অত্যাধিক গাঢ়, ধনুকের মতো ডানা ও চেরা লেজ আরও গাঢ়। নিচের পালক মলিন ধূসরাভ-পিঙ্গল, চিবুক ও গলায় হালকা পিঙ্গল। কনীনিকা পাটকিলে, বেঁটে চঞ্চু গাঢ় শিঙে-পাটকিলে, গোড়াটা চওড়া, মুখগহ্বর গোলাপী-ধূসর। পা, আঙুল ও নখর গোলাপি-পাটকিলে।

বাসস্থান— ভারতে *একটি প্রজাতির 2টি উপজাতি। প্রথম* (সাই পা বাটাসিয়েনসিস)— পাকিস্তানে নেই; হিমালয়ের দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গ সহ সমগ্র ভারত, রাজস্থান ও গুজরাটের দু'চারটি স্থান এবং বাংলাদেশে। সমতলে যেখানে তাল বা সুপুরি গাছ সেইখানেই। *দ্বিতীয়* (সাই পা ইনফিউমেটাস)- আসামে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ, নাগাভূমি, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশে। তালগাছ ছাড়াও গারো ও নাগা পাহাড়ের অধিবাসীদের তালপাতা দিয়ে ছাওয়া ঘরের মাথায় *এইউপজাতির* পাখিরা বাসা বাঁধে। ভারতের বাইরে বর্মা, থাইদেশ, ভিয়েতনাম,হাইনান দ্বীপ, মালয়, টামবেলান দ্বীপপুঞ্জ, সুমাত্রা, জাভা, বলি, বিলিটন এবং বর্ণিও।

খাদ্য— উড়ন্ত পিঁপড়ে ও অন্যান্য উড়ন্ত কীটপতঙ্গ।

স্বভাব— যেখানে তাল গাছের সংখ্যা বেশি সেখানে তালচড়াইকে দেখা যাবেই। সুপুরি-গাছের সারিতেও এদের দর্শন মেলে। বাতাসীর মতো এরাও সংঘচারী, কিন্তু একটা ছড়ানো-ছিটানো ভাব আছে এবং ওড়াটাও অত দ্রুত নয়। সারাদিন এদের কাটে ডানার উপরে। কখনও খুব উঁচুতে, আবার কখনো মাটি ঘেঁষে। মুখে আওয়াজ টিটিটি-ইই...'। কখনও দেখা যায় ঘেঁষা-ঘেঁষি করে তালগাছের যে পাতা একটু ঝুলছে তার ডাঁটায় বসে আছে কয়েক জোড়া। মাঝে মাঝে পাশাপাশিভাবে ছোটো ছোটো পায়ে চলে যায় তালডাটার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। আবার দেখা যায় একই তালগাছে, একডালে তালচড়াই অপর ডালে চামচিকের কলোনি।

তালচড়াই কলোনি করে বাস করলেও একগাছে দুই বা তিনজোড়া মাত্র বাসা করে। বড়ো তালপাতার ডগা যখন বেঁকে ঝুলে ভিতর দিকে কুঁকড়োয় তখন সেই কোঁকড়ানো ডগার তলায় তালচড়াই তার ছোট্ট বাসা বাঁধে। উপকরণ— পাতার শির, সব্জির চিকন আঁশ, পাতা ও পালক। দেখতে খানিকটা ঘড়ির ছোটো পকেটের মতো 10 মিমি গভীর এবং 40 মিমি ব্যাস। সবকিছু উপকরণ লালা দিয়ে সিমেন্ট করে। বাসা খুবই নরম কিন্তু বাসার মুখের চারধারে লালা দিয়ে এক ধরনের ড়ি বানায় যাতে বাসাটা পাখির দেহভার বহন করতে পারে।

প্রজননকাল— সারা বছরই। অঞ্চল অনুযায়ী কিছুটা তারতম্য ঘটে। কারুর কারুর অনুমান বছরে বার ডিম পাড়ে কিন্তু তা পরীক্ষাসাপেক্ষ। বাসা বানানোর জন্যে স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই খসে পড়া পাতা বা সব্জির অংশ শূন্যেই সংগ্রহ করে এবং তা' দেওয়া থেকে আরম্ভ করে ঘর-গেরস্তালীর কাজই দু'জনে করে। ডিম পাড়ে সাধারণত 2টি কখনও 3টি। ডিম সাদা লম্বাটে আকারের, কটা মুখ একটু চাপা, অমসৃণ খোলা পাতলা। কতদিনে ডিম ফোটে তা এখনও নির্ণয় করা য় নি। ডিমের গড় মাপ— 18.2 × 11.5 মিমি (লম্বায় 0.70, চওড়ায় 0.45 ইঞ্চি)।

ছিপ্পক বর্গ

ছিপ্পক বর্গের (অর্ডার কাপ্রিমালগিফরমেস) পাখিরা একটু অদ্ভুত ধরনের। সবাই নিশাচর এবং হাঁ-মুখ এদের খুব বড়ো। ধরনধারণে পেঁচাদের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও এরা সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাই এদের আলাদা বর্গের মধ্যে ধরা হয়েছে। এই বর্গে দুটি বংশ— ভেকমুখ (পডারগিদি) ও ছিপ্পক (কাপ্রিমালগিদি)।

ভেকমুখ বংশের পাখিদের হাঁ-মুখ খুব চওড়া। ছিপ্পক বংশের পাখিদের এত চওড়া হয় না। ভেকমুখদের চঞ্চু বেশ শক্তিশালী এবং বাঁকা, চঞ্চুর ডগা বঁড়শির মতো বাঁকানো। চঞ্চুর গোড়ায় খোঁচা খোঁচা সরু লম্বা পালক নাকের ছ্যাঁদাকে ঢেকে রাখে।

ভারতে একটি মাত্র গণ— ভেকমুখ (বাট্রাচোস্টোমাস) এবং দুটি *প্রজাতি*। *একটি প্রজাতিকে* (বা হজসনি) দেখা যায় সিকিম, ভূটান, আসামে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ও দক্ষিণাংশের পাহাড়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, বাংলাদেশে ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রামে 300 থেকে 1800 মি. উচ্চতার মধ্যে চিরহরিৎ জঙ্গলে। মণিপুরী নাগারা বলে— 'স্যামবং', ইংরেজি— *হজসন'স ফ্রগমাউথ*। লম্বায় 27 সেমি (সাড়ে 10 ইঞ্চি)। *দ্বিতীয় প্রজাতিকে* (বা মনিলিজার) দেখা যায় ভারতের পশ্চিমঘাটে কানাড়া ও ত্রিবান্দ্রাম জেলায় 1200 মি. উচ্চতার মধ্যে গভীর জঙ্গল ও তার আশপাশে এবং শ্রীলঙ্কায়। মালয়ালামরা বলে— 'মাক্কাচিক্কাটা', ইংরেজি— *সিলোন ফ্রগমাউথ*। লম্বায় 23 সেমি. (9ই ইঞ্চি)।

ছিপ্পক বংশ

ছিপ্পক বংশে (কাপ্রিমালগিদি) দুটি গণ— হেমতুণ্ড (ইওরোস্টোপোডাস) ও ছিপ্পক (কাপ্রিমালগাস)। হেমতুণ্ড পাখিদের নাকের উপর খোঁচা খোঁচা লোম পালক নেই, আছে দুই কানের উপর ও পাশে লম্বাটে পালক, যেন খাগের কলম গোঁজা। এই গণে *দুটি উপজাতি*। প্রথম *উপজাতি*— (ইও মাক্রোটিস সেরভিনিকেপস্): *বাসস্থান*— আসামে ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব ও দক্ষিণাংশে, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, বাংলাদেশের ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম 1000 মি. উচ্চতার মধ্যে এবং দক্ষিণ ইউনান, বর্মা, মালয় উপদ্বীপ, পেনাং, দক্ষিণপূর্ব থাইদেশ, দক্ষিণ ভিয়েতনাম। অসমিয়া নাম— *'দিন কূ নাহ্'*, ইংরেজি— *বার্মিজ গ্রেট ইয়ার্ড নাইটজার*। ডাকে 'পিইই-হুইইউ-হুইইউ-হুইউউ'। লম্বায় 41 সেমি (16 ইঞ্চি)। *দ্বিতীয় উপজাতি* (ইও মা ব্যরডিল্লনি) : বাসস্থান— কেরালার কোট্টাইয়াম, কুইলন ও ত্রিবান্দ্রাম জেলার চিরহরিৎ এবং ভিজে পর্ণমোচীর জঙ্গল, প্রধানত পাহাড়ের পাদদেশে 1000 মি. উচ্চতার

মধ্যে। মালয়ালাম নাম— *'সাক্কিয়া মুক্কাকি'*, ইংরাজি— *কেরালা গ্রেট ইয়ার্ড নাইটজার।* ডাক— শিসের মতো 'চুই-চুইইইউ'। লম্বায়— 40 সেমি (সাড়ে 15 ইঞ্চি)।

ছিপ্পক বংশের অন্তর্গত ছিপ্পক গণের (কাপ্রিমালগাস) পাখিদের *বাসস্থান*— ভারত, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণপূর্ব সাইবেরিয়া, পশ্চিম চীন, জাপান এবং পালান দ্বীপপুঞ্জ। ভারত ও তার নিকটবর্তী স্থানে দেখা যায় *6টি প্রজাতি। প্রথম প্রজাতি*— ছিপ্পক, ছাপ্পা, ডাবচিরি, ডাবনাক (কাপ্রিমালগাস ইন্ডিকাস), ইংরাজি— *ইন্ডিয়ান জাঙ্গল নাইটজার। বাসস্থান*— পশ্চিম রাজস্থান, কচ্ছ এবং পাকিস্তানের কিছু অঞ্চল ছাড়া ভারতে প্রায় সর্বত্র 2300 মি. উচ্চতার মধ্যে, প্রধানত সেগুন ও বাঁশের জঙ্গলে। লম্বায় 29 সেমি. (সাড়ে 11 ইঞ্চি)। ডাক কিছুটা মধুরতার সঙ্গে বিষাদমাখা 'উই-কুকবুউ', আর চাঁদনি রাতে দু' সেকেণ্ড অন্তর অন্তর 'চাক-চাক'। *দুটি উপজাতি। প্রথম*— চিন বাসসা (কা ই কেলারটি), ইংরাজি— *সিলোন জাঙ্গল নাইটজার।* লম্বায় 27 সেমি. (সাড়ে 10 ইঞ্চি)। ডাকে— 'চাক'ম চাক'ম'। *দ্বিতীয়* (কা ই হাজারি), ইংরেজি— *হিমালয়ান জাঙ্গল নাইটজার। বাসস্থান*— উত্তর পশ্চিম পাকিস্তানের হাজারা জেলা থেকে হিমালয়ের পুবে নেপাল, সিকিম, ভূটান, অরুণাচল, আসামে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ও দক্ষিণাংশের পার্বত্য অঞ্চল, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, মিজোরাম, বাংলাদেশ থেকে ইউনান, বর্মা, মালয় 3300 মি. উচ্চতার মধ্যে। লম্বায়— 32 সেমি। ডাকে— 'চাক-চাক চাক্কু-চাক্কু'।

দ্বিতীয় প্রজাতি— ছাপাকি, পাটাক (কা ইওরোপাইয়াস)-এর *একটি উপজাতি* (কা ই আনউইনি), ইংরেজি— *হিউম'স ইওরোপীয়ান নাইটজার।* পরিযায়ী হয়ে আসে এপ্রিল-মে থেকে আগস্ট-সেপ্টেম্বর-এ পাকিস্তান, কাশ্মীর, কচ্ছ, রাজস্থান, বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর। লম্বায় 25 সেমি. (10 ইঞ্চি)। ডাকে— টিকটিকির মতো 'চাক-চাক-চাক'।

তৃতীয় প্রজাতি— শাপকর (কা মাহ্‌রাট্রেনসিস), ইংরেজি— *সিনড্ নাইটজার। বাসস্থান*— আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশ, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। শীতে কখনো-সখনো পরিযায়ী হয় গুজরাট, বোম্বাই এবং পশ্চিমবঙ্গে। ডাকে— নরম গলায় 'পররব্ পররব্'। দিনের বেলায় হঠাৎ উড়লে শোনা যায় 'ক্লাক ক্লাক'।

চতুর্থ প্রজাতি— *ঠুকঠুকিয়া* (কাপ্রিমালগাস মাকরুরাস), ইংরেজি— *ইন্ডিয়ান লংটেইলড্ নাইটজার,* হিন্দি— *চুপকা। 4টি উপজাতি। প্রথম উপজাতি* (কা মা আট্রিপেনসিস) ঃ *বাসস্থান*— মহারাস্ট্র, অন্ধ্র, মহীশূর, তামিলনাড়ু ও কেরালা 2000 মি. উচ্চতার মধ্যে পার্বত্যনালার বাঁশবনে। ইংরেজি— *সাদার্ন লংটেইলড নাইটজার,* তেলেগু— *আস্কাপ্রিগাড়ু.* তামিল— *পাড়ুকাই কুরুভি।* লম্বায়— 28 সেমি (সাড়ে 11 ইঞ্চি)। ডাকে— 'চউঙ্ক চউঙ্ক'। *দ্বিতীয়*— (কা মা ইকুয়াবিলিস)ঃ *বাসস্থান*— শ্রীলঙ্কা 1100 মি. উচ্চতার মধ্যে ঘন জঙ্গলে। ইংরেজি— *সিলোন লংটেইলড নাইটজার,* সিংহলী— *চিন বাসসা।* লম্বায়— 28 সেমি (11 ইঞ্চি)। *তৃতীয়*— (কা মা আমবিগুয়াস)ঃ *বাসস্থান*— দক্ষিণ নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, মিজোরাম, বাংলাদেশের চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল, বর্মা, দক্ষিণ ইউনান থেকে টেনাসেরিয়াম, থাইদেশ এবং ইন্দোচীনীয় অঞ্চল। ইংরাজি— *বার্মিজ লংটেইলড নাইটজার।* লম্বায়— 33 সেমি (13 ইঞ্চি)। ডাকে— 'অরক অরক...চক-আক'। *চতুর্থ*— (কা মা আন্দামানিকাস)ঃ *বাসস্থান*— মধ্য ও দক্ষিণ আন্দামান। দেখা যায় জঙ্গলের তলায় কিংবা ঝরেপড়া পাতার উপর। লম্বায়— 28 সেমি (11 ইঞ্চি)।

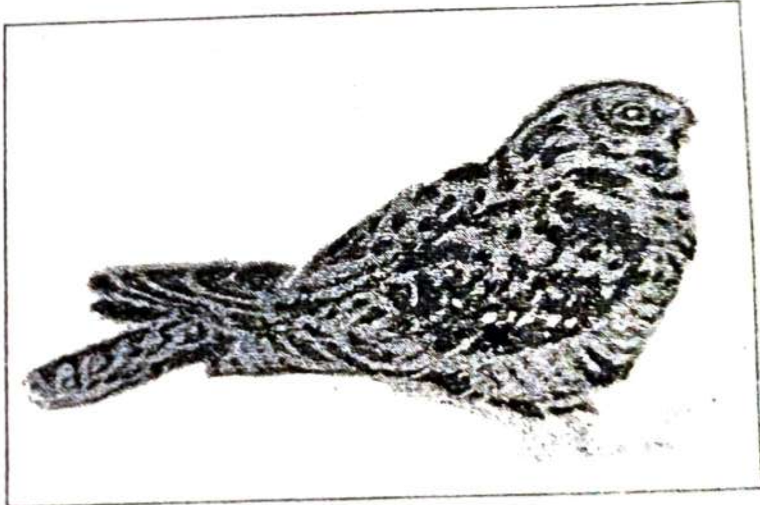
পঞ্চম প্রজাতি— ছেপকা (কাপ্রিমালগাস এসিয়াটিকাস)। ইংরাজি. *ইন্ডিয়ান লিটল নাইটজার।* *একটি উপজাতি* (কা এ এইডস): *বাসস্থান*— শ্রীলঙ্কার শুষ্ক ঝোপঝাড়পূর্ণ জঙ্গলে 1000 মি. উচ্চতার মধ্যে। লম্বায় 24 সেমি (সাড়ে 9 ইঞ্চি)।

ষষ্ঠ প্রজাতি— (কাপ্রিমালগাস আফিনিস)। ইংরজি— *ফাঙ্কলিন'স, অ্যালায়েড নাইটজার। বাসস্থান*— পাকিস্তান, পাঞ্জাব, হিমালয়ের পাদদেশ ধরে পুবে আসাম, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, মিজোরাম, বাংলাদেশ, দক্ষিণে রাজস্থান, কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র থেকে সমগ্র দক্ষিণ ভারত, পশ্চিমবঙ্গ। লম্বায় 25 সেমি (10 ইঞ্চি)। ডানা 132 থেকে 148 মিমি এবং লেজ 95 থেকে 113 মিমি। লম্বায়— ছেপকার (24 সেমি) চেয়ে একটু বড়ো হলেও ডানা লেজ মাপে ছোটো। এইটুকুনই তফাত।

ছেপকা (Indian Nightjar)

কেন্দুলির মেলা থেকে বোলপুরে ফিরতে হবে। কলকাতায় ফিরতে হলে রাতের ট্রেনটা না ধরলে নয়। সুতরাং বাউলের আসর ছেড়ে উঠতে হল। আসরটা জমেছিল ভালই।

বাস ধরার জন্যে বেরিয়ে পড়েছি। এমন সময় এক ভদ্রলোক, যার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল জয়দেবের মন্দিরে, তিনি বললেন, আমার গাড়িতে আসুন, জায়গা আছে, গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। ভদ্রতার খাতিরে না না করেও পিছনের বুকে স্যুটকেসটা রেখে সামনে তাঁর পাশে বসে পড়লাম। চালক তিনি। পিছনে তাঁর স্ত্রী ও এক আত্মীয়া। এঁদের সঙ্গেও মেলায় পরিচয় হয়েছিল।



চি 23. ছেপকা

রাতের অন্ধকারে গাড়ি ছুটল। দু'দিকে গাছপালার মধ্যে দিয়ে হেডলাইট জেলে কাঁচা রাস্তার ধুলো উড়িয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে পথের উপর ধুলো থেকে একটা-দুটো পাখি উড়ছে। আলোয় দেখছি গাড়ির বনেট ঘেঁষে বাঁক খেয়ে নিমেষের মধ্যে চলে যাচ্ছে। ধাক্কা লাগবে লাগবে করেও লাগছে না। চালক জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো এক রকমের পেঁচা কি?

বললাম, না পেঁচা নয়। তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। এদের বর্গ বংশ ও প্রজাতি সম্পূর্ণ আলাদা। ইংরেজিতে বলে— *নাইটজার।*

—বলে উঠলেন, নাইটজার। এই নামের সঙ্গে তো পরিচয় আছে। ইংরেজি বই-টইতে পড়েছি। এরা যে এমন এবং আমাদের দেশেও আছে তা জানতাম না। চেহারাটা বোঝা যাচ্ছে না, তবে

ছুঁচলো লম্বা ডানা আর লম্বা লেজ দেখতে পাচ্ছি। দাঁড়ান। একটাকে গাড়ির ধাক্কায় মারার চেষ্টা করি।

চালকের স্ত্রী বলে উঠলেন, না না। এইমাত্র বোষ্টম-বাউল জয়দেবের স্থান থেকে বেরিয়েই প্রাণিহত্যা করবে! ছি:! ...আমি সশব্দে হেসে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই হেসে ওঠেন। ভদ্রমহিলা বললেন, তার চেয়ে ওদের সম্বন্ধে কিছু বলুন। এই পাখিদের সম্বন্ধে বলতে বলতে গাড়ি বোলপুর স্টেশনে পৌঁছল।

যে পাখিরা পথের ধুলোর উপর গাড়ির হেডলাইটের আলোয় ক্রমাগত এদিক-ওদিক ওড়া-উড়ি করে পোকা ধরে খাচ্ছিল, তারা ছিদ্রক বর্গের (অর্ডার কাপ্রিমালগিফরমেস) অন্তর্গত ছিদ্রক বংশের (কাপ্রিমালগিদি) এক প্রজাতি ; নাম— ছেপকা (কাপ্রিমালগাস এশিয়াটিকাস), ইংরেজি— লিটল নাইটজার।

ছেপকা লম্বায় 24 সেমি (সাড়ে 9 ইঞ্চি)। উপরাংশ হলদেটে-ধূসর, তার উপর খুব সরু সরু কালো লম্বাটে ছিট মাথার চাঁদির উপর থেকে নেমেছে, তারপর খুব সরু কালো কালো টান পিঠের উপর ; ঘাড়ের পাশে চওড়া লালচে-কালোর ছাই ছাই ছোপে ভাঙা ; বেশ কিছু বড়ো কালো ছিট এবং উজ্জ্বল লালচে-হলুদের দাগ পিঠের দু'পাশে। ওড়ার প্রথম চারটি পালকের উপর সাদা বা মলিন লালচে-হলুদের ছিট। দ্বিতীয় পালকটি লম্বায় সবচেয়ে বড়ো। লেজের মাঝে পালক-জোড়া উপরের পালকের মতো কিন্তু তার উপর ভাঙা ভাঙা কালো পটি, বাকি দুই বাইরের পালকের উপর সাদা ছোপ। নিচের সব পালকে লালচে-হলুদের উপর পাটকিলের অস্পষ্ট টান ও ছোপ। চোখের পাশ ও চিবুক থেকে খোঁচা খোঁচা দাড়ি-পালক আছে বেশ কয়েকটা। গলার দু'পাশে সাদা ছোপ। গায়ের সব পালকেই একটা রেশমি ভাব। কনীনিকা পাটকিলে, তাকে ঘিরে গোল হয়ে আছে হলুদ রঙের আঙটি। ছোটো চঞ্চু শিঙে-পাটকিলে, ডগা ঈষৎ বাঁকানো, হাঁ-মুখ খুব বড়ো, মুখের ভিতরটা হলুদ। পা ও আঙুল গোলাপি-পাটকিলে, নখর মলিন শিঙে-পাটকিলে। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান— পাকিস্তানে সিন্ধু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান থেকে সমগ্র ভারত, দক্ষিণে কন্যা কুমারিকা, পুবে আসাম, বাংলাদেশ। ভারতের বাইরে বর্মা, দক্ষিণ থাইদেশ এবং দক্ষিণ ইন্দোচীনীয় অঞ্চলসমূহ। সাধারণত শুকনো পর্ণমোচী জঙ্গল 1500 মি. উচ্চতার মধ্যে, ঝোপঝাড়ের জঙ্গল, পাথুরে নালা প্রধানত খেত-আবাদের কাছে, গ্রামের ধারে জংলি বাগান, ধুলোয় ভরা গাঁ-জঙ্গলের রাস্তায় দেখা যায়।

খাদ্য— সবরকম পোকামাকড়। সন্ধ্যায় ও রাতে যেসব মথ ও পতঙ্গ ওড়ে তাদের বড় হাঁ-মুখ ফাঁক করে ধরে। ডাকে— ভূতুড়ে গলায় 'চাক চাক চাক্কু'... চাক-চাক-চাকর র-র্'। যখন ডাকে তখন মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত সমস্ত শরীর থির থির করে কাঁপতে থাকে। সাধারণত প্রজননকাল ছাড়া অন্য সময় উড়তে উড়তে ডাকে শুধু— 'চাক চাক'। প্রজননকালে একে অপরকে ডাকে ও জবাব দেয়, বিশেষত চাঁদনি রাতে শোনা যায় খুব বেশি।

স্বভাব— ছেপকারা নিশাচর। সকাল-সন্ধ্যের দুই গোধূলিতেও দেখা যায় পোকামাকড় অন্বেষণে ব্যস্ত। সাধারণত একা বা জোড়ায় থাকে। কখনও কখনও দিনের বেলায় পারিবারিক ছোটো দলে

শুকনো নালায়, শুকনো পাতা ও আবর্জনার মধ্যে এমনভাবে মিশিয়ে থাকে যে বোঝা যায় না। গাছের কাণ্ডের উপর, মাইল পোস্ট বা কাঠের বেড়ার উপর লম্বালম্বিভাবে এমন করে বসে যে, সেই বস্তু থেকে আলাদা করা যায় না। গরুর গাড়ি বা মোটর গাড়ি চলার কাঁচা রাস্তার উপর সাধারণত বসে ধুলা-স্নানের সঙ্গে কীটপতঙ্গ খাদ্য সংগ্রহের জন্য।

প্রজননকাল— সঠিক জানা যায় নি। তবে প্রধানত ফেব্রুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর মাসেই। স্থান বিশেষে সর্বোচ্চ সময়ের তফাত হয়। বাসা বানায় না। ফাঁকা বাঁশবন বা ঝোপ ঝাড়ের ভিতর, এমনকি মফঃস্বল শহরের বাড়ির জংলা হাতাতেও, মাটিতে 2টি লম্বাটে আকারের ঘি-রঙা বা ফিকে গোলাপির উপর লালচে-পাটকিলের এবং কালচে-বেগুনির ছিট ও ছোপের ডিম পাড়ে। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই ডিমে তা' দেয়, তবে কতদিনে ফোটে সেটা এখনও জানা যায় নি। ডিমের গড় মাপ— 26˙5 x 19˙9 মিমি (লম্বায়— 1˙04, চওড়ায়— 0˙77 ইঞ্চি)।

ঠকঠকিয়া (Large-tailed Nightjar)

চল্লিশ দশকের শুরুতে বসন্তকালে বেশ কিছুদিন মধ্যমগ্রাম-বারাসতের কাছে ছোটো জাগুলিয়া বলে একটা গ্রামে ছিলাম। যে বাগানবাড়িতে ছিলাম তার সামনে সান-বাঁধানো পুকুর, পিছনে ডোবা, গাছপালা, জমি প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বিঘে।

দ্বিতীয় দিনে গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল অদ্ভুত এক শব্দে। কে যেন লোহার উপর কাঠের হাতুড়ি ঠুকছে। শব্দটা আসছে খুব কাছ থেকে। একটু ভয়ও পেলাম। সেইসঙ্গে শব্দটার উৎস-সন্ধানের জন্য কৌতূহলও হল। বিছানা ছেড়ে হাতে টর্চ ও লাঠি নিয়ে জাল দিয়ে ঘেরা বারান্দার দরজা খুলে বেরলাম। চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। পূর্ণিমা কি চতুর্দশী হবে, চারিদিক চাঁদের আলোয় ফেটে পড়ছে। বড়ো বড়ো গাছের আলোছায়ায় এক ভৌতিক পরিবেশ। এক-দু মিনিট অন্তর শুধু ওই ধাতব শব্দ।

শব্দ লক্ষ্য করে সুপুরিবীথি দিয়ে এসে গেট খুলে বাইরের কাঁচা রাস্তার উপর এসেছি। বট, আম ইত্যাদি গাছে কাঁচা রাস্তাটা ছাওয়া। ধুলোয় ভরা। আবছা আলোয় দেখছি রাস্তার ধুলোর উপর আমগাছের ছোটো একটা মোটা ডাল পড়ে আছে। টর্চ জ্বেলে যেই এগিয়েছি, প্রায় পায়ের কাছ থেকে উড়ে গেল একটা পাখি। রাস্তা পার হয়ে বসল গিয়ে নেড়া গাছের কাণ্ডে লম্বালম্বিভাবে। এর পিছনে দিগন্তব্যাপী নেড়া ধানখেতের এবড়োখেবড়ো জমি।



চি 24 ঠকঠকিয়া

অদ্ভুত দেখতে পাখিটা, শুকনো আমগাছের ডালেরই রঙ। ওখানে বসেই ডেকে উঠল। লোহার উপর কাঠের হাতুড়ি ঠোকার শব্দ, 'চউঙ্ক চউঙ্ক চউঙ্ক'। এত জোর আওয়াজ কোনো পাখির হতে পারে তা জানা ছিল না। কিছুটা দূর থেকেই এর জবাব দিল আর কোনও পাখি। খানিকক্ষণ শুনে ফিরে এলাম নিজের বিছানায়।

পরদিন সকালে মুনিম ঘনা যে গাইবলদ দেখে, গরুর গাড়িও চালায় তাকে এইরকম ডাকের কথা বলাতে বলল, ওতো রাতচরা, 'টঙ্কপাখি'। পরে জেনেছিলাম ওই পাখি ছিপ্পক বংশের (কাপ্রিমালগিদি) *এক প্রজাতি*; নাম— ঠুকঠুকিয়া, রাতচরা, টঙ্কপাখি (কাপ্রিমালগাস মাকরুরাস), ইংরেজি— *ইন্ডিয়ান লংটেইলড নাইটজার*, হিন্দি— *চুপকা*।

ঠুকঠুকিয়া লম্বায় 33 সেমি (13 ইঞ্চি)। ছেপকারই মতো দেখতে তবে লেজ ও ডানা বড়ো এবং তলার পালক অনেক ফিকে। স্ত্রী-পাখিকে তফাত করা যায় লেজের বাইরের পালকের ডগার পালকের ধারটা হলদেটে-লালচে থাকায়। কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চুর আগা গাঢ় পাটকিলে, মাঝখানটা পাটকিলে, গোড়াটা লালচে। পা ও আঙুল লালচে-বেগুনি, পায়ের তলা মাংস-গোলাপি।

বাসস্থান— হিমালয়ের পাদদেশে 1800 থেকে 2200 মি. উচ্চতার মধ্যে পাঞ্জাব থেকে অরুণাচল, আসামে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ও দক্ষিণের জঙ্গল, দক্ষিণে গাঙ্গেয় উপত্যকা, পুবে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, ওড়িশা, পূর্বঘাটে উত্তর অন্ধ্র।

খাদ্য— মথ, পোকামাকড়, সকাল-সন্ধ্যের প্রদোষে ও রাতে যেসব পোকামাকড় ওড়ে।

স্বভাব— সকাল-সন্ধ্যের প্রদোষ ও রাতের পাখি। সাধারণত একা বা জোড়ায় বিচরণ করে। দিনের বেলায় ঝরেপড়া শুকনো পাতা বা আবর্জনার মধ্যে চুপচাপ পড়ে থাকে। দেহের রঙের সঙ্গে পাতা বা আবর্জনা এমনভাবে মিশে যায় যে অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। প্রায়ই দেখা যায় তাদের পছন্দসই জায়গা থেকে সন্ধ্যের সময় হাওয়াশীলদের (সোয়ালো) মতো উড়ে উড়ে পতঙ্গ ধরতে। গাছের ডালে আড়াআড়িভাবে যেমন বসে তেমনি বসে মোটা ডাল ও কাণ্ডে লম্বালম্বিভাবে। জঙ্গল বা গ্রামে গোরুর গাড়ি চলার রাস্তার ধূলোর উপর পড়ে থাকে এমনভাবে যে বোঝাই যায় না। হাত-খানেকের মধ্যে গেলে ওড়ে। লোকে চমকে ওঠে। খানিকটা দূরে গিয়ে আবার ফিরে আসে স্বস্থানে। ডাক— লোহার উপর কাঠের হাতুড়ি ঠোকার 'চউঙ্ক' শব্দে। ডাকার আগে কোনো ব্যাঙের কর্কশ শব্দ ডেকে নিয়ে 2 থেকে 4 বার গলা সেধেই চার সেকেন্ডে পাঁচবার 'চউঙ্ক' এবং এটা চলে 50-60 বার। প্রজননকালে শোনা যায় সারা রাত। ডাকাডাকির মধ্যে দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগও রাখে। মোটরে করে জঙ্গলের রাস্তায় যেতে যেতে হেড লাইটের আলোয় চোখটা টকটকে লালচে দেখায়। বেগবান গাড়ি খুব কাছে এলে শেষ মুহূর্তে উড়ে যায় ডানা ঝাপটে এঁকেবেঁকে অদ্ভুত গতিবেগে। এটা আবার সবসময় সম্ভব হয় না, তখন বেচারিকে অন্তিমকালের দুঃখ পেতে হয়।

প্রজননকাল— প্রধানত মার্চ থেকে মে। বাসা বাঁধে না। মাটির উপরেই ডিম পাড়ে কিছু পাতা জড়ো করে। ডিম সাধারণত 2টি মলিন ঘি-রঙা থেকে গোলাপি-হলুদ, তার উপর ছাই-ধূসর ও মলিন লালচে-পাটকিলের ছিট ও ছোপ। দু'জনে মিলেই সন্তান প্রতিপালন করে। কিন্তু কতদিনে ডিম ফোটে তা এখনও জানা যায় নি। ডিমের গড় মাপ— 32 × 23 মিমি।

উলূক বর্গ

উলূক বর্গের (স্ট্রিগিফরমেস) পাখিরা সবাই সকাল-সন্ধ্যের পাখি এবং নিশাচর। এদের চোখ গোল চাকতির মধ্যে এবং মানুষের মতো পাশাপাশি। কেবল একটি মাত্র গণের (জিনাস) পাখিই ব্যতিক্রম।

মানুষের এই বর্গের পাখিদের নিয়ে অহেতুক ভয় ও নানা কুসংস্কার আছে। ভয়টার উৎস রাতের অন্ধকারে এদের রোমহর্ষক ডাক। আবার দেশবিদেশে দেবীর বাহনরূপে পূজোর বেদীতেও একে স্থান দিয়েছে। আমাদের যেমন লক্ষ্মীর বাহন, গ্রীক পুরাণে তেমনি জ্ঞানের দেবী অ্যাথিনীর সঙ্গী। যার থেকে ইংরেজি 'ওয়াইজ আউল', 'ওয়াইজ ওলড্ আউল' প্রভৃতি কথার উৎপত্তি।

উলূক বংশ

উলূক বর্গে একটিমাত্র বংশ উলূক (স্ট্রিগিদি)। এই বংশকে দুটি উপবংশে ভাগ করা হয়েছে— শ্বেতোলূক (টাইটোনিনি) ও উলূক (স্ট্রিগিনিনি)। উলূক বংশের প্রতিটি প্রাণীরই দৃষ্টি ও ঘ্রাণশক্তি খুব প্রবল। গোল ডানায় নরম পালকের জন্যে অত্যন্ত দক্ষ ও নিঃশব্দ শিকারী। শিকারকে তার অজান্তে নখরের সাহায্যে ধরে একদম সোজাসুজি গিলে ফেলে। কেবল বড়ো কোনো প্রাণীকে ধরলে চঞ্চুর সাহায্যে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। যেসব অংশ হজম হয় না সেগুলো উগরে ফেলার জন্যে তার আস্তানার কাছে গেলে জানা যায় তারা কি খায়। পাশাপাশি দুই বড়ো চোখে জ্বলন্ত পাটকিলে, হলুদ বা কমলা কনীনিকায় সামান্যতম আলোর স্পর্শেই দেখতে পায় কিন্তু নিছক অন্ধকারে একদম দেখতে পায় না, তখন অন্ধ। চোখ চাকতির মধ্যে দৃঢ়ভাবে বসানো হলে কি হবে এই অসুবিধে দূর করে মাথাটা পুরে 270° ডিগ্রি গোল করে ঘুরিয়ে। মোটা সুদৃঢ় চঞ্চুর চারপাশে সংজ্ঞাবহ সরু খোঁচা লোম-পালক দিয়েই তার শিকারকে অনুভব করে। কারণ দূরের জিনিস পরিষ্কার দেখতে পায়, কাছের জিনিস দেখে কষ্ট করে। উপরের চঞ্চুর গোড়ায় মোমের মতো অনাবৃত ঝিল্লী, তার মধ্যে নাকের ছ্যাঁদা লুকনো। বিপদ আশঙ্কা করলে ডানা ছড়িয়ে দিয়ে সব পালক ফুলিয়ে তুলে শত্রুকে যা নয় তার চেয়ে নিজেকে ডবল করে দেখিয়ে ভয় দেখায়। প্রথম ডিম পাড়া থেকেই স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই তা' দেয়। যে কোনও গর্তে তা গাছই হোক, পাহাড়ের খোঁদলই হোক, বা অন্য কোনও পাখির পরিত্যক্ত বাসা বা মাটির উপরেই হোক, সেখানেই ডিম পাড়ে।

উলূক বংশকে 11টি গণে ভাগ করা হয়েছে। যেমন— শ্বেতোলূক (টাইটো), পিঙ্গলক (ফোডিলাস),

ঊর্ধ্বকর্ণ (ওটাস), বায়সান্তক (বিউবো), হিমোলুক (নাইকটিয়া), পেচক (নিনকস) ভুভুল (গ্লসিডিয়াম), কুবয় (অ্যাথেনি), বনঘূক (স্ট্রিকস্), কর্ণিক (এসিও) এবং পক্ষ্মপাদ (ঈগোলিয়াস)।

লক্ষ্মী পেঁচা (Barn Owl)

কোন্ ছোটবেলা থেকে যে এই পাখিকে মাঝেমাঝে সন্ধ্যেবেলায় দেখছি, কলকাতা শহরের বুকে বা গাঁ-গঞ্জে তাই আজ প্রথম দেখার কথাটা একদম মনে নেই। বেশ বড়োসড় পাখির নিঃশব্দে ওড়াটা দেখতে ভালো লাগতো। একবারের কথা মনে আছে। সেটা ঘটেছিল হাজারিবাগ জেলার গিরিডিতে। অল্প বয়েস তখন, স্কুলে পড়ি। গরমের ছুটিতে ওখানে আমাদের বাড়িতে আছি। বিকেলের দিকে 'পিপীলিকার ডানা ওঠে মরিবার তরে' করে পিঁপড়েরা উড়তে আরম্ভ করল ; কাক, শালিক আর ফিঙেতে মিলে উড়ন্ত পিঁপড়ে ধরে ধরে খেতে লাগল। আমি বারান্দায় চেয়ারে বসে সেই মহাভোজ দেখছি। সন্ধ্যা প্রায় নেমেছে। আধো গোধূলি আধো আঁধার ! গোলাপ, বেল, আতা, জাম, আম ইত্যাদি গাছের গোড়ায় কাঁকলাস বা গিরগিটি (ক্যালোটেস ভেরসিকলার) আছে জানতাম। মাঝে মাঝে সরসর করে গাছের ডালে, পাঁচিল বা মাটির উপর দিয়ে দৌড়তেও দেখেছি। কিন্তু বাগানে যে এত ছিল তা জানতাম না। তারা এসে মাটি থেকে টপাটপ পিঁপড়ে তুলে খেতে লাগল। কোথায় ছিল কতকগুলো কটকটে ব্যাঙ



চি 25. লক্ষ্মী পেঁচা

(...ফো মেলানোসট্রিকটাস), তারাও থপথপ করে আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে শুরু করে দিল ভোজ। ...ং পাশের বাড়ির মহুয়া গাছের উপর থেকে নেমে এল দুটো পাখি। কিছু বোঝবার আগেই ...-একটা গিরগিটি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল মহুয়া গাছের পাতার আড়ালে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ...বার ফিরে এসে আরও দুটো নিয়ে গেল। বার-কতক এই রকম হবার পর ব্যাঙ ও গিরগিটিরা ...জাত প্রবৃত্তির বশে ভোজের বিপদ অনুভব করতে পেরে আত্মগোপনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ...কারখানা দেখে আমি হেসে ফেললাম।

...এর কয়েক বছর বাদে যেসব পশুপাখি কেউ পোষে না তা যখন পোষা শুরু করি, তখন হাতিবাগানের ...থেকে একটা কিনে এর সুন্দর চেহারাটা দেখেছিলাম।

...পাখিটা উলূক বংশের (স্ট্রিগিদি) অন্তর্গত শ্বেতোলূক গণের (টাইটো) এক *প্রজাতি* ; নাম— ...পেঁচা (টাইটো আলবা), ইংরেজি— *বার্ন আউল*, হিন্দি— *কুরাইয়া,বড়ি চুরি*।

লক্ষ্মী পেঁচা লম্বায় 36 সেমি (14 ইঞ্চি)। হরতনের মতো অদ্ভুত গোল চাকতি মুখ। মুখের শক্ত পালককে দেখায় যেন প্লাইউডের পাতলা এক টুকরো কাঠ কেটে সাদা চাকতিটা তৈরি। তার মধ্যে ড্যাবা ড্যাবা দুই চোখ। থেকে থেকে একটা চোখ বুজিয়ে চোখ মারে। লম্বাটে চঞ্চু সোজা নেমেছে, গোড়াটা বসা। নাকের ছ্যাঁদা ডিম্বাকার। উপরের পালক সোনালি হলদেটে-লাল ও ধূসর, তার উপর সর্বত্র কালো সাদা ফুটকি। ঘাড় ও ডানা হলদেটে পাটকিলে। নিচটা রেশমী সাদা, অল্পবিস্তর হালকা হলদেটে-লালের আভা তার উপর গাঢ় পাটকিলের ছিট। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে, কখনও হালকা বাদামী বা কালো। চঞ্চু মাংসল সাদা, চঞ্চুর গোড়ায় মোমের মতো উন্মুক্ত ঝিল্লী মাংসল। পা ও আঙুল মাংসল-পাটকিলে, নখর গাঢ়। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান— 1000 মি. উচ্চতার মধ্যে পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের সর্বত্র, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কা। দেখা যায় পুরনো পরিত্যক্ত দুর্গ, ভাঙা প্রত্নতাত্ত্বিক কাঠামো, গুহা, পরিত্যক্ত কূয়ো, খালি এবং বসতিপূর্ণ বাড়ির আলসে-কার্নিসের গর্তে। *একটি উপজাতি* (টা আ ডেরোপাটরফি), *বাসস্থান*— আন্দামান। *অপর প্রজাতি*— ঘাস পেঁচা (টা কাপেনসিস) ইংরেজি— *গ্রাস আউল।*

খাদ্য— চড়াইয়ের মতো ছোটো পাখি, ধেড়ে ও নেংটি ইঁদুর, চামচিকে, টিকটিকি-গিরগিটি, ব্যাঙ ইত্যাদি। *ডাক*— নানারকম চিল-চেঁচানি, মুরগির চাপা ডাক, নাক ডাকার মতো ঘরর্ ঘরর্ ক্রুদ্ধ হিসহিস এবং রাগলে দুই চঞ্চুর ঠকঠকানি। প্রজননকালে এইসব নানারকম ডাক ও আওয়াজ শোনা যায় বেশি।

স্বভাব— খেতখামারের প্রভূত উপকারী, কেননা সমীক্ষায় দেখা গেছে এক-একটি পেঁচা দিনে প্রায় 12 - 13টি ইঁদুর খেয়ে থাকে। প্রধানত ভোরবেলা, সন্ধ্যে ও রাত্রে বিচরণ করে। প্রখর রোদের আলো সহ্য করতে পারে না, সেটা বোঝা যায় কাক বা ফিঙেরা তাড়া করলে। আবার এও দেখা যায়, দিনের কড়া আলোয় কোনরকম অসুবিধে বোধ না করে ঘেসো মাঠের 3-4 মি. উঁচু দিয়ে উড়ে গিয়ে, শূন্যে ডানা নাড়িয়ে এক জায়গায় প্রায় আধ মিনিট স্থির হয়ে জমিতে থাকা শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাধারণত দিনের বেলায় একা থাকে।

ঘাস পেঁচা (Grass Owl)

শরৎকাল। শান্তিনিকেতনে কাশ ও উলুঘাসের মাঠের মধ্যে দিয়ে চলেছি। বেশ লাগছে চলতে। এদিন অবশ্য মন ছিল ছোটো বটের (বাস্টার্ড কোয়েল), ভাটরি বটের (গ্রে কোয়েল) বা গুরবু-র (ব্লু ব্রেস্টেড কোয়েল) দিকে। কোথাও তাদের সন্ধান পাচ্ছি নে। হঠাৎ প্রায় পায়ের কাছ থেকে এক জোড়া লক্ষ্মী পেঁচা উড়ল। অল্প খানিকটা উড়ে কাছেই ঘাসের আড়ালে বসল। যেখানে বসেছে সেইদিকে লক্ষ্য রেখে বসে বসে খুব ধীরে একটি করে উলু সরিয়ে চলেছি। এইভাবে মিনিট দশেক চলার পর দেখলাম একজোড়া পেঁচা। পাশাপাশি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছে। না, লক্ষ্মী পেঁচা নয়। তবে খুব নিকট আত্মীয় *প্রজাতি* হবে। দেহের

উপরটা গাঢ় পাটকিলে, লক্ষ্মীর মতো সোনালি-হলদেটে ধূসর না, তার উপর খুব সাদা ছিট ছিট। তলা সাদার উপর ছড়ানো-ছিটনো পাটকিলের ফুটকি। মুখে সাদা গোল চাকতি, তার চারধারে পাটকিলে গলাবন্ধ। দুই চোখের নিচে কালো ফুটকি। গোড়ালি বেশ লম্বা, তার উপর সরু এবং চেপে বসা পালক। মনে হয় যেন চুড়িদার পাজামা পরেছে। স্ত্রী-পুরুষে তফাৎ নেই। একবার চোখ খুলে আমায় দেখল। তখন দেখলাম কনীনিকা বাদামী, চঞ্চু মাংসল-সাদা, নাকের উপর অনাবৃত ঝিল্লী গোলাপি। পা ও আঙুল মাংসল কালচে-পাটকিলে, নখর শিঙে পাটকিলে।

আর একটু কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে ধরার চেষ্টা করতেই পাখি দুটো উড়ে একটু দূরে গিয়ে ঝোপের আড়ালে লুকলো। ধরার রণে ক্ষান্ত দিলাম।

পরে কলকাতায় ফিরে বই দেখে জানলাম, পাখি দুটো উলুক বংশে শ্বেতোলূক গণের (টাইটো) এক প্রজাতি। লক্ষ্মী পেঁচারই খুড়তুতো ভাই। নাম— ঘাস পেঁচা (টাইটো কাপেনসিস লংগিমেমব্রিস). ইংরেজি— *গ্রাস আউল*, অসমিয়া— *সান উলু হরাই*। লম্বায়— 36 সেমি (14 ইঞ্চি)।

বাসস্থান— হিমালয়ের দেরাদুন থেকে তরাই ডুয়ার্সের ভিতর দিয়ে গাঙ্গেয় উপত্যকা থেকে পশ্চিমবঙ্গ, নেপাল, সিকিম, ভূটান, আসামে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ও দক্ষিণাংশ, মণিপুর, বাংলাদেশ, দক্ষিণে বিহারের ছোটোনাগপুর, মধ্যপ্রদেশ, দক্ষিণ ভারতে 1800 মি উচ্চতার মধ্যে তামিলনাডু। মহীশূর ও কেরালা। শ্রীলঙ্কায় নেই। দেখা যায় বড়ো ঘাসের জঙ্গল, যেখানে বারসিঙ্গা (সোয়াম্প ডিয়ার), ডাহর বা নীখরা (ফ্লোরিকান) বাস করে, সেই প্লাবিত উঁচু ঘাসের মাঠে।

খাদ্য— প্রধানত মেঠো ইঁদুর, এছাড়া পঙ্গপাল, ঘাসফড়িং, টিকটিকি-গিরগিটি।

স্বভাব— সকাল-সন্ধ্যের পাখি, নিশাচরও। পুরোপুরি মাটিতেই বাস করে। রাতে এমন নিঃশব্দে শিকার করে যে মনে হয় ভূতের আবির্ভাব হয়েছে। ডাকাডাকির বালাই নেই। স্টুয়ার্ট-বেকার বলেছেন, লক্ষ্মীপেঁচার মতো একটা নাকিসুরে চিলচেঁচানি দেয়। সাধারণত একা বা জোড়ায় থাকে, তবে উত্তর প্রদেশে এক সঙ্গে ছটিকে থাকতে দেখা গেছে।

প্রজননকাল— অক্টোবর থেকে মার্চ। লম্বা ঘেসো জমিতে মাটির মধ্যে উলু বা কাশ পা দিয়ে চ্যাপ্টা করে পেতে বাসা বানায়, মাথার উপরে থাকে ঘাসের আচ্ছাদন। ডিম পাড়ে 4 থেকে 6টি ধবধবে সাদা, লক্ষ্মী পেঁচার ডিম থেকে আলাদা করা শক্ত। কতদিনে ডিম ফোটে, স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধে সন্তান প্রতিপালনের ধারা কিছুই এখনো জানা যায় নি। ডিমের গড় মাপ— 39.9× 32.7 মিমি।

ভূতুম পেঁচা (Brown Fish Owl)

ছেলেবেলার কথা। মজিলপুরে মামার বাড়িতে আছি। রাতে আচমকা জেগেছি। ভয়ে গা ঘেমে গলা শুকিয়ে কাঠ। বুকের মধ্যে ধপাস্ ধপাস্ শব্দ শুনতে পাচ্ছি। মাঝ রাতে এই অবস্থা। অনেক কষ্টে ঘাড় ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি চাঁদের আলোয় চারিদিক থিকথিক করছে। যে আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল সেই শব্দ আবার শুনলাম। জালার ভেতর থেকে কে

যেন বলছে, 'বুউম বুউম'। একটু থেমে খুব তাড়াতাড়ি 'হুদ হুদ হুদ', পরমুহূর্তেই 'ঝি দিবি না বৌ দিবি? ....হুদ হুদ হুদ ...বউুম বুউম।' আর থাকতে পারি না, হাত পা সব ঠান্ডা হয়ে আসছে, কান ফাটানো এক চিৎকার করে উঠি। সকলে হুড়মুড় করে উঠে পড়ে। মা কাছে আসতেই আঁকড়ে ধরি। থরথর করে কাঁপছি। ছোটোমামা ঘরে ঢুকে মাকে বলল, ছোড়দি কি হয়েছে?

সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল রক্ত হিম করা 'হুদ্ হুদ্ হুদ্ ...ঝি দিবি না বৌ দিবি?' ছোটোমামা বললেন, ও তো পেঁচা। ভূতুম পেঁচা। তারপর জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে বললেন, ওই দেখ বসে আছে। ভয়ে ভয়ে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি খিড়কির পুকুরের ধারে একটা গাছের গুঁড়ির উপর পিছন ফিরে বসে আছে বড় ঝুড়ির মতন কি যেন। মাথায় শিং। পেঁচা না ছাই!



চি 26. ভূতুম পেঁচা

এরপর বড়ো হয়ে বার কতক ভূতুম পেঁচা দেখেছি। উলুক বংশে (স্ট্রিগিদি), বায়সান্তক (বিউবো) গণের *প্রজাতি* (বিউবো জেইলোনসিস লেসচেনলট), ইংরেজি— *ব্রাউন ফিশ আউল*, হিন্দি— *উল্লু, অমরাই কা ঘুঘু*-র সঙ্গে মোলাকাত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দিনের কথা মনে পড়ে, গা ছমছমের সঙ্গে হাসিও পেয়েছে।

ভূতুম পেঁচা লম্বায় 56 সেমি (22 ইঞ্চি), উত্তরভারতে লম্বায় একটু বড়ো। বড়ো কানওয়ালা লালচে-পাটকিলে পেঁচা। লম্বা লম্বা কালো টানে পিঠ ভর্তি। তলা সাদাটে-লালচে, তার উপর ঢেউ-খেলানো সরু সরু পাটকিলের টান আড়াআড়িভাবে, ওর উপর বুকে-পেটে কালো কালো লম্বা টানের ছিট। ঘাড়ে ও গলায় সাদা ছোপ। চোখ উজ্জ্বল সোনালি-হলুদ, চঞ্চু মলিন সবজেটে ও ধূসর, পালকহীন পা ও আঙুল ধোঁয়াটে হলুদ, নখর শিঙে-পাটকিলে। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান— পাকিস্তান থেকে পুবে আসাম, হিমালয়ের পাদদেশ ধরে তরাই দুন-ডুয়ার্স ইত্যাদির ভিতর দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ এবং সমগ্র উপদ্বীপাত্মক ভারতের জলাজঙ্গল। পছন্দ করে বুড়ো আমগাছের জঙ্গলের মাথা, রাস্তার ধার, খালের পাশ, জঙ্গলের ভিতর স্রোতস্বতী বা জলার ধারে ঘন পাতার গাছের ভিতর, ভেঙে পড়া পুরনো মসজিদ বা কবরস্থান। দেখা যায় গিরিখাত এবং উঁচুপাড়ের নদীর ধারে উড়তে।

খাদ্য— প্রধানত মাছ, ব্যাঙ, কাঁকড়া, ইঁদুর, পাখি এবং সরীসৃপ। জলের ধারে পড়ে থাকা কুমিরের মাংস খেতেও দেখা গেছে।

স্বভাব— সাধারণত জোড়ায় থাকে। দিনের বেলাতে বিশেষত মেঘলা দিনে ওদের উড়তে ও শিকার করতে দেখা যায়। সন্ধ্যের মুখে বুম বুম আওয়াজ করতে করতে দিনের আবাসস্থান থেকে

বার হয়। পুকুর নদী বা জলার ধারে গাছের গুঁড়ি বা পাথরের উপর বসে শিকার খোঁজে। কখনওবা এক চক্কর উড়ে এসে আবার বসে। জল ঘেঁষে উড়ে চলতে চলতে তীক্ষ্ণ নখর দিয়ে জলের উপর উঠে আসা মাছকে ধরে। কখনও উৎক্রোশের (অসপ্রে) মতো জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে ধরে না।

প্রজননকাল— নভেম্বর থেকে মার্চ। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতেই বেশি ডিম পাড়ে। একটা বা দুটো সাদা গোলাকার মসৃণ ডিম। বাসা বাঁধে পুরনো আম বা বটজাতীয় গাছের দুই ডালের মাঝে অথবা নদীর উঁচু পাড়ের পাথরের খোঁদলে, ভাঙা মসজিদ বা ওই জাতীয় পুরনো দেবদেউলেও। কখনো-সখনো বাসায় লাইনিং দেয় কিছু সরু শুকনো গাছের ডাল দিয়ে। প্রতি বছর একই জায়গায় বাসা বাঁধে। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরতে প্রায় পাঁচ সপ্তাহ লাগে। ডিমের গড় মাপ 58.4 × 48.9 মিমি।

হুতোম পেঁচা (Eurasian Eagle Owl)

পাখি ধরতে বেরিয়ে বকুদা অর্থাৎ বাপী বসু, সতীশ আর আমি বহুদূর চলে গিয়েছি খেয়াল নেই। সেই পুরান মার্টিন কোম্পানির রেল লাইন ধরে নন্দীগ্রাম, বাগুইআটি, বারাসাত ছাড়িয়ে চলে গিয়েছি। ধরেছি দুটো পাপিয়া, একটা বৌ-কথা কও। আসন্ন শীতের বিকেল। চট করে সন্ধ্যে নেমে আসে। এলও তাই। সতীশ বলল, রেল লাইন ছেড়ে নেমে আসুন। লতারা এইখানেই বেশি ঘোরাফেরা করে। সবারই খুব তেজ। বলে উঠি, কী বকছ? নিচে বটপাকুড়ের জঙ্গলের মধ্যে তোমার লতারা নেই, আছে রেল লাইনের উপরে? সতীশ বলে, না বাবু ওখান দিয়ে গেলে ভয় কম, ত্যানারা সরে যাবেন। কিন্তু রেল লাইনের আশপাশ খুবই বিপদের। যারা জানে না তারা প্রায়ই চোট খায়। মারাও পড়ে। বকুদা বলল, সতীশ যখন বলছে আর ও এখানকার লোক, চল লাইন ছেড়ে নেমে জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই যাই। অগত্যা লাইন ছেড়ে নিচে নামলাম।

চি 27. হুতোম পেঁচা

রেল লাইনের উপর পশ্চিমে শেষ গোধূলির যে আভাটা পাচ্ছিলাম, নিচে নেমে তা হারালাম। একটা-দুটো করে নক্ষত্র ফুটে উঠছে। আম জাম বট পাকুড় মুচকুন্দ প্রভৃতির ফাঁক দিয়ে সতীশ পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। সতীশের কাঁধে পাখি ধরার সাতনলা, হাতে খাঁচায় তিনটে ধরা পাখি। মাঝে মাঝে আমি আর বকুদা পালা করে খাঁচাটা বইছি।

হঠাৎ কানে এল ভারী গলায় কে যেন জালার ভেতর থেকে বলছে 'বু-বো'। 'বো'টার উপর জোর

বেশি। রক্ত হিম করা আওয়াজ। বকুদা আর আমি সতীশের পিছনে পরস্পরের হাত চেপে ধরে দাঁড়িয়ে পড়েছি। আবও ভারিক্কি গলায় কে যেন বলে উঠল, 'দুর-গুউন'। একটু থেমে 'টু-হুট'। আমরা নড়তে পারছি না, বুক ঢিব ঢিব করছে। সতীশ এগিয়ে গেছে, তাকে যে ডাকব সে শক্তিটুকু নেই।

সতীশের খানিক বাদে খেয়াল হল, আমরা পিছনে নেই। ও ছুটতে ছুটতে ফিরে এল। আমরা ভয়ে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ভাবছি, সাপের ভয়ে লাইন ছেড়ে জঙ্গলের মধ্যে এসে এ কী বিপত্তি! সতীশ বারে বারে জিজ্ঞেস করছে, কি হয়েছে? এমন সময় আবার হেঁড়ে গলায় 'বু বো... দুর-গুউন'। দু'জনেই বলে উঠেছি— ওই শোন, ও কিসের আওয়াজ? সতীশ একচোট হেসে বলল, ও ত পেঁচা, হুতোম পেঁচা, কেউ বলে হুতুম। আসুন, আমার সঙ্গে, ওকে দেখাচ্ছি। পাখি জেনে সাহস ফিরে পেলাম। বালক বয়সে ভূতুমের ভয় পেয়েছিলাম, আর এখন এই হুতোম। হুতোম অর্থাৎ কালীপ্রসন্ন সিংহের নকশাই জানতাম। এর ডাকের নকশাতে প্রাণ খাঁচা-ছাড়া হবার যোগাড়!

সতীশের পিছু পিছু গিয়ে দেখি পরিত্যক্ত কোন বাগানবাড়ির ভাঙ্গা উঁচু পাঁচিলের উপর বসে আছে। আকারে চিল বা ভূতুমের মতো তবে গায়ে-পায়ে বেশ। আমরা কাছে গিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই দেখলাম, বেড়ালের মতো বসে আছে। হ্যাঁ, পেঁচাই এবং কানঝুটি দুটো পাখনা মেলা। বড়ো বড়ো দুই চোখ জ্বলজ্বল করছে। আমাদের ভয় দেখানর জন্য উপর-নিচের দুই চঞ্চু ঠুকে 'টাক টাক টাক' আওয়াজ করতে লাগল। তাতেও যখন আর ভয় পেলাম না, তখন নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে পাখার ঝাপট মেরে উড়ে চলে গেল। বাড়ি ফিরে বই ঘেঁটে জানলাম হুতোম বা হুতুম পেঁচা (বিউবো বিউবো বেঙ্গলেনসিস), উলূক বর্গের (স্ট্রিগিফরমেস) অন্তর্গত উলূক বংশে (স্ট্রগদি), বায়সান্তক গণের (বিউবো) *এক প্রজাতি। ইংরেজি— ইন্ডিয়ান গ্রেট হর্নড আউল, ঈগল আউল,* হিন্দি— ঘুঘু। বায়সান্তক গণে ভারত ও তার সংলগ্ন স্থানে *5টি প্রজাতি।* হুতোম পেঁচা লম্বায়— 56 সেমি (22 ইঞ্চি)। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। মাথা ও ঘাড় উজ্জ্বল হলদেটে-পাটকিলে, তারপর গাঢ় পাটকিলের আঁকা ডোরা-কাটা। সাদাটে গোল চাকা মুখের ধারে দুই কানঝুঁটি গাঢ় কালচে-পাটকিলে, ধারটা হলদেটে, লাল। উপরের পালক গাঢ় পাটকিলে, তার উপর ফিকে লালচে-হলুদ ও সাদার ছোপ ও ছিট। সেটা বেশি প্রকট হয়েছে ডানার দু'পাশে এবং লেজের উপরে। ওড়ার পালক গাঢ় তামাটে তার উপর পাটকিলের কয়েকটা পটি, ডগাটা ছাই-রঙা। লেজে লালচে-হলদেটে পটি। চিবুক ও গলা সাদাটে, বাকি নিচের পালক লালচে-হলুদ, তার উপর গাঢ় কালচে পাটকিলের ছোটো টান এবং কাটাকুটি সারা বুক ও তলপেট জুড়ে। এই দাগগুলি ক্রমে মিলিয়ে গেছে লেজের তলা ও পায়ে। গুলফে ঘন পালক যা ভূতুমের নেই। ভূতুম ও হুতুমকে তফাৎ করতে হয় পায়ের পালক দেখে। কনীনিকা উজ্জ্বল কমলা-হলুদ, চঞ্চু শিঙে-পাটকিলে, হাঁ-মুখের ভিতরটা গোলাপী। পা ও আঙ্গুল ময়লাটে ধূসরাভ-পাটকিলে, নখর শিঙে-কালো।

বাসস্থান— 1500 মি. (ক্বচিৎ 2400 মি) উচ্চতার মধ্যে সিন্ধু, রাজস্থান, পশ্চিম হিমালয়ের পাঞ্জাব, কাশ্মীর থেকে পুবে নেপাল, গাঙ্গেয় উপত্যকা ধরে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর ও বাংলাদেশ, দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সমতল ও পাহাড়ে সর্বত্র। শ্রীলঙ্কা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে নেই। ভারতের বাইরে বর্মার আরাকানে। পুরোপুরি মরুভূমি এবং ভিজে স্যাঁতসেঁতে

গাছপালার জঙ্গল ছাড়া বড়ো বড়ো গাছ, ভাঙ্গা পরিত্যক্ত বাড়ি, চষা খেত ও গাঁয়ের ধারে, নদীর খাড়া পাড় বা পাথুরে পাহাড়ই এর পছন্দ।

খাদ্য— মেঠো ও নেংটি ইঁদুর প্রধান খাদ্য। তাই কৃষির উপকারী বন্ধু। পাখির মধ্যে ময়ূর, তিতির, নীলকণ্ঠ, টিকটিকি-গিরগিটি, ব্যাঙ, কাঁকড়া ও বড়ো বড়ো পোকামাকড়।

স্বভাব— সাধারণত নিশাচর, কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় কোনো উন্মুক্ত স্থানে সূর্যাস্তের অনেক আগে বা সূর্যোদয়ের অনেক পরে পাথর বা মাটির ঢিবির উপর বসে থাকতে। দিনের বেলায় দেখা যায় নির্জন কোনো পাতা-ছাওয়া গাছের ডালে আত্মগোপন করতে বা দুই বড়ো পাথরের খাঁজে গিরিখাতের চূড়ার কিনারায় মাটি বা পাথরের উপর, অথবা ভাঙ্গা পরিত্যক্ত অট্টালিকার কোনো স্থানে বসে থাকতে। প্রখর রোদে কোনো অসুবিধে বোধ না করে মাটি ঘেঁষে বড়ো দুই ডানায় ধীরে-সুস্থে ঝাপট মেরে ভেসে চলে। সেই সময় কোনো ব্যাঙ দেখতে পেলে নখরে তুলে নেয়। ওদের বিরক্ত করে ঝামেলা বাধায় এক কাক, শালিক আর ফিঙেরা। কিন্তু ওরা ঠিক কেটে বেরিয়ে যায়। সূর্যাস্তের পর ভয়াবহ আওয়াজ দিতে শুরু করে।

প্রজননকাল— অক্টোবর-নভেম্বর থেকে মে, তবে ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসেই বেশি ডিম পাড়ে। বাসা বানায় না। হয় গিরিখাতের ধারে, পাহাড়ের উপরে ঝুঁকে পড়া পাথরের তলায় মাটিতে একটু আঁচড় দিয়ে অল্প খোদল করে ডিম পাড়ে। আবার কখনও দেখা যায় কোনো ঝোপ বা গাছের তলাতেও। ডিম পাড়ে 4টি, কখনও 2 বা 3টি চওড়া গোলাকার চকচকে সাদা, কখনও তার উপর ঘি-রঙের আভা দেখা যায়। প্রতিটি ডিম পাড়ার ব্যবধান 24 ঘণ্টার উপর। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই ডিমে তা' দেওয়া থেকে সন্তান প্রতিপালনের সব দায়িত্ব বহন করে। ডিমের গড় মাপ— 53˙6 × 43˙4 মিমি।

বড়ো জাতের পেঁচাদের ভারতের প্রায় সব জায়গাতেই অমঙ্গলের চিহ্ন বলে ধরা হয়। যদি কোনো বাড়ির পাঁচিল বা ছাদে বসে ডাকে তবে সেই বাড়ির কেউ না-কেউ মারা যাবেই, এই বিশ্বাস বহু লোকের। কত যে উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত কুসংস্কার আছে তার ইয়ত্তা নেই। মারণ, বশীকরণ, উচ্চাটন প্রভৃতিতে হুতোমের অবদান কিছু কম নয়। সিদ্ধার্জুনকক্ষপুটম্, দত্তাত্রেয়ঃ প্রভৃতি তন্ত্রশাস্ত্রে আছে, "হুতোমের হৃদয়, ঘৃতকুমারী ও গোরচনা, এই সকল দ্রব্য সম পরিমাণে লইয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে কেবল যে কোন রমণী নয় ত্রিভূবন বশ করিতে পারা যায়। ইহার পূর্বে দশ সহস্রবার জপ করিতে হইবে, ওঁ নমো মহাযক্ষিণি অমুকং মে বশমানায় স্বাহা!" আরও আছে— একটা হুতোমকে আটদিন না খেতে দিয়ে রেখে তাকে একটি ছড়ি দিয়ে পেটাতে থাকলে সে মানুষের ভাষায় কথা বলবে এবং তোমার ভূত— ভবিষ্যৎ— বর্তমান যখনই প্রশ্ন করবে তখনই সে নির্ভুল বলে যাবে। কিন্তু কোন্ ভাষায় বলবে তা বলা নেই। হয়ত সংস্কৃত, বুঝতে পারলে হয়।

একটা হুতোমকে অন্ধকার ঘরে না খেতে দিয়ে রাখ। সেই ঘরের দেওয়ালের ঠিক মাঝখানে পেরেক পুঁতে একপায়ে দড়ি বেঁধে টাঙ্গিয়ে রাখ। প্রতিদিন তার কাছে একঘণ্টা ধরে মন্ত্র জপ কর। 40 দিন পরে ঐ মৃত পাখিকে একটি ছালায় পুরে ঘরের চাল থেকে আরও 21 দিন ঝুলিয়ে রাখ। তারপর ওর থেকে সমস্ত হাড় একটি একটি করে আলাদা করে নদীর তীরে নিয়ে যাও। কিন্তু তোমার এই যাওয়া যেন কেউ দেখে না ফেলে। তারপর একটি একটি করে হাড় নদীর জলে ছোঁড়। তার মধ্যে

যে হাড়টি জলের মধ্যে সাপের মত কিলবিল করে চলবে, তাকে তুলে রেখে দাও। তোমার প্রাণের সব আকাঙ্ক্ষা-বাসনা ঐ হাড় পূর্ণ করবে।

কাল পেঁচা (Brown Hawk Owl)

—হ্যাঁ রে, তুই নাকি এক অলক্ষুণে পাখি বাড়িতে এনেছিস?

—কে তোমায় বলল?

—যেই বলুক, ছাদে যাবার সিঁড়ির কোণে কাঠের বাক্সর মধ্যে আছে। আমি দেখেছি, কি কুটিল চোখ! ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রইল। নিশ্চয়ই অলক্ষুণে। বাড়িতে মৃত্যু আসবেই। নামেই তার পরিচয়।

—যাচ্চলে। পশুপাখি কীটপতঙ্গ কোন কিছুই অলক্ষুণে হতে পারে না। তোমাদের ভগবানেরই সৃষ্ট জীব। বিনা কারণে এর সৃষ্টি হয় নি। প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যেই এরা সৃষ্ট হয়েছে। ওরা যদি না থাকে পোকামাকড়-টিকটিকি, গিরগিটি, ইঁদুর ইত্যাদি এত বেড়ে যাবে যে মানুষই আর এ পৃথিবীতে বাস করতে পারবে না। বাড়ির টিকটিকি কমে গেছে টের পাওনা? ধরে ধরে ওকে খাওয়াই যে।



চি ২৪ কাল পেঁচা

—তোর বক্তিমে রাখ। কালই ওকে বিদায় করবি। আমি কোন কথা শুনতে চাই না।

মার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে আরও সাতদিন রেখেছিলাম। মুশকিল হত মাঝে মাঝে রাত দুপুরে চিৎকার করে এমন হাঁক পাড়ত যে লোকের পিলে চমকে যেত। আমি কিন্তু ডাকটার মধ্যে একটি মিষ্টত্ব খুঁজে পেতাম। সকলের গঞ্জনা শুনে শেষকালে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম। ভালো করে লক্ষ্য করাই গেল না।

পাখিটা কিনেছিলাম হাতিবাগানের হাটে, কানা সতীশের কাছ থেকে। উলুক বংশে (স্ট্রিগিদি) 11টি গণের মধ্যে পেচক গণের (নিনকস্) এক প্রজাতি : নাম— কাল পেঁচা (নিনকস্ স্কুটুলাটা), ইংরেজি— ব্রাউন হক আউল। কাল পেঁচা লম্বায়— 32 সেমি। অন্যান্য পেঁচাদের মতো মুখের সামনে চাকতির মধ্যে চোখজোড়া পাশাপাশি নেই, শিকরে-বাজদের মতো মাথার দু'পাশেই শুধু নয়, চেহারাতেও অনেক মিল আছে। মাঝামাঝি বয়েস পর্যন্ত সাদা বুকে বাজেদের মতো লালচে-পাটকিলের ফোঁটা।

বয়েস হলে ফোঁটাগুলো আড়াআড়ি লাইনে পরিণত হয়। ভালো করে লক্ষ্য না করলে বাজপাখি বলেই মনে হয়। উপরটা গাঢ় ধূসরাভ-পাটকিলে, গলাটা সাদাটে, ঘাড়ের কাছে ইতস্তত ছড়ানো সাদা ছোপ। ডানা লম্বাটে, কোটরে পেঁচা (স্পটেড আউলেট) বা ছোটো কাল পেঁচার (বারড জাঙ্গল আউলেট) চাইতে বেশি সূঁচলো। গলা লালচে- ধূসর তার উপর পাটকিলের ছিট; লম্বা লেজে (124-135 মিমি) কতকগুলো কালো পটি, পটির পার সাদা। কনীনিকা উজ্জ্বল সোনালি-হলুদ, চঞ্চু, শিঙে-ধূসর বা নীলাভ-কালো, ডগাটা ফিকে। চঞ্চুর গোড়ায় মোমের মতো অনাবৃত ঝিল্লি (cere) ফিকে সবুজ বা সবুজাভ-পাটকিলে। জঙ্ঘায় পালক, আঙুল ফিকে হলুদ বা হলদেটে-সবুজ। প্রতিটি আঙুলের উপর খুব পাতলা করে খোঁচা লোম। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান— বহিঃহিমালয়, পাকিস্তান থেকে পুবে নেপাল, সিকিম, ভূটান, অরুণাচল, আসামে ব্রহ্ম-পুত্রের উত্তরে ; দক্ষিণে সিন্ধু, গুজরাট, রাজস্থানের খরা অঞ্চল ছাড়া সর্বত্র উত্তর ও মধ্যভারত ; পুবে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও উত্তর অন্ধ্র। বোম্বাই, আবু পর্বত ও মাদ্রাজে একবার-দু'বার দেখা গেছে। পছন্দ করে জংলী জায়গা, ঘন গাছপালার বাগান কিন্তু কাছে জল থাকা চাই। যে জঙ্গলের ধারে নদী ও নালা আছে সেখানে দেখা যাবেই, এমনকি মানুষজনের আবাসস্থলের কাছে-পিঠেও।

খাদ্য— বড়ো জাতের কীটপতঙ্গ, ব্যাঙ, টিকটিকি, গিরগিটি, ছোট-পাখি, নেংটি ইঁদুর, মাঝে মাঝে চামচিকে।

ডাকে— খুব পরিষ্কার করে— 'উউ.... উক উউ... উক' উউ... উক, 6 থেকে 20 বার, সাধারণত 9 থেকে 13 বারই শোনা যায়, একটানা 9 বা 13 বারের ডাকে গড় থাকে প্রতি সেকেণ্ডে একবার। 'উউ ....উক' ডেকে কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে আবার ডাক দেয়। 13 বা 20 বার ডাকের পর একদম চুপ করে যায়। প্রজননকালে প্রায় ঘণ্টাখানেক ডাকে। স্ত্রী-পুরুষ সেই সময় দ্বৈতসঙ্গীত চালায়। দিন শুরু হবার আগে খুব প্রত্যুষে বেশ খানিকক্ষণ ডেকে চুপ করে যায়, আর দিনের বেলায় ডাকে না। মেঘলা দিনে কিন্তু ভর-দুপুরেও ডাকে।

স্বভাব— প্রত্যূষে সন্ধ্যার আগে এবং রাতে এদের দেখা যায়। সাধারণত একাই ঘোরাফেরা করে। দিনের বেলায় গাছের ছায়ায় বিশেষত যেসব গাছে লতা উঠেছে, সেইসব গাছের ডালে স্ত্রী-পুরুষ দু'জনে পাশাপাশি ঘেঁষে চুপটি করে বসে থাকে। কোনো কারণে বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটলে প্রখর রোদের ভিতর কিছু-মাত্র অসুবিধে বোধ না করে এক গাছ থেকে আরেক গাছে উড়ে যায়। ওড়াটা খুব দ্রুত। ঘন ঘন পাখার ঝাপট মেরে খানিকটা ভেসে ডালের কাছে এসে নিচ থেকে উপরে শূন্যে উঠে তারপর ডালে বসে। ওড়া ও বসাটা একদম বাজপাখিদের মতো। মেঘলা দিনে দুপুরেও ঘোরাফেরা করে। সাধারণত যে গাছে বসে ঘুরে ফিরে সেই গাছে, সেই ডালে বা কোনো খুঁটির উপর রাতের পর রাত একই জায়গায় বসে মাটিতে শিকারের দিকে নজর দেয়। মাঝে মাঝে শূন্যে ঝাঁপিয়ে উঠে কোনো পতঙ্গ যাচ্ছে দেখে তাকে ধরে নিজের জায়গায় ফিরে আসে। সন্ধ্যের সময় দেখা যায় চেপকাদের (নাইটজার) মতো শূন্যেই কীটপতঙ্গ ধরতে।

প্রজননকাল— সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নি। একমাত্র পক্ষিবিদ বি বি অসমাস্টন। জুলাই 1935 সালে দেরাদুনে মাটি থেকে 8 ফুট উঁচুতে আমগাছের গায়ে গর্তে 4টি ডিম পেয়েছিলেন।

কোটরে পেঁচা (Spotted Owlet)

গরমের ছুটিতে জয়নগর-মজিলপুরে মামার বাড়িতে আছি। শেষ রাত্তির থেকে বৃষ্টি লেগেছে। এখনও থামার নাম নেই। ঝিরঝির করে পড়েই চলেছে। আবছায়া আলো। জানলার দিকে মুখ করে চুপচাপ বিছানায় পাশবালিশ আঁকড়ে শুয়ে আছি। চোখে ঘুম নেই। সদরে ঢোকার মোটা দেওয়ালের উঁচু পাঁচিল কালের হাতে পড়ে পলেস্তারা খসিয়ে ফেলেছে। পুরনো শেওলা লাগা পাতলা ইট জায়গায় জায়গায় না-পাত্তা হয়ে ফোকর সৃষ্টি করেছে। পাশ ফিরে টেবিল ঘড়িতে দেখলাম বেলা দেড়টা। খাওয়ার পাট বারটাতেই সারা। চারিদিক সুনসান। শুধু ঝিরঝিরে বৃষ্টির সংগীত। বাঁ-দিকে আঁঠির আমগাছ থেকে একটু ভয়চকিত গলায় বেনেবৌ ডেকে উঠল, 'গেরস্তের খোকা-আ-হোক্'। তারপরেই দুটো পাখি বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে সদরের পাঁচিলের মাঝে ভাঙ্গা একটা ফোকরে এসে বসে গা ঝাড়া দিল। পাখি দুটো কেমন যেন চৌকো মতন। বেশি বড় নয়। পাশাপাশি দুই বড় ড্যাবা ড্যাবা চোখ। একদৃষ্টিতে আমায় দেখছে। আমার আর তাদের মধ্যে একটা গোপন চুক্তিতে যেন সমঝোতা হয়েছে তেমনিভাবে একটা চোখ বুজিয়ে আমায় চোখ মারল।



চি 29. কোটরে পেঁচা

এমন সময় ছোট মাসিমা ঘরে ঢুকে বললেন, কিরে এখনও ঘুমোস নি? বলি, না, কিন্তু ঐ পাখি দুটো কি? ছোট মাসিমা বলেন, সেদিন রাতে 'ভূতুমের ডাক শুনে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে অস্থির। আজ আবার একজোড়া। যতসব অলক্ষুণে পাখি। পরে বড় হয়ে পুষে দেখেছি মোটেও অলক্ষুণে নয়। বেশ পোষ মানে।

পাখি-জোড়া ছিল উলুক বংশের (স্ট্রিগিদি) অন্তর্গত কৃবয় গণের (অ্যাথিনি) *এক প্রজাতি*। নাম— কোটরে পেঁচা (অ্যাথেনি ব্রামা ইন্ডিকা), ইংরেজি— *স্পটেড আউলেট*, হিন্দি— *উল্লু*। কোটরে পেঁচা গ্রীক পুরাণের দেবরাজ জিয়ুসের কন্যা জ্ঞান ও কৃষির দেবী অ্যাথেনিব প্রতীক।

কোটরে পেঁচা শালিকের চেয়ে বড়ো নয়, 21 সেমি (8 ইঞ্চি)। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। কপাল ও চোখের উপর একটা লাইন সাদাটে। ডানা ও লেজ মেটে-পাটকিলে। মাথায় চাঁদির উপর ছোটো ছোটো সাদা ছিট, বাকি উপরের পালক মেটে-পাটকিলের উপর কম-বেশি স্পষ্টভাবে সাদা ছিট এবং কয়েক জায়গায় সাদা লম্বা দাগ। ঘাড়ের পিছনে অস্পষ্টভাবে অর্ধেক কলার সাদা। ওড়ার পালকে ফিকে ভাঙ্গা পটি। লেজে চার থেকে ছটি সাদা পটি। চিবুক, গলা এবং ঘাড়ের দু-পাশ

সাদা। গলার উপর একটা চওড়া পাটকিলে পটি, ঠিক মাঝে কিছুটা ভাঙ্গা। বাকি তলার পালক সাদা, তার উপর পাটকিলের পটি ও ছিট লেজের তলায় কাছ পর্যন্ত। কনীনিকা সোনালী-হলুদ, চঞ্চু সবুজাভ-শিঙে, উপরের চঞ্চুর গোড়াটা হলুদ, নাকের উপর অনাবৃত ঝিল্লী সবুজাভ পাটকিলে। পা ও আঙুল ময়লাটে হলদে-সবুজ, নখর গাঢ় শিঙে, পায়ের তলা হলদেটে-সাদা।

বাসস্থান— পাঞ্জাবের কোহাট পেশোয়ার জেলা, জম্মু-কাশ্মীর, হিমালয়ের পাদদেশ 1400 মি. উচ্চতার মধ্যে : পুবে নেপাল, সিকিম, ভূটান, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ ; পশ্চিমে বেলুচিস্তান, সিন্ধু, রাজস্থান, কচ্ছ, গুজরাট থেকে সমগ্র উপদ্বীপাত্মাক ভারতে বাকি *দুটি উপজাতিসহ*। গভীর জঙ্গল এড়িয়ে চলে। দেখা যায় গাঁ-গঞ্জে আমগাছ, যে কোনো পুরনো বড়ো গাছ, পরিত্যক্ত বাড়ি, মন্দির, মসজিদ ইত্যাদিতে। ভারতের বাইরে দক্ষিণ-পূর্ব ইরান (বামপুর)। বাকি *দুটি উপজাতি*— *প্রথম*— তামিল নাম— *'পাল্লি আন্ডাই'* (অ্যা ব্রা ব্রামা), ইংরেজি— *সাদার্ন স্পটেড আউলেট*। *বাসস্থান*— উপদ্বীপাত্মক ভারতের 20 ডিগ্রি উঃ অক্ষাংশের দক্ষিণে। *দ্বিতীয়*— অসমিয়া— *কোটরে পেঁচা*, (অ্যা ব্রা আল্ট্রা), ইংরেজি— *ইস্ট আসাম স্পটেড আউলেট*। *বাসস্থান*— লখিমপুর জেলা, উত্তর-পূর্ব আসামের উত্তর থেকে দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র ও লোহিত নদী। আরও দুটি *প্রজাতি* ভারতে দেখা যায়। *প্রথম*— 'বিলিতি কোটরে' (অ্যা নকটুয়া), ইংরেজি— *হাটন'স আউলেট*। লম্বায় 23 সেমি (9 ইঞ্চি), লম্বায় সবচেয়ে বড়ো। *বাসস্থান*— ট্রান্সকাসপিয়া থেকে সাইর ডারাইয়া, ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান থেকে থাল কোহাট ইত্যাদি স্থানে সমতল থেকে 3000 মি. উচ্চতার মধ্যে। *দ্বিতীয়*— 'জংলী কোটরে' (অ্যা ব্লিউইট্টি), ইংরেজি— *ফরেস্ট স্পটেড আউলেট*। এও লম্বায় 21 সেমি (9 ইঞ্চি)। *বাসস্থান*— সাতপুরা পর্বতমালা, পশ্চিম খান্দেশ থেকে পুবে মধ্যপ্রদেশ এবং ওড়িশার সম্বলপুর জেলায়।

খাদ্য— প্রধানত পোকা, মথ, পঙ্গপাল ও অন্যান্য পতঙ্গ, কেঁচো, টিকটিকি-গিরগিটি, নেংটি ইঁদুর ও ছোটো পাখি। ডাক— কর্কশ ও তীক্ষ্ণ 'চিবুরর্ চিবুরর্', তারপরেই 'চিইইভক চিইইভক'। কখনও বা 'চিবুরর্' পরেই 'চিইইভক'। এছাড়াও 'চাক চাক'। প্রজননকালে ডাকাডাকিটা বেশি করে।

স্বভাব— সাধারণত হয় জোড়ায় না হয় পারিবারিক 3-4টি দলে বিচরণ করে। প্রত্যূষ ও গোধূলির পাখি এবং নিশাচরের হলেও দিন-দুপুরে শিকার ধরতে কখনও-সখনও বার হয়। তবে দিনে ওদের অন্যান্য পাখিদের উৎপাতে সুবিধের হয় না। সাধারণত সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই গাছের কোটরে বা কোনো পাতা-ছাওয়া ডালে আশ্রয় নিয়ে পুরুষ-স্ত্রী পাশাপাশি গা ঘেঁষে বসে থাকে। বট-তেঁতুল বা আমগাছে একসঙ্গে দু'তিন জোড়াকে আলাদা আলাদা ডালে বা কোটরে থাকতে দেখা যায়। ওদের অস্তিত্ব কোনো বড়সড় গাছে আছে কিনা বোঝার জন্যে গাছের গায়ে কোনো কিছু দিয়ে ঠুকে আওয়াজ করলে কোটরে বা পাতার আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখে কে শব্দ করছে। তারপর এ-ডাল-সে-ডাল বা এ-গাছ-সে-গাছ করে উড়তে গিয়েই নজরে পড়ে যায়। অন্য স্থানে উড়ে গিয়েই আগন্তুক শব্দকারীকে মাথা, মুখ নাড়িয়ে নানারকম অঙ্গভঙ্গি করতে থাকে। সবসময় মাথাটা পুরো ঘুরিয়ে দেয়

সন্ধ্যের পর নিজেদের আস্তানা থেকে বেরিয়ে বেড়া, টেলিগ্রাফের পোস্ট বা তার, না হয় যেখান থেকে বসে শিকার দেখার সুবিধে হয় সেইখানে বসে। থেকে থেকে কোনো পোকার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। না-হয় এদিক-ওদিক নিঃশব্দে উড়ে যায়। উড়তে উড়তে উড়ন্ত পিঁপড়ে বা পতঙ্গ নজরে ধরে। সেই ধরাটা বা উড়তে উড়তে এক জায়গায় স্থির হয়ে পোকা বা নেংটি ইঁদুরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গিটাও কেমন যেন হাস্যকর। সাধারণত দেখা যায় রাস্তার আলোর স্তম্ভ হচ্ছে শিকারভূমি। সেখান থেকে উড়ন্ত পোকা ধরে ফিরে আসে নিজের জায়গায়। এক পায়ে পোকাটা ধরে মুখে তোলে ঠিক যেন টিয়া-চন্দনাদের বাদাম খাওয়া। ওড়াটা সব জাতের ছোটো পেঁচাদের মতো ঢেউ খেলানো, কিছু দ্রুত ডানা ঝাপটানো। ডানা দুটো দু'পাশে মুড়ে রেখে নেমে আসা এবং আবার ঝাপট দিয়ে ওঠা।

প্রজননকাল— ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল। বাসা বানায় গাছের গায়ে আপনা থেকে যে কোটর হয় তাতে। ভাঙ্গা পরিত্যক্ত দেওয়ালের ফোকর কিংবা পরিত্যক্ত বা বসবাসকারী বাড়ির সিলিং-এর ফাঁকে। কখনও অল্প ঘাস, শন, পাটের আঁশ এবং পালকের লাইনিং দেয়। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই বাসার লাইনিং দেওয়া এবং সন্তান প্রতিপালন সবই করে। ডিম পাড়ে 3-4টি, মাঝে মাঝে 5টি সাদা অল্প গোলাকার। কতদিনে ডিম ফোটে তা এখনও জানা যায় নি। ডিমের গড় মাপ— 32·2 × 27·1 মিমি।

অন্যান্য পেঁচা

উলূক বংশে আরও কয়েকটি গণের পাখিকে পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়। তারা হল—

1. **কণ্ঠী পেঁচা**— (ওটাস বাক্কামোএনা মারাথি)। বাংলা নামকরণ কখনও হয় নি। হিন্দি— *যারকভি চোঘড়*, ইংরেজি— *কলার্ড স্কপস্ আউল*। উর্ধ্বকর্ণ গণের (ওটাস) পাখি। এই গণে *5টি প্রজাতি*। এই প্রজাতিতে (ওটাস বাক্কামোএনা) *6টি উপজাতি*। উর্ধ্বকর্ণদের মাথা একটু বড়ো, চঞ্চু ছোটো, কানঝুঁটিও বেশ বড়ো।

লম্বায় শালিকের মতন 23-25 সেমি (9-10 ইঞ্চি)। উপরাংশ : ধূসর বা লালচে-হলুদ-পাটকিলে, তার উপর সাদা সাদা ছোপ ও সরু সরু আঁকিঝুকি, ঘাড়ে ফিকে সাদাটে কণ্ঠী। নিম্নাংশে : চিবুক ও গলা ফিকে হলদেটে-লাল, গলায় তার উপর কালো সরু টান। বাকি তলা সাদা থেকে গাঢ় হলদেটে-লাল, তার উপর কালো এবং খুব সরু করে ঢেউ খেলানো লালচে-পাটকিলের টান। কনীনিকা হলদে, চঞ্চু শিঙে-সবজেটে, পা হলদেটে-মাংসল।

বাসস্থান— গুজরাট থেকে পুবে মহারাষ্ট্রের খান্দেশ, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা এবং দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গল, ঘন পাতার গাছের বাগান যা গ্রাম ও চাষবাসের কাছাকাছি।

স্বভাব— দু'তিন সেকেন্ড অন্তর প্রশ্নবোধক *ডাক* 'উট ?' চলে প্রায় দশ থেকে পনের মিনিট ধরে। সম্পূর্ণ নিশাচর। দিনে ক্বচিৎ দেখা যায়। রাতে ডাক শুনে বুঝতে হয় কোথায় আস্তানা গেড়েছে। দিনের বেলায় ঘন পাতার অন্ধকার আড়ালে গাছের ডালে খাড়া হয়ে এমন চুপচাপ

থাকে যে বোঝাই যায় না। (Jungle Owlet)

2. **ছোটো কালপেঁচা**— (গ্লসিডিয়াম রেডিয়াটাম), হিন্দি— *জংলি চোঘড়*, ইংরেজি— *বারড্ জাংগল আউলেট*। ভুভুল গণের (গ্লসিডিয়াম) পাখি। এই গণে *3টি প্রজাতি*। লম্বায় 20 সেমি (8 ইঞ্চি)।

কানঝুঁটিহীন বেঁটেখাটো গোলমাথার পাখি। উপরাংশ : গাঢ় পাটকিলে, তার উপর ফিকে লালচে-হলুদের টান। নিম্নাংশ : চিবুক, গোঁফ পালক, বুক ও পেটের উপরটা সাদা, বাকি নিচটা গাঢ় জলপাই-পাটকিলে এবং সাদার টান। ওড়ার সময় ডানার তলায় লালচে-হলুদের ছোপ দেখা যায়। কনীনিকা উজ্জ্বল লেবু-হলুদ, চঞ্চু সীসে-হলুদ, পা ও আঙুল ময়লা-সবজেটে বা লেবু-হলুদ, নখর সীসে-পাটকিলে।

বাসস্থান— হিমালয়ের তরাই, ভাবর, দুন ও ডুয়ার্সে 2000 মি. উচ্চতার মধ্যে হিমাচল প্রদেশ থেকে পুবে গাড়োয়াল, কুমায়ুন, নেপাল, সিকিম, ভূটান, পশ্চিমবঙ্গ ; দক্ষিণে কেরালা পর্যন্ত ও শ্রীলঙ্কায় ভিজে পর্ণমোচী ও অন্যান্য জঙ্গলে বিশেষত যেখানে সেগুন ও বাঁশবন বেশি।

স্বভাব— ডাক দেয় দু'তিনবার 'কুউকুক, কুউকুক'। অনেকটা শোনায় যেন দূর থেকে লাল জংলি মোরগ ডাকছে। সাধারণত একা অথবা জোড়ায় থাকতে ভালোবাসে। প্রত্যূষে ও গোধূলিতেই বেশি শিকার ধরে। সন্ধ্যের পর রাতের অন্ধকারে যেমন দেখা যায় তেমনই দেখা যায় সূর্য ওঠার অনেক পরেও। ওদের বিরক্ত করা অন্যান্য পাখিদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে ঘন পাতার আড়ালে বা গাছের কোটরে আশ্রয় নেয়। (Mottled Woodowl)

3. **বনপেঁচা**— (স্ট্রিকস্ অসেল্লাটা)। মালয়ালী— *কাল্লিকুরাভান*। বাংলা-হিন্দি বা অন্য কোনো ভাষায় নামকরণ হয় নি। ইংরেজি— *মটলড্ উড আউল*। বনঘুক গণের (স্ট্রিকস্) পাখি। এই গণে *4টি প্রজাতি* আছে।

লম্বায় প্রায় গোদা চিলের আকারে 48 সেমি (19 ইঞ্চি)। কানঝুঁটিহীন উপরাংশ : লালচে-পাটকিলে কালো, তার উপর সাদা আর কালচে-হলুদের ছোপ ও আঁকিবুকি, মুখের গোল চাকতি সাদা তার উপর খুব সরু করে কালো কালো টান। গলায় বাদামী ও কালোর উপর সাদা ছিট। গলার কাছ ঘেঁষে ঘাড়ে, উপর আধখানা বেশ পরিষ্কার সাদা কলার। বাকি তলাটা সাদা ও সোনালি লালচে-হলুদ, তার উপর সরু করে কালচে সব টান।

বাসস্থান— উত্তর হিমালয়ের তলদেশ থেকে রাজস্থান, পুবে উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় উপত্যকায় আম, পুরনো বট, তেঁতুল ইত্যাদি ঘন পাতার জঙ্গলে গ্রাম ও চাষবাসের কাছে।

স্বভাব— ডাকে জোরে একটু ভূতুড়ে গলায় 'চুহুয়া-আ আ'। এছাড়া লক্ষ্মী পেঁচার মতন একটা চিল-চেঁচানি ডাক আছে। প্রধানত নিশাচর। দিনের বেলাটা পাতার আড়ালে ডালের উপর পাশাপাশি জোড়ায় বসে কাটায়। কোন কারণে বিরক্ত বোধ করলে দুপুর রোদেও বেশ খানিকটা উড়ে অন্য কোনো গাছের পাতার আড়ালে আত্মগোপন করে।

4. **ছোটোকান পেঁচা**— (এসিও ফ্লামমিউস)। বাংলা-হিন্দি কোনো নামকরণ হয় নি। মালয়ালী— *চুটা মুঙ্গা*, ইংরেজি— *শর্টইয়ার্ড আউল*। কর্ণিক গণের (এসিও) পাখি। এই গণে *2টি প্রজাতি*।

(Short-eared Owl)

ছোটোবড়ো দু'রকম কানঝুঁটি দেখা যায়। লম্বায় প্রায় পায়রার আকারে ৩৮ সেমি (১৫ ইঞ্চি)।

মোটামুটি ফিকে লালচে-হলুদ, তার উপর গাঢ় পাটকিলের ছিট, মাথা গাঢ় ধূসরাভ। মুখের গোল চাকতি সাদা, তার ভিতর বেশ এলোমেলোভাবে কিছু কালো পালক মেশানো, সমস্ত চাকতিটা ঘিরে একটা গাঢ় পাটকিলের শক্ত বন্ধনী; দুটি ছোটো কালচে-পাটকিলে কানঝুটি আছে হলদে চোখের উপরে। নিম্নাংশ : ফিকে লালচে-হলুদ, বুকের উপর লম্বালম্বিভাবে পাটকিলের ছিট। ওড়ার সময় তলাটা সাদা, ডানা সূঁচলো, প্রত্যেক ডানায় একটা করে কালো টান এবং প্রান্তদেশ কালো। কনীনিকা উজ্জ্বল লেবু-হলুদ, চঞ্চু স্লেট-কালো, লোমে ঢাকা পায়ের যেটুকু উন্মুক্ত তা গাঢ় পাটকিলে, নখর শিঙে-কালো।

বাসস্থান— ইওরোপ ও এশিয়ার উত্তরাংশ থেকে শীতে পরিযায়ী হয় পাকিস্তান, নেপাল, সিকিম, ভূটান, পূর্ব আসাম ও মণিপুরসহ সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ। মাঝে মাঝে শ্রীলঙ্কা ও মালডিভ দ্বীপপুঞ্জেও। দেখা যায় ঘেসো জমি যার মাঝে ঝোপঝাড়, পাহাড়ের ধারে ছড়ানো-ছিটানো আগাছায়, অথবা ঝিলের ধারে বড়ো বড়ো ঘাসজমি এমনকি আধখরা জায়গাতেও।

স্বভাব— ভারতে এর ডাক শোনা যায় নি। হয় একা না হয় পাঁচ-ছয়ের বা কুড়ির দলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে চরে। পুরোপুরি দিবাচর। মাটিতেই বেশি ঘোরাফেরা করে।

পরভৃত বর্গ

পরভৃত বর্গের (অর্ডার কুকুলিফরমেস) পাখিদের পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। তবে গ্রীষ্ম-মণ্ডলীয় অঞ্চলেই বেশি। এই বর্গের কিছু পাখি নিজেরা বাসা বাঁধে না, পরের বাসাতেই কাজ চালায়। অপরের বাসায় ডিম পাড়ে কিন্তু ডিমে তা' দেয় না এবং সন্তান প্রতিপালন করে না। সবই পরপৈদী। তাই এদের বর্গের নাম পরভৃত। আবার এই বর্গের কিছু পাখি আছে যারা নিজেরা সব দায়িত্ব পালন করে। অর্থাৎ, সাধারণ অন্যান্য সব পাখির মতো বাসা বাঁধা, ডিম পাড়ে এবং সন্তান প্রতিপালন ইত্যাদি সবই করে। কোনো কারণে তারা স্বভাব ত্যাগ করেছে, কিন্তু অভ্যন্তরীণ অস্থিসংস্থানে তারা যে একদিন পরভৃত ছিল তা বোঝা যায়। সত্যিকারের পরভৃত যারা তাদের অস্থিসংস্থান এমন যে তাদের পক্ষে ডিমে তা' দেওয়া সম্ভব নয়। এই বর্গের পাখিরা যুগ্মাঙ্গুল গোষ্ঠীর (জাইগোডাকটিলাস)। এদের প্রথম ও চতুর্থ আঙুল পিছন দিকে। ডিম ফুটে বার হবার পর গায়ে কোনো পালক থাকে না।

পরভৃত বংশ

পরভৃত বর্গে একটিমাত্র বংশ পরভৃত (কুকুলিদি)। এই বংশ 10টি গণে বিভক্ত— কাকপুষ্ট (ইউডাইনামীস), শাওল (ক্ল্যামাটর), প্রিয়ক (সুরনিক্যুলাস), হরীতক (চালসিটেস), পরভৃত (কুকুলাস), বর্ষপ্রিয় (কাকোম্যানটিস), কুক্কুভ (সেন্ট্রপাস), রক্তমুখ (ফাএনিকোফাইউস), হরিতচঞ্চু (রোপোডাইটেস) ও ভূশুক (টাক্কোকুয়া)।

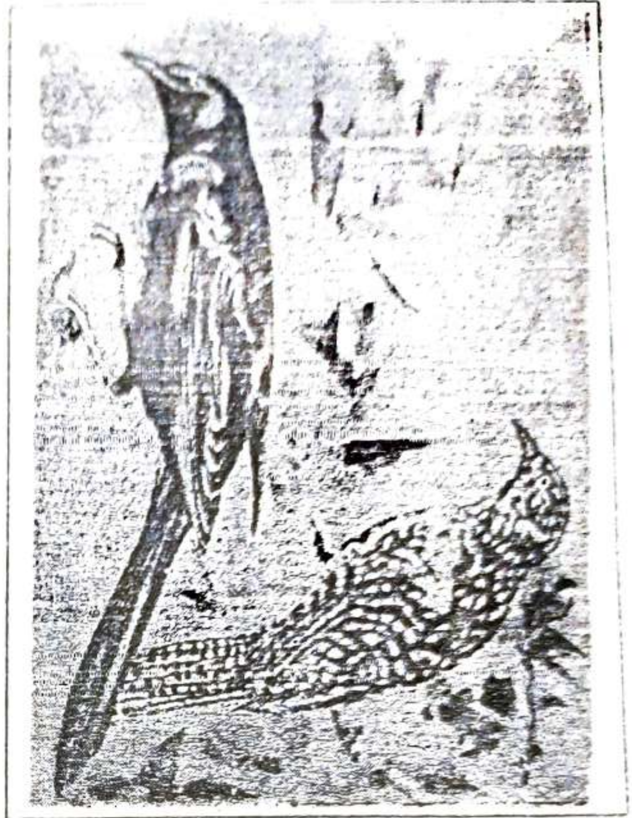
ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে যারা খাঁটি পরভৃত নয় এবং যারা এই বৃত্তি ত্যাগ করেছে এই দুই গণের পাখিদেরই দেখা যায়। এই বংশের পাখিদের অনেক কিছুই আজও অজ্ঞাত।

কোকিল

কাক, চিল, চড়াই, শালিকের মত এই পাখিটিকে চেনে না বা ডাক শোনে নি এমন কোন বঙ্গসন্তানই নেই শুধু বলব না, বলব খুব অল্প ভারতীয়ই আছে। বিলিতি কাব্যে যেমন 'কুকু', আমাদের তেমন এই পাখিটি। এই পাখিটি এবং কুকু নিয়ে আমার এক তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। তখন কতইবা বয়স হবে, এগার। ফোর্থ ক্লাসে পড়ি অর্থাৎ এখনকার ক্লাস সেভেন-এ। ইংরেজীর

মাস্টারমশায় ক্লাসে সেদিন নতুন কবিতা পড়াচ্ছেন। 'কাক্কু'— কোকিলের উপর ইংরেজী কবিতা। 'হেইল! বিউটিয়াস স্ট্রেঞ্জার অফ দি গ্রোভ/দাও মেসেঞ্জার অফ স্প্রিং...।

আমি চিরকালই ডেপো। তখন থেকেই পাখির প্রতি আমার অদম্য আকর্ষণ। যা পাই তাই পুষি এবং জানবার চেষ্টা করি। তার উপর 'জীবজন্তু'র লেখক দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আমাদের বাড়িতে তখন প্রায়ই আসতেন। জ্ঞানটি তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া। সুতরাং আমি উঠে প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম, সরি কাক্কু নয় কুক্কু। আমাদের দেশেও কুক্কু আছে, তার নাম 'বৌ-কথা-কও'। কোকিলের ইংরেজি— *'দি কোয়েল'*।



চি 30. কোকিল

এই কথা শোনামাত্র ঝড়ের বেগে চেয়ার পেছনে ঠেলে প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে এসে আমার গালে বিরাশী সিক্কার এক চড়। ভেঙচে বলে উঠলেন, 'কাক্কু নয় কুক্কু... দি কোয়েল! বৌ কথা কওয়াচ্ছি। ওঠ্! ওঠ্!' স্ট্যান্ড আপ অন দি বেঞ্চ। কান ধর্। এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবি ক্লাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত। কাক্কু নয় কুক্কু, দি কোয়েল। হুঁঃ! আমায় উনি শেখাচ্ছেন? স্টুপিড!...

রাগে অপমানে চড় খেয়ে কান, গাল আমার বেগুনি হয়ে গেছে। মুখে বিড়বিড় করে বলে যাচ্ছি— কাক্কু নয় কুক্কু। কোকিলের ইংরেজী— দি কোয়েল।

মিনিট পাঁচ-সাত পড়ানর পর হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে আমার পাশের ছেলেদের জিজ্ঞেস করলেন, ও বিড়বিড় করে কি বলছে রে?' আমারই সহপাঠিরা সবাই বলে উঠল, 'কাক্কু' নয় কুক্কু। কোকিল— দি কোয়েল।' বাস! আবার হেঁচকা টানে বেঞ্চির উপর থেকে নিচে। হিড়হিড় করে ক্লাসের বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে করিডরে সেই কানধরা আর নীলডাউন।

দু'দিন পরেই আবার ইংরেজী কবিতার ক্লাস। কবিতাটা শেষ হয় নি। মনে মনে ভাবছি আজ আবার না জানি কি হবে! ক্লাসে ঢুকেই তিনি কোনো কথা না বলে পড়াতে লাগলেন নতুন কবিতা— হাফ এ লিগ, হাফ এ লিগ, হাফ এ লিগ অন ওয়ার্ড। অল ইন দ্য ভ্যালি অফ ডেথ রোড দ্য সিক্স হান্ড্রেড।

সেই কুক্কু কবিতা আর পড়ানই হল না। বড় হয়ে বুঝেছিলাম কমনরুমে বা লাইব্রেরিতে গিয়ে চেম্বার্স বা ওয়েবস্টার ডিক্সনারি দেখে সঠিক উচ্চারণটা জেনে লজ্জায় ঐ কবিতাটি আর পড়ান নি।

পরভৃত বংশে (কুকুলিদি) কাকপুষ্ট গণের (ইউডাইনামীস) এক *প্রজাতি*। পুরুষ : কোকিল

(ইউডাইনামীস স্কোলোপাসিয়া), স্ত্রী : ছিট কোকিল, হিন্দি— *কোয়েল*, ইংরেজি— *দি কোয়েল।*

পুরুষের চকচকে উজ্জ্বল কাল দেহের উপর নীলচে-সবুজের আভা, হলদেটে-সবুজ চঞ্চু, টকটকে লাল চোখ, লম্বা লেজ। স্ত্রী-পাখির উপরাংশে গাঢ় পাটকিলের উপর সর্বত্র সাদা ছিট ও টান, নিম্নাংশ সাদা, চিবুক, গলা ও ঘাড়ের দু'পাশে কালচে ছিট এবং বাকি তলার অংশে কালচে টান। উভয়ের পা ও আঙুল সীসে, নখর শিঙে। প্রথম ও চতুর্থ আঙুল পিছন দিকে। এই কারণে মাটিতে দাঁড়াতেই পারে না। লম্বায়- 43 সেমি (17 ইঞ্চি)।

বাসস্থান— ভারতে *3টি উপজাতি।* তাদের মধ্যে কিছু স্থায়ী বাসিন্দা, কিছু ভবঘুরে এবং কিছু স্থানীয়ভাবে পরিযায়ী হয়। অনেক স্থানে বিশেষত উত্তর এবং উপদ্বীপাত্মক ভারতে বসন্তকালের শুরুতে দর্শন দেয়, দক্ষিণ ভারতে শীতে। প্রজননকাল ছাড়া অন্যসময় ডাকে না এবং আত্মগোপন করে থাকে বলে নানা ভ্রান্ত ধারণা জন্মায়। যদিও এ-সম্বন্ধে এখনও সঠিক তথ্য জানা যায় নি। আমরা যাদের দেখি ও ডাক শুনি সেই *প্রথম উপজাতি* (ইউ স্কো স্কোলোপাসিয়া), আসাম ও বাংলাদেশ ছাড়া সমতলে 1000 মি. উচ্চতার ভিতর এবং পাঞ্জাব ও কাশ্মীর থেকে নেপাল, সিকিম, ভূটান এবং অরুণাচল প্রদেশে 1800 মি. উচ্চতার মধ্যে অল্পস্বল্প জঙ্গল, শহর ও গ্রামের ধারে বা ভিতরে যে কোনও বাগান ও খেতখামারে বাস করে। *দ্বিতীয় উপজাতি* (ইউ স্কো মালয়ানা), ইংরেজি— *মালয় কোয়েল*, অসমিয়া— *কোকিল হুরাই*, আসাম, দক্ষিণ অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশে। ভারতের বাইরে বর্মা, থাইদেশ, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া। *প্রথম উপজাতির* সঙ্গে তফাত করা খুবই শক্ত। আকারে সামান্য বড়, চঞ্চুও একটু বড়, স্ত্রী-পাখির উপরে ও নিচে লালচে ভাবটা একটু বেশি। *তৃতীয় উপজাতি* (ইউ স্কো ডোলোসা), ইংরেজি— *আন্দামান কোয়েল*— আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে।

খাদ্য— প্রধানত ফল, বিশেষত বট-পিপুল, কুল, শেয়াকুল, তুঁত, শ্বেতচন্দন, তেলাকুচা, সলপ বা গোলসাও প্রভৃতি। বিষাক্ত ফুলের ফল খুবই প্রিয়। পায়ের গঠনের জন্যে মাটিতে দাঁড়াতে পারে না, তাসত্ত্বেও কলকে ফল খাবার জন্যে মাটিতে বুক ঠেকিয়ে খেতে একবার আমি দেখেছি। এছাড়া শুঁয়োপোকা নানা কীটপতঙ্গ এবং ছোট পাখির ডিম বিশেষত বেনেবৌ ও বুলবুলের ডিম, বাসা থেকে চুরি করে খায়। খায় পালতে মাদারের মধু।

স্বভাব— প্রথমেই একজন খুব ভোরে একটা গলা ভাঁজার ডাক দেয় কর্কশ গড়ান গলায়— 'কুরুচ- কিউকিউকিউ' এই লম্বা টান পরপর ছ'সাতবার। এইভাবে অন্যান্য পুরুষ কোকিলদের জানায় তার চৌহদ্দি। অন্য একটি পুরুষ সেই চৌহদ্দি ঘোষণার ডাক শুনেই ঐভাবে জবাব দেয়। কাছাকাছি অন্য পুরুষরা থাকলে তারাও জবাব দিয়ে জানান দেয় তাদের চৌহদ্দির। বেলা একটু বাড়লেই শুরু হয় সঙ্গীত বা কুহুতান— 'কু-উউ কু উউ'। সাত-আট টানে উচ্চগ্রামে তুলে হঠাৎ ঝপ করে বন্ধ করে দেয়। আবার ডাকতে শুরু করে। আমাদের মধ্যে কোকিল পোষার সখ অনেকের আছে। কাছাকাছি দুই বাড়ির কোকিল যখন প্রতিযোগিতা শুরু করে, তখন তাদের দ্বৈত কুহুতানের চোটে কান উড়ে যায়, প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এইসব ডাক ছাড়াও কোন কারণে উত্তেজিত হলে অর্ধস্ফুট নানা শব্দ করে। স্ত্রী-পাখি অর্থাৎ ছিট কোকিল প্রাকমিলনের আগে খুব দ্রুত 'কিক কিক-কিক'

(ইউডাইনামীস স্কোলোপাসিয়া), স্ত্রী : ছিট কোকিল, হিন্দি— *কোয়েল*, ইংরেজি— *দি কোয়েল*।

পুরুষের চকচকে উজ্জ্বল কাল দেহের উপর নীলচে-সবুজের আভা, হলদেটে-সবুজ চঞ্চু, টকটকে লাল চোখ, লম্বা লেজ। স্ত্রী-পাখির উপরাংশে গাঢ় পাটকিলের উপর সর্বত্র সাদা ছিট ও টান, নিম্নাংশ সাদা, চিবুক, গলা ও ঘাড়ের দু'পাশে কালচে ছিট এবং বাকি তলার অংশে কালচে টান। উভয়ের পা ও আঙুল সীসে, নখর শিঙে। প্রথম ও চতুর্থ আঙুল পিছন দিকে। এই কারণে মাটিতে দাঁড়াতেই পারে না। লম্বায়- 43 সেমি (17 ইঞ্চি)।

বাসস্থান— ভারতে *3টি উপজাতি*। তাদের মধ্যে কিছু স্থায়ী বাসিন্দা, কিছু ভবঘুরে এবং কিছু স্থানীয়ভাবে পরিযায়ী হয়। অনেক স্থানে বিশেষত উত্তর এবং উপদ্বীপাঞ্চল ভারতে বসন্তকালের শুরুতে দর্শন দেয়, দক্ষিণ ভারতে শীতে। প্রজননকাল ছাড়া অন্যসময় ডাকে না এবং আত্মগোপন করে থাকে বলে নানা ভ্রান্ত ধারণা জন্মায়। যদিও এ-সম্বন্ধে এখনও সঠিক তথ্য জানা যায় নি। আমরা যাদের দেখি ও ডাক শুনি সেই *প্রথম উপজাতি* (ইউ স্কো স্কোলোপাসিয়া), আসাম ও বাংলাদেশ ছাড়া সমতলে 1000 মি. উচ্চতার ভিতর এবং পাঞ্জাব ও কাশ্মীর থেকে নেপাল, সিকিম, ভূটান এবং অরুণাচল প্রদেশে 1800 মি. উচ্চতার মধ্যে অল্পস্বল্প জঙ্গল, শহর ও গ্রামের ধারে বা ভিতরে যে কোনও বাগান ও খেতখামারে বাস করে। *দ্বিতীয় উপজাতি* (ইউ স্কো মালয়ানা), ইংরেজি— *মালয় কোয়েল*, অসমিয়া— *কোকিল ছরাই*, আসাম, দক্ষিণ অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশে। ভারতের বাইরে বর্মা, থাইদেশ, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া। *প্রথম উপজাতির সঙ্গে* তফাত করা খুবই শক্ত। আকারে সামান্য বড়, চঞ্চুও একটু বড়, স্ত্রী-পাখির উপরে ও নিচে লালচে ভাবটা একটু বেশি। *তৃতীয় উপজাতি* (ইউ স্কো ডোলোসা), ইংরেজি— *আন্দামান কোয়েল*— আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে।

খাদ্য— প্রধানত ফল, বিশেষত বট-পিপুল, কুল, শেয়াকুল, তুঁত, শ্বেতচন্দন, তেলাকুচা, সলপ বা গোলসাও প্রভৃতি। বিষাক্ত ফুলের ফল খুবই প্রিয়। পায়ের গঠনের জন্যে মাটিতে দাঁড়াতে পারে না, তাসত্ত্বেও কলকে ফল খাবার জন্যে মাটিতে বুক ঠেকিয়ে খেতে একবার আমি দেখেছি। এছাড়া শুঁয়োপোকা নানা কীটপতঙ্গ এবং ছোট পাখির ডিম বিশেষত বেনেবৌ ও বুলবুলের ডিম, বাসা থেকে চুরি করে খায়। খায় পালতে মাদারের মধু।

স্বভাব— প্রথমেই একজন খুব ভোরে একটা গলা ভাঁজার ডাক দেয় কর্কশ গড়ান গলায়— 'কুরুচ- কিউকিউকিউ' এই লম্বা টান পরপর ছ'সাতবার। এইভাবে অন্যান্য পুরুষ কোকিলদের জানায় তার চৌহদ্দি। অন্য একটি পুরুষ সেই চৌহদ্দি ঘোষণার ডাক শুনেই ঐভাবে জবাব দেয়। কাছাকাছি অন্য পুরুষরা থাকলে তারাও জবাব দিয়ে জানান দেয় তাদের চৌহদ্দির। বেলা একটু বাড়লেই শুরু হয় সঙ্গীত বা কুহুতান— 'কু-উউ কু উউ'। সাত-আট টানে উচ্চগ্রামে তুলে হঠাৎ ঝপ করে বন্ধ করে দেয়। আবার ডাকতে শুরু করে। আমাদের মধ্যে কোকিল পোষার সখ অনেকের আছে। কাছাকাছি দুই বাড়ির কোকিল যখন প্রতিযোগিতা শুরু করে, তখন তাদের দ্বৈত কুহুতানের চোটে কান উড়ে যায়, প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এইসব ডাক ছাড়াও কোন কারণে উত্তেজিত হলে অর্ধস্ফুট নানা শব্দ করে। স্ত্রী-পাখি অর্থাৎ ছিট কোকিল প্রাকমিলনের আগে খুব দ্রুত 'কিক কিক-কিক'

উড়ে এধার-ওধার করতে থাকে, আর তার পিছনে ছোটে কোকিল। ছিট কোকিল [illegible] বেড়ায় এবং এ পুরুষকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে, [illegible] সে কিছুতেই ছাড়ে না।

[illegible] অক্টোবর [illegible] র বেলা দুটো। এই সময় ভারতীয় পরিসংখ্যান সংস্থার 206 নং বি টি রোডের বাগানে আমার দৃষ্টিপথে পড়ে দুটি কোকিল একটি ছিট কোকিলের মনোরঞ্জন করার চেষ্টা করছে। [illegible] থেকে 10 ফুট দূরত্বের ব্যবধান পরস্পরের মধ্যে রেখে ওড়াউড়ির খেলা খেলছে এবং তিনজনেই একই [illegible] লাল ফল খাচ্ছে। দুই কোকিলের মধ্যে কোন লড়াই নেই। জানি না আগামী প্রজননকালে স্ত্রী-পাখিটি কাকে বরণ করবে— একজনকে না দু'জনকেই। পরভৃত বংশীয় স্ত্রী-পাখিদের মধ্যে বহুস্বামিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

কোকিল পুরোপুরি বৃক্ষবাসী। ঘন পাতার গাছে বা ঝোপে লুকিয়ে থাকতে ভালবাসে বলে সহজে চোখে পড়ে না। এমনিতে খুবই চুপচাপ। হঠাৎ দেখা যায় যখন এক গাছ থেকে আরেক গাছে উড়ে উড়ে আশ্রয় নেয়। শীতের শেষে বসন্তে যখন পাতিকাক ও দাঁড়কাকদের প্রজননকালের শুরু, সেই সময় থেকে এদের ডাক বাড়ে। সকাল সন্ধ্যে তো ডাকেই তাছাড়া দুপুরে ও গভীর রাতেও ডেকে থাকে।

পরভৃত বংশীয় পাখি বলে এরা নিজেরা বাসা বানায় না, ডিমেও তা' দেয় না। সবই পরশ্রৈপদী সারে। এইসময় এদের চাতুর্য্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মেলে। পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে চতুর যে কাক তাকেও একদম বোকা বানিয়ে ছাড়ে। কোকিল কাকের বাসার কাছে এসে এমন বিরক্তি উৎপাদন করে যে কাক বাসা ছেড়ে ওর পিছুপিছু ধাওয়া করতে বাধ্য হয়। কোকিলও এদিক-ওদিক করে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, সেই ফাঁকে স্ত্রী-পাখি এসে খালি বাসায় ডিমটি পেড়ে চলে যায়।

কাকেদের সঙ্গে তাল রেখে এদের *প্রজননকাল*— মার্চ থেকে আগস্ট, তবে মে থেকে জুলাই মাসেই বেশি ডিম পাড়ে। কাকের ডিমের সঙ্গে হুবহু এক দেখতে, তবে আকারে একটু ছোট। সবুজাভ-ধূসরের উপর লালচে-পাটকিলের ছিট ও ছোপ। কোকিলের ডিম আগে ফোটে 13-14 দিনে। পাতিকাকের 16-17 দিনে আর দাঁড়কাকের 18-20 দিনে। আগে ফোটার জন্যে খাদ্যের বড় ভাগটা এদের বেশি জোটে। আসল ছানারা উপোস করে। এছাড়াও দেখা যায় এবং আমিও দেখেছি, একটু বড় হয়ে বাসার বাইরে এলে বাড়তি খাবার ছিট কোকিল এনে খাওয়ায়। এইসময় কোকিল-ছানা কাকের ছানার মত কর্কশ গলায় 'কাআআ' ডাকে। আশ্চর্য লাগে এই ছানা অবস্থায় কাকের আনা পচা-গলা মাছ-মাংস, নাড়ি-ভুড়ি ইত্যাদি খেয়ে পরিপুষ্ট হয়, কিন্তু বড় হয়ে কোনভাবেই এই ধরনের খাদ্য খায় না। কাক দাঁড়কাকের বাসায় ডিম পাড়া ছাড়াও সময় সময় বেনেবৌ ও শালিকের বাসাতেও ডিম পেড়ে থাকে। ডিমের গড় মাপ— 31˙0 × 23˙6 মিমি।

পাপিয়া

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রে যে কোন পল্লীগ্রামে বা কলকাতার উপকণ্ঠে, কিংবা মেঘে ছাওয়া দিনে একটি পাখির ডাক প্রায়ই শুনি— 'পি-পি পি-পি পি-পিহু', একটু নিচু থেকে স্বরগ্রামের উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে 'পিউ-কাঁহা, পিউ-কাঁহা, পিঁউ-কাঁহা'। মিনিট খানেক চুপচাপ থেকে আবার ডাকতে

শুরু করে। সহজে থামে না। কাছাকাছি বা একটু দূরে আরও যদি কোনও পাখি থাকে তবে সেও সমস্বরে ডাকতে থাকে। কেউ এমনি করে চারবার, কেউ পাঁচ বা ছ'বার আবার কেউবা সাতবারও ডাকে। যারা সবে ডাকতে শুরু করেছে তারা বার তিনেকই ডাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বরগ্রাম উচ্চপর্যায়ে যাবার ক্ষমতা লাভ করে।

অনেকেই এর নাম জানি-- পাপিয়া, চোখগেল, ইংরেজি- *হক-কুকু, ব্রেনফিভার বার্ড (কুকুলাস ভেরিয়াস)* বলে, কিন্তু কম লোকেরই পরভৃত বংশের (কুকুলিদি) এই পাখির সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় ঘটেছে। অবশ্য কবির কাব্যে ও গানে, যেমন দ্বিজেন্দ্রলালের 'পাপিয়ার ঐ আকুল তানে, আকাশভুবন গেল ভেসে' বা নজরুলের 'কাঁদে পিউ-কাঁহা পাপিয়ার' সঙ্গে আমরা খুবই পরিচিত।



চি 31. পাপিয়া

শিকরে বাজের চঞ্চুর গঠন ও চোখের ক্রূরদৃষ্টি ছাড়া পাপিয়ার বাকি দেহের রং একদম শিকরে বাজের (স্প্যারো হক, অ্যাকশিপিটার বেডিয়াস) মত। পূর্ণবয়স্কের চেহারা, উপরটা ছাই-ধূসর, লেজের পালকে লালচে আভা এবং চওড়া দিকে চারপাঁচটি মলিন সাদা ও কালো পটি। নিম্নাংশ : বুক লালচে-ধূসর এবং সরু পাটকিলের টান পেটের ও বুকের দু'পাশে। অপ্রাপ্ত বয়স্কের (যার ছবি এখানে), উপরাংশে পাটকিলের উপর মলিন লালচের টান, লেজের পটি লালচে এবং কালো। নিচের দিকে ফিকে লালচে-হলুদের উপর কালচে-পাটকিলের ছিট্ ও ফোঁটা। বাচ্চা শিকরেও ঠিক এমনি দেখতে।

পাপিয়া লম্বায় 34 সেমি (সাড়ে 13 ইঞ্চি), চঞ্চু হলদেটে-সবুজ, ডগা কাল, মুখের ভিতর সোনালী ও হলদে। পা, আঙুল ও নখর উজ্জ্বল হলুদ।

বাসস্থান-- ভারতের প্রায় সর্বত্রই পাপিয়াকে দেখা যায়। মোটামুটি স্থানীয়ভাবে ঘোরাফেরা করে, বিশেষত বর্ষকালে। শীতকালে এরা ডাকে না বলে এদের অস্তিত্বের খবর পাই না। পার্বত্য অঞ্চলে এবং সমতলে উঁচু গাছের জঙ্গলে ও বড় আম-জাম ইত্যাদি উঁচু গাছের বাগানে যার কাছে খেতখামার আর মানুষের বাসস্থান আছে, সেইখানেই ওদের আস্তানা। গাছের উপরেই হয় একা না হয় জোড়ায় বাস করে। মাটিতে নামে না বললেই চলে। ওড়ার ধরনও শিকরের মতন।

খাদ্য-- শুঁয়োপোকা, মাকড়সা, উড়ন্ত উইসহ নানারকম পোকামাকড়, বট-পাকুড় ফল, মাঝে মাঝে টিকটিকি-গিরগিটি।

স্বভাব-- অস্থিসংস্থানের বিশেষত্বের জন্য পরভৃত বংশের পাখিরা বাসা বেঁধে বাচ্চা তুলতে পারে না, শুধু দু'একটি পাখি পারে, কারণ তারা তাদের বংশধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে ক্রমবিকাশ এবং

শুরু করে। সহজে থামে না। কাছাকাছি বা একটু দূরে আরও যদি কোনও পাখি থাকে তবে সেও সমস্বরে ডাকতে থাকে। কেউ এমনি করে চারবার, কেউ পাঁচ বা ছ'বার আবার কেউবা সাতবারও ডাকে। যারা সবে ডাকতে শুরু করেছে তারা বারতিনেকই ডাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বরগ্রাম উচ্চপর্যায়ে যাবার ক্ষমতা লাভ করে।

অনেকেই এর নাম জানি— <u>পাপিয়া, চোখগেল</u>, ইংরেজি- *হক-কুকু, ব্রেনফিভার বার্ড (কুকুলাস ভেরিয়াস)* বলে, কিন্তু কম লোকেরই পরভৃত বংশের (কুকুলিদি) এই পাখির সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় ঘটেছে! অবশ্য কবির কাব্যে ও গানে, যেমন দ্বিজেন্দ্রলালের 'পাপিয়ার ঐ আকুল তানে, আকাশভুবন গেল ভেসে' বা নজরুলের 'কাঁদে পিউ-কাঁহা পাপিয়ার' সঙ্গে আমরা খুবই পরিচিত।



চি ৩। পাপিয়া

শিকরে বাজের চঞ্চুর গঠন ও চোখের ক্রূরদৃষ্টি ছাড়া পাপিয়ার বাকি দেহের রং একদম শিকরে বাজের (স্প্যারো হক, অ্যাকশিপিটার বেডিয়াস) মত। পূর্ণবয়স্কের চেহারা, উপরটা ছাই-ধূসর, লেজের পালকে লালচে আভা এবং চওড়া দিকে চারপাঁচটি মলিন সাদা ও কালো পটি। নিম্নাংশ ঃ বুক লালচে-ধূসর এবং সরু পাটকিলের টান পেটের ও বুকের দু'পাশে। অপ্রাপ্ত বয়স্কের (যার ছবি এখানে), উপরাংশে পাটকিলের উপর মলিন লালচের টান, লেজের পটি লালচে এবং কালো। নিচের দিকে ফিকে লালচে-হলুদের উপর কালচে-পাটকিলের ছিট্ ও ফোঁটা। বাচ্চা শিকরেও ঠিক এমনি দেখতে।

পাপিয়া লম্বায় 34 সেমি (সাড়ে 13 ইঞ্চি), চঞ্চু হলদেটে-সবুজ, ডগা কাল, মুখের ভিতর সোনালী ও হলদে। পা, আঙুল ও নখর উজ্জ্বল হলুদ।

বাসস্থান— ভারতের প্রায় সর্বত্রই পাপিয়াকে দেখা যায়। মোটামুটি স্থানীয়ভাবে ঘোরাফেরা করে, বিশেষত বর্ষকালে। শীতকালে এরা ডাকে না বলে এদের অস্তিত্বের খবর পাই না। পার্বত্য অঞ্চলে এবং সমতলে উঁচু গাছের জঙ্গলে ও বড় আম-জাম ইত্যাদি উঁচু গাছের বাগানে যার কাছে খেতখামার আর মানুষের বাসস্থান আছে, সেইখানেই ওদের আস্তানা। গাছের উপরেই হয় একা না হয় জোড়ায় বাস করে। মাটিতে নামে না বললেই চলে। ওড়ার ধরনও শিকরের মতন।

খাদ্য— শুঁয়োপোকা, মাকড়সা, উড়ন্ত উইসহ নানারকম পোকামাকড়, বট-পাকুড় ফল, মাঝে মাঝে টিকটিকি-গিরগিটি।

স্বভাব— অস্থিসংস্থানের বিশেষত্বের জন্য পরভৃত বংশের পাখিরা বাসা বেঁধে বাচ্চা তুলতে পারে না, শুধু দু'একটি পাখি পারে, কারণ তারা তাদের বংশধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে ক্রমবিকাশ এবং

অভিযোজনের ফলে। সাধারণত মার্চ থেকে জুনের মধ্যে অপরের বাসাতেই ডিম পাড়ে। যে সব পাখির বাসাতে এরা ডিম পাড়ে, তার মধ্যে ছাতারে (জাংগল ব্যাবলার, টারডয়েডেস স্ট্রিয়াটাস) প্রধান।

১৯৮১-র এপ্রিলে রাজপুরের পক্ষিনিকেতনে ছাতারের বাসায় পাপিয়া ডিম পেড়েছে। সেই ডিম ফুটেছে। ডাকছে ছাতারের মতই কিন্তু একটু জোরে। প্রকৃতি সংসদের দু'জন সেই ডাকের টেপ করেছেন কিন্তু ছবি তুলতে পারেন নি। আমি একবার খুব ভাল করে লক্ষ্য করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। ছাতারের ডাক ছাড়াও জোরে টিয়া পাখির তীক্ষ্ণ ট্যাঁ ডাকতেও শুনেছি। ডিম থেকে বেরোবার পরে চোখ ফোটবার আগেই এই পাপিয়ারা কাঁধ ও গলার সাহায্যে একে একে ছাতারে বাচ্চাদের দেহের তলায় ঢুকে তাদের উল্টে ফেলে দিয়েছিল বাসার বাইরে।

পালক পিতামাতা সদাই খাইখাই পাপিয়ার বাচ্চাকে তো খাওয়ায়ই, তাছাড়া দলের অন্য ছাতারেরাও খাইয়ে থাকে। যখন বাসার বাইরে একটু-আধটু উড়ে নামতে পারে তখন ছাতারেরা ভয় পেয়ে যায়, শিকরে বলে ভুল করে সচকিত হয়ে ওঠে সবাই, কিন্তু আবার দলের মধ্যে মিশে গেলে সবাই-ই শান্ত হয়ে যায়।

হিমালয়ের পাদদেশে পাপিয়া ডিম পাড়ে হসন্তীপাখিদের (লাফিং থ্রাস, গাররুলাক্স) বাসায়। একসময়ে কলকাতায় বনেদী বাড়িতে এবং উগ্র পক্ষিপ্রেমিকদের মধ্যে পাপিয়া পোষার রেওয়াজ ছিল। পরস্পরের মধ্যে রেষারেষিও ছিল, কার পাখি কেমন ডাকতে পারে এই নিয়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই সখ চলে গেছে, কারণ পাখির খাদ্য যোগান দেওয়া এখন খুবই শক্ত।

বৌ-কথা কও

বনগাঁ লাইনে বামুনগাছি স্টেশনে নেমে ছোট জাগুলিয়ায় গিয়েছি। বেলা সাড়ে বারোটা কি একটা হবে, সান বাধানো পুকুর ঘাটে স্নানের উদ্যোগ করছি, এমন সময় অনুভব করলাম মাথার উপর দিয়ে ঝড়ের গতিতে একটা পাখি উড়ে যাবে। দূর থেকে তার ডাক শুনছি। আসছে সবেগে। একটা ছাই-ধূসর পাখি 'কুকু-কুকু' করে ডাক দিতে দিতে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল।

ডাক না শুনলে মনে করতাম একটা শিকরে বাজই বুঝি উড়ে গেল। এই ডাক থেকে নাম হয়েছে বৌ-কথা কও ; কোথাও বলে কইফল-পাকা, ইংরেজ বা অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের কাছে— *অরেঞ্জ-পিকো, ক্রসওয়ার্ড পাজল* : ইংরেজি— *ইন্ডিয়ান কুকু* (কুকুলাস মাইক্রপটেরাস)। বাংলাদেশে কোথাও কোথাও বলে 'চইতার বৌগো'। অনেকে আবার কালো মাথা, হলদে দেহ বেনেবৌকে (ব্ল্যাকহেডেড ওরিওল) ভুল করে বৌ-কথা কও বলেন।



চি 32 বৌ-কথা কও

পরভৃত বংশের বৌ-কথা কও লম্বায় 33 সেমি (13 ইঞ্চি)। উপরাংশ : গাঢ় স্লেট পাথরের মতো ধূসর, তার উপর পাটকিলের আভা। নিম্নাংশ : মলিন-ধূসর এবং সাদা, ফাঁক ফাঁক করা কিছু কালো পটি, লেজেও তাই। স্ত্রী-পাখির মলিন-ধূসর ডানা এবং বুকে পাটকিলের উপর লালচের আভা। অপ্রাপ্তবয়স্কের মাথা ও ঘাড় লালচে-সাদাটে, পিঠ, ডানা ও লেজে লালচে এবং সাদার ছোপ সর্বত্র। নিচের দিকে মলিন লালচে-হলুদের উপর চওড়া কালো পটি। সকলের কনীনিকা পাটকিলে, উজ্জ্বল লেবু-হলদে গোল চোখের পাতা। উপরের চঞ্চু শিঙে-পাটকিলে, নিচেরটা সবজেটে-পাটকিলে। চিবুক হলদেটে, মুখগহ্বর হলদেটে-গোলাপী। পা ও আঙুল হলদে, নখর শিঙে-পাটকিলে।

বাসস্থান— ভারতে কিছু পাকাপাকিভাবে বাস করে, কিছু ভবঘুরে বৃত্তি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, আবার কিছু হিমালয়ের নিম্নাংশ ধরে কাশ্মীর থেকে অরুণাচল, দক্ষিণে সমগ্র উপদ্বীপাত্মক ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে পৌঁছয়। কেবল পাকিস্তান, রাজস্থান, কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র এবং উত্তর গুজরাটের খরাপূর্ণ স্থানগুলিতে দেখা যায় না। বাংলাদেশের চট্টগ্রামে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। ভারতের বাইরে বার্মা, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ চীন, কোরিয়া এবং সোভিয়েট রাশিয়ার নিম্ন আমুর উপত্যকায় পাকাপাকিভাবে বাস করে। দু'একটি প্রজাতি পরিযায়ী হয়ে ভারতে আসে। পায়ে আঙটি পরিয়ে দেখা হয় নি বলে এদের গতিবিধি সম্বন্ধে সঠিক জানা যায় না।

সাধারণত বড় গাছের একদম মাথার দিকে একাকী থাকে। শিক্রের মতো ওড়াওড়ি করে। ডাক শুরু করে মার্চ থেকে আগস্টের গোড়ার দিক পর্যন্ত। ডাকার সময় ভোর থেকে সকাল ন'টা, আবার সন্ধ্যে থেকে রাত্রি। পূর্ণিমার দিন হলে সারারাত। প্রাকমিলনের আগে স্ত্রী-পাখির খোঁজে দিনের বেলায় অর্থাৎ দুপুরেও ডাকে, উড়তে উড়তে যেমন আমি দেখেছিলাম। এক জনের সঙ্গে স্থায়ীভাবে ঘর করে না। বাছবিচারহীনভাবে স্ত্রী-পুরুষে মিলিত হয়।

খাদ্য— শুয়োপোকা ও অন্যান্য পোকা। পোকার খোঁজে মাঝে মাঝে মাটিতে নামে। লাফাতে লাফাতে ঝরাপাতা উল্টে পোকা খোঁজে। মাটির উপর ভাল চলতে পারে না।

এরা যখন ডাকতে শুরু করে তখন আর সহজে থামে না। মিনিটে কুড়ি-বাইশ বার অক্লেশে ডেকে চলে। একসময় মিষ্টি ডাকের জন্য পাপিয়ার মতো বৌ-কথা কও পোষার রেওয়াজ ছিল। ...র পাখি কবার ডাকে তারই প্রতিযোগিতা চলত দুই পক্ষিপ্রেমিকের মধ্যে।

স্বভাব— পরভৃত বংশের পাখি বলে ভারতে সাধারণত ফিঙে (কিংক্রো) বা নীলফিঙের (গ্রে ড্রঙ্গো) বাসায় ডিম পাড়ে। শা-বুলবুলকে (প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার) দেখা গেছে বৌ-কথা কও-এর বাচ্চাকে খাওয়াতে। তুলিকাদের (পিপিটস) বাসাতেও নাকি ডিম পাড়ে। মনে হয় সে-পাখি আমাদের পাখি নয় পরিযায়ী কুক্কু (কুকুলাস ক্যানোরাস), যারা ডাকে কুক্-কু, কুক্-কুক্-কু বলে। ...র প্রজননকালীন আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। যেসব খবর পাওয়া যায় সব সত্য নয়।

ছবিতে যে বাচ্চা বৌ-কথা কও-কে দেখা যাচ্ছে তাকে ফিঙে মানুষ করেছে। বাচ্চা আকারে বড় বলে অনেক সময় পালক ফিঙে মাথার উপর বসে মুখে খাদ্য দিয়েছে। রাশিয়ার পাখি ডিম পাড়ে কাজলপাখির (ব্রাউন শ্রাইক) বাসায়। ডিম ফুটতে সময় নেয় 12 দিন।

কুকো

একটি পাখিকে গ্রামবাংলার বাগানের ঝোপেঝাড়ে, পুকুর বা ডোবার আনাচে কানাচে আমরা প্রায়ই দেখতে পাই। এমনকি শহর কলকাতার আশপাশেও। একটু বাগান, একটু ঝোপঝাড়, সেইখানে এই পাখি থাকবেই। অনেকেই এই পাখিকে দেখেছেন। কিন্তু চেনেন না। আবার অনেকে ডাক শুনেছেন কিন্তু চোখে দেখেন নি।

পাখিটাকে প্রথম দেখেছিলাম কোন্ ছোটবেলায় তা আজ আর মনে নেই। হয় মজিলপুরে না হয় সোনারপুর বা হরিনাভিতে। পাখিটা ছিল দাঁড়কাকের মত বড়। কুচকুচে কালো দেহে বাদামী ডানা সরু থেকে চওড়া, কালো লেজটাকে নিয়ে রাশভারীভাবে চলছে পুকুরের ধারে, কলমের বুড়ো বুড়ো আমগাছগুলোর তলা দিয়ে। গাছতলাটা ছোট ছোট আগাছায় ভরা। পোকামাকড় খুঁজছে। হঠাৎ ডেকে উঠল বেশ ভারী গম্ভীর গলায় 'কুব্-কুব্-কুব কুব্-কুক'। আরেকটা পাখি কোথা থেকে যেন ডেকে জবাব দিল 'কুব-কুব-কুব খাট-খাট-খাট' করে। এই 'খাট-খাট' শব্দটা দূর থেকে ভেসে আসা ধানকলের ডিজেল ইঞ্জিন-এর মত। তারপরেই আমার দেখা পাখিটা কোনরকমে ঝটপট করতে করতে উড়ে একটা বুড়ো কলমের আমগাছ ছাড়িয়ে বাঁশঝাড়ের আড়ালে চলে গেল। এই ছবিটা আজও মনের মধ্যে গাঁথা আছে। এরপর কতবার যে মোলাকাত হয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। হাতে নিয়েও দেখেছি।



চি 33. কুকো

পাখিটা পরভৃত বর্গের (কুকুলিফরমেস) অন্তর্গত পরভৃত বংশের (কুকুলিদি) মধ্যে যারা অন্যের বাসায় ডিম পাড়ে না, নিজেরা বাসা বানায়, এমনি এক গণের (সেন্ট্রপাস) এক প্রজাতি। নাম— কুকো, কুবো, কানাকুয়া (সেন্ট্রপাস সাইনেনসিস), ইংরেজি— *ক্রো ফেঝান্ট, কুকাল হেজ ক্রো*, হিন্দি— *মাহোকা*।

কুকো লম্বায় 48 সেমি। চঞ্চু মোটা, উপরের চঞ্চু নিচের দিকে বাঁকা। মাথা, গলা, ঘাড় এবং বুকের পালক কালো হলেও অমসৃণ কর্কশ বাদামী, ডানা গোল, প্রতিটি পালকের ডগা কালচে-ধূসর, বাকি দেহের কালো পালকে সবুজ ইস্পাত-নীল এবং বেগুনির আভা। কনীনিকা টকটকে লাল, চঞ্চু ও পা কালো, পিছনের আঙ্গুলের নখর বেশ লম্বা ও প্রায় সোজা। এটা পরভৃত বংশের অন্য কোন পাখির মধ্যে দেখা যায় না। বাকি তিনটি নখর ছোট ও বাঁকা। জঙ্ঘা লম্বাটে, পালকহীন। নাকের গর্তের খানিকটা অংশ ঝিল্লী দিয়ে ঢাকা। চোখের উপর ভুরুতে খোঁচা খোঁচা খাড়া লোম,

বা নাকের পাশেও আছে। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে, তবে স্ত্রী-পাখি আকারে একটু বড়।

বাসস্থান— সমগ্র ভারতে 2100 মি. উচ্চতার মধ্যে, পাকিস্তানের সিন্ধু ও পাঞ্জাব, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার 5টি উপজাতিতে। তারমধ্যে একটি 'ছোট কুকো'কে (সে ট্রল্যো বেঙ্গলেনসিস) পশ্চিমবঙ্গ, 1500 মি. উচ্চতার মধ্যে দেরাদুন থেকে বাংলাদেশে এবং দক্ষিণে মহীশূর, কেরালা ও তামিলনাড়ুতে দেখা যায়। লম্বায়— 37 সেমি। ভারতের বাইরে দক্ষিণ চীনের কোয়াংসি, চেকিয়াং ও ফুকিয়েন প্রদেশ। দেখা যায় নির্দিষ্ট সময়ে পাতা ঝরে পড়ে এমন জঙ্গল (ডেসিডুয়াস), উঁচু ঘেসোজমি, খেতের আশপাশের ঝোপ, মানুষের বসতির ভিতর যে কোন বাগান, নদীর ধারে, জোয়ারভাটার জলে ডোবা বাউবন ও বাঁশঝাড়ে।

খাদ্য— ইঁদুরছানা, মাঝে মাঝে চামচিকে, টিকটিকি-গিরগিটি, অঞ্জিনা, ছোট নির্বিষ সাপ, আটকে পড়া ছোট মাছ, ব্যাঙ, কবচী, কম্বোজ, ঝোপ আশ্রয়কারী পাখির ডিম ও ছানা, সুবিধে পেলে দুর্বল ছোট পাখি, ঘাসফড়িং, পঙ্গপাল, পিঁপড়ে, উইঘাস, পাতা ইত্যাদি। এককথায় সর্বভুক।

স্বভাব— কুকো একটু চুপচাপ প্রকৃতির, নড়াচড়া কম করে এবং গাছের উপরেই সাধারণত থাকে। হয় একা না হয় জোড়ায়, ঝোপের তলায় ধীরে-সুস্থে পা ফেলে চলে আর খাদ্য খোঁজে। সেইসময় লম্বা লেজটাকে তুলে মাটির সঙ্গে সমান্তরালে রাখে। মাঝেমাঝে লেজটাকে ছড়ায় আর বন্ধ করে। থেকে থেকে লেজটাকে খাঁড়া করে পিঠের উপর ঝুঁকিয়ে দেয়। তখন মনে হয় কোন জীবজ্ঞীব (ফেব্যান্ট)। এইভাবে ঝোপের মধ্যে খাবার খুঁজে বেড়ায়। হঠাৎ ডানা খুলে সামনে মাথার দিকে প্রায় এগিয়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠে শিকারবস্তুকে ধরে। প্রায়ই দেখা যায় এক-দু ফুট শূন্যে লাফিয়ে ঘাসফড়িং বা গিরগিটিকে ঝুঁকে পড়া সরু ডালে বসে থাকা অবস্থায় ধরে ফেলতে। হাঁটা, দৌড়ানোটা বেশ জোরভাবে পা ফেলে করে, কিন্তু ওড়াটা অস্বচ্ছন্দের। সাধারণত আড়াল ছেড়ে বাইরে আসতে চায় না। কোন কারণে আসতে বাধ্য হলে কোনরকমে ল্যাগব্যাগ করে উড়ে কাছের কোন ঝোপঝাড়ে গিয়ে আত্মগোপন করে। ডাল বেয়ে ওঠে 'হাতের উপর হাত' দেওয়ার ভঙ্গিমায়। উপরে উঠে নিচের ঝোপড়া গাছের মাথায় এসে পড়ে। এডাল থেকে সেডালে চলে লাফিয়ে লাফিয়ে, সেইসঙ্গে চলে খাদ্য খোঁজা। উপর থেকে উড়ে নিচের ঝোপে গিয়ে পড়ে নিঃশব্দে ডানা ছড়িয়ে।'

প্রাক মিলনের সময় পুরুষ স্ত্রীকে জমির উপরে, কখন ঝোপের ভিতরে, কখনও বাইরে তাড়া করে বেড়ায়। স্ত্রীটি লেজ ও গলা নামিয়ে কাঁপাতে থাকে আর মুখে একটা কর্কশ স্বরে 'চিইই-ই স্কি-ই-ইয়া-অ' ডাক দিতে দিতে ছুটে পালায়। এই তাড়া দেওয়া ও পালান শেষ হয় কোন গাছের ডালের উপর উঠে।

প্রজননকাল— সাধারণত জুন থেকে সেপ্টেম্বর। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই বাসা বাঁধে রাগবি ফুটবলের মতো গোলাকার, 45 × 35 সেমি, সরু গাছের ডাল, পাতা কিংবা শরঘাস ও বাঁশপাতা দিয়ে, হয় ঘন ঝোপ বা কাঁটাওয়ালা ঝোপের না হয় বাঁশবনের ভিতর মাঝামাঝি উচ্চতায়। বাসা বেশ লুকনো, সহজে নজরে পড়ে না। ডিম পাড়ে চুন-সাদা অর্ধবৃত্তাকার 3-4টি, মাঝেমাঝে 5টি, আবার 6টি, পাড়তেও দেখা গেছে। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই ডিমে তা' দেয়। তা' দিতে দিতে ডিমের রঙ হলদেটে হয়ে যায়। কিন্তু কতদিনে ডিম ফোটে তা এখনও জানা যায় নি।

ভারতের অনেক জায়গায় এর মাংস খেলে যক্ষ্মা, হাঁপানি ও অন্যান্য বুকের রোগ সেরে যায় বলে লোকেদের বিশ্বাস। মাংসও সুস্বাদু।

চাতক

মনের মধ্যে একটা ভুল ধারণা একবার যদি গেঁথে যায়, তা আর কিছুতেই যেতে চায় না। সেই ভুল ধারণার মূল উৎস কিংবদন্তি, প্রচলিত লোকবিশ্বাস এবং বহু কবির কাব্যে তার ব্যবহার। এই রকম একটা পাখির সম্বন্ধে ভুল ধারণাটাকে ত্যাগ করতে বহু বছর লেগেছিল। সঠিক নামটা হিন্দিতে পেয়েছি কিন্তু বাংলায় কোথাও পাই নি, এমনকি বহু পুরাতন আদি পক্ষিতত্ত্বের বইতেও নয়। ডঃ সত্যচরণ লাহার 'কালিদাসের পাখি' (1934) বইতে পূর্ণ আলোচনা থাকা সত্ত্বেও 1950 সালে যখন যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'পশুপক্ষী' বইটিকে পরিশোধিত ও পরিবর্ধিত করেছি, তখনও সেখানে পুরান ভুলটিকেই রেখে দিয়েছি। সংস্কার ছাড়তে পারি নি। অন্যান্য ছোটখাট ভুলের সঙ্গে সেই বড় ভুলটি রয়ে গেছে, বর্তমানে প্রকাশিত পুনর্মুদ্রণেও। এখন নতুন যাঁরা পড়বেন তাঁদের মনের মধ্যে ভুলটাই গেঁথে যাবে।



চি 34. চাতক

পাখিটাকে প্রথম দেখি হাতিবাগানের হাটে একটা বাঁশের খাঁচায় গোটা তিন-চার একসঙ্গে। ইংরেজি ও লাতিন নামটা জানি। বাংলা নাম ওরা যা বলল তা জার্ডন (1862) ও স্টুয়ার্ট বেকার-এর (1922) বইতে দেখেছি। প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে দেখেছি শিলং-এ। ঝোপের মধ্যে ধাতব মিষ্টস্বরে ডাকছে 'পিউ পিউ ....পি-পি-পিউ'। হঠাৎ একটাকে দেখি সাদা শার্ট, কালো কোট গায়ে, মাথায় কালো ঝুঁটি নিয়ে উড়ে চলেছে, তার পিছনে ডাকতে ডাকতে তাড়া করেছে আরও গোটা তিনেক। এই তাড়ার অর্থ দু'রকমের হতে পারে, এক এলাকার লড়াই, দুই প্রজননের উদ্দেশ্যে। শেষ দেখেছি 21 নভেম্বর 1982-তে। 'বার্ড ওয়াচার সোসাইটি'র দুই সভ্যের আহ্বানে বাসুদেবপুর গ্রাম ছাড়িয়ে বর্তির বিলে। বিকেল প্রায় পাঁচটা নাগাদ একটা নিচু ছোট গাছের নেড়া সরু ডালে বসেছিল একজোড়া অপরিণত বয়সী। 4-5 মিটার পর্যন্ত কাছে গিয়ে দেখেছি, ওড়েনি। পরে উড়ল ডানায় পায়রার মত শব্দ করে। অপরিণতরা সাধারণত পায়রার মত শব্দ করে। অপরিণতরা সাধারণত কর্কশ গলায় 'চু-চু-চু' ডাকে, এরা কিন্তু ডাকল না।

এরা পরভৃত বংশের (কুকুলিদি) অন্তর্গত শাওন গণের (ক্লামাটর) এক প্রজাতি, নাম চাতক, কোলা বুলবুল, গোলা কোকিল (ক্লামাটির জাকোবিনাস)। ইংরেজি— পায়েড কোস্টেড কুক্কু।
চাতক লম্বায় 33 সেমি। বয়স্কদের ঝুঁটি লেজসমেত উপরাংশ কালো, নিচটা সাদা। কালো ডানায় গোলাকার সাদা সবু সবু ছোপ এবং লেজ ধাপে ধাপে চওড়া হয়ে নেমেছে, সেটা ওড়ার সময় স্পষ্ট বোঝা যায়। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। অপরিণতদের ঝুঁটি অত বাড়ন্ত নয়, ডানার সবু ছোপগুলো খুবই ছোট। উপরে কালোর বদলে ফেকাসে ভুসো, তলার সাদা অংশ তামাটে-ধূসর।

বাসস্থান— অনুমান করা হয় আফ্রিকাতে। কিন্তু সঠিক প্রমাণ নেই পরিযায়ী হয় কিনা। আঙটি পরিয়েও দেখা হয় নি। সুতরাং এদের যাওয়া-আসার পথ আলাদা ও হেঁয়ালিপূর্ণ। মাঝে মাঝে দু'চারটি করে দেখা ও নমুনা পাওয়া গেছে, মার্চ-এপ্রিল এবং মে-তে দক্ষিণ আরবে। মনে করা হয় এরা ভারতেই আসছিল। দল বেঁধে পরিযায়ী হওয়ার খবর কোথাও পাওয়া যায় না। ক্বচিৎ পাওয়া যায় পরিযায়ী অবস্থায়, আগস্ট-সেপ্টেম্বরে উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানে কোহাট এবং কুররাম উপত্যকায়। প্রথম এভারেস্ট অভিযানে 1922 সালে তিব্বতে তিংরিতে (28°36' উঃ 86°43' পূ.) 4270 মি. উচ্চতায় একটিকে পাওয়া যায়। আরেকটিকে পাওয়া যায় 28 জুন 1922 সালেই, হিমাচল প্রদেশে কুলুতে রোটাং পাসের ভিতর 3800 মি. উচ্চতায়।

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমির শুরুতে অর্থাৎ জুনের গোড়া থেকেই এদের আগমনবার্তা ঘোষিত হয়। 2600 মি. উচ্চতার মধ্যে প্রায় সমগ্র ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে। আন্দামান ও নিকোবরে এখনও পর্যন্ত নথিভুক্ত হয় নি। শ্রীলঙ্কায় যে উপজাতি (ক্লা জা জাকোবিনাস), তার দেহের চেয়ে লেজটা বড়, যদিও লম্বায় সেই 33 সেমি। দেখা যায় উন্মুক্ত জঙ্গলপূর্ণ স্থান, বাগান, কুঞ্জবন বা তরুবীথিকায়, তা শহর বা গ্রামের কাছে হলেও এবং চষাক্ষেতের আশপাশে, সময়ে সময়ে মরুসদৃশ জঙ্গলের বেঁটে ঝোপঝাড়ে।

খাদ্য— প্রধানত নানা জাতের শুঁয়ো পোকা, তার মধ্যে লোমশই বেশি প্রিয়, সাদাটে ছারপোকা জাতীয় কীট, ঘাসফড়িং, গুবরে, পিঁপড়ে, উই, বর্ষায় ঝোপঝাড় বা জঙ্গলের তলার মাটিতে যে বনের কম্বোজ দেখা যায় তা এবং মাঝে মাঝে সবুজ পাতা। উড়ন্ত উই ধরে ঝোপের উপর থেকে সোজা লাফিয়ে উঠে শূন্যে।

স্বভাব— চাতক উঁচু গাছের উপর বা নিচু ঝোপ থেকে যেমন খাদ্য সংগ্রহ করে, তেমনি মাটিতে নেমে জোড়পায়ে লাফিয়ে লাফিয়েও করে। সুতরাং, এর থেকে সহজেই অনুমেয় যে, চাতককে তার জলের জন্যে বৃষ্টির অপেক্ষা করতে হয় না। কালিদাস থেকে শুরু করে অন্যান্য কবিরা যাই বলুন না কেন 'অম্ভোবিন্দুগ্রহণচতুর' তা অবাস্তব, বিজ্ঞান সম্মত নয়, কোন জীবের পক্ষে সম্ভবও নয়। অভিধানে দেখি চাতক শব্দের অর্থ 'চাততি যাচতে সততম্ভোমেঘম্'। এতে তার বর্ষায় জল প্রার্থনার জন্যে কাতর কণ্ঠস্বরের ইঙ্গিত করেছে অর্থাৎ বর্ষার দূত বলে বর্ণিত হয়েছে। পাখির জীবন সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান না থাকার জন্যেই এইসব ভুল উক্তি।

প্রজননকাল— জুন থেকে আগস্ট। পরভৃত বংশের পাখি বলেই ডিম পেড়ে যায়। সমতলে ছাতারে উপবংশে (টিমালিইনি) শারীশীল গণের (টার্ডয়িডেস) মেঠো ছাতারে (কমন ব্যাবলার), ছাতারে

(জাঙ্গল ব্যাবলার), বড় ছাতারে (লার্জ গ্রে ব্যাবলার), এবং হিমালয়ের নিম্নভূমিতে হসন্তী পাখিদের (লাফিং থ্রাস) ও কাশ্মীরে মেটে-লাটোরার (রুফাস ব্যাকড শ্রাইক) বাসায়। ডিম পাড়ে সাধারণত একটি, কচিৎ দুটি আকাশী-নীল, ভোঁতা আকারের। কতদিনে ডিম ফোটে তা এখনও নির্ণয় করা যায় নি।

অন্যান্য পরভৃত

পরভৃত বংশের আরও কয়েকটি গণের পাখিকে পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়। তারা হল—

1. **লাল কোকিল—** (কাকোম্যানটিস সননেরাটিই)। বাংলা নামকরণ কখনও হয় নি। তেলেগু— *বাশা ,কাট্টি পিট্টা*, মালয়ালী— *চেনক্যুয়িল*, গুজরাটি— *পাট্টভালি লাল কয়াল*, ইংরেজি— *বেক্যাণ্ডেড কুক্কু। বর্ষপ্রিয় গণের (কাকোম্যানটিস) এক প্রজাতি।*

শালিকের চেয়ে আকারে একটু বড়ো কিন্তু ছিপছিপে, লম্বায়— 24 সেমি. (সাড়ে 7 ইঞ্চি)। উপরাংশ : উজ্জ্বল লালচে-হলুদ, তার উপর পাটকিলের টান। নিম্নাংশ : মাথা ও ঘাড়ের দু'পাশ সাদাটে, তার উপর ঢেউ খেলানো পাটকিলের কাটাকুটি টান। লেজ লালচে-হলুদ, প্রতিটি পালকের ডগায় সাদা ও কালো সরু টান। কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু শিঙে-কালো, তলার চঞ্চুর গোড়াটা জলপাই-ধূসর, পা ও আঙুল ধূসরাভ-সবুজ, নখর শিঙে-পাটকিলে। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান— নিম্ন হিমালয়ের 2400 মি. উচ্চতার ভিতর পাদদেশ কুমায়ুন থেকে নেপাল, সিকিম, ভূটান,আসাম, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ মহারাস্ট্র, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, মহীশূর, কেরালা এবং বাংলাদেশের গভীর ও চাষবাসের কাছে হালকা জঙ্গলে। কলকাতার আশপাশে বেলঘরিয়া, আগরপাড়া ইত্যাদি অঞ্চলে এবং নরেন্দ্রপুরের পক্ষিনিকেতনে বেশ কিছু দেখা যায়।

ডিম পাড়ে ফটিকজল, বুলবুল ও ছোটজাতের গুপিলদের (ব্যাবলার্স) বাসায়।

2. **পীক—** (ক্যাকোম্যানটিস মেরুলিনাস), অপর নাম 'ছোটো ভরাউ,' ইংরেজি— *রূফাসবেলীড প্লেনটিভ কুক্কু।* বর্ষপ্রিয় গণের (ক্যাকোম্যানটিস) অপর *একটি প্রজাতি।*

রোগা ছিপছিপে চেহারা,লম্বায় 23 সেমি. (9 ইঞ্চি)। উপরাংশ : ছাই-ধূসর ও পাটকিলে, লেজে কালচে টান এবং প্রতিটি পালকের শেষে সাদা ছোপ। নিম্নাংশ : চিবুক, গলা ও বুক ধূসর, বাকি তলাটা লালচে-হলুদ থেকে মরচেপড়া লাল। কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু শিঙে-পাটকিলে, পা ও আঙুল পাটকিলে-হলদে, নখর শিঙে-পাটকিলে।

বাসস্থান— আসাম, মণিপুর, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ; নিম্ন হিমালয়ে ডুয়ার্স ও তরাইয়ের 2000 মি. উচ্চতার মধ্যে অরুণাচল প্রদেশ এবং পশ্চিমে ভূটান, সিকিম, নেপাল। দেখা যায় বেশ ঘন গাছের বাগান, চা-বাগিচা এবং ঝোপঝাড়ে।

ডিম পাড়ে হলদেপিঠ সূর্যপাখি বা মৌটুসী (ঈথোপাইগা) ও মাকড়খেকোদের (আরাকনোথেরা) বাসায়।

Violet Cuckoo

3. বেগুনি পীক— (চালসিটেস জানথরিনচাস)। বাংলায় কখনও নামকরণ হয় নি। কাছাড়ি— দাওপিট-পিপ, ইংরেজি— *ভায়োলেট কুকু।* হরীতক গণের (চালসিটেস) *এক প্রজাতি।*

চড়াইয়ের চেয়ে সামান্য বড়ো, লম্বায়— 17 সেমি. (সাড়ে 6 ইঞ্চি)। পুরুষের উপরাংশ : মাথা ঘাড় ও অন্যান্য অংশ উজ্জ্বল ধাতব বেগুনি, লেজ কালচে কিন্তু প্রতিটি পালকের ডগায় সাদা ছোঁয়াচ। নিম্নাংশ : চিবুক, গলা, ঘাড়ের দু'পাশ ও বুকের উপরাংশ উজ্জ্বল বেগুনি, বাকি তলাটা চওড়া সাদা ও বেগুনি কিংবা সবুজ পটি। স্ত্রী-পাখির উপরাংশ : সবজেটে ব্রোঞ্জ-এর উপর তামাটে আভা, কখনও কপালে অল্প সাদার ছোঁয়াচ, ডানার ওড়ার পালকের ডগা সবজেটে, লেজে সবুজ ও বাদামীর পটি, প্রতিটি পালকের শেষে সাদার ছোঁয়াচ। নিম্নাংশ : মাথা ও ঘাড়ের দু'পাশ সাদা ও ব্রোঞ্জ-সবুজের কয়েকটা পরপর পটি। কনীনিকা লাল, চোখের পাতা সবুজ, তাকে ঘিরে লাল আভাটি। পুরুষের চঞ্চু কমলা-হলুদ, স্ত্রীর মলিন সবুজ, উভয়ের পা ও আঙুল পাটকিলে-সবুজ, নখর হলদেটে।

বাসস্থান— আসাম, অরুণাচল, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ ও তার সন্নিকটস্থ পশ্চিমবঙ্গ 500 মি. উচ্চতার মধ্যে। মাঝেমাঝে দেখা যায় মার্চ থেকে আগস্টের মধ্যে আন্দামানে এবং একবার মাদ্রাজের পেরাম্বুর-এ দেখা গিয়েছিল 1937 সালে। দেখা যায় কিছুটা চিরহরিৎ জঙ্গল, বহু গাছের এক জায়গায় সমাবেশ, ফলবাগান ইত্যাদিতে।

ডিম পাড়ে হলদেপিঠ মৌটুসী (ইয়েলো ব্যাকড্ সানবার্ড) ও মাকড়খেকোদের (স্পাইডারহান্টার) বাসায়।

Drongo cuckoo.

4. **ফিঙে-কোকিল**— (সুরনিক্যুলাস লুগুব্রিস)। বাংলায় নামকরণ হয় নি। লেপচা— করিও হিয়েম, মালয়ালী— *কাক্কাটামপুরাট্টি কুয়িল*, ইংরেজি— *ড্রোঙ্গো-কুকু।* প্রিয়ক গণের (সুরনিক্যুলাস), এক *প্রজাতি।*

ফিঙের মতই লম্বায়— 25 সেমি, (10 ইঞ্চি)। উজ্জ্বল ধাতব কালো, লেজ ফিঙের মতই চেরা তবু লেজে সাদা পটি বেশ কয়েকটা। কনীনিকা গাঢ় বাদামী, চঞ্চু পাটকিলে-কালো, পা ও আঙুল নীলচে-স্লেট, নখর শিঙে-পাটকিলে।

বাসস্থান— নিম্ন হিমালয়ে তরাই ভাবর ও ডুয়ার্সে 2000 মি. উচ্চতার মধ্যে পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশ থেকে গাড়োয়াল, কুমায়ুন, নেপাল, সিকিম, ভূটান, অরুণাচল, আসাম, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, বাংলাদেশ। নথিপত্রে পশ্চিমবঙ্গের নাম উল্লেখ না থাকলেও কলকাতার পাশে পাতিপুকুর, মধ্যমগ্রাম আদিতে পরিযায়ী হয়ে আসতে দেখেছি এবং চারু-সতীশদের সাহায্যে প্রায়ই একটি-দুটিকে ধরেওছি। তামিলনাড়ু ও দক্ষিণ কেরালাতেও পরিযায়ী হয়।

ফিঙে (ডিক্রুরাস), লেজচেরা (এনিক্যুরাস), বিষ্ণুলিঙ্গ (পেরিক্রোকোটাস) ও মালয়ালী পটি-গ্লান'দের (ব্ল্যাকহেডেড ব্যাবলার) বাসায় ডিম পাড়ে।

Green billed malkoha.

5. **বনকোকিল**— (রাপোডাইটেস ট্রিসটিস), অসমিয়া— *বামুরা*, লেপচা— *সানকু*, ইংরেজি— *গ্রীনবিলড মালকোহা।* হরিৎচঞ্চু গণের (রোপোডাইটেস) *এক প্রজাতি।* পরভৃত বংশীয় হলেও এরা বাসা বাঁধে।

লম্বা লেজ (38 সেমি) নিয়ে বেশ বড়ো 51 সেমির (23 ইঞ্চি) পাখি। প্রথমেই চোখে পড়ে চোখের চারপাশ পালকহীন আর সেখানে টুকটুকে লাল চামড়া এবং সবুজ চঞ্চু। কপাল ধূসর তার মাঝে খোঁচা খোঁচা কালো পালক। উপরাংশে গাঢ় ছাই-ধূসরের উপর গাঢ় সবুজের আভা। লেজে চকচকে সবুজের উপর কালচে আভা, লম্বা লেজ সরু থেকে ক্রমে চওড়া, মাঝে কয়েকটা সাদা পটি, লেজের শেষপ্রান্তও সাদা। চিবুক, গলা ও মাথার দু'পাশ হলদেটে ছাই-ধূসর, সেটা ক্রমে তলপেট থেকে নিচে নেমে এসেছে। নিচের দিকে কালচে ভাবটা বেশি। চিবুক, গলা ও বুকে কিছু কালো পালকের আঁচড়। কনীনিকা পাটকিলে, পা ও আঙুল সবজেটে-স্লেট, নখর শিঙে।

বাসস্থান— হিমালয়ের তরাই ভাবর এবং ডুয়ার্সে 700 মি. উচ্চতার মধ্যে, কখনওবা 1800 মি. উচ্চতায় গাড়োয়াল থেকে পুবে কুমায়ুন, নেপাল, সিকিম, ভূটান থেকে অরুণাচল, আসামে লখিমপুর, শিবসাগর ও পার্বত্য কাছাড়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গে ডুয়ার্স ও সুন্দরবন এবং বাংলাদেশের ঢাকা ও চট্টগ্রাম; দক্ষিণে মানভূম ও হাজারিবাগ জেলা ও পূর্ব মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলা।

প্রজননকাল— এপ্রিল থেকে আগস্ট। বাসা বাঁধে মাটি থেকে 3-7 মিটারের মধ্যে, নিজের আকারের চেয়ে ছোটো অনেকটা ঘুঘুর বাসার মতো। খড়ি-সাদা ডিম পাড়ে 2-4টি, বেশিরভাগ সময় 3টি। ডিমের গড় মাপ— 33·8 × 25·8 মিমি।

Sirkeer Malkoha

6. **জংলি তোতা**— (টক্কোকুয়া লেসচেনলটিই), তেলেগু— *আদাভি চিলুকা*, মালয়ালী— *কল্লি কুইল*, ইংরেজি— *সিরকীর কুক্কু*। ভূশুক-গণের (টাক্কোকুয়া) এক প্রজাতি। পরভৃত বংশের হলেও এরা নিজেরা বাসা বাঁধে।

আকারে পাতিকাকের কিন্তু লেজ লম্বা, সবশুদ্ধ 42-44 সেমি. (সাড়ে 16-সাড়ে 17 ইঞ্চি)। দেখলেই মনে হয় জংলি তোতা ও কুকোর মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে। মেটে পাটকিলে ও লালচে-হলুদ দেহ, মাথা ও বুকের পালকে কালো আঁচড়। সরু থেকে মোটা কালচে লেজে সাদা ছোপ।

বাসস্থান— হিমালয়ের তরাই ও ডুয়ার্সে 2100 মি. উচ্চতার মধ্যে কুমায়ুন থেকে পুবে নেপাল, পশ্চিমবঙ্গ, ভূটান এবং পশ্চিম অরুণাচল, পশ্চিম আসাম, বাংলাদেশ, বিহার, ওড়িশা, পূর্ব মধ্যপ্রদেশ, উত্তর অন্ধ্র এবং মহারাস্ট্রে শুকনো পর্ণমোচী জঙ্গল ও পাহাড়ের তলদেশের ঝোপঝাড়ে।

প্রজননকাল— এপ্রিল থেকে জুলাই। মাটি থেকে সাধারণত 2-3, কখনও 6মি. উচ্চতার মধ্যে মনসা জাতীয় (ইউফরবিয়া) গাছের ডালের ফাঁকে পিরিচের আকারে কাঠিকুটো দিয়ে বাসা বাঁধে। লাইনিং দেয় সবুজ পাতার। ডিম পাড়ে 2টি, ক্বচিৎ 3টি ছাপছোপহীন খড়ি-সাদা। ডিমের গড় মাপ 36·2 × 27·3 মিমি।

শুক বর্গ

শুক বর্গ (অর্ডার পসিট্টাসিফরমেস)-এর পাখিদের নিয়ে পুরাণ থেকে শুরু করে ভারতের নানা কথা ও গল্পগাথায় নানাভাবে উল্লেখ আছে। এই বর্গে দুটি বংশ— তোতা (প্যারটস) ও শুক (প্যারাকীটস) এবং বংশ দুটি নানা গণ ও প্রজাতিতে বিভক্ত।

এই বর্গের পাখিরা কাকের পরেই বুদ্ধিমত্তায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এদের মাংসল জিভ কথার পুনরাবৃত্তিতে সাহায্য করে এবং বিশেষ সময়ে তারা তা ব্যবহার করে থাকে। স্মরণশক্তি ও নকল করার ক্ষমতা বেশ কিন্তু বিচারশক্তি একদম নেই। শ্বাসনালীর গঠন (সিরিঙ্কস) এমন যে, তার ফলে স্বরকে নানারকমভাবে উঁচুনিচু বিভিন্ন পরদায় নিতে সক্ষম। তোতা বংশীয় পাখিদের মধ্যে এর উৎকর্ষতা বেশি দেখা যায়। শুক বংশীয় পাখিদের মধ্যে এতটা উন্নততর ভাব দেখা যায় না।

তোতাদের স্ত্রী-পুরুষ প্রায় একই দেখতে এবং এরা স্বভাবে সংঘচারী। এদের লেজ চৌকো মতন। পা বেঁটে ও শক্তসমর্থ। পায়ের গড়ন যুগ্মাঙ্গুল গোষ্ঠীর (জাইগোড্যাকটাইলাস) অর্থাৎ প্রথম ও চতুর্থ আঙুল পিছন দিকে। এই কারণে যে-কোনো খাদ্যবস্তুকে পা দিয়ে আঁকড়ে ধরে চঞ্চুতে নিয়ে যেতে পারে। এই চঞ্চু বেঁটে, মোটা ও শক্ত এবং এর সাহায্যে যে-কোনো কিছু বেয়ে উপরে উঠতে পারে। এরা অর্ধভুক্ত খাদ্য উগরে এনে বাচ্চাদের খাওয়ায়।

তোতা বংশ

কাকাতুয়া

তোতা বংশের 'কাকাতুয়া' ভারতের পাখি নয়। বাইরে থেকে একসময় প্রচুর চালান আসত ও একটু অবস্থাপন্ন বাড়িতে পোষার খুব রেওয়াজ ছিল। বর্তমানে চালান বন্ধ হয়ে যাওয়াতে এর হাটে-বাজারে বিক্রি হতে দেখা যায় না। যা দু'একটা ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে মাঝে-সাজে আসে তার আকাশ ছোঁয়া দাম।

কাকাতুয়া ছাড়া নুরী (লরি); ম্যাক ইত্যাদিরাও একসময় চালান হয়ে আসত। পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের পাখি না হওয়া সত্ত্বেও কাকাতুয়াকে আমরা খুব ভালভাবেই চিনি, তাই একে স্থান দিয়েছি এখানে। দু'একটি উদাহরণ দিলেই এদের সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে।

স্কুলে পড়ি তখন। সুশীল আড্ডি ছিল আমার সহপাঠী। তাদের বাড়িতে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রহস্যলহরী সিরিজের বইগুলো একের পর এক গোগ্রাসে গিলতাম। কি একটা ছুটির দিনে ওর দেওয়া বই শেষ হয়েছে, দুপুরবেলা ভাবলাম যাই বইটা বদলে একটা নতুন বই নিয়ে আসি। সুশীলের বাড়িটা চিনি কিন্তু কোনদিন যাই নি।

বড় সদর দরজাটা খোলা। দু'দিকে বৈঠকখানা, মাঝে পথ। পথের শেষে মস্ত উঠান, ঠাকুরদালান। সুশীল বলে হাঁক দিতেই কে যেন খুব গম্ভীর গলায় বলল, সরে যা মেরে দেব। চমকে উঠে চারদিকে তাকাই, কাউকে দেখতে পাই না। 'সুশীল' বলে আবার ডাকতেই ওই অপরূপ বাণী কানে এল। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি দাঁড়ে ঝুলছে এক সাদা কাকাতুয়া।



চি. ২৫. কাকাতুয়া

স্কুলে পড়ার সময় রাস্তার ওপারে আমাদের বাড়ির সামনে ছিল চ্যাটার্জিদের বাড়ি। বাড়ির ঠাকুরমার পোষা এক কাকাতুয়া ছিল। তাঁর ঘরেই থাকত। রোজ সকালে বাইরের বারান্দায় দাঁড়শুদ্ধ রোদে রাখা হতো। সে চিৎকার করে নানারকম কথা বলত। নাতি হরেনের নাম ধরে ডাকত বেশি। একদিন সকালে শুনি পাখিটা তারস্বরে চিৎকার করছে— 'কি কেলেঙ্কারি, কি কেলেঙ্কারি, শেষে হরেনের বৌটা বেইরে গেল।' সে আর থামে না। এমন রসের সংবাদ পেয়ে রাস্তায় বেশ ভিড় জমে উঠল। শেষে বাড়ির এক চাকর এসে পাখিটাকে সরিয়ে নিল। তারপর থেকে আর কখনও দেখি নি।

কলেজে পড়ার সময় খুব শখ ছিল স্টিভেনসন-এর ট্রেজার আইল্যান্ড-এ জন সিলভার-এর কাঁধে যে পাখিটা থাকত সেই একটা পোষার। ভাগ্যচক্রে এক জাহাজী বাঙালি নাবিকের কাছ থেকে আমার এক দাদা আফ্রিকার সেই গ্রে প্যারট (প. সিট্টাকাস এরিথাকাস) কিনেছিলেন। নাবিকদের কাছে থাকার দরুন যেসব বাণী উচ্চারণ করত তা মোটেই সুবিধের ছিল না। ভদ্র পরিবেশে এসে সে রিকশর ঘন্টা, কুঁজো থেকে জল গড়ানর শব্দ, কুকুর, বেড়াল, ঘোড়া ইত্যাদির ডাক, এমনকি কনক দাস (পরে বিশ্বাস)-এর 'আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কি এনেছিস বল' এই লাইনটি রেকর্ড থেকে মিউজিক সহ হুবহু তুলেছিল। এই পাখিটিকে সেই দাদা আমার কাছে রেখেছিলেন।

মা তখন গিরিডিতে। পুজোর ছুটিতে পাখি নিয়ে গেছি। পৌঁছেছি সন্ধ্যেবেলা। পরদিন ভোর না হতেই আমার মাথার কাছে খাঁচাটার পাশে এসে মা বলতে শুরু করে দিলেন, বল দয়াল, দীনবন্ধু ইত্যাদি। আমি প্রমাদ গুণে মাকে ঘর থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছি। মা শুনছেন না। ব্যস শুরু হল, 'শালা' রাসকেল, জুতি মেরে মুখ ছিঁড়ে দেব।' তারপর নাবিকী খিস্তি সব। মা অগ্নিশর্মা,

এখনই বিদেয় কর। সেলারের কাছ থেকে কেনা, সুতরাং এই রোগ সারাতে বেশ সময় নেবে। মাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। পাখিটা যেন আমার অবস্থা উপলব্ধি করেই ব্যঙ্গ ভরে সজোরে হাসতে থাকল। এই হল কাকাতুয়ার পরিচয়।

কাকাতুয়া গণের পাখিদের বাসস্থান অস্ট্রেলিয়া ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। যেসব কাকাতুয়া আমাদের দেশে বেশি চালান হতো তারা— 1. সাদা ঝুঁটি (কাকাতুয়া আলবা), লম্বায় 46 সেমি। সম্পূর্ণ সাদা দেহ, ঝুঁটির ডগা চওড়া ; 2. গোলাপী ঝুঁটি (কা মোলকেকেনসিস), লম্বায় 50 সেমি। সাদা দেহের উপর গোলাপী আভা। এরও ঝুঁটি চওড়া কিন্তু লম্বা পালকগুলি লাল। 3. ছোটো হলুদ ঝুঁটি (কা গালোরিটা), লম্বায় 46 সেমি। ঝুঁটি ও গাল হলুদ। এটাই পোষা হত বেশি ; 4. লাল (গালা, রোজেট, কা. রোজেটকাপিল্লা), লম্বায় 30-34 সেমি। উপরটা ছাই-ধূসর, মাথা ও বুক গোলাপী, খুব ছোট ঝুঁটি। 5. লেডবিটার (কা. লেডবিটারি), মাথার ঝুঁটির প্রতিটি পালক লাল, সাদা ও হলুদ। উপরটা সাদা, তলা গোলাপি। 6. করেল্লা (বোয়র ইয়েড, কা. সানগুইনিয়া), মাথার ঝুঁটি ছোটো, চওড়া এবং চোখের চারপাশে পালক নেই। শেষোক্ত দু'জন অস্ট্রেলিয়ার খেতের ফসল নষ্ট করে খুব। কলকাতার চিড়িয়াখানায় সবগুলিই আছে।

শুক বংশ

শুক বংশীয় (পসিট্টাসিদি) পাখিরা বৃক্ষবাসী, শস্যভোজী এবং উজ্জ্বল রঙিন হয়। ভারতীয় পাখিদের রঙ প্রধানত সবুজ। চঞ্চু বেঁটে, শক্ত এবং বাঁকানো। উপরের চঞ্চু মাথার খুলির সঙ্গে আলগাভাবে লাগানো। সেই কারণে যথেচ্ছ ঘোরাতে-ফেরাতে পারে। লেজ খুব লম্বা, মোটা থেকে সরু। মাঝের পালক সরু, সূঁচলো এবং লম্বায় অনান্য পালকদের ছাড়িয়ে যায়। চঞ্চু মোটা। উপরের চঞ্চুর দুই পাশ ফোলা এবং বেশ বাঁকানো। নিচের চঞ্চু বেঁটে ও ভোঁতা। পা যুগ্মাঙ্গুল। ভারতীয় পাখিদের ডানার প্রথম সারির পালক 10টি, লেজের পালক 12টি। এই বংশে দুটি গণ— ত্রিকেতু (পসিট্টাক্যুলা) ও লঘুশুক (লরিক্যুলাস)। ত্রিকেতু গণে 12টি প্রজাতি, লঘুশুকে 2টি।

চন্দনা



চি 36. চন্দনা

ছেলেবেলায় এই পাখিটিকে যখন পুষি তখনও তার গায়ে ভাল করে ডানা ও পালক গজায় নি, গলা, বুক প্রায় নেড়া, খোঁচা খোঁচা সরু পালক সবে গজাচ্ছে। বিহারে গিরিডিতে এক পাখিওয়ালার কাছ থেকে তার ঝাঁকাভর্তি পাখির মধ্যে থেকে দু'আনায় বর্তমানের বার পয়সায় তাকে কিনেছিলাম। তখনও বুঝতে পারি নি পাখিটি স্ত্রী কি পুরুষ কোনটিতে গিয়ে দাঁড়াবে। কারণ গলায় গাঢ় গোলাপি কণ্ঠী বা তলার চঞ্চু থেকে কালো পটিটি তখনও ওঠে নি। স্ত্রী-পাখি হলে কোনোটাই দেখা দেবে না, আর কথাও বলবে না। ভাগ্যক্রমে পাখিটি পুরুষই উতরে ছিল। কথাও শিখেছিল কয়েকটি। বাড়ির দুই দুর্দান্ত ডানপিটে ছেলেকে একটু বেশিক্ষণ চোখের সামনে দেখতে না পেলে তাদের মা যা বলে খোঁজ নিতেন, পাখিটা সেই সুরে তবে একটু জড়ান গলায় হাঁক পাড়ত সঙ্গে সঙ্গে, 'খুচু-খোকন কোথায় গেল?' দুষ্টু ছেলে দুটি

বকুনি খেলে, তার মুখেচোখে হাসিমেশান ব্যঙ্গ ফুটে উঠত, হাসত হেঃ হেঃ হেঃ'। ছেলে দুটির মনের অবস্থা তখন বর্ণনার বাইরে।

পাখিটি শুক বংশের (প্সিট্টাকিদি) অন্তর্গত ত্রিকেতু গণের (প্সিট্টাকুলা) *এক প্রজাতি।* নাম— চন্দনা (প্সিট্টাকুলা ইউপাট্রিয়া), হিন্দি *সুগা, হিরামন, তোতা, পাহাড়ী তোতা ; ইংরেজি— লার্জ ইণ্ডিয়ান প্যারাকীট।*

চন্দনা লম্বায় সূঁচলো লেজ সমেত 53 সেমি (21 ইঞ্চি)। দেহের রঙ ঘাস-সবুজ, লেজের তলাটা ফিকে হলুদ। ডানার দ্বিতীয় সারির পালকের আচ্ছাদকের উপর গাঢ় লালের ছোপ। বেঁটে মোটা বাঁকান চঞ্চু টকটকে লাল, উপরের চঞ্চুর একদম ডগাটা কমলা-লাল, তলার চঞ্চু ছোট এবং ভোঁতা। উপরের চঞ্চু ইচ্ছামতন এদিক-ওদিক ঘোরাতে পারে। জিভ মোটা ও মাংসল। গলায় ঘাড় ঘুরে রক্ত-গোলাপি আঙটি। তলার চঞ্চু থেকে একটা কালো পটি গিয়ে মিশেছে গলার গোলাপি হাঁসুলিতে। লেজ মোটা থেকে সরু হয়েছে, মাঝের পালক সরু ও সূঁচলো এবং অন্যান্য পালকের চেয়ে অনেক লম্বা। কনীনিকা লেবু-হলুদ, তাকে ঘিরে খুব সরু একটা নীল আঙটি, চোখের পাতা কমলা-হলুদ। পা ও আঙ্গুল ময়লাটে হলুদ, নখ স্লেট-ধূসরাভ। আঙ্গুল দুটো সামনে ও দুটো পিছনে। এই কারণে তারা এই ধরনের পা ও চঞ্চুর সাহায্যে যে-কোন জিনিস বেয়ে উঠতে পারে।

বাসস্থান— পাকিস্তান, সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কা, আন্দামান ও বার্মার বনজঙ্গলে। খাদ্যে ঘাটতি পড়লে যাযাবরীবৃত্তি গ্রহণ করে অন্যত্রও সরে যায়। *সিংহলী উপজাতি* —'লাবুগিরাওয়া' (প্সি ইউ ইউপাট্রিয়া), *বর্মী উপজাতি* (প্সি. ইউ আভেনসিস) ও *আন্দামানী উপজাতি—* তামিল পেরিয়া কিলি' (প্সি ইউ ম্যাগনিরসট্রিস)।

খাদ্য— ফল শাকসবজি ও সবরকমের বীজ বুনো ও চষা দুইই এবং গম, ভূট্টা, ধান ইত্যাদি। এই কারণে চন্দনা ও তার জাতিভাই টিয়া (প্সি, ক্রামেরি, রোজরিংগড্ প্যারাকীট) দুইই কৃষি এবং উদ্যানপালনের অসম্ভব ক্ষতিকারক পাখি। অন্যান্য ত্রিকেতু গণের (প্যারাকীটস্) পাখির মতো এরাও শিমূল, পলাশ, রক্তমাদার এবং ঐ জাতীয় ফুলের পাপড়ি ও মধ্যঅংশ কিছু খেয়ে আর বেশিরভাগ ছিঁড়ে-ছিটিয়ে নষ্টকরে ভিতরের মধু খায়।

স্বভাব— চন্দনাকে দেখা যায় তিনচারটির দল থেকে বেশ বড় দলে, যেখানে খাদ্যের প্রাচুর্য বেশি সেখানে। রাত্রি বাস করে জঙ্গলের মধ্যে বড় ঘন পাতার গাছে। সেখানে অন্য কোন প্রজাতির প্রবেশাধিকার নেই। সূর্যাস্তের সময় বেশ দূর দূর থেকে পাঁচ থেকে পঞ্চাশের দলে জমায়েত হয়। ডানার ঝাপট খুব ঘনঘন না হলেও সুষমভঙ্গিতে বেশ দ্রুত ওড়ে। চন্দনার ঝাঁক ফলের বাগানের ভয়ানক ক্ষতি করে। গাছের ডালে ডালে উড়ে ঘুরে বেড়িয়ে আধপাকা ফল ছিঁড়ে নিয়ে বসে পছন্দমতো ডালে। এক পায়ে ফলটাকে তুলে মুখের সামনে এনে খায়। বেশিরভাগ সময় একটা-দুটো কামড় দিয়েই ফেলে দেয় মাটিতে। আবার উড়ে যায় আরেকটাকে ছিঁড়তে। খাদ্যশস্যও ঠিক তাই। ডগাটি ছিঁড়ে পাগলের মত টুকরো টুকরো করে, খাওয়ার চেয়ে নষ্ট করে বেশি। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, চন্দনা ও টিয়াদের মধ্যে খাদ্য মুখে তুলতে কেউ বাঁ আর কেউবা ডান পা ব্যবহার করে।

ডাকে বেশ জোরে কিঁয়াক কিঁয়াক। টিয়ার ডাকের চেয়ে গাঢ় এবং একটু মিষ্টতাও আছে। এই ডাকটা ডালে বসে যেমন ডাকে তেমনি ডাকে উড়তে উড়তে। বন্দীদশায় খুব সহজেই মানুষের

কথা দু'চারটে বলতে পারে। কিন্তু শিস্ দিতে শেখালে কথা আর বলতে চায় না। বন্য অবস্থায় কখনও অন্য পাখির ডাক নকল করে না। টিয়াপাখির সঙ্গে সার্কাসে বা মেলার তাঁবুতে নানারকম কসরতের খেলা শিখে দেখায়। সবচেয়ে বেশি কথা শিখতে পারে মধ্য আহমেদাবাদ উপত্যকায় এবং গুজরাটের রাজপিপলা অঞ্চলের পাখিরা। যাঁরা এই পাখি পোষেন তাঁরা এই দুই অঞ্চলের পাখি সংগ্রহের চেষ্টায় থাকেন।

প্রজননকাল— ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল। বাসা বাঁধে নারকেল, শিমুল কখনও শাল, শিশু বা অন্য কোনও শক্ত গাছের গায়ে কয়েক সেমি. গভীর গর্ত করে। গর্তর মুখটা খুব সুন্দর করে গোল করে। সুন্দরবনে করে কেওড়া ও সুঁদরি গাছে। অনেকসময় দেখা যায় একই গাছে অনেকগুলি বাসা, তবে এক বাসার সঙ্গে অন্য বাসার সংযোগ নেই, অনেকটা ফ্ল্যাট বাড়ির মতো। কখনও দেখা যায় বসন্তবউরি ও কাঠঠোকরার পরিত্যক্ত বাসা বড় করে নিজের পছন্দমত তৈরি করে নিতে। ডিম পাড়ে 3-4টি চাকচিক্যহীন একটু গোলাকার সাদা। বাসা তৈরি থেকে তা'-দেওয়া এবং আধাহজমী খাদ্য উগরে মুখের মধ্যে দিয়ে ছানাদের খাওয়ানো স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই করে। ডিম ফুটতে সময় নেয় 19-21 দিন। ডিমের গড় মাপ— 34×28 মিমি।

টিয়া

পশ্চিমবঙ্গের এই সর্বনেশে পাখিকে কোনদিনই পছন্দ করতে পারি নি। দেখতে সুন্দর হলেও তার কোন গুণ খুঁজে পাই নি। সামান্যতমও নয়। অথচ বহুলোক পোষেন। কথা বলানর চেষ্টা করেন, বলেও কিছু জড়ান গলায়। ছেলেবেলায় পুষেছি কয়েকটা। কিন্তু একটু অসাবধান হলেই পালিয়েছে। সবাই বলত— এরা শিকলি কাটার জাত। যতদূর মনে পড়ছে ছেলেবেলায় যখন পাখি পোষার সখ সবে শুরু হয়েছে, তখন প্রসূতিবিদ্যা-বিশারদ ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের স্ত্রী, যাঁকে আমরা দিদিমা বলে ডাকতাম, তিনি খাঁচাশুদ্ধ একটি পাখি আমায় উপহার দিয়েছিলেন। সেটাই অনেকদিন ছিল, দু'চারটে কথাও বলত, ভুল করে শিস্ দেওয়া শিখিয়েছিলাম বলে শিসই দিত। কিন্তু কোনদিনই তেমনভাবে আমার পছন্দসই পোষ মানে নি। স্বাভাবিক নিয়মে বয়েসকালে মারা গিয়েছিল অথবা পালিয়েছিল কিনা আজ আর তা মনে নেই। কয়েক বছর আগে সুন্দরবনে সন্দেশখালি 2নং ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতি অনুজ প্রতিম শ্রীধীরেন দত্ত কথায় কথায় বলেছিলেন, এরা যে তাঁর কী ক্ষতি করেছে তা আর বলার নয়। তখন সূর্যমুখীর বীজ নিয়ে খুব মাতামাতি হচ্ছে, তিনি তার ঝুপখালির জমিতে বিঘে খানেক সূর্যমুখীর চাষ করেছিলেন। ফুল এসেছে প্রায় থালার মতো সোনালি-হলুদ, বীজ সব পুষ্ট হচ্ছে। কদিন বাদেই কাটা হবে। একদিন সকালে কোথা থেকে শয়ে শয়ে এই পাখিরা এসে ফুলের উপর পড়ল। এদের চিৎকারে পাড়া মাত। নানারকম ভয় দেখান সত্ত্বেও কোনোকিছুতে ভ্রূক্ষেপ না করে এই সবুজ সৈন্যরা ধ্বংসলীলায় মেতে উঠল। দেখতে দেখতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব শেষ করে দিয়ে উড়ে চলে গেল। দেখলেন বীজ খাওয়ার চেয়ে নষ্ট করেছে বেশি, ডগা থেকে ফুল মাটিতে ফেলেছে। তাঁরা শুধু এই ধ্বংসলীলা হতবুদ্ধি হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখলেন, কোনভাবেই কিছু প্রতিকার করতে পারলেন না।



চি 37. টিয়া

এই সর্বনেশে পাখি শুক বংশের (পৃসিটাসিদি) অন্তর্গত ত্রিকেতু গণের (পৃসিট্টাকুালা) এক *প্রজাতি*। নাম— টিয়া (পৃসিট্টাকুালা ক্রামেরি বোরিয়ালিস), ইংরেজি— *নর্দান রোজরিংগড প্যারাকীট*। হিন্দি— *তোতা, লাইবার তোতা*, ভারতে 2টি উপজাতি।

টিয়া সূঁচলো লেজ সমেত লম্বায়— 42 সেমি (সাড়ে 16 ইঞ্চি)। পুরুষের উপরের পালক উজ্জ্বল ঘাস-সবুজ, পিঠের খানিকটা অংশে ফিকে নীলচে-ধূসরের আভা। মাথার দু'পাশ এবং ডানার কাঁধের কাছটা ফিকে। লেজের মাঝের পালকের গোড়া সবুজ, ক্রমে নীলচে-ধূসর, লেজের অন্যান্য পালক সবুজ, ডগায় হলুদের ছোঁওয়া, তলাটা হলুদ। একটা কালো লাইন নাকের গর্ত থেকে চোখ পর্যন্ত, ঘাড়ের উপর দিয়ে গোলাপি কলার, কিন্তু সেটা সামনে আসে নি। চিবুক ও চঞ্চুর তলায় গোড়াটা কালো,সেটা গিয়ে মিশেছে গোলাপি কলারে। স্ত্রী-পাখির গোলাপি কলার ও কালো পটির জায়গায় অস্পষ্ট পান্না-সবুজ আঙটি। চঞ্চুর উপর-নিচ দুই-ই প্রবাল-লাল কিন্তু মাঝে মাঝে তলার চঞ্চুতে খানিকটা লাল খানিকটা কালো দেখা যায়।

বাসস্থান— পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত জেলা সমূহ, পাঞ্জাব, সমগ্র ত্তর ভারত থেকে হিমালয়ের পাদদেশ ধরে নেপাল, তরাই, গাঙ্গেয় উপত্যকা, পশ্চিমবঙ্গ থেকে াসাম, বাংলাদেশ, দক্ষিণে 20° উঃ অক্ষাংশ পর্যন্ত। বাস করে ভিজে এবং শুকনো পর্ণমোচী জঙ্গল, ধ্য মুরুভূমি অঞ্চল, মানুষের বসবাসের কাছে হালকা জঙ্গল, বাগান-বাগিচা, ফলবাগান এবং খেতের আশপাশে। 1874 সাল নাগাদ আন্দামানে কিছু চালান দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেখানে পখাইয়ে নিতে পারে নি। ভারতের বাইরে বর্মা, দক্ষিণ-পূর্ব চীন এবং ভিয়েতনাম। *দ্বিতীয় জাতি*— 'দক্ষিণী টিয়া' (পৃসি ক্রা মানিল্লেনসিস), ইংরেজি— *রোজরিংগড় প্যারাকীট*। *বাসস্থান*— দ্বীপাখ্যক ভারতে 20° উঃ অক্ষাংশের দক্ষিণ এবং শ্রীলঙ্কায়। অন্যান্য অঞ্চলের পাখিদের সঙ্গে র ভারতের পার্থক্য শুধু এইখানে যে এদের তলার চঞ্চুর সমস্তটাই কালো।

খাদ্য— ফল, খাদ্যশস্য, শস্যকণা, বুনো ও চাষকরা সব রকমের বীজ, লঙ্কা, চিনাবাদাম, ছোলা, ই, ফুলের পাপড়ি ও শিমূল, মাদার, পলাশ, মহুয়া প্রভৃতি ফুলের মধু ইত্যাদি।

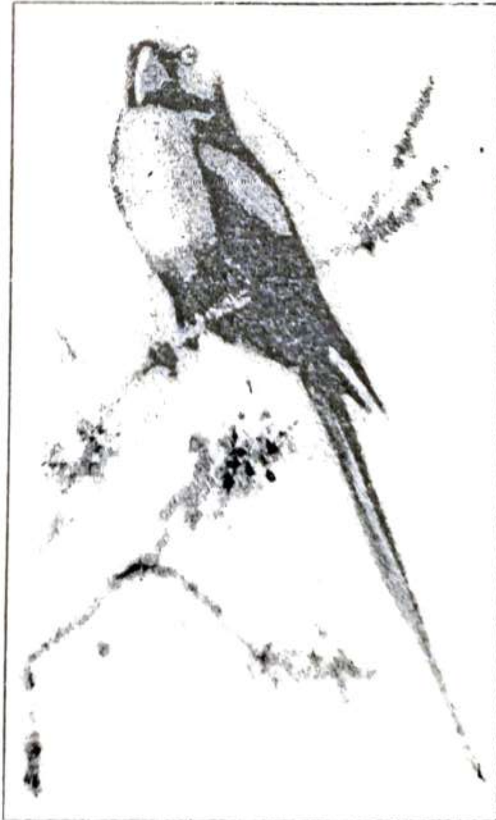
ডাক-জোরে তীক্ষ্ণ 'টি-য়াক' বা 'কি-য়াক'। কখনও খুব তাড়াতাড়ি কয়েকবার স্বরগ্রামের ওঠাপড়ার া। এই ডাকটা এক জায়গায় বসে যেমন ডাকে তেমনি ডাকে উড়তে উড়তে।

স্বভাব— কৃষি ও সবজিবাগানের ধ্বংসকারী প্রাণী। ছোট বা বড় দলে দলবদ্ধ হয়ে উচ্ছৃঙ্খল কার-গণ্ডগোলের মধ্যে পাকা জোয়ার-ভূট্টা বা অন্যান্য খাদ্যশস্যের ক্ষেত বা ফলবাগানে হঠাৎ বাজি শুরু করে। চঞ্চু ও পায়ের সাহায্যে আঁকড়ে-মাকড়ে খুব সরু ডালে পৌঁছে, একের

পর এক আধপাকা ফল কেটে চলে। খাওয়ার চেয়ে নষ্ট করে বেশি। শস্যখেতের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়ে, পাকা শস্যর ছড় চঞ্চু দিয়ে কেটে কাছের কোন গাছের উপর বসে, একপায়ে ধরে চঞ্চুর সামনে নিয়ে আসে। একটা দুটো ঠোকর দিয়ে খেয়ে বাকিটা উপর থেকে মাটিতে ফেলে দেয়। খেতের চাষী ও পাহারাদারদের চিৎকার, ক্যানেস্তারা পেটান, ঢিল ও গুলতি ইত্যাদি চালাতে থাকলে তারা কেবল একস্থান থেকে আরেক স্থানে চলে গিয়ে তাদের ধ্বংসলীলা চালিয়ে যায়। উত্তর ভারতের অনেক রেল স্টেশনে ও মালগুদামে দেখা যায়, ডাল বা চিনাবাদামের বস্তা চঞ্চু দিয়ে কেটে তার ভিতরের মালপত্র বের করে খেতে বা নষ্ট করতে। মাটিতে চলে লেজ খানিকটা তুলে হেলেদুলে। কাক-শালিক ইত্যাদির সঙ্গে একই গাছে রাত্রিবাস করে। সূর্যাস্তের সময় সৈন্যবাহিনীর মত একের পর এক দল বিভিন্ন দিক থেকে গাছে আশ্রয় নিতে থাকে।

মদনা

1976 সালে নভেম্বরের শেষে হঠাৎ একটা জরুরী কাজে কানপুরে যেতে হল। প্লেনেই গিয়েছিলাম। দমদম ছাড়ার পর মাঝখানে দুপুর নাগাদ প্লেনটা গোরখপুরে নামল। থামবে কিছুক্ষণ। রানওয়ের পাশেই বেশ গাছপালা। হাত-পায়ের খিল ছাড়াবার জন্যে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম একটা বেশ বড়ো শিমূল গাছে সাত-আটটা পাখি ঘোরাফেরা করছে। প্রথমে ভেবেছিলাম চন্দনা বুঝি। কিন্তু একটু লক্ষ্য করতেই বুঝলাম চন্দনা নয়। এর আগে প্রাকৃতিক পরিবেশে এই পাখিদের দেখি নি। যা কিছু দেখেছি শৌখিন পক্ষিপ্রেমিকদের বাড়িতে, হয় খাঁচার ভিতর না হয় দাঁড়ের উপর। টিয়া-চন্দনা জাতীয় পাখিদের উপর কোনো ঔৎসুক্য না থাকাতে কখনও ভালো করে প্রাকৃতিক পরিবেশে বা টিয়া-চন্দনা ছাড়া আর কোনো প্রজাতিকে নিজের কাছে রেখে পর্যবেক্ষণ করি নি। আমাদের দেশে সত্যিকারের তোতা (প্যারট) নেই। যা আছে এদের জ্ঞাতি (প্যারাকীট), যাদের লেজ লম্বাটে এবং সূঁচলো, আর তোতা বা প্যারটদের লেজ ছোট ও চৌকো মতন। খুব ছোট জাতের (14 সেমি) এক চৌকো-লেজ পাখি আছে, তাদের বলে 'লটকন' (লরিকীট), তাদের লক্ষ্য করেছি এবং পুষেছিও। এরা লঘুশূক গণের (লরিক্যুলাস) মধ্যে পড়ে। যাদের কথা পরে উল্লেখ করেছি। মন দিয়ে পাখিগুলোকে দেখছি। পুরুষ-স্ত্রী দু'জাতেরই পাখি আছে। বুকটা লালচে। তফাত চঞ্চুর রঙে। মাঝে মাঝে ডাকছে



চি ৩৪ মদনা

ছোট্ট করে নাকি সুরে— 'ক্যাঁক'। ডাকের মধ্যে কিছুটা মিষ্টত্বও আছে। কতক্ষণ ঐভাবে দাঁড়িয়েছিলাম খেয়াল নেই। প্লেনের লোকদের হাঁকাহাঁকিতে সম্বিত ফিরল। প্রপেলার চালু হয়েছে, তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, দেখছি প্রপেলারের আওয়াজে পাখিগুলো উড়ে গেল। আমিও ভিতরে গিয়ে নিজের জায়গায় বসে পড়েছি।

গোরখপুরে শিমূল গাছের উপর পাখিগুলো ছিল শুক বর্গের (প্সিট্টাসিফরমেস) অন্তর্গত শুক বংশের (প্সিট্টিসিদি) ত্রিকেতু গণের (প্সিট্টাক্যুলা) *এক প্রজাতি*। নাম— মদনা (পুরুষ), কাজলা (স্ত্রী)। হিন্দি— *গৌর তোতো*, ইংরেজি— *রেড ব্রেসটেড প্যারাকীট* (প্সিট্টাক্যুলা আলেকজান্ড্রি ফাস্সিয়াটা)। আন্দামানে একটি উপজাতিকে দেখা যায়— 'আন্দামানী মদনা' (প্সি আ অ্যাবট্টি)।

মদনা লম্বায় 38 সেমি (15 ইঞ্চি)। পুরুষ-পাখি মদনার মাথা বেগুনি-ধূসর, কপালের উপর দিয়ে একটা কালো সরু পটি চোখে গিয়ে মিশেছে। একটা চওড়া কালো পটি তলার চঞ্চু থেকে মাথার ধার পর্যন্ত গেছে। ঘাড়ের পিছন ও ধারের সবুজ উপরাংশের অন্য জায়গার চেয়ে উজ্জ্বল। একটা হলুদ ছোপ ডানার ঘাড়ের কাছে। গলা ও বুক মদের মতো লাল। পেট নীলচে-সবুজ, তলপেট ও লেজের নিচের আচ্ছাদক হলদেটে-সবুজ। লেজের উপরটা নীলচে-সবুজ, ডগায় হলদেটে ছিট, তলা ধূসরাভ হলদে। চঞ্চুর উপরাংশ প্রবাল-লাল, নিচটা পাটকিলে-কালো। স্ত্রী-পাখি অর্থাৎ কাজলার মাথায় নীলচে-সবুজের আভা, লালের ভাব কম। বুকের লালটা পুরুষের চেয়ে গাঢ়। চঞ্চুর উপরাংশ কালো, নিচটা পাটকিলে-কালো। পুরুষের কনীনিকা খড়-হলুদ বা উজ্জ্বল ফিকে হলুদ, স্ত্রী-পাখির সাদাটে-হলুদ। উভয়ের পা ও আঙ্গুল ধূসরাভ সবজেটে-হলুদ বা ফিকে হলদেটে-স্লেট।

বাসস্থান— নিম্ন হিমালয়ের তরাই, ভাবর অঞ্চলে 1500 মি. উচ্চতার মধ্যে দেরাদুন থেকে পুবে নেপাল, সিকিম, ভূটান, অরুণাচল ; দক্ষিণে আসাম, নাগাল্যাণ্ড, বাংলাদেশ। ভারতের বাইরে দক্ষিণ-পশ্চিম ইউনান, বার্মা, উত্তর ভিয়েতনাম, ইন্দোচীনীয় অঞ্চল, দক্ষিণ চীন এবং হাইনান। দেখা যায় ভিজে পর্ণমোচী জঙ্গল, অগভীর জঙ্গল এবং ঝুমচাষের আশপাশে। ঘন চিরহরিৎ জঙ্গল এড়িয়ে চলে।

খাদ্য— বুনো ডুমর জাতীয় এবং অন্যান্য বন্য ফল ও বাগানের ফল, ফুলের কুঁড়ি, মাংসল পাহাড়ী শিমূল, পলাশ জাতীয় ফুলের মধু, পাহাড়ী ধান, ভুট্টা, বজরা জাতীয় শস্য।

স্বভাব— ডাকে ছোট্ট অথচ তীব্র স্বরে ক্যাঁক', কিন্তু খুব কর্কশ নয়। টিয়া ও চন্দনার চেয়ে ডাকটা আলাদা। দলবদ্ধ হয়ে চরার সময় কোন কিছুতে বিপদের আশঙ্কা বুঝলে এই ক্যাঁক ডাকটা যেমন ডাকে, তেমনি ডাল থেকে ওড়ার সময়ও এই ডাকটা দিয়ে ওড়ে।

মদনারা সাধারণত 6 থেকে 10-এর দলে বিচরণ করে। সময়ে সময়ে বেশ বড়ো দলেও দেখা যায়, বিশেষত যখন দল বেঁধে পাহাড়ি ধানখেত ও ফলের বাগানে অভিযান চালায়। প্রায়ই দেখা যায়, শস্য কাটার পর মাটিতে নেমে পড়ে থাকা শস্য হেলেদুলে তুলে খেতে। কিছু ঝাঁককে দেখা যায় একটা গাছের ফল যতদিন না শেষ হচ্ছে ততদিন তারা সেখানেই রাত্রিবাসের জায়গা থেকে এসে প্রতিদিন হাজির হয়। গাছের পাতার আড়ালে খায় নিঃশব্দে। অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় যখন

এক ডাল থেকে আরেক ডালে যায় তখন ডানার শব্দে। এক গাছ থেকে আরেক গাছে উড়ে যাবার সময় একযোগে খুবই দ্রুত উড়ে যায়। দলের কেউ যদি কোন কারণে আহত হয়, তার ডাকে সবাই আকৃষ্ট হয়ে চারদিকে গোল হয়ে তাকে ঘিরে মিষ্টিসুরে ডাকাডাকি করে, মনে হয় যেন আহতকে সান্ত্বনা জানাচ্ছে। দিগ্‌বিজয়ী আলেকজাণ্ডার এই পাখিকে পছন্দ করে ইওরোপে নিয়ে যান। পাখি বিজ্ঞানীরা এর বৈজ্ঞানিক নামের সঙ্গে দিগ্‌বিজয়ীর নাম যুক্তকরে রেখেছেন।

প্রজননকাল— জানুয়ারি থেকে এপ্রিল। কিছুটা হেরফের হয় উচ্চতা ও পরিবেশের জন্য। বাসা বাঁধে সাধারণত 3 থেকে 10 মিঃ উচ্চতার মধ্যে, গাছের গায়ে আপনা থেকে যে গর্ত হয় তাকে কেটে বড়ো করে। সুবিধে পেলে বসন্তবউরি বা কাঠঠোকরার পরিত্যক্ত বাসা ব্যবহার করে। কখনও দেখা যায় জঙ্গলের মধ্যে কাছাকাছি অনেক গাছে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত কলোনির মত বাসা বাঁধতে। কাছেই কোন খেত ও লোকবসতি থাকা চাই। ডিম পাড়ে 3-4টি সাদা রঙের। ডিমের গড় মাপ— 30·9 × 25·6 মিমি।

দেখা যায় শালিক বা সাপ কোন এক জোড়া পাখির বাসার কাছে এসে ভীতি প্রদর্শন করলে সেই জোড়া চিৎকার করে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু টিয়া অন্য জায়গা থেকে উড়ে চলে আসে। সকলেমিলে ভীতি প্রদর্শনকারীকে চারিদিক থেকে ঘিরে দশ গুণ ভয় দেখাতে থাকে, যতক্ষণ না শত্রু বাধ্য হয়ে পশ্চাদপসরণ করছে। পুরুষের পাণি প্রার্থনা খুবই মজার। যে স্ত্রী-পাখিকে মনে ধরে তার কাছে সরে এসে শরীরটাকে টানটান করে বড়োকরে তোলে। খাদ্যথলি থেকে আধা-হজমী খাদ্য উগরে এনে তাকে খাওয়ায়। থেকে থেকে প্রেম নিবেদন করে চঞ্চুতে চঞ্চু আটকিয়ে। তারপর মনোনীতাকে ছেড়ে এক ফুট তফাতে সরে এসে মাথা সামনে-পিছনে করে তাকে অত্যন্ত মুগ্ধভাবে দেখতে থাকে। এই সময় দুই ডানা অল্প নামিয়ে দেয়, যে পাশে স্ত্রী-পাখিটি সেইদিকের পা তুলে শূন্যে আঁচড়াতে থাকে। তারপরেই উলটোদিকের পাশে গিয়ে একই ভাব প্রদর্শন করে। একবার এপাশে আরেকবার ওপাশে, এই আসা-যাওয়া করতেই থাকে যতক্ষণ না স্ত্রী-পাখিটি তার প্রেম নিবেদনে সাড়া দিয়ে মিলিত হচ্ছে।

প্রজননকাল— প্রধানত জানুয়ারি থেকে এপ্রিল, কিন্তু জুলাই পর্যন্ত গড়াতে দেখা যায়। বাসা হয় কোন গাছের গায়ে স্বভাবজাত গর্তকে নিজেদের দেহ অনুপাতে চঞ্চু দিয়ে কেটে বড় করে নেয় এবং তাতে কোন কিছু বিছয় না, না হয় বসন্ত বউরি বা কাঠঠোকরার তৈরি করা বাসা দখল করে। 3 থেকে 10 মিটারের মধ্যেই সাধারণত বাসাটা থাকে। পাথুরে গর্ত, পরিত্যক্ত ভাঙা বাড়ির দেওয়াল এবং পুরানো দুর্গের ভিতরেও বাসা বাঁধতে দেখা যায়। অনেক জোড়া কাছাকাছি ছড়ান-ছিটানভাবে কলোনি বাসা বাঁধে। শহরের ভিতর, বাজারের পাশে, কোনও বাড়ির বাইরের দেওয়ালের গর্তেও বাসা দেখা যায়। ডিম পাড়ে 3-4টি, কখনও 5টি, ক্বচিৎ 6টি সাদা গোলাকার। বাসার গর্ত দু'জনে মিলে করে কিন্তু ডিমে তা' দেয় স্ত্রী-পাখি একাই। বাচ্চা প্রতিপালন করে দু'জনেই মুখের মধ্যে আধা-হজমী খাদ্য উগরে দিয়ে। ডিম ফোটার পর প্রায় চার সপ্তাহ পরে বাচ্চারা বাসা ছেড়ে উড়ে চলে যায়। ডিমের গড় মাপ— 29·3 × 24·0 মিমি।

ফুলটুসী

পাখি দেখার প্রথম দিকে সুবিধে না হলে গিয়েছি শিবপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেনে। নানা জাতের পাখি দেখতে পেতাম সারা বছর ধরে অর্থাৎ প্রত্যেক ঋতুতে। সেইসব যুগ পার হবার পরও গিয়েছি বহুবার, এমনকি নতুন শিক্ষার্থীদের নিয়েও। একা একা ঘুরেও দেখেছি। বার কয়েক গিয়েছিলাম প্রয়াত পক্ষিপ্রেমিক প্রদ্যোৎ কুমার সেনগুপ্তর সঙ্গে। তিনিই আমায় একবার ঐ মুক্তাঙ্গনে গোটাদুই পাখি এবং তাদের বাসা দেখান। অন্যান্য মুক্তাঙ্গনে এই পাখি দেখলেও এদের বাসা কখনও দেখি নি। বোটানিকসে বাসা দেখব তাও কোনোদিন ভাবি নি। পাখিটাকে খাঁচায় দেখেছি অনেকের কাছে কিন্তু আমি কখনও পুষি নি। অন্যান্য জাতভাইদের পুষেছি। তবে বেশিরভাগই কারুর পোষা পাখি উড়ে এসেছে, ধরে পুষেছি, কেউবা পাখি পুষি বলে দানও করেছেন। গিরিডিতে অল্প পয়সায় কিনেওছি। এই জাতের পাখিদের কোনোদিনও পছন্দ করি নি, শস্যখেত ও ফলবাগানের অনিষ্টকারী শত্রু বলে। অনেকক্ষণ ধরে গাছের কাণ্ডের উপর দিকে গোল ছ্যাঁদা করা গর্ত থেকে স্ত্রী-পুরুষদের আসাযাওয়া করতে দেখলাম। স্ত্রী ও পুরুষ পাখিকে চেনার কোনও অসুবিধে নেই। দু'জনের গলার কলার দেখলেই চেনা যায়।


চি 39. ফুলটুসী

এই পাখিরা শুক বংশের (প্সিট্টাসিদি) অন্তর্গত ত্রিকেতু গণের (প্সিট্টাক্যুলা) *এক প্রজাতি।* নাম— ফুলটুসী, ফরিয়াদি, টুই (প্সিট্টাক্যুলা মাইয়ানোকেফালা বেঙ্গলেনসিস), হিন্দি— *লালশিরা,* তোতা, দেশী টুইয়া, ইংরেজি— *ব্লসমহেডেড প্যারাকীট।*

সূঁচলো লম্বা লেজসমেত 36 সেমি (14 ইঞ্চি) পাখি। পুরুষের লাল মাথা নীল রঙ দিয়ে ধোয়া, চিবুক থেকে একটা কালো কলার ঘাড় ঘুরে এসে মিশেছে। এই কালো কলারের পরেই কিছুটা জায়গা মরচে পড়া তামাটে-সবুজ। উপরের পালক হলদেটে-সবুজ, ডানা ও বস্তিপ্রদেশ তামাটে-সবুজ, ডানার বড়ো পালকগুলো সবুজ, ধারটা ফিকে, ডানার কাঁধে একটা গাঢ় লালের ছোপ। লেজের মাঝের পালক সবুজ, ডগায় এসে নীল, তারপরেই সাদার ছোটো ছিট। বাকি লেজের পালক হলদে, একটা ধার সবুজ। নিচে উজ্জ্বল হলদেটে-সবুজ। স্ত্রী-পাখির মাথা লাল, গলার কলার হলুদ। উভয়ের কনীনিকা হলদেটে-সাদা, উপরের চঞ্চু মলিন কমলা-লাল, নিচের চঞ্চু কালচে-পাটকিলে, পা ও আঙুল সবজেটে-ধূসর, নখর শিঙে।

বাসস্থান— ভারতের সর্বত্র। পাকিস্তানে রাওলপিণ্ডির আশপাশ থেকে পুবে হিমালয়ের নিম্নভূমি

ধরে জম্মু-কাশ্মীর, যুক্তপ্রদেশ, নেপাল, ভূটান ডুয়ার্স, পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণে গাঙ্গেয় উপত্যাকা, সৌরাষ্ট্র, মধ্যভারত। সাধারণত 600 মি. উচ্চতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, মাঝে মাঝে 1500 মি. তেও দেখা যায়।

অপর উপজাতি— 'দক্ষিণী ফুলটুসী' (প্সি সাই সাইয়ানোকে ফালা), হিন্দি— *টুইয়া তোতা*, তেলেগু— *রাম অ চিলুকা*, তামিল— *কিলি*, সিংহলী— *পন্নু গিরওয়া*, ইংরেজি *সাদার্ন ব্লসমহেডেড প্যারাকীট*। উপদ্বীপাত্মক ভারতে 20°উঃ থেকে সমগ্র দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলঙ্কায় দেখা যায়, ঘন গাছপালাসমৃদ্ধ ভিজে পর্ণমোচী জঙ্গল, সমতল এবং পাহাড়ের পাদদেশে। আধা মরুভূমি অঞ্চল এড়িয়ে চলে। খাদ্যের জন্যে কিছুটা এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে। *অপর প্রজাতি*— কাছাড়ী *'দাওব্রাতর কাপিবা'*, কলকাতার পাখিওয়ালাদের *'অসমিয়া ফুলটুসী'* (প্সি রোজিয়াটা রোজিয়াটা)— নিম্ন হিমালয়, সিকিম ডুয়ার্স, ভূটান, উত্তরবঙ্গ, আসাম ও বাংলাদেশে দেখা যায়।

খাদ্য— যে কোনো শস্য ও ফল, ফুলের কুঁড়ি, মাংসল ফুলের পাপড়ি, শিমূল, পলাশ ও ফুলওয়ারার (বাসমিয়া) মধু, বট, পিপুল, ডুমুর, কুল ইত্যাদি ; ধান, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, ছোলা, নানা জাতীয় শিম যা জঙ্গলের পাশে খেতে জন্মায়।

স্বভাব— টিয়াদের মতো ফুলটুসীর হাত থেকে ফসল রক্ষা করা খুবই শক্ত। তীক্ষ্ণস্বরে 'টুই টুই' করে উড়ে চলে। কিছু নিম্নস্বরে মিষ্টি আওয়াজ শোনা যায়, যখন বিশ্রামের জন্যে গাছের ডালে সকলে জমায়েত হয় এবং অন্য সময়েও।

ফুলটুসী দেখা যায় ঘন গাছপালায় ভরা জায়গায়। সাধারণত 5 থেকে 10-এর দলেই দেখা যায়। যেখানে খাদ্য প্রচুর, বিশেষত জঙ্গলের মধ্যে খেতের ধারে সেখানে বেশ কয়েকশ' জমায়েত হয় এবং ফসলের সর্বনাশ করে। ওড়ে খুব দ্রুত সাবলীল গতিতে, এদিক-ওদিক টাল খেতে খেতে এক গাছ থেকে আর এক গাছে। মুখে প্রশ্ন সূচক 'টুই ? টুই ? টুই ?' তখন নীল লেজের একদম ডগায় সাদা ছিটটা দেখে চিনতে কোনো অসুবিধে হয় না। রাত্রিবাস করে কোনো বাঁশঝোপ, পলাশ বা ওই জাতীয় কোনো গাছে।

প্রজননকাল— ডিসেম্বর-জানুয়ারি থেকে এপ্রিল। শ্রীলঙ্কায় মাঝেমাঝে জুলাই-আগস্টেও দেখা যায়। সেই সময়কার আচার-ব্যবহার সব টিয়াদের মতো। স্ত্রী-পুরুষে দুজনেই বাসা বাঁধে মাটি থেকে মাঝামাঝি উচ্চতায় গাছের কাণ্ডে বা মোটা শাখায়। সুন্দর করে গোল গর্ত করে প্রবেশপথ বানায়। সাধারণত দু'জনে মিলে বানালেও অনেকসময় দেখা যায় পরিত্যক্ত ছোটো কাঠঠোকরা বা বসন্তবউরির বাসা ব্যবহার করতে। গর্ত-বানায় কিছু বিছায় না। ওদের কাটা ছোটো টুকরোগুলিই ডিম-শয্যা হয়। একই গাছে উপর-নিচ করে অথবা কাছকাছি গাছে অনেক জোড়ায় মিলে ফুলটুসী কলোনি গড়ে তোলে। ডিম পাড়ে 4-5টি, ক্বচিৎ 6টি সাদা। ডিম অন্যান্য টিয়াজাতীয় পাখিদের চেয়ে একটু বেশি গোলাকার। যা দেখা গেছে, দু'জনে মিলে বাসা বানালেও স্ত্রী-পাখি একাই ডিমে তা' দেয়। তবে কতদিনে ডিম ফোটে তা এখনও জানা যায় নি। ছানাদের স্ত্রী-পাখিই আধা-হজমী খাদ্য উগরে খাওয়ায়। ডিমের গড় মাপ— 24 9 × 20 2 মিমি।

ফল-পাকুড়ের সর্বনাশা এই পাখি দেখতেই সুন্দর। অনেকে পোষেনও। কিন্তু দু'চারটে ছোটোখাটো শিস্ তোলা ছাড়া কথা বলার ক্ষমতা নেই।

পাহাড়ী মদনা

কদিনের জন্য বিশেষ কাজে 1976 সালের মাঝামাঝি দার্জিলিং যেতে হয়েছিল। কাজের মাঝে অবসর পেলেই হাজির হতাম ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম অথবা হিমালয়ান জ্যুলজিকাল পার্কে। দু'জায়গাতেই আড্ডা বেশ ভালো জমতো। চিড়িয়াখানার এক কর্তাব্যক্তি একদিন বললেন, সিকিম যাবেন? আমি আগামী কাল সকালে কাজে যাচ্ছি, রাজি থাকলে আপনাকে আপনার আস্তানা থেকে তুলে নেব। সানন্দে রাজি হলাম।



চি 40. পাহাড়ী মদনা

পরদিন জিপ এসে হর্ন দিতেই বেরিয়ে এলাম। সূর্য সবে উঠছে। আকাশ পরিষ্কার। কুয়াশা বা মেঘ নেই। শুরু হবে আরও কিছুক্ষণ পরে। সূর্যের ছটা এসে হিমালয়ের উন্মুক্ত জঙ্ঘাকে সোনালি রঙে রাঙিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা নামের সার্থকতা বজায় রাখছে।

গাড়ি ছুটছে দু'পাশে গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। হঠাৎ বাঁদিকে জঙ্গলের মাঝে কয়েকটা পাখিকে উড়তে দেখে পাশে বসা নেপালী ড্রাইভারকে স্টিয়ারিং-এর উপর হাত রেখে বললাম, থামাও। আমার বাঁদিকে দরজার পাশে বসা কর্মকর্তাটিও দেখেছেন। দু'জনেই গলায় ঝোলান দূরবীন সমেত নেমে এসে দেখছি পাখিগুলোকে। মুক্ত পরিবেশে এর আগে কখনও দেখিনি। বন্দিশালায় খাঁচায় দেখেছি। ওদের তীব্র ডাক কানে আসছে।

শুক বংশের (প্সিট্টাসিদি) অন্তর্গত ত্রিকেতু গণের (প্সিট্টাকুলা) *প্রজাতি*। নাম— পাহাড়ী মদনা, পাহাড়ী তোতা, গাগী (প্সিট্টাকুলা হিমালয়ানা), ইংরেজি— *হিমালয়ান স্লেটিহেডেড প্যারাকীট*।

পাহাড়ী মদনা লম্বা সূঁচলো লেজসমেত 41 সেমি। ঘাস-সবুজ টিয়া জাতের পাখি, মাথাটা গাঢ় নীলচে স্লেট-রঙা। চিবুক কালো, একটা সরু কালো লাইন ঘাড় ঘুরে গেছে। ঘাড়ের পিছনে কালো লাইনটার তলায় উজ্জ্বল মরচে পড়া তামাটে-সবুজ। ডানার ঘাড়ে গাঢ় লাল ছোপ। স্ত্রী-পাখিদের এই লাল ছোপটা নেই। লেজ সূঁচলো হয়ে নেমে এসেছে এবং প্রত্যেক পালকের ধারে উজ্জ্বল মনিল হলুদ, বিশেষত মাঝের সরু নীল পালক জোড়ায়। ফুলটুসীর (ব্লসমহেডেড) আকার ছোটো (36 সেমি)। এবং মাথাটা নীলচে-লাল। দূর থেকে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। এদের কনীনিকা ঘি-সাদা বা লেবু-হলুদ। উপরের চঞ্চু কমলা, গোড়াটা লালচে, ডগাটা হলদে, নিচের চঞ্চু হলুদ, পা ও আঙুল হলদেটে-সবুজ, নখর সীসে শিং-রঙা।

বাসস্থান— পাকিস্তানের কোহাট, কুররাম, চিত্রম অর্থাৎ হিমালয়ের আফগান সীমান্ত থেকে পুবে কাশ্মীর, গাড়োয়াল, কুমায়ুন, নেপাল, সিকিম, ভূটান এবং আসামের পশ্চিমাংশে 600 মি. (শীতে)

থেকে 2500 মি-র (গ্রীষ্মে) মধ্যে। কখনও কখনও 250 মি-র মধ্যে নেমে আসে। বেশ কিছুটা ঘোরাফেরা করে খাদ্যসংগ্রহের জন্য। পাহাড়ের ধারে গভীর জঙ্গল ও উপত্যকায় দেখা যায়। পছন্দ করে দেবদারুর জঙ্গল, পাহাড়ী চাষের খেত ও পাহাড়ী ফলবাগান।

পাহাড়ী মদনার আরেকটি *প্রজাতি* (পসিট্টাকুলা ফিনিশ্চিদি), কাছাড়ি নাম— *দাওবাতর কোগাশিম*, ইংরেজি— *ইস্টার্ন স্লেটিহেডেড প্যারাকীট*, লম্বায় একটু ছোট- 36 সেমি। দেখতে একই, হাতে না পেলে তফাত ধরাই যায় না। তফাত এই যে, পাহাড়ী মদনার উপরের চঞ্চু প্রবাল-লাল, ডগা হলুদ, তলার চঞ্চুর সবটাই হলুদ। পা ও আঙুল নোংরা সবুজ। আচার-ব্যবহার দু'জাতেরই এক।

বাসস্থান— দক্ষিণ-পূর্ব ভূটান, উত্তরবঙ্গ (ডুয়ার্স), আসাম, অরুণাচল, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, মিজো এবং বাংলাদেশের শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম পাহাড়ের পাদদেশ থেকে 2100 মি. উচ্চতার মধ্যে। ভারতের বাইরে পশ্চিম ইউনান, বর্মা থেকে টেনাসেরিয়াম, উত্তর থাইল্যাণ্ড, দক্ষিণ লাওস এবং মধ্য ভিয়েতনাম।

খাদ্য— নানাবিধ বাদাম, বীজ, ফল। ওক গাছের ফল খুব প্রিয়। বুনো এবং আবাদী ফল ও শস্য দুই খায়। আখরোট, আপেল ও পিয়ারর্স বাগানের শত্রু। খাওয়ার চেয়ে নষ্ট করে বেশি। উচ্চ উপত্যকার ভূট্টা খেতের অসম্ভব অনিষ্টকারী।

স্বভাব— ডাকে উচ্চগ্রামে 'টু-উই, টু-উই'। ফুলটুসীর মতো উড়তে উড়তে ডাকে, কিন্তু ডাকে খুব জোরে এবং স্পষ্ট করে। থেকে থেকে উচ্চগ্রামে তীব্র চিৎকার দেয় যখন বিশ্রাম নেয়। ঝাঁক বেঁধে যখন বিশ্রাম নিতে থাকে তখন নিম্নস্বরে মিষ্টিসুরে কলরব করে।

অন্যান্য ত্রিকেতু গণের পাখিদের চেয়ে ঘন জঙ্গলই পছন্দ করে বেশি। দেখা যায় পারিবারিক দলে বা ছোট ঝাঁকে। ফুলটুসীদের মতো বড় ঝাঁক কখনও বাঁধে না। একডাল থেকে আরেক ডালে যায় বাঁকানো চঞ্চু ও পায়ের উপর পা দিয়ে বেয়ে। ওড়ে খুব দ্রুত এবং সরাসরি, মুখে উচ্চগ্রামে জোড়া ডাক। ওড়ে সবাই একসঙ্গে। কখনও বাঁক নিচ্ছে,কখনও পাক খাচ্ছে, সাবলীলভঙ্গিতে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ শূন্যে উঠে গিয়ে পাতায় ছাওয়া গাছের উপর নেমে আসে।

প্রজননকাল— প্রধানত মার্চ থেকে মে। সাধারণত 2500 মি-র মধ্যে কিছুটা হেরফেরও হয়। উত্তরবঙ্গের পাখিদের (ইস্টার্ন স্লেটিহেডেড) সময় ফেব্রুয়ারি থেকে মে। বাসা বাঁধে নিজেদের পছন্দমত গাছের গায়ে, আপনা থেকে হওয়া গর্তের ভিতর বা পরিত্যক্ত কাঠঠোকরা বা বসন্তবউরির বাসায় চঞ্চু দিয়ে খুঁড়ে নিয়ে। জমি থেকে উচ্চতা হয় 6 থেকে 18 মি-র মধ্যে। অনেকসময় দেখা যায় একই গাছে বা কাছেপিঠের গাছে বাসা বেঁধেছে ছোট কলোনির মতো। ডিম পাড়ে 3 থেকে 5টি, সাধারণত 4টি সাদা চাকচিক্যহীন গোলাকার। মনে করা হয় ফুলটুসীদের মতোই সন্তান প্রতিপালন করে। কতদিনে ডিম ফোটে এবং এদের প্রজননকালীন আচারব্যবহার কেমন তা কিছুই এখনও জানা যায় নি।

মদনগৌর তোতা (Malabar Parakeet)

বাঙ্গালোরে গিয়েছিলাম 1965 সালে। সেখানে ওমর কাশিম বলে অল্পবয়সী দক্ষিণ ভারতীয় মুসলমান ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়। স্বভাবতই কথায় কথায় পাখির কথা উঠল। তার কাছে জানলাম, এই



চি 41. [illegible]গৌর তোতা

মহীশূর রাজ্যে সাস্তাবেরি বলে এক গ্রামে তার বাড়ি। সেই গ্রামের কাছে বাবুদ্দীন বলে এক পীরের আস্তানা আছে। সেখানে এক জাতের জংলী টিয়া পাখি দেখা যায়, তারা নাকি পরিস্কার জড়তাহীন স্বরে কোরান শরিফের বয়ান বলে। আমি তার কথা হেসেই উড়িয়ে দিই। টিয়া-চন্দনা জাতীয় প্যারাকীটদের কথায় কিছুটা জড়তা থাকবেই। আর জংলী পাখি আপনা থেকেই কোরান শরিফের বয়ান বলছে, এ অসম্ভব। তর্ক চলল সমানে। সকাল বেলায় চায়ের টেবিলেই ঝড়টা উঠেছিল। বিকেলে সে নিয়ে গেল এক বয়স্ক মুসলমান ভদ্রলোকের বাড়িতে। দেখলাম তাঁর সখ নানা জাতের ক্যানারি পাখির। একটা খাঁচায় রয়েছে কস্তুরা (মালাবার হুইসলিং থ্রাস)। তিনি বললেন, ওমর যা বলেছে তা সত্যি। বাবাবুদান পাহাড়ের বাবুদ্দীন সাহেবের মাজারে এই জংলী তোতার বাস। তিনি নিজে যান নি কিন্তু তাঁর অনেক আত্মীয়স্বজন গেছেন এবং পাখির মুখে বয়ানও শুনেছেন। এই পাখি পোষার ...নেকে আগ্রহীও। কিন্তু সেখান থেকে ওই পাখি কে ধরে আনবে?

কৌতূহল চরমে উঠল। পরদিনই রওনা হয়ে পৌঁছলাম বাবাবুদান পাহাড়ের কোলে জংলী গ্রাম ...রেবিতে। তার পরদিন সকালে হাজির হয়েছি পীর বাবুদ্দীন সাহেবের আস্তানায়। ...ঙ্গে সঙ্গে গাছের উপর থেকে অভ্যর্থনা জানাল 'সালাম আলায়াকুম' একের পর এক পাখিরা ...ও সমস্বরে 'ইয়ে আল্লা'। কখনও 'বালা ইলাহা ইল্লালাহ্.... বিসমিল্লা হির্' রহমানে নির রহিম... ...ন, তেরি কুদরত'। অনেক বয়ান শুনলাম যা আমি কখনও শুনি নি, আজ তা মনেও নেই। ... তাজ্জব বনে গেলাম। মুখে কথা সরে না। ওমর মিচকি মিচকি হাসতে থাকে। ওমরের ... বাবাবুদানের মাহাত্ম্য। আল্লার বাণী যে ঠিক, সেই কথা পাখিরাও জানাচ্ছে।

...ক্তিবাদী মন মানতে চায় না। দেখলাম একটু দূরে এক অশীতিপর বৃদ্ধ নামাজ পড়ছেন। ...নামাজ পড়া শেষ হলে তার কাছে গিয়ে বসলাম। তিনি হিন্দি-উর্দু কিছুই জানেন না। তবে ... পাঁচবার নামাজ পড়েন এবং শুনে শুনে শরিয়ত সব মুখস্থ। ওমর দোভাষীর কাজ করল। ... অনুনয়-বিনয়ের পর তিনি যা বললেন তা হল, বহু বছর আগে বাবুদ্দীন বলে এক ধর্মপ্রাণ ... মক্কায় যান। সেখান থেকে ফেরার সময় ইয়েমেন থেকে তিনিই দক্ষিণ ভারতে প্রথম কফির ... নিয়ে আসেন। তাঁর নামেই পাহাড়ের নাম বাবাবুদান। তিনি এই জাতের কিছু জংলী তোতা ... কোরান শরিফের বাণী শেখান, তারপর ছেড়ে দেন। বংশানুক্রমে সেই পাখিরাই এই বাণী ...সছে। শুনে মনের ভার নেমে গেল।

এই পাখিরা শুক বংশের (পসিট্টাসিদি) অন্তর্গত ত্রিকেতু গণের (পসিট্টাকুলা) এক প্রজাতি। নাম— মদনগৌর বা বাবাবুদান তোতা (পসিট্টাকুলা কলামবয়ডেস), মালয়ালী— *নিলাট্টাট্টা*, ইংরেজি— *ব্লুউইংগড্ প্যারাকীট*, মদনগৌর তোতা সুঁচলো লেজসমেত লম্বায় 38 সেমি (সাড়ে 14 ইঞ্চি)। টিয়ার (রোজরিংগড্) চেয়ে একটু ছোটো, ফুলটুসীর (ব্লসমহেডেড) চেয়ে অল্প বড়ো। পুরুষ পাখির নীলচে-সবুজ দেহে গোলাপী-ধূসর মাথা, পিঠ এবং বুক, উজ্জ্বল নীলচে-সবুজ ও কালো কণ্ঠী। পিঠের তলার অংশ, বস্তিপ্রদেশ ও লেজের আচ্ছাদক সবজেটে-নীল। ডানা ও লেজের মাঝের পালক নীল, লেজের নীল পালকের ধারে হলুদ। স্ত্রী-পাখির কালো কণ্ঠী ছাড়া বাকি বুক ও পিঠ ঘুঘু-ধূসর। উভয়ের কনীনিকা মলিন, সোনালি-হলুদ বা উজ্জ্বল হলুদ। পুরুষের উপরের চঞ্চু টকটকে লাল, ডগাটা হলুদ, তলার চঞ্চু শিঙে-পাটকিলে, চিবুকের কাছে কমলা, ডগাটা হলুদ। স্ত্রী-পাখির উপর ও নিচের চঞ্চু গাঢ় শিঙে-পাটকিলের উপর কালচে ভাব, চিবুকের কাছে কমলা। উভয়ের পা ও আঙুল সবজেটে-ধূসর, নখর শিঙে-পাটকিলে।

বাসস্থান— পশ্চিমঘাটে কেরালা থেকে উত্তরে বোম্বাইয়ের থানা জেলা, নীলগিরি, পালনি, তামিলনাড়ু ও মহীশূরে পার্বত্য অঞ্চলে চিরহরিৎ জঙ্গলে 500 থেকে 1500 মি. উচ্চতার মধ্যে। শ্রীলঙ্কায় নেই। মাঝে মাঝে খাদ্যান্বেষণে নেমে আসে পর্ণমোচীর জঙ্গলে এবং তখন ফুলটুসীদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। তবে পছন্দ করে একটু উচ্চতার জঙ্গলসমূহ।

খাদ্য— নানাবিধ খাদ্যশস্য, বীজ ও ফল। ফলের মধ্যে ডুমুর জাতীয় ফলই বেশি প্রিয়। এছাড়া ফুলের কুড়ি, পাপড়ি ও মধু। পালতে মাদার জাতীয় গাছ যা দক্ষিণ ভারতে কফি ও চা বাগানে ছায়াগাছ-রূপে ব্যবহৃত হয়, সেখানে এরা হানা দেবেই। জোয়ার ও অন্যান্য খাদ্যশস্য ও বরবটি খেতের খুবই অনিষ্টকারী এবং সেই সঙ্গে ফল বাগানেরও।

স্বভাব— ডাকে ফুলটুসীর মতো জোড়া করে 'টুই টুই' কিন্তু অনেক কর্কশ ও তীব্র। বেশিরভাগ ডাক শোনা যায় উড়ন্ত অবস্থায়। এছাড়া শা-বুলবুল বা দুধরাজের কর্কশ চে-চিউই' খুব জোরে ডাকে। দলবদ্ধ হয়ে খুবই চেঁচামেচি করে।

মদনগৌর তোতা 4-5 বা তার চেয়ে কিছু বেশি সংখ্যায় পহাড়ীদের বাসস্থানে বা খেতের ধারে ঘোরাফেরা করে। পরিত্যক্ত কফি বা চা বাগান এদের অতি প্রিয় বিচরণভূমি। ওড়া ও অন্যান্য আচার-ব্যবহার ফুলটুসীদের মতই।

প্রজননকাল— জানুয়ারি থেকে মার্চ। গভীর জঙ্গল, চা বা কফি বাগানে 6 থেকে 30 মি. উচ্চতার মধ্যে গাছের গায়ে গর্ত করে বাসা বানায়। নাগেশ্বর বা লোহাকাঠ পছন্দ করে খুব বেশি। যদিও এই গাছের কাঠ খুবই শক্ত তা সত্বেও চঞ্চু দিয়ে খুঁড়ে ঠিকই গর্ত করে। অনেক সময় পরিত্যক্ত কাঠঠোকরা বা বসন্ত বউরির বাসা পেলে সেখানেই বাসা বানায়। ডিম পাড়ে 4টি গোলাকার সাদা। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই বাসা বানানো থেকে ঘরগেরস্থালীর সব কাজই করে, কিন্তু কতদিনে ডিম ফোটে তা আজও জানা যায় নি। ডিমের গড় মাপ— 28·3 × 24·5 মিমি।

ত্রিকেতু গণের পাখিদের মধ্যে এদের কথা বলার ক্ষমতা খুবই বেশি এবং স্বরও খুব স্পষ্ট। সংগ্রহ করতে পারলে অনেকে পোষেন। মাঝে মাঝে বিক্রির জন্যে হগ সাহেবের বাজারের পিছনে পাখির বাজারে আসে।

বদ্রিকা

অনেকেই এই পাখিদের সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন। মুক্তবিহঙ্গ নয় বলে এদের সম্বন্ধে বেশি জানার ষ্টা করি নি। যতটুকু জানি তাই লিখছি।

শুক বংশের (প্সিট্টাসিদি) বদ্রিকা, (মেলপসিট্টাকাস আনডিউলেটাস), ইংরেজি— *বাজরিগার, আনডিউলেটেড গ্রাস প্যারাকীট*। আমাদের দেশের পাখি না হলেও গৃহপালিত হয়ে বংশবৃদ্ধি করেছে, রতে শুধুমাত্র নয় পৃথিবীর সর্বত্র। যাঁরা পাখি পোষেন বা পুষতে শুরু করেছেন, তাঁরা তাঁদের লে-মেয়েদের প্রথম পাখি যা কিনে দেন তা হয় মুনিয়া না হয় বদ্রিকা। বন্দী অবস্থায় খাঁচার তর ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা তোলে বলে এর কদর সবচেয়ে বেশি। সব দেশেই এই পাখির কেনাবেচার ব্যবসা চলে।



চি 42 বদ্রিকা

বদ্রিকার আদিবাস অস্ট্রেলিয়া। সেই বন্য বদ্রিকার দেহ সবুজ, কপাল ও গাল হলুদ এবং সেই হলুদ গালে তিনটি কালো গোল ছোটো ফুটকি। পিঠে কালোর উপর হলদে ডোরা দাগ। লম্বায় 18 সেমির মতো, সরু সূঁচলো লম্বা লেজ এবং চঞ্চুর প্রান্তে মোমের মতো অনাবৃত ঝিল্লী (সিয়্যার, cere)।

বর্তমানে মানুষ নানারকম ভাবে বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি করায় নানা রঙের বদ্রিকার উৎপত্তি হয়েছে। বুদ্ধিমানের মতো বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি করতে দেখেছি কম। বেশিরভাগ পক্ষিশালায় রঙের কোনো ছিরিছাঁদ নেই। এতে সৌন্দর্যের হানি হয়েছে। যতসব বর্ণসঙ্কর বদ্রিকা আমার চোখে পড়েছে তার মধ্যে ভাল লেগেছে সাদা, রূপোলি, নীল, (কোবাল্ট) আকাশী নীল, রূপোলি নীল, হলুদ, হালকা সবুজ ও জলপাই-রঙা। বর্তমানে দুটো নতুন রঙ দেখতে পাই। ধূসর ও সীসে বা স্লেট-রঙা।

যাঁরা বড় পক্ষিশালার মধ্যে পোষেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, বর্তমানে তাঁদের পাখিরা আর লম্বায় 18 সেমির মত হচ্ছে না, অনেক হচ্ছে। এর কারণ, অতিরিক্ত অন্তর্মিলনের ফল। সুতরাং জোড় বাঁধার নির্বাচনে খুবই সতর্ক প্রয়োজন।

অবস্থায় বদ্রিকারা অত্যন্ত সামাজিক এবং সঙ্ঘচারী প্রাণী। বন্দী জীবনে অন্যান্য পাখির থাকতে পারে তবে জাভা চড়াইদের সঙ্গটাই পছন্দ করে বেশি।

কার ঘর ছোট হলে কিন্তু তারা ডিম পাড়ে না। বাজারে বদ্রিকার খাঁচা বলে যা বিক্রি হয় র মধ্যে কাঠের ঘর করা থাকে তাতে ডিমপাড়ার আশা খুবই কম। ওড়াওড়ি করার জন্য ড়ো জায়গার প্রয়োজন। আর খাঁচার মধ্যে বেঁটে কলসীর মতো হাঁড়ি ঝোলানো উচিত।

সেই হাঁড়ির একপাশে ছোটো গর্ত করে দিতে হয়। গলাটি তার দিয়ে বেঁধে ঝোলাতে হবে। মুখটা সরা চাপা। মুখ খোলা থাকলে হাঁড়ির কাঁধের উপর বসে ভিতরে ময়লা করে। সেই মল ডিমের উপর পড়লে তা শুকিয়ে ডিমের উপর আবরণ সৃষ্টি করে। ফলে ডিম তাপে ফোটার উপযোগী হয়ে ওঠে না, নষ্ট হয়ে যায়।

বন্দী দশায় যে খাদ্য খাওয়ালে শরীর-স্বাস্থ্য ভালো থাকে তা-হলো, সমানভাবে মেশানো কাঙনিদানা, ও জোয়ার, ধানের বীজ, লেটুস ইত্যাদি। বড়ো পক্ষিশালায় কিছু ঘাস অবশ্যই বিছানো দরকার। পরিষ্কার জলের পাত্র এবং খাঁচার গায়ে সমুদ্রফেন (কাটলফিশ) বাঁধা উচিত। এতে ওদের চঞ্চুর ধার যেমন ঠিক থাকে, তেমনি ওর থেকে কিছু পরিমাণে আয়োডিন শরীরের ভিতর যাওয়ায় রক্তকণিকার উপকার হয়।

ডিম পাড়ার সময় অর্থাৎ প্রজননের সময় কয়েকটি পাখি একসঙ্গে থাকে। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরতে 18 দিন সময় নেয়। যখন প্রায় 4 সপ্তাহ বয়েস তখন বাসা থেকে বেরিয়ে ওড়ে।

শুক বংশের পাখি বলে এদের পক্ষে কথা বলা ও নানারকমের ডাক নকল করা সম্ভব। ভারতে কোথাও কেউ কথা বলতে শিখিয়েছেন কিনা জানি না। কেউ এ নিয়ে পরীক্ষা করেছেন বলেও খবর পাই নি। বিদেশে নাকি বদ্রিকাকে কথা বলতে শেখানো হয়েছে বলে শুনেছি। আমার মনে হয় যে বদ্রিকার ছানা সদ্য উড়তে শিখেছে এবং নিজে থেকে খাওয়া ধরেছে, তেমন কোনো পাখিকে ঝাঁকের মধ্যে থেকে বার করে সম্পূর্ণ আলাদা করে তাকে অন্য খাঁচায় রাখা। বয়সী সঙ্গী ও অন্যান্যদের সঙ্গে দল বেঁধে থাকার অভ্যাসের জন্য, খেলার সাথী হিসেবে সূতোর রিল বা পিংপং বল তার দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে, কথা বলা শেখানর চেষ্টা করলে সম্ভব হবে বলে মনে হয়।

লটকন (Vernal Hanging Parrot)

এই পাখিকে প্রকৃতির আঙিনায় সাক্ষাৎলাভ করার সৌভাগ্য আমার হয় নি। পশ্চিমবঙ্গের পাখিও নয়। কিন্তু তার আদর আছে পাখি পুষিয়েদের কাছে। যেসব জায়গা এদের আবাসভূমি সেইসব জঙ্গলে গিয়েছি, ঘুরেছি, অবশ্য এই পাখি দেখব বলে ঘুরি নি। ঘুরেছি জঙ্গলের টানে তার ভাষা বুঝতে, তার গান শুনতে, তার কাছ থেকে শিক্ষালাভ করতে, গুরুগৃহের স্নেহচ্ছায়ায় বাস করতে এবং অন্যান্য বাসিন্দা অর্থাৎ পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, গাছপালা আদিবাসীদের সঙ্গে পরিচয় লাভ করতে। একটা আত্মিক যোগ স্থাপন করে প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে যেতে। ঐসব জঙ্গলে ঘোরবার সময় এই পাখির কথা একবারও মনের মধ্যে উদয় হয় নি। দৈবাৎ দেখা হয়ে গেলে চেনার অসুবিধে ছিল না। না চিনে উপায় নেই বলেই।

পনের-কুড়ি বছর আগেও কলকাতার রাস্তায় বাঁকের দু'পাশে পাখির খাচা ঝুলিয়ে যারা পাখি বিক্রি করে বেড়াতো তাদের খাঁচায় টিয়া, চন্দনা, ময়না, মুনিয়া ইত্যাদির সঙ্গে এই পাখিও কারুর কারুর কাছে থাকতে দেখেছি। একবার গোটা-ছয়েক কিনে পুষেওছিলাম। তখন এদের বৈশিষ্ট্য ভাল করে লক্ষ্য করি।

এরা শুক বংশের (পসিট্টাসিদি) অন্তর্গত লঘুশুক গণের (লরিক্যুলাস) *এক প্রজাতি*। নাম— লটকন, ভোরা (লরিক্যুলাস ভেরনালিস). ইংরেজি— *ইন্ডিয়ান লরিকীট*। দুটি *প্রজাতি*।

লটকন চড়াই পাখির চেয়ে লম্বায় ছোট 14 সেমি (সাড়ে 5 ইঞ্চি)। উপর দিক ঘাস-সবুজ, ডানা ও লেজের রঙটা গাঢ়। বস্তিপ্রদেশ ও লেজের উপরের আচ্ছাদক টুকটুকে লাল। লেজ কাকাতুয়াদের (প্যারটস্) মতো চৌকো, টিয়াদের (প্যারাকীটস্) মতো সূঁচলো নয়। তলার পালক হলদেটে-সবুজ। পুরুষের গলায় একটা ছোট নীলের ছোপ, যেটা স্ত্রী-পাখির থাকে না। কনীনিকা হলদেটে-সাদা, পাটকিলে-জরদ বা ধূসরাভ-খাঁকি। চঞ্চু লালচে-কমলা বা প্রবাল-লাল, ডগায় হলুদ ভাব। পা ও আঙুল ময়লাটে-কমলা বা ফিকে হলদেটে-স্লেট, নখর শিঙে-পাটকিলে।

চি 43. লটকন

বাসস্থান— নেপাল, সিকিম, ভূটান, অরুণাচল, আসাম, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, ত্রিপুরা, বাংলাদেশের সিলেট, পার্বত্য ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম ; পশ্চিম ভারতে সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল ও ঘাট, বোম্বাইয়ের 19°উঃ অক্ষাংশ থেকে দক্ষিণে নীলগিরি, পালনি ও মহীশূরের পার্বত্যাঞ্চল, তামিলনাড়ু, কেরালা,সেখান থেকে উত্তরে পূর্বঘাট ধরে মধ্যপ্রদেশ, ও ওড়িশা 1000 মি-র মধ্যে, নীলগিরিতে 1800 মি. উচ্চতার ভিতর। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের খুব সাধারণ পাখি। দেখা যায় সমতল ও পাহাড়ের পাদদেশের চিরহরিৎ এবং ...জে পর্ণমোচী জঙ্গলে। ভারতের বাইরে আরাকান, মধ্য ও দক্ষিণ বর্মা থেকে টেনাসেরিয়ম, ...াইদেশ এবং ইন্দোনেশীয় দেশগুলিতে। *দ্বিতীয় প্রজাতি*— সিংহলী 'পল গিরাওয়া' (লরিক্যুলাস ...রিল্লিনাস), ইংরেজি— *সিলোন লরিকীট*।

খাদ্য— সবরকম ফলের নরম শাঁস, ফলসা জাতীয় ছোটো ফল, প্রধানত পিপুল ও বটের ফল, ...দার ইত্যাদি ফুলের মধু। ইউক্যালিপটাসের ফল খুবই প্রিয়, পাখিতে গাছ ছেয়ে যায়। টিয়া-...নাদের মতো এরা ফুল নষ্ট করে না, শুধু মধুটুকু খায় এবং খাবার সময় কপালে পরাগ লাগে ...ং তার ফলে পরাগসংযোগ ঘটে। তাড়ির খুব ভক্ত। ভাঁড় বাঁধা সব গাছে গিয়ে অতিরিক্ত খাওয়ার ...লে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, নড়তে বা উড়তে পারে না, অনেক সময় পড়েও যায়। বন্দী অবস্থায় ...া হচ্ছে সাদা ভাত, পাকা কলা, পেঁপে ও আম চটকানো। আমার কাছে যে কটা ছিল তারা ...া চটকানো খেতেই ভালবাসত বেশি।

স্বভাব— ডাকে 'চি-চি-চিই-ই'। এমনি খুব চুপচাপ। হয় জোড়ায় না হয় পারিবারিক দলে বিচরণ

করে। যেখানে খাদ্যের প্রাচুর্য বেশি সেখানে কখনও কখনও 50 কি তারও বেশি দলে মিলিত হয়। শুধু যে খাদ্যের জন্যেই ঘোরাফেরা করে তা নয়, কারণ যেখানে বর্ষা খুব বেশি সেখানেও সদলবলে হাজির হয়, আবার কোথাও বা শীত যেখানে খুব বেশি সেখানেও হাজির হয়েছে। ছোটো আকার ও দেহের রঙের জন্যে লম্বা গাছের মাথায় ঘোরাফেরাটা সহজে নজরে পড়ে না। উপস্থিতি বোঝা যায় একগাছ থেকে আরেক গাছে দ্রুতবেগে উড়ে যাবার সময়। কোনো ডালে গোড়া থেকে উপরে ওঠার সময় ঘন ঘন বেড় দিয়ে ঘুরে ঘুরে ওঠে। এই ওঠাটা খুবই দ্রুত, প্রায় দৌড়েরই সমান। উপরে ওঠে চঞ্চু ও পায়ের সাহায্যে। ওড়াটাও খুব দ্রুত। ডানার কয়েকটা তাড়াতাড়ি ঝাপট, তারপর দুই ডানা বুজিয়ে একটু নেমে আসা, তারপর আবার ঝাপট। সেই সঙ্গে মুখে চলে দু'তিন সেকেণ্ড অন্তর চামচিকের মত অনবরত ত্রিমাত্রিক 'চি চি চিঁই-ই'। এই চারিত্রিক ডাকটা পাতার আড়ালে গাছের ডালের উপর দিকে উঠতে উঠতে ডাকে বলে বোঝা যায় যে ঐগাছে ওরা আছে। আবার দেখা যায় যে গাছে আছে হঠাৎ সেই গাছ থেকে কয়েকটা বার হয়ে গাছটাকে একটা চক্কর দিয়ে উড়ে একটু উপরদিকে গিয়ে পাতার মধ্যে ঢুকছে। বাদুড়ের মতো সরু ডাল আঁকড়ে মাথা নিচু করে ঝুলে ঘুমোয়। আরেকটা অদ্ভুত স্বভাব দেখা যায়, বাসা বানানোর পর আস্তারণ বিছানোর জন্যে সবুজ পাতা খুব সরু টুকরো টুকরো করে কেটে লাল বস্তিপ্রদেশের মধ্যে গুঁজতে। অনেকগুলি গোঁজার পর উড়ে যায় যেখানে বাসা বেঁধেছে সেখানে। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য একমাত্র আফ্রিকার প্রেমিক পক্ষির (লাভবার্ড, আগাপর্নিস) মধ্যেই দেখা যায়।

প্রজননকাল— জানুয়ারি থেকে এপ্রিল। আন্দামানে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি। বাসা বাঁধে গাছের বা ডালের গায়ে আপনা থেকে হওয়া গর্তে। গর্তটা সোজাসুজি হোক বা নিচের দিকে নামাই হোক তাতে কিছু এসে যায় না। প্রয়োজন মত নিজেরা বাকিটুকুন সেরে-সুরে নেয়। গর্তটা লম্বায় এক মিটারের মতোও হয়। মাটি থেকে বাসার উচ্চতা 2 থেকে 10 মিটারের মধ্যে। বস্তিপ্রদেশে বয়ে আনা সরু করে কাটা সবুজ পাতা শুধু বিছায় না লাইনিংও দেয়। ডিম পাড়ে 3-4টি চকচকে সাদা। ডিমে তা' দেবার সময় গাছের পচা ডালের পাটকিলে-রঙ লেগে নিষ্প্রভ হয়। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই পালা করে তা' দেয়। আধা-হজমী খাদ্য উগরে দু'জনেই বাচ্চাদের খাওয়ায়। ডিম কতদিনে ফোটে তা এখনও জানা যায় নি। ডিমের গড় মাপ— 19·1 × 15·8 মিমি।

পারাবত বর্গ

পারাবত বর্গে (কলাম্বিফরমেস) দুটি বংশ— কৃকল (প্টেরোক্লিডিদি) ও কপোত (কলাম্বিদি)। এই দুই বংশের পাখিরা মাঝারি আকারের এবং কতকগুলি বিষয়ে অন্যান্য বর্গের পাখিদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। এদের চঞ্চু ছোটো এবং কপোত বংশীয়দের চঞ্চুর গোড়ায় মোমের মতো অনাবৃত স্ফীত ঝিল্লী (সিয়্যার) আছে, যার মধ্যে নাসারন্ধ্র। গায়ের পালক দেহের চামড়ার সঙ্গে খুব আলগাভাবে লাগানো। এই বর্গের পাখিরাই একমাত্র চুমুক দিয়ে জল পান করতে পারে, অন্যান্যদের মতো জল চঞ্চুতে নিয়ে মুখ উপরে তুলে গলাধঃকরণ করে না। বিশ্রামের সময় এরা অন্যান্যদের মতো ডানার তলায় মাথা গোঁজে না, মাথা রাখে কাঁধের উপর। প্রায় সবাই গাছে বাস করে এবং খাদ্যগ্রহণের জন্যে মাটিতে নামে। এরা পুরোপুরি উদ্ভিদ্-ভোজী। ফল, বীজ এবং শস্যাদির কচি ডগা খেয়ে থাকে।

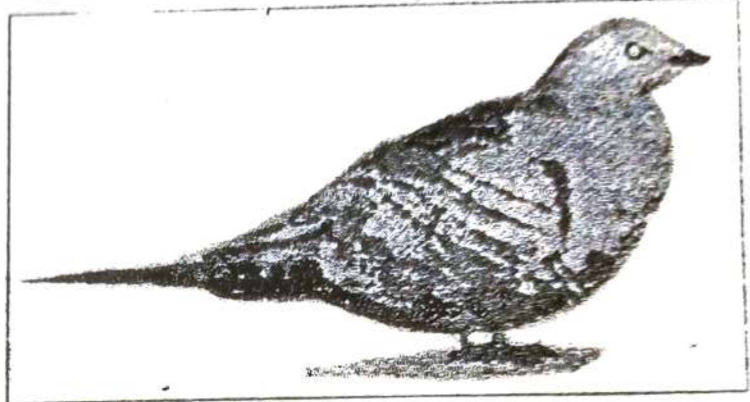
এই পাখিরা দুই মেরু ছাড়া পৃথিবীর সর্বত্রই 300 প্রজাতিতে ছড়িয়ে আছে। বেশিরভাগ আছে এশিয়ার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে। এই বর্গের অবলুপ্ত পাখি 'ডোডো'র (রাফাস কুকুল্লাটাস) বাসস্থান ছিল ভারত মহাসাগরের বুকে মরিশাস দ্বীপে। উড্ডয়নক্ষমতাহীন মোটাসোটা মাংসল ডোডো ছিল লম্বায় প্রায় 120 সেমি (4 ফুট)।

কৃকল বংশ

পারাবত বর্গের (কলাম্বিফরমেস) অন্তর্গত কৃকল বংশীয় (প্টেরোক্লিডিদি) পাখিরা আকারে কপোত বংশীয়দের (কলাম্বিদি) মতই, কিন্তু এদের চঞ্চুর গোড়ায় স্ফীত ঝিল্লী নেই এবং পা পালকে আচ্ছাদিত। দেখায় লম্বা লেজওয়ালা তিতিরের (পারস্ট্রি জে) মতো। ঝাঁক বেঁধে চরে। এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ ইওরোপের শুষ্ক তৃণাবৃত ও নিষ্পাদপ প্রান্তর এবং উন্মুক্ত খরাপ্রধান বা পাথুরে মরুসদৃশ অঞ্চলে দেখা যায়। মাংস সুস্বাদু তাই শিকারের উপযুক্ত পাখি বলেই বিবেচিত হয়। উন্মুক্ত স্থানে মাটি আঁচড়ে দু'তিনটি ডিম পাড়ে। ডিম ফোটার পরই ছানারা ঘুরে বেড়ায়। পুরুষ-স্ত্রী দু'জনেই ছানাদের খাওয়ায় আধা-হজমী খাদ্য, তাদের চঞ্চুর ফাঁক করে মুখের মধ্যে উগরে দিয়ে। এই বংশে দুটি গণ— কৃকল (প্টেরোক্লস) ও ব্যঙ্গপাদ (সাইরহাপটেস)। ব্যঙ্গপাদের বাসস্থান তিব্বতীয় অঞ্চল ও হিমাচল প্রদেশ।

ভাট তিতির (Chestnut bellied Sandgrouse

শান্তিনিকেতনের বল্লভপুরে তখনও মৃগদাব হয় নি। কেউ কল্পনাও করে নি। সেই সময়ে এক গরমের দিনে লালবাঁধের পাশ দিয়ে ওখানে পৌঁছেছি। শাল-পিয়ালের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে খানিকটা গিয়ে খোয়াইয়ে নেমে একটু ঘুরে ফিরছি। হঠাৎ দেখি খোয়াইয়ের কাঁকুরে বেলে জমির ভিতর গোটা পঁচিশেক পায়রা বা ঘুঘুর আকারে পাখি প্রায় মিশিয়ে আছে। প্রথমটা বুঝতেই পারি নি, পারতাম না, যদি না ওরা ছোট পায়ে চলাফেরা না করত। প্রথমে ভেবেছিলাম তিলে-ঘুঘু (স্পটেড ডাভ)। কিন্তু ঘুঘুর তো অত সূঁচলো লেজ হয় না। তবে কি পাখি ? ঘুঘুর অন্য কোনো জাত যা আমি চিনি না, যা কখনও দেখি নি, তাই কি ? দূর থেকে দেখতে থাকি। দেখলাম ঐ ঝাঁকে দু'রকম দেখতে পাখি পাটিতে পা মুড়ে বসে আছে। কেউ কেউ বেঁটে পা দিয়ে হেঁটে কাঁকুরে বেলে জমিতে কি যেন খুঁটে খাচ্ছে।



চি 44. ভাট তিতির

এইটুকুন বুঝলাম, সংখ্যায় যারা বেশি তারা পুরুষ, তাদের উপরটা বালি-ধূসর এবং ফিকে লালচে-হলুদ, পিঠে ময়লাটে হলুদের উপর দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো কালো কালো টান। গাল, চিবুক এবং গলা ময়লাটে হলুদ, তার নিচে কালো মালার মতন লাইন বুক জুড়ে। পেট ও তলপেট চকলেট-কালো। লেজের শেষটা সূঁচলো হয়ে বেশ খানিকটা বেরিয়ে আছে। অন্যগুলোর অর্থাৎ স্ত্রী-পাখিদের মাথা, ঘাড় ও বুকে সব লাইন ধরে কালো ফুটকি নেমে এসেছে। এদেরও বুকে কালো পটির মালা। বুক ময়লাটে লালচে-হলুদ। পেট, তলপেট এদেরও চকলেট-কালো, তার উপর কালো লাইন আড়াআড়ি ভাবে। এদেরও লেজ সরু হয়ে সূঁচলো।

হয়তো আমার উপস্থিতি বুঝতে পেরে ঝাঁকটা উড়ল, যেন বুলেটের ঝাঁক চলে গেল, এমনই চেহারার গঠন। বেঁটে কাস্তের মতো পাখা। মুখে ডাকছে 'কুট-রো কুট-রো', মাঝে মাঝে মিষ্টি সুরে 'গাট্টার গাট্টার'। কিন্তু উড়ে জঙ্গলের দিকে গেল না, খোয়াইয়ের ভিতর দিয়ে গিয়ে চোখের আড়ালে নেমে পড়ল।

কলকাতায় ফিরে অনেক পরে জেনেছিলাম, ওরা পারাবত বর্গের (কলাম্বিফরমেস) অন্তর্গত কৃকল বংশের (পটেরোক্লিডিদি) *এক প্রজাতি।* নাম— ভাট তিতির (পটেরোকলেস একসুসটাস), হিন্দি— *কুহার।* ইংরেজি— *ইন্ডিয়ান স্যান্ডগ্রাউজ।*

পায়রাদেহী ভাট তিতির লম্বায়— 28 সেমি (সাড়ে 11 ইঞ্চি)। তার মধ্যে সূঁচলো লেজই 12 সেমি। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে, চোখকে ঘিরে গোলপাতা সবজেটে-হলুদ, চঞ্চু সীসে-শিঙে, পা ও নখর ধূসর-পাটকিলে।

বাসস্থান— পাকিস্তান (বেলুচিস্তান ও সিন্ধু প্রদেশেই বেশি), উপদ্বীপাত্মক ভারতে পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত,

দক্ষিণে মাদ্রাজের মাদুরাই ও তিরুনেলভেলি পর্যন্ত। আসাম, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অংশে ও শ্রীলঙ্কায় দেখা যায় না। কিছুটা যাযাবরী করে, কিছুটা এদিক-ওদিক পরিযান করে। দেখা যায় খরাপ্রধান অঞ্চলে শস্য কাটার পর, শুকনো গোড়ার পাশে, রোদে পোড়া চষাখেতের উঁচুনিচু মাটির চাপড়ার ভিতর এবং কিছুটা আধা-মরুভূমির মত জায়গায়। জঙ্গল, নদী বা সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল এড়িয়ে চলে।

খাদ্য— সম্পূর্ণভাবে নিরামিষাশী। প্রধানত আগাছা ও ঘাসের বীজ খায়। তার মধ্যে জোয়ার, কলাই, শ্যামা ঘাস, নীল ইত্যাদি বীজই প্রধান, এর সঙ্গে কাঁকর ও বালির কণা। সরষের সঙ্গে তার পাতাও খেয়ে থাকে। এদের বিষ্ঠা দেখতে ছোটো ক্যাপসুলের মতো, মাথাটা সাদা।

স্বভাব— ভাট তিতিরকে দেখা যায় 3, 5 বা 10 থেকে 30-এর দলে। কেউ কেউ একশ'-ও বেশি ঝাঁক বাঁধতে দেখেছেন। এটা দেখা যায় পাকিস্তানের থর মরুভূমি অঞ্চলে। সকলে এসে জমা হয় একটি মাত্র জলের গর্তের সামনে। পা দিয়ে বালি আঁচড়ে খাদ্য সংগ্রহ করে। দেহের রং এমন যে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। কয়েক গজের মধ্যে গিয়ে পড়লেও বোঝা যায় না। একবার ড়লেই দেখা যায়। সূর্য ওঠার ঘণ্টা দু'য়েক পরে পারিবারিক দলে এসে হাজির হয় পছন্দসই জলের গর্তের সামনে। এই হাজির হওয়াটা প্রতিদিন একই সময়ে। অনেকটা দূর হলেও আসে। পছন্দসই জলের গর্তের সামনে এসে ভিড় করে। প্রথম দল যেটি আসে তারা জল থেকে কিছুটা দূরে এসে নামে। কিছুক্ষণ পা মুড়ে বসে, ধূলোয় গড়াগড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে জলের ধারে আসে। কখনও কখনও বুক-পেট পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে দেয়। কয়েক ঢোক জল খেয়েই চলে যায়। একের পর পরপর এমনিভাবে আসতে-যেতে থাকে। খুব গরমের সময় মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে আবার ফিরে আসে জল খেতে, কিন্তু অন্যান্য জাতভাই 'কটিঙ্গা' (করোনেটেড) বা পাহাড়ী ভাট তিতিরদের (পেইন্টেড) মতো, কখনও সন্ধ্যার সময়ে আসে না।

আগে দেখা যেত অনেক শিকারীকে এই জলগর্তের কাছে আড়ালে বন্দুক নিয়ে বসে থাকতে। দের জলপান করার সময়ে জোরে পাখসাট মেরে বুলেটের মতো, যাওয়া-আসার পথে ঘাপটি রে বসে থাকা শিকারীরা বন্দুক চালাতো। এটা একটা স্পোর্ট হিসেবেই গণ্য ছিল।

প্রজননকাল— জানুয়ারি থেকে মে। এই সময়ের মধ্যে স্থানবিশেষে এক এক জায়গায় এক এক ম প্রজননকাল। মাটি আঁচড়ে অল্প খোঁদল করে উন্মুক্ত স্থানেই বাসা বানিয়ে ডিম পাড়ে, সাধারণত টি, কখনও 2টি। ডিম দেখতে উপবৃত্তাকার, রং ধূসরাভ বা পাথুরে-হলদেটে, তার উপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পাটকিলের ছিট,এর মধ্যে কিছু মলিন ধূসর ও ল্যাভেণ্ডারের ছিটও থাকে। 23 দিনে ডিম ফোটে। ডিমের গড় মাপ— 36˙8 × 26˙2 মিমি। বাচ্চাদের জল খাওয়ায় নিজের ভেজা বুক বাচ্চার র কাছে নিয়ে এসে। ধারে-কাছে কোনো শত্রু এলে বাসা ছেড়ে কিছু দূরে গিয়ে আহত হবার ন করে শত্রুকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

1960-62 সালে বেশ কিছু পাখিকে আমেরিকার নেভাডা ও হাওয়াই রাজ্যে নিয়ে গিয়ে ছাড়া হয়েছিল। কারণ সেখানকার জমি ও আবহাওয়া আমাদের দেশের মতই। কিন্তু রিপোর্ট পাওয়া ভাট তিতিরদের বিদেশ পছন্দ হয় নি। 1965 সালের মধ্যেই সব উড়ে চলে যায়। একটিও নি।

কপোত বংশ

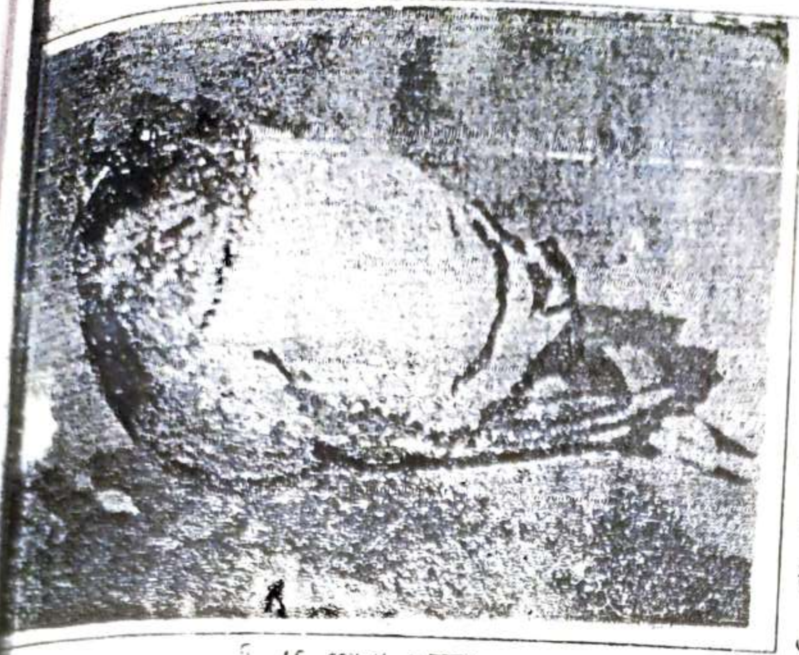
অনেকেরই ধারণা ঘুঘু (ডাভ) ও পায়রা (পিজিয়ন) দুটি আলাদা বংশ। পারাবত বর্গের (কলাম্বিফরমেস) অন্তর্গত কপোত বংশে (কলাম্বিডিদি) 7টি গণ, তার মধ্যে দুটি গণে (স্ট্রেপটোপেলিয়া ও চালকোফাপস্) আছে ঘুঘু। কপোত বংশের গণগুলি হল— কণ্ঠকেশ (ক্যালোএনাস), হরিতালক (ট্রেব্ন্), হারীত (চালকোফাপস্), দুকুল (ডুকুলা), দীর্ঘবর্হ (ম্যাক্রপাইগিয়া), কপোত (কলাম্বিয়া), এবং পাণ্ডুক (স্ট্রেপটোপেলিয়া)। দীর্ঘবর্হ ঠিক পুরোপুরি ঘুঘু নয় কেবল মাথাটা ছাড়া। হিমালয়ের বাসিন্দা। নেপালে বলে 'তুসাল' (কুক্কু ডাভ)।

কণ্ঠকেকা নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পাখি। এই বইতে যে সব গণ শুধু পশ্চিমবঙ্গেই দেখা যায়, তাদের নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

কপোত বংশে একটি পায়রা আজ অবলুপ্ত। তার নাম— দেশভ্রমণকারী পায়রা— প্যাসেঞ্জার পিজিয়ন (একটোপিসটেস মাইগ্রেটোরিয়াস)। এরা বাস করত যুক্তরাস্ট্র ও কানাডার রকি পর্বতের পূর্বাংশে। সংখ্যায় ছিল অজস্র কিন্তু এত অল্পসময়ের মধ্যে এদের অবলুপ্ত হওয়াটা বিস্ময়ের ব্যাপার। এদের ঝাঁকের যে হিসাব পাওয়া যায় তা হচ্ছে, চওড়ায় আধমাইলের উপর এবং লম্বায় বহু মাইল। এরা আকারে ঘুঘুর মতো, কেবল লেজ বেশ লম্বা। মানুষের হাতে লক্ষ লক্ষ মারা পড়েছে এটা ঠিক, তবুও সন্দেহ হয় একমাত্র মানুষই কি এদের অবলুপ্তির পথে ঠেলে দিয়েছে ? এই বন্য পায়রার ঝাঁককে শেষ দেখা গিয়েছে 1899 খ্রিস্টাব্দে এবং শেষ যেটি বন্দীজীবন যাপন করেছিল সিনসিন্নাটির চিড়িয়াখানায় তার মৃত্যু হয় 1914 সালে।

গোলা পায়রা

কাক, চড়াই, শালিক, চিলদের সঙ্গে আরেকটি পাখি আমাদের খুবই পরিচিত। তাকে দেখা যায় শহরে, গঞ্জে, হাটে, বাজারে, রাস্তায়, ঘাটে সর্বত্র, এমনকি কারখানা, গুদাম, রেলস্টেশন, পুরনো অট্টালিকা, মসজিদ, মন্দিরেও। তাকে আমরা বলি গোলা পায়রা, কেলে গোলা, কোথাওবা জালালী পায়রা (কলাম্বা লিডিয়া), ইংরেজি— *রক পিজিয়ন, রক ডাভ*, হিন্দি— *কবুতর*, গোলা পায়রা লম্বায় 33 সেমি (13 ইঞ্চি)। নীলচে-ধূসর দেহে চকচকে ধাতব-সবুজ, বেগুনি ও ম্যাজেণ্টার ঝলক বুকের উপরের অংশ এবং ঘাড়-গলাকে ঘিরে। ডানায় দুটি কালো পটি। কনীনিকা কমলা, চঞ্চু পাটকিলে-কালো, চঞ্চুর গোড়ায় মোমের মতো অনাবৃত ঝিল্লী ধূসর-সাদা। পা ও আঙ্গুল ম্যাজেণ্টা, নখর পাটকিলে-কালো। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।


চি. 45. গোলা পায়রা

বাসস্থান— সমগ্র ভারত, নেপাল, ভূটান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জের সমতল ও 3 হাজার মি. উচ্চতার মধ্যে। 1898 খ্রিস্টাব্দে কারনিকোবর দ্বীপে বসবাস করানোর চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু তা সাফল্যলাভ করে নি। পাহাড়ের দুরারোহ পার্শ্বদেশ, গুহাকন্দর, গিরিখাত থেকে জনবহুল শহরে সর্বত্রই এদের বসবাস। ভারতের বাইরে বর্মা, থাইদেশ, দক্ষিণ ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা, মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া।

খাদ্য— জনার, জোয়ার ইত্যাদি রকম খাদ্যশস্য, মুগ, মুসুর ইত্যাদি ডাল, চিনাবাদাম, ঘাস ও যে কোনও আগাছার বীজ, ছোট কন্দ, শস্যখেতের নবীন চারা। এছাড়া পাকস্থলীতে পাওয়া যায় বালি ও পাথরের শক্ত কণিকা। কে বক-বকম-বক। হিন্দি ভাষীদের মতে গুটুর-গু'।

স্বভাব— গোলা পায়রার ঐতিহ্য বহুদিনের। 3 হাজার খ্রীঃ পূঃ প্রাচীন মিসরেও এর অস্তিত্বের র পাওয়া যায়। মধ্য এশিয়ায় তারও আগে। তখন থেকেই হাজার হাজার বছর ধরে পত্রবাহকের জ করে আসছে। এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও পত্রবাহকের কাজে এদের ব্যবহার করা হয়েছে। লা পায়রার আদি পুরুষ থেকে শুধু নতুন নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয় নি, সেই সঙ্গেই উদ্ভুত হয়েছে র বৈচিত্র্য, আকার, পালকবিন্যাস এবং স্বরের হেরফেরও। গোলা পায়রা বন্য অবস্থায় ানিবাসী। এইভাবে বাস করে সঙ্কীর্ণ শৈলশিরায় পাহাড়ের ফাটল ও গর্তে, ধ্বংসপ্রাপ্ত গিরিদুর্গ, ীন ধ্বংসাবশেষ অট্টালিকা, পুরোন কুয়োর ভিতরে। কিছু কলোনি দেখা যায় বন্য খেজুরগাছের ল ও গাঁয়ের ধারে বড় বড় গাছে। এইসব জায়গা থেকে কয়েক-শ'র দলে সকাল সন্ধ্যায় গাঁয়ে া-যাওয়া করে। মাঠে পড়ে থাকা শস্যের কাছে এবং মাড়াইয়ের জায়গায় এসে জড়ো হয়। রোপা খাদ্যশস্য, ডাল, চিনাবাদাম ইত্যাদির বীজ পা দিয়ে মাটি খুঁড়ে তুলে চাষীদের বেশ ক্ষতিসাধন । ওড়াটা খুব দ্রুত। ঘন ঘন পাখা আন্দোলন করে লেজ খানিকটা হাতপাখার মতো ছড়িয়ে ওড়ে। মাঝে মাঝে সাবলীলভাবে গোঁত্তা খেয়ে বাঁক নেয় এবং নামার আগে উপরে একটু উঠে নামে। প্রজননকালে উড়তে উড়তে পিঠের উপর দুই ডানা উপরে তুলে করতালির মতো াত করে। শহরে ও গ্রামে মানুষজনকে ভ্রূক্ষেপ করে না। যেখানে-সেখানে বাসা বেঁধে চতুর্দিক য় নোংরা করে। কিছু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি নিয়ম করে প্রত্যহ এদের খেতে দেন এবং অনেকেই এদের রকম ক্ষতি করার কথা ভাবেন না। তার ফলে একটা বেপরোয়াভাব এদের মধ্যে গড়ে উঠেছে। ালিত পায়রাদের সঙ্গে অবাধ মিলনের ফলে নানা বিশৃঙ্খল জাতেরও সৃষ্টি হয়েছে। এই বর্গের

পাখিরা চঞ্চু ডুবিয়ে জল চুষে পান করে যা আর কোনো বর্গের পাখির মধ্যে দেখা যায় না। প্রজননকালের কোনো স্থিরতা নেই। বছরের যে কোনও সময়ে ডিম পেড়ে থাকে। বছরে দু'বার তো ডিম দেয়ই, তাছাড়া আরও দু'একবার দিয়ে থাকে। বর্ষাকালে এদের প্রজনন কিছু কম। যে কোনও ফোকর, কার্নিস, খিলান, কড়িবরগার পাশে, যেখানে সুবিধে সেখানেই কাঠিকুটো নানারকম আবর্জনা, কিছু পালক ইত্যাদির সঙ্গে নিজেদের বিষ্ঠা মিশিয়ে এক দুর্গন্ধপূর্ণ নোংরা বাসা বানায়। 2টি সাদা মসৃণ উপবৃত্তাকার ডিম পাড়ে। ডিম ফোটে 16 দিনে। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই বাসা বাঁধা থেকে ডিমে তা' দেওয়া এবং ঘরগেরস্থালীর সব কাজই করে। সদ্যোজাত ছানাদের চঞ্চুর মধ্যে চঞ্চু ঢুকিয়ে অর্ধভুক্ত খাদ্যশস্য গলিত অবস্থায় উগরিয়ে খাওয়ায়। একেই 'পায়রার দুধ' (পিজিয়ন মিল্ক) বলে।

দক্ষিণ ভারতে গোলা পায়রা নিয়ে দুটি কাহিনী খুব চালু। প্রথমটি কোঙ্কন সমুদ্রবেলায় রত্নাগিরির 15 কিমি দূরে সমুদ্রের মধ্যে ভেনগুরলা পাহাড়ের, আর দ্বিতীয়টি গেরসোপ্পা বা জোগ জলপ্রপাতের গায়ে পাহাড়ের খাঁজে ও গুহায়। এরা মাঠ থেকে ধান এনে নাকি সঞ্চয় করে বর্ষাকালে খাবে বলে। কথিত আছে, গেরসোপ্পায় গোলা পায়রার ধানসংগ্রহ এত বেশি হতো যে সেখান থেকে ধান এনে বোম্বাই সরকার তা নিলাম ডেকে পাঁচশ' টাকায় বিক্রি করতেন। এ প্রায় একশ' বছর আগের ঘটনা। এই বিক্রির নথিপত্তর সব নষ্ট হওয়াতে সব প্রমাণ লোপ পেয়েছে। যেসব লোক পাহাড়ের চূড়া থেকে ঝুড়িতে বসে দড়ি করে নেমে এসে ধান সংগ্রহ করত, তাদের মধ্যে একজনের দড়ি ছিঁড়ে যাওয়ায় সে মৃত্যুমুখে পড়ার জন্যে বাৎসরিক 70-80 কুইন্টাল ধান সংগ্রহ বন্ধ হয়ে যায়। দুঃসাহসের পরিচয় আর কেউ দেয় নি। ভেনগুরলা পাহাড়ের গল্পটাও অসম্ভব বলে মনে হয়। তীর থেকে দূরত্ব 15 কিমি এবং কাছে-পিঠে ধানক্ষেতও নেই। এই ধানসঞ্চয় কোনমতেই সম্ভব নয়।

গোলা পায়রার বংশোদ্ভুত যেসব পায়রা পশ্চিমবঙ্গে পোষা হয় তাদের মধ্যে লক্কা, মুখ্খী, সেরাজু, পরপণ, পাউটার, ক্যারিয়ার, জেকোবিন ইত্যাদি প্রধান। গোলা পায়রার মতো দেখতে আকারে কিছু বড় পত্রবাহক হোমার পায়রাও অনেকে পোষেন। কলকাতায় এদের বাৎসরিক দূরপাল্লার ওড়ার প্রতিযোগিতাও হয়। এরা প্রায় 50-55 মাইল বেগে ওড়ে।

তিলে ঘুঘু

তখন কতইবা বয়েস, আট-নয়েক হবে। সবে স্কুলে ভর্তি হয়েছি। গরমের ছুটিতে গিয়েছি মামার বাড়ি মজিল পুরে। শিয়ালদা থেকে ট্রেনে করে মগরাহাটে নেমে ছই দেওয়া সালতি বা ডোঙায় চেপে খালের উপর দিয়ে গিয়ে পৌঁছেছি বিকেলের দিকে। সন্ধ্যের পরেই বাড়ির আশপাশের বড়ো বড়ো আম-জাম-কাঁঠাল-জামরুল গাছগুলো মনে হতে লাগল নিঃশব্দে আমাদের দেখছে। সে এক অপার্থিব আবহাওয়া। সকলেই হাসাহাসি গল্পগুজব করছে, আর আমি ভয়ে সিঁটিয়ে দেওয়ালের কোল ঘেঁষে তক্তপোষে বসে আছি। ভয় করছে সেটা প্রকাশ করতে পারছি না, পাছে হাস্যাস্পদ হই। নিস্তব্ধ রাতে নানারকম আওয়াজ। শুনছি কারা যেন কর্কশ তীক্ষ্ণস্বরে 'ট্চক্-টংক্-কুটরু-কুটরু-চিররুক-চিররুক-চিবক-চিইবক'। কাকে চিবোবে ? কি করে যে প্রথম রাত কেটেছিল তা আজ মনে পড়লে হাসি পায়।



চি 46. তিলে ঘুঘু

সকাল হতেই সাহস ফিরে এল। কানে এল কত মিষ্টি মিষ্টি পাখির সুর ও শিস। কারুরই নাম জেনি না, চিনি না। দুপুরের খাওয়ার পর গুরুজনদের তাড়নায় বিছানায় শুয়েছি। বিষন্ন দুপুর। হঠাৎ কানে এল এক বিষাদভরা সুর, 'ঘুরুর-ঘুরর ঘুরুউ-ঘু-ঘু-ঘু-ঘুঁন্। মন উদাস হয়ে যায়। ছোটমাসিমার ছেলে গবুদা আমার চেয়ে বছর তিনেকের বড়। ওখানকার স্কুলেই পড়ে। সকাল থেকেই পল্লীগ্রামের জীবনযাত্রা ও নানারকমের দুষ্টমিতে দীক্ষা দিয়ে চলেছে। তাকে ডাকটা কার জিজ্ঞাসা করতেই বলল, আয় দেখবি আয়। জানলার ধারে গিয়ে দেখি ঘাসের উপর চরছে গোলা পায়রার আকারের একটা পাখি। একটু ছোটো, রোগাটে, তবে দেখতে সম্পূর্ণ আলাদা। ঘাসের মধ্যে কখনও আস্তে কখনও দৌড়ে চলছে। পাখি দু'টির দেহের উপরাংশ গোলাপী-পাটকিলে ও ধূসর, তার উপর সাদা ছিট ছিট। ঘাড়ের দু'পাশে একটু নিচে দাবার ছকের মতো সাদা-কালো ঘর কাটা। লেজ কালচে-পাটকিলে এবং স্লেট-রঙা। লেজের শেষে সাদা পটি, লেজের মাঝের দু'জোড়া পালক পাটকিলে। এক সময় এর জোড়াটা পাখার পট পট শব্দ তুলে গোলাপজামের গাছ থেকে নেমে এল। নামার সময় লেজটা হাতপাখার মতো ছড়াতে দেখলাম। নিম্নাংশ লালচে-ধূসর, গলার কাছের রঙ অনেক ফিকে। পেট, তলপেট ও লেজের তলাটা সাদা। কনীনিকা ফিকে লালচে-পাটকিলে, চোখের গোলপাতা হালকা টকটকে-লাল, চঞ্চু গাঢ় সীসে-পাটকিলে,পা ও আঙুল উজ্জ্বল ম্যাজেন্টা, নখর পাটকিলে। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

পাখি দুটো পারাবাত বর্গের অন্তর্গত কপোত বংশের (কলাম্বিদি) *এক প্রজাতি।* নাম— তিলে ঘুঘু, ছিটে ঘুঘু (স্ট্রে পটোপেলিয়া চাইনেনসিস স্যুরাটেনসিস), হিন্দি— *পার্কি, পান্ডুক,* ইংরেজি— স্পটেড ডাভ। লম্বায় 30 সেমি।

বাসস্থান— পাকিস্তানের মরুভূমি-প্রধান অঞ্চল ছাড়া, 2400 মি. উচ্চতার মধ্যে ভারতে সর্বত্র ও বাংলাদেশ। দেখা যায় যে কোনো বাগান, তরুবীথিকা, চষাখেত এবং ছায়াঘেরা জঙ্গলে। খাদ্যান্বেষণে কিছুটা এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে।

খাদ্য— ধান, জোয়ার ও অন্যান্য খাদ্যশস্য, মসুর কলাই ইত্যাদি ডাল, ঘাসের এবং আগাছার বীজ।

স্বভাব— ডাকে 'ঘুঘুর-ঘু' করে কিন্তু কারুর কারুর ডাকের মধ্যে শোনা যায় সুরের নানা কারুকার্য। তিলে ঘুঘু সামান্য আর্দ্রভূমি পছন্দ করে। হয় জোড়ায় না হয় ছোট দলে ধান বা অন্যান্য শস্য কাটার পর, গরুর গাড়ির রাস্তার উপর, যে কোনো বাড়ির উঠোন, বাড়ির বারান্দায় এবং

গ্রাম্য পরিবেশে দেখা যায়। কোনো কারণে উত্তেজিত হলে হঠাৎ মাটি থেকে যখন ওড়ে তখন পাখার ঝাপটে খুব আওয়াজ হয়, আর উড়তে উড়তে বেঁকে এপাশ ওপাশ করে। ওড়াটা বেশ জোরে, মাঝে মাঝে ভাসা আর গাছের ডালে বা অন্য কোথাও বসার সময় লেজটা হাতপাখার মতো ছড়িয়ে দেয়। প্রাকমিলনের আগে পুরুষ প্রণয়-প্রার্থনা জানায় একটু ঝুঁকে মাথা ওঠানামা করতে করতে, গলা ফুলিয়ে মুখে ঘুঁ ঘুঁ ডাকে এবং লেজ নামিয়ে কখনও জোড়পায়ে লাফিয়ে কখনও একপা দুপা করে এগিয়ে। শূন্যেও খেলা দেখায়। গাছের মাথা বা কোনো পোস্টের উপর থেকে কোনাকুনি ভাবে উড়ে ঘন ঘন ডানার ঝাপটের শব্দ করে নিচে নামতে থাকে, সেই সঙ্গে লেজ ছড়িয়ে দিয়ে একটা মাধুর্যপূর্ণ আধাবৃত্ত রচনা করে। মুখে ঘুঁ ঘুঁ আওয়াজ।

বাসা বাঁধে প্রধানত এপ্রিল থেকে জুলাইয়ে। আবার কোথাও বছরের যে কোনো সময়ে গাছের নিচের দিকে বা কাঁটাঝোপের ভিতর অথবা বেঁটে খেজুরগাছের মাথার উপরে বাসা বাঁধে। এছাড়াও দেখা যায় পাথরের খোঁদলে, কার্নিসের কোণে এবং বাংলোবাড়ির বারান্দার বরগার কোণায়। বাসার উপাদান কিছু কাঠি ও ঘাসের গোড়া, মাঝখানটা একটু বসা। ডিম পাড়ে সাধারণত 2টি, ক্বচিৎ 3টি মসৃণ সাদা। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই বাসা বাঁধা থেকে সন্তান পালন পর্যন্ত পরস্পরকে সাহায্য করে। ডিম ফোটে মনে হয় 13 দিনে, সঠিক সময় নির্ণয় এখনও হয় নি। ডিমের গড় মাপ— 27·2 × 21·8 মিমি। ডিমে যখন তা' দেয়, তখন কোনো অনধিকারীর আগমন ঘটলে খেপে যায়। ঘন ঘন নাকিসুরে ঘুঁ ঘুঁ আওয়াজের সঙ্গে মহাবিক্রমে তেড়ে যায়। আবার দেখা যায় কোনো কাক ডিম বা ছানা চুরি করে পালাচ্ছে, আর তার পিছনে মারমুখী হয়ে তাড়া করে চলেছে। ঐ পর্যন্তই। কোনো সঙ্ঘর্ষ হয় না। খানিকটা তাড়া করে ছেড়ে দেয়। কাকটা একটু অবাক হয় মাত্র কিন্তু তার দুষ্কর্মের জন্যে কোনোরকম লজ্জা বোধ নেই। বিষাদসুরে ডাক শোনার জন্যে অনেককে খাঁচায় তিলে ঘুঘু পুষতে দেখেছি। মরিশাসে ভারত থেকে নিয়ে গিয়ে বসবাস করানো হয়েছে।

ছবিতে তিলে ঘুঘুর তলায় যে পাখিটি রয়েছে সেটি পাড় ঘুঘু।

হরিয়াল

পাখি দেখা, চেনা ও পোষার যুগে আমি দু-জনের সঙ্গী ছিলাম। দলপতি ক্রিকেটার কার্তিক বসু ও তাঁর ভাই বাপী। এঁরা দু'জনে আমার চেয়ে অনেক অগ্রসর ছিলেন। আমি ছিলাম শিক্ষানবিশ। মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গে দু-একজন জুটতেন কিন্তু তাঁরা নিত্যসঙ্গী ছিলেন না।

এক দুপুরে বেলগাছিয়া ট্রাম ডিপোয় এসে নেমেছি। ঐ ট্রাম ডিপোর উল্টোদিকে ছিল মার্টিন কোম্পানির ছোটো ট্রেনের স্টেশন শ্যামবাজার। আমরা লাইনের পাশ দিয়ে পাকা পিচ-বাঁধান রাস্তা ধরে এসেছি পাতিপুকুর স্টেশনে। এর উল্টোদিকে থাকতো পাখিধরা বেদেরা, যারা প্রতি রবিবার সকালে হাতিবাগানের হাটে বিক্রির জন্যে নিয়ে আসতো হরেক রকমের পাখি। সেখানকার বাসিন্দারা সবাই আমাদের পরিচিত। পাওয়া গেল এক সতীশকে, আর সবাই পাখির খোঁজে বেরিয়ে গেছে। আমাদের ডাকে পাখিধরার জন্যে সাতনলা, চৌধুরির কাঠি, বাঁশের খোলে রাখা সরষের তেলে জ্বাল দেওয়া



চি 47. হরিয়াল

বট-পিপুলের আঠা, আর মাটির ছোটো ভাঁড়ে গোটাকতক ধুরঘুরে পোকা নিয়ে সে বেরিয়ে এল।

সতীশ আমাদের সঙ্গে অনেক ঘুরেছে। তার কথামতো লাইনের পাশ দিয়ে পিচের রাস্তা ধরে চললাম। খানিকটা গিয়ে রাস্তাটা বেঁকে চলে গেছে দমদম নাগের বাজারের দিকে। আমরা রেল লাইনের উপর দিয়ে চলে পৌঁছলাম নন্দীগ্রাম। এরপরের স্টেশন বাগুইহাটি। এই দুই স্টেশনের মাঝে দু'দিকে ঘন গাছপালা, জনহীন বাগানবাড়ি ইত্যাদি তখন পড়ত। আমরা লাইন ছেড়ে নেমে যেতাম তলায় আগাছায় ভরা বড়ো বড়ো গাছপালার মধ্যে। সেদিন বেশ খানিকটা ঢোকার পর একটা ঝাঁকড়া বটগাছের কাছে এলাম। অজস্র বটফল পেকেছে। দেখতে পেলাম দশ-বারটি পাখি পাতার আড়ালে। কেউ চুপ করে বসে আছে, কেউ বটফল খাচ্ছে। আমরা কাছে আসাতে সব স্ট্যাচু হয়ে গেল। পাতার রঙের সঙ্গে যেন মিলিয়ে গেল। আমার নজরেই প্রথম পড়ে। গোলা পায়রার মতো পাখি কিন্তু রঙ একদম আলাদা। আমি কলকে দেখাতেই তাঁরা নাম বলে উঠলেন। নামটার সঙ্গে আমি পরিচিত কিন্তু এর আগে চাক্ষুষ খনও দেখি নি।

দুটি নমুনা সংগ্রহ হল। তখন দেখলাম, হলদে জলপাই-সবুজ এবং ছাই-ধূসর রঙের পাখি। ঘাড়ে লচের ছোপ, ডানায় সবজেটে-কালোর উপর হলদে টান। পা ও আঙুল উজ্জ্বল ধাতব-হলুদ, নখর কে ধূসর। কপাল সবজেটে-হলুদ, বুক, বুকের দু-পাশ ও পেট ধূসর। কনীনিকার বাইরের গোল ংটি গোলাপি, ভিতরটা উজ্জ্বল নীলার মতো নীল। চঞ্চু ফিকে ধূসর, গোড়াটা মোমের মতো উন্মুক্ত ল্লীসমেত সবজেটে, মুখের ভিতরটা ধূসরাভ-গোলাপি, দ্বিতীয় নমুনার ভিরতটা ছিল ধূসরাভ-হলুদ। খলাম মুখের ভিতরটা দু-রকম রঙেরই হয়। স্ত্রী-পাখি একটু ছোটো, বিশেষত ডানাটা। পাখি দুটো রাবত বর্গের (কলাম্বিফরমেস) অন্তর্গত কপোত বংশের (কলাম্বিদি) এক *প্রজাতি*। নাম— হরিয়াল ট্রন ফোএনি কপটেরা), ইংরেজি— *গ্রীণ পিজিয়ন*। লম্বায় 33 সেমি (13 ইঞ্চি)।

বাসস্থান— প্রায় সমগ্র ভারত, পাকিস্তান, উত্তর ভারত, রাজস্থান থেকে হিমালয়ের পাদদেশ ধরে নেপালের নিম্নভূমি সহ গাঙ্গেয় উপত্যকা, বিহার, উত্তর ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, আসামে ব্রহ্মপুত্রের ও দক্ষিণাংশ, মণিপুর ও বাংলাদেশ। ভারতের দক্ষিণাংশে ওখানকার *প্রজাতির* (ট্রে ফো



চি 47 হরিয়াল

বট-পিপুলের আঠা, আর মাটির ছোটো ভাঁড়ে গোটাকতক ঘুরঘুরে পোকা নিয়ে সে বেরিয়ে এল।

সতীশ আমাদের সঙ্গে অনেক ঘুরেছে। তার কথামতো লাইনের পাশ দিয়ে পিচের রাস্তা ধরে চললাম। খানিকটা গিয়ে রাস্তাটা বেঁকে চলে গেছে দমদম নাগের বাজারের দিকে। আমরা রেল লাইনের উপর দিয়ে চলে পৌঁছলাম নন্দীগ্রাম। এরপরের স্টেশন বাগুইহাটি। এই দুই স্টেশনের মাঝে দু'দিকে ঘন গাছপালা, জনহীন বাগানবাড়ি ইত্যাদি তখন পড়ত। আমরা লাইন ছেড়ে নেমে যেতাম তলায় আগাছায় ভরা বড়ো বড়ো গাছপালার মধ্যে। সেদিন বেশ খানিকটা ঢোকার পর একটা ঝাঁকড়া বটগাছের কাছে এলাম। অজস্র বটফল পেকেছে। দেখতে পেলাম দশ-বারটি পাখি পাতার আড়ালে। কেউ চুপ করে বসে আছে, কেউ বটফল খাচ্ছে। আমরা কাছে আসাতে সব স্ট্যাচু হয়ে গেল। পাতার রঙের সঙ্গে যেন মিলিয়ে গেল। আমার নজরেই প্রথম পড়ে। গোলা পায়রার মতো পাখি কিন্তু রঙ একদম আলাদা। আমি সকলকে দেখাতেই তাঁরা নাম বলে উঠলেন। নামটার সঙ্গে আমি পরিচিত কিন্তু এর আগে চাক্ষুষ কখনও দেখি নি।

দুটি নমুনা সংগ্রহ হল। তখন দেখলাম, হলদে জলপাই-সবুজ এবং ছাই-ধূসর রঙের পাখি। ঘাড়ে লালচের ছোপ, ডানায় সবজেটে-কালোর উপর হলদে টান। পা ও আঙুল উজ্জ্বল ধাতব-হলুদ, নখর ফিকে ধূসর। কপাল সবজেটে-হলুদ, বুক, বুকের দু-পাশ ও পেট ধূসর। কনীনিকার বাইরের গোল আঙটি গোলাপি, ভিতরটা উজ্জ্বল নীলার মতো নীল। চঞ্চু ফিকে ধূসর, গোড়াটা মোমের মতো উন্মুক্ত ঙ্গীসমেত সবজেটে, মুখের ভিতরটা ধূসরাভ-গোলাপি, দ্বিতীয় নমুনার ভিরতটা ছিল ধূসরাভ-হলুদ। বুঝলাম মুখের ভিতরটা দু-রকম রঙেরই হয়। স্ত্রী-পাখি একটু ছোটো, বিশেষত ডানাটা। পাখি দুটো পারাবত বর্গের (কলাম্বিফরমেস) অন্তর্গত কপোত বংশের (কলাম্বিদি) এক *প্রজাতি*। নাম— হরিয়াল (ট্রেরন ফোএনি কপটেরা), ইংরেজি— *গ্রীণ পিজিয়ন*। লম্বায় 33 সেমি (13 ইঞ্চি)।

বাসস্থান— প্রায় সমগ্র ভারত, পাকিস্তান, উত্তর ভারত, রাজস্থান থেকে হিমালয়ের পাদদেশ ধরে পূবে নেপালের নিম্নভূমি সহ গাঙ্গেয় উপত্যকা, বিহার, উত্তর ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, আসামে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ও দক্ষিণাংশ, মণিপুর ও বাংলাদেশ। ভারতের দক্ষিণাংশে ওখানকার *প্রজাতির* (ট্রে ফো ক্লোরিগাস্টার) সঙ্গে মিলেমিশে থাকে। তফাত হল দক্ষিণী হরিয়ালের তলাটা সর্বত্র উজ্জ্বল- হলুদ। ভারতের বাইরে বর্মা, থাইল্যাণ্ড থেকে ইন্দোচীনীয় অঞ্চলে দেখা যায়।

খাদ্য— বট-পিপুল ইত্যাদি ডুমুর জাতীয় ফল এবং জলপাই, কুল, জাম ইত্যাদি ফলও। এককথায় এরা ফলাহারী।

স্বভাব— ডাকে নিচুস্বরে খানিকটা গারগল করার মতো আওয়াজে মিষ্টি করে। হরিয়াল বৃক্ষবাসী, ক্বচিৎ মাটিতে নামে। গাছপালা সমৃদ্ধ জায়গাতে যেমন থাকে তেমনি থাকে জঙ্গলেও। প্রায়ই দেখা যায় শহর ও গ্রামের ধারে ঝাঁকড়া গাছে, এমনকি মানুষজনের বাগানেও। ফলন্ত গাছের সরু ডাল ধরে ঝুঁকে অথবা পা আঁকড়ে নিচু মুখ করে ঝুলে ফল ছিঁড়ছে। সাধারণত 10 থেকে 50 -এর দলে ঘোরাফেরা করে। সময় সময় পাকা বট-পিপুলের ফল খেতে আরও বড় দলে এসে হাজির হয়। ওদের সঙ্গে হাজির হয় শালিক, ধনেশ, বুলবুল এবং অন্যান্য ফলাহারী পাখি। কারুর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি নেই। মিলেমিশে খেয়ে চলে।

হরিয়ালের কাছাকাছি এলেই ওরা স্ট্যাচু হয়ে যায়। গাছপালার রঙের সঙ্গে এমনভাবে মিশে যায় যে ধরাই যায় না। একমাত্র নড়াচড়া করলেই ওদের অস্তিত্ব বোঝা যায়। সেই সময় শিকারীরা বন্দুক ছুঁড়লে ফটফট করে উড়ে গিয়ে বসে কাছেপিঠের গাছে,কখনও দূরে যায় না। অবস্থা শান্ত হলে সেই ফলভরা গাছেই দু-চারটি করে আবার সবাই ফিরে আসে। ওড়াটা ডানার আওয়াজের সঙ্গেই দ্রুত এবং সোজাসুজি।

প্রজননকাল— মার্চ থেকে জুন। এর দু-একমাস আগে-পরেও হতে দেখা গেছে। মাঝারি উচ্চতার গাছে পাতার ফাঁকে লুকিয়ে দুই সরু ডালের মাঝে কাঠির টুকরো দিয়ে বুনে বাসা বানায়, জঙ্গল, গ্রামের ধারে বা যে কোনো বাগানে। দেখা যায় যে গাছে ফিঙে বাসা বেঁধেছে সেই গাছ পছন্দ করে বেশি। কতোয়াল ফিঙে সবসময়েই হরিয়ালের ডিম ও ছানাদের রক্ষা করে কাক হাঁড়িচাচাদের হাত থেকে। ডিম পাড়ে 2টি অর্ধবৃত্তাকার চকচকে সাদা রঙের। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই বাসা বাঁধা থেকে তা দেওয়া সবই করে, কিন্তু ক'দিনে ডিম ফোটে তা ঠিক নির্ণয় হয় নি। ডিমের গড় মাপ— 31.8 × 24.6 মিমি।

সোনা কবুতর

সেই যেবার মেদিনীপুরের শালবনীতে গিয়েছিলাম প্রাকৃতিক পরিবেশে মেদিনীপুরী ময়না দেখতে এবং বৈদাৎ দেখা পেয়েছিলাম ঢোল বা বুনো কুকুরদের, সেবার একটা নতুন পাখিও দেখেছিলাম। সালটা 1960 থেকে 62 -র মধ্যে হবে, কারণ ঐ সময়ের মধ্যে খসড়া বা ফিল্ড ডায়েরিটা হারিয়েছি।

ঢোলরা দুলকি চালে শিসের মতো শব্দ তুলে জঙ্গলে ঢুকে যাবার পর, জিপটা নিয়ে খানিকটা গিয়ে একটা জঙ্গলের ধারে নেমে তার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। এই জঙ্গলে রয়েছে বেশ কিছু বট-পাকুড় ও বুনো ডুমুর জাতীয় গাছ। ময়না দেখার আশায় এদিক-ওদিক যেতে যেতে তাকাচ্ছি গাছের মাথায়। এমন সময় দেখি একটা গাছের একদম মাথায় উপরে নেড়া ডালে বসে আছে বেশ বড় সাইজের এক পায়রার মত পাখি। সব পালক ফুলিয়ে পাখিটা রোদ পোহাচ্ছে। গোলাপি-ধূসর দেহ, পিঠ ও লেজ উজ্জ্বল ধাতব ব্রোঞ্জ-সবুজ, লেজের তলাটা বাদামী-লাল। এর আগে



চি 48. সোনা কবুতর

পাখিটাকে দেখেছিলাম বন্দীদশায় আলিপুরের চিড়িয়াখানায় আর ডঃ সত্যচরণ লাহার বাগানে। তাই দেখামাত্র চিনতে অসুবিধে হল না।

পাখিটা পারাবত বর্গের (কলাম্বিফরমেস) অন্তর্গত কপোত বংশের (কলাম্বিদি) *এক প্রজাতি*। নাম— সোনা কবুতর, বড় হরিয়াল (ডুকুলা ঈনিয়া সাইলভাটিকা), ইংরেজি— *গ্রীন ইম্পিরিয়াল পিজিয়ন*, হিন্দি— *ডুমকুল*। লম্বায় 43 সেমি (17 ইঞ্চি)। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। কনীনিকা গাঢ় লাল, চঞ্চুর ডগা সাদা, মাঝখানটা নীলচে-সাদা, গোড়া ও নাকের অনাবৃত ঝিল্লী বেগুনি-লাল। পা ও আঙুল মলিন বেগুনি-লাল বা টকটকে লাল, নখর লালচে শিঙে-পাটকিলে।

ডুকুলা গণে *তিনটি প্রজাতি*। ডুকুলা-ঈনিয়া ছাড়া বাকি দুটি হল, লাল-পিঠ (ডু বেডিয়া) ও সাদা-কালো (ডু-বাইকলার)। ডুকুলা-ঈনিয়ার সবশুদ্ধ *4টি উপজাতি*।

বাসস্থান— পূর্ব উত্তরপ্রদেশ থেকে পূর্বে বিহার, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং বাংলাদেশ। নেপালে দেখতে পাওয়াটা আশ্চর্যের হবে না। *দ্বিতীয় উপজাতি* 'দক্ষিণী সোনা কবুতর' (ডু ঈ প্যাসিল্লা), তামিল— *পেরিইয়া পুরা*, ইংরেজি— *'সাদার্ণ গ্রীন ইম্পিরিয়াল পিজিয়ন'*।

বাসস্থান— উপদ্বীপাত্মক ভারতে 20°উঃ দেখা যায় চিরহরিৎ ও ভিজে পর্ণমোচীর জঙ্গলে 300 মি. উচ্চতার মধ্যে পাহাড়ের পাদদেশে এবং সমতলে। কখনও কখনও 600 মি. উচ্চতার মধ্যে দেখা যায়। খাদ্যান্বেষণে বেশ খানিকটা ঘোরাফেরা করে। ভারতের বাইরে বর্মা থেকে টেনা সেরিয়াম, উত্তর থাইল্যাণ্ড এবং ইন্দোচীনিয় অঞ্চল সমূহে।

খাদ্য— এরা পুরোপুরি বুনো ফলভোজী। ডুমুর জাতীয় এবং জঙ্গলের অন্যান্য ফলই খায়। পছন্দ করে জায়ফল (নাটমেগ)। শক্ত খোসাসুদ্ধ পুরোটাই গিলে ফেলে। হজমের পর বাকিটা উগরে দেয়। তলার চঞ্চুর গোড়াটা বেশ চওড়া, খাদ্যনালী ইচ্ছা মতো বড়ো করতে পারে। সেই কারণে 4 সেমি, পর্যন্ত চওড়া ফল সহজেই গলার মধ্যে ঢোকায়।

স্বভাব— ডাকে ভারী গলায়, মনে হয় অন্য কোনোখান থেকে আওয়াজ আসছে 'উক-উক-উইর্ উক-উইর,-উইর্'। শেষটা শোনায় যেন ব্যঙ্গের হাসির মতন।

সোনা কবুতরকে সাধারণত দেখা যায় একা বা জোড়ায়, কখনও বা 5-6- এর দলে। গাছ যখন ফলে ভরে যায় তখন 20-30 -এর দলও এসে জমায়েত হয়। হরিয়ালদের মতো খুব বড় দলে ক্বচিৎ দেখা যায়। খুবই শান্ত এবং সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকে। খাদ্য সংগ্রহের সময়েও কখনও ঝগড়াঝাটি করে না। একে অন্যকে কখনও তেড়ে যায় না। রোদ ওঠার পর সকালে

বা সূর্যাস্তের আগে গাছের উপরে নেড়া ডালে বসে গায়ের পালক ফুলিয়ে রোদ পোহায়, যেমন আমি মেদিনীপুরের জঙ্গলে দেখেছিলাম। ওড়ে খুব দ্রুত কিন্তু পক্ষ চালনা দেখে সেটা মনেই হয় না। পাখা ঝাপটানোটা বেশ ধীরে-সুস্থে, তাতেই গতিবেগ তোলে। গাছের ডাল থেকে ওড়ার ঠিক আগে ঘুঘুদের মতো পাখার আওয়াজ তুলে ওড়ে। গাছের মাথা ছাড়িয়ে খুব উঁচু দিয়ে উড়ে নিজেদের পছন্দমতো খাদ্যভূমির দিকে যায়। জলপানের সময় মাটিতে নামে। আর নামে জঙ্গলে জন্তুদের লবণ চাটা (সল্ট লিক) জমির ধারে। সেখান থেকে নোনামাটির ছোটো ছোটো ডেলা তুলে খায়। প্রজননের সময় নীলকণ্ঠ পাখিদের মতো শূন্যে দোল খেয়ে একবার উপরে ওঠে, আরেকবার নামে। এছাড়া অন্যান্য পায়রাদের মতো মাথা নিচু করে প্রায় বুকে ঠেকিয়ে ঘন ঘন অভিবাদন করে মাথা ও ঘাড় দেখিয়ে।

প্রজননকাল— মার্চ থেকে জুন, তবে এপ্রিল-মে মাসেই বেশি। স্থানবিশেষে সময়ের কিছুটা হেরফের হয়। মাটি থেকে প্রায় 10 মিটারের মতো উচ্চতায় ঘন পাতাভরা চারাগাছে সরু সরু কাঠি দিয়ে প্ল্যাটফর্মের মতো বাসা বানায়। কোনো আস্তরণ বিছায় না, তাই তলা থেকে ফাঁক দিয়ে কি আছে না আছে দেখা যায়। ডিম পাড়ে সাধারণত 1টি, কচিৎ 2টি উপবৃত্তাকার অল্প চকচকে সাদা। ডিমের গড় মাপ – 45.4 × 33.5 মিমি। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই বাসা বাঁধা থেকে শুরু করে ডিমে তা দেওয়া ও সন্তান প্রতিপালন সবই করে। কতদিনে ডিম ফোটে তা এখনও জানা যায়নি।

অন্যান্য কপোত

কপোত বংশের আরও কয়েকটি গণের পাখিকে পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়, তারা হল—

1. **মোটাচঞ্চু হরিয়াল**— (ট্রেরন ক্যারভিরোস্ট্রা নিপালেনসিস)। বাংলা নামকরণ আলাদা করে করা হয় নি, সবই হরিয়াল। নেপালী— *থোরিয়া*, কাছাড়ি— *দাওরেপ বুকু গাজাও*, ইংরেজি— *থিকবিলড্ গ্রীন পিজিয়ন*। হরিতালক গণের (ট্রেরন) *এক প্রজাতি*।

পায়রার চেয়ে ছোটো, লম্বায় 27 সেমি (সাড়ে 10 ইঞ্চি)। মাথায় বাদামী আভা, ধূসর ও জলপাই-সবুজ লেজ, শেষটা ফিকে দারচিনি, খুব স্পষ্টভাবে হলুদ টান ডানার উপর। উজ্জ্বল-লাল ও সবজেটে মোটা চঞ্চু এবং চোখের চারপাশে পালকহীন উজ্জ্বল তামাটে-সবুজ চামড়া। পা ও আঙুল গাঢ় গোলাপি বা প্রবাল-লাল। স্ত্রী-পাখির মাথায় বাদামী আভাটি নেই, লেজের তলায় আচ্ছাদক সাদাটে এবং তার উপর ভাঙা ভাঙা গাঢ় সবুজের টান। কনীনিকার বাইরের গোল আঙটি সোনালি-হলুদ, ভিতরেরটা গাঢ় নীল, চঞ্চু ফিকে হলদেটে-সবজেটে আর সাদাটে-সীসে, গোড়াটা উজ্জ্বল প্রবাল-লাল,পা ও আঙুল লালচে-গোলাপি, কখনওবা প্রবাল-লাল।

বাসস্থান— হিমালয়ে পশ্চিম নেপাল থেকে পুবে সিকিম, উত্তরবঙ্গ বিশেষত ডুয়ার্স অঞ্চল, ভূটান থেকে পূর্ব অরুণাচলের শেষ সীমানায় 1500 মি-র উচ্চতার মধ্যে। এছাড়া ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণাংশের আসাম পাহাড়, মণিপুর ও বাংলাদেশের গাছে ঢাকা স্থানে ও জঙ্গলে। ভারতের বাইরে বর্মা, থাইদেশ ও ইন্দোচীনীয় অঞ্চল।

2. **ছোটো হরিয়াল**— (ট্রে পম্পাডোরা ফেরেই)। কাছাড়ি— *দাওরেপ*, নাগা— *ইনবুইগাম*, কুকি— *ভোহ্পলিপ*, অসমিয়া— *ছোটা হাইথা*, ইংরেজি— *অ্যাশিহেডেড গ্রীন পিজিয়ন*। হরিতালক গণের (ট্রেরন) *অপর একটি প্রজাতি।*

লম্বায় 24 সেমি (11 ইঞ্চি)। মাথা, ঘাড় গাঢ় ছাই-ধূসর, কপালটা ফিকে। মাথার দুধার সবজেটে-হলুদ, ঘাড়ের শেষটা সবুজ, পিঠ বাদামী-টকটকে লাল, বাকি উপরটা জলপাই-সবুজ, ডানা কালো তার উপর হলুদের চওড়া পটি। নিচে চিবুক, গলা, ঘাড়ের দু'পাশ সবজেটে-হলুদ, উপরের বুক কমলা, বাকি তলাটা জলপাই-সবুজ, লেজের তলার আচ্ছাদক দারচিনি। কনীনিকার বাইরের গোল গোলাপি, ভিতরের গোল ফিকে নীল, চোখের পাশে পালকহীন চামড়া নীলচে, চঞ্চু ধূসর, পা ও আঙুল গাঢ় লাল।

বাসস্থান— পশ্চিমবঙ্গ (এমনকি কলকাতার দক্ষিণে চব্বিশ পরগণা, সুন্দরবন), আসামে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চল, অরুণাচল, মণিপুর, বাংলাদেশে সমতল থেকে 1500 মি. উচ্চতার মধ্যে জঙ্গল ও ঘনগাছপালা ঢাকা অঞ্চলে।

3. **কমলাবুক হরিয়াল**— (ট্রে বিসিনক্টা বিসিনক্টা), অসমিয়া— *হাইথা*, তেলেগু— *পসপু পচ্ছাপাভুরামু*, ইংরেজি— *অরেঞ্জব্রেস্টেড গ্রীন পিজিয়ন*। হরিতালক গণের আর-এক *প্রজাতি।*

লম্বায় 29 সেমি (সাড়ে 11 ইঞ্চি)। দেহের উপরটা জলপাই-সবুজ, লেজ স্লেট-ধূসর, তার উপর কালচে পটি, একদম শেষে কালো পটি, তার ধারে ধূসরের ভাব। নিচে হলদেটে-সবুজ। বুকে উপরের অংশে একটা ফিকে নীলচে-লাল (লাইলাক) পটি, বাকি তলাটা কমলা, লেজের তলার আচ্ছাদক দারচিনি, ধারটা ফিকে হলুদ। কনীনিকার বাইরের গোল গোলাপি, ভিতরে সামুদ্রিক নীল, চোখের পাশে পালকহীন চামড়া উজ্জ্বল ল্যাভেন্ডার-নীল, চঞ্চু ফিকে নীল বা ফিকে সবুজ, পা ও আঙুল গাঢ় প্রবাল-লাল, নখর শিঙে-পাটকিলে।

বাসস্থান— উত্তর প্রদেশের তরাই ভাবর থেকে হিমালয়ের পাদদেশ ধরে নেপাল, উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স, আসামে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলসমূহ, মণিপুর, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ছোটোনাগপুর থেকে দক্ষিণে পূর্বঘাট, পশ্চিমঘাট ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, কেরালা, মহীশূরের জঙ্গল ও ঘন গাছপালার অঞ্চলে 1500 মি. উচ্চতার মধ্যে।

4. **বেগুনি বনপায়রা**— (কলাম্বা প্যুনিসিয়া)। বাংলায় নামকরণ হয় নি। অসমিয়া— *লালি পাগুমা*, কাছাড়ি— *দাওহুকুরুমা করো গোফু*, ইংরেজি— *ভায়োলেট উড পিজিয়ন*। কপোত গণের (কলাম্বা) *এক প্রজাতি।*

লম্বায় গোলা পায়রার চেয়ে 3 সেমি বড়ো, 36 সেমি (14 ইঞ্চি)। চাঁদি ও ঘাড় ধূসরাভ-সাদা, উপরাংশ গাঢ় বাদামী-পাটকিলে, বস্তিপ্রদেশ গাঢ় স্লেট, কালচে-পাটকিলে লেজ। নিম্নাংশ দ্রাক্ষারস-বাদামী। সমস্ত পালকে চকচকে ধাতব-সবুজ ও নীলকান্ত মণি রঙের আভা।

বাসস্থান— পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, পূর্ব মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলা, আসাম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর ও বাংলাদেশে 1600 মি. উচ্চতার মধ্যে জঙ্গলে যেখানে ঝোপঝাড়, কাছেপিঠে চাষাবাদ

আছে এবং ঘন গাছে ভরা গিরিখাতের ভিতরে। ভারতের বাইরে বর্মা, থাইদেশ, লাওস, উত্তর মালয় ও মধ্য ভিয়েতনাম।

১৩. **রাম ঘুঘু**— (স্ট্রেপটোপেলিয়া ওরিয়েন্টালিস এগ্রিকোলা), অসমিয়া— *পুকো*, কাছাড়ি— *দাওটু গাজাও*, মণিপুরী— *লেইমা খুনু* (অর্থাৎ দেবী পায়রা), ইংরেজি— *ইস্টার্ণ টার্টল ডাভ*। পাণ্ডুক গণের (স্ট্রেপটোপেলিয়া) *এক প্রজাতি*।

লম্বায় গোলা পায়রার মতন 33 সেমি (13 ইঞ্চি)। লালচে-পাটকিলে বড়ো ঘুঘু, ঘাড়ের দু'পাশে কালো দাবার ছক, গোল লেজের শেষে সাদা পটি। অনেকটা তিলে ঘুঘুর মতো দেখতে তবে পায়রার মতো গাঁট্টাগোট্টা। কনীনিকা কমলা, চোখের চারপাশে পালকহীন চামড়া ম্যাজেন্টা, চঞ্চুর গোড়া ম্যাজেন্টা বাকি অর্ধেকটা শিঙে-পাটকিলে, পা ও আঙুল ম্যাজেন্টা, নখর শিঙে-পাটকিলে।

বাসস্থান— মধ্য নেপালের 4000 মি. উচ্চতা থেকে পূবে সিকিম, ভূটান, অরুণাচল, ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণাংশের আসাম পাহাড় (1300 মি উচ্চতার মধ্যে), নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজো এবং বাংলাদেশের মিশ্র পর্ণমোচী জঙ্গলে। শীতে পরিযায়ী হয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে দক্ষিণে পূর্ব উপকূল ধরে।

১৪. **পাড় ঘুঘু**— (স্ট্রে ডেকাওকটো)। হিন্দি— *ধর ফাখটা, গুগি*, মারাঠি— *কভডা*, গুজরাটি— *ঢোল*, তেলেগু— *পেড্ডা বেল্লা গুওয়া*, অসমিয়া— *ছোট কপু*, কাছাড়ি— *দাওটা গোফু*, ইংরেজি— *ইন্ডিয়ান রিং ডাভ*। পাণ্ডুকগণের অপর *প্রজাতি*।

লম্বায় 32 সেমি (সাড়ে 12 ইঞ্চি)। ফিকে ধূসর ও পাটকিলে কপোত, ঘাড়ে একটা কালো আধা কলার। বুক নীলচে-লাল, তলপেট ছাই-ধূসর, লেজের তলার আচ্ছাদক গাঢ় ধূসর। কালচে লেজের শেষে সাদা পটি, সেটা দেখা যায় ওড়া এবং নামার সময়। কনীনিকা টকটকে লাল, চোখের পাতার ধার লাল, চোখের পাশে ছোটো পালকহীন চামড়া ধূসরাভ-গোলাপি, চঞ্চু পাটকিলে-কালো, পা ও আঙুল গাঢ় গোলাপি, নখর কালো। তিলে ঘুঘুর সঙ্গেই রয়েছে পাড় ঘুঘুর ছবি।

বাসস্থান— পাকিস্তান, সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা। সিকিম, ভূটানে নেই, মাঝে মাঝে নেপালের উপত্যকায় দেখা যায়। আন্দামান, নিকোবর, লাক্ষা, মালদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জেও নেই। ভারতের বাইরে হাঙ্গেরি, দক্ষিণপূর্ব ইওরোপ, এশিয়া মাইনর, তুর্কিস্তান, উত্তর চীন ও জাপান, দক্ষিণে প্যালেস্টাইন, ইরাক, পারস্য এবং পশ্চিম চীন। সম্প্রতি ইউনাইটেড কিংডম ও উত্তর স্ক্যান্ডেনেভিয়াতেও বাসা বেঁধেছে।

১৫. **কণ্ঠী ঘুঘু**— (স্ট্রে ট্রানকিবারিকা), অপর নাম গোলাপি ঘুঘু, লাল ঘুঘু, অসমিয়া— *হরুয়া কোপু*, কাছাড়ি— *দাওটু কাশিবা গাজু*, ইংরেজি— *রেড টার্টল ডাভ*। পাণ্ডুক গণের আর *এক প্রজাতি*।

লম্বায়— 23 সেমি (9 ইঞ্চি)। সৌষ্ঠবপূর্ণ রঙিন উজ্জ্বল ছোটো এক ঘুঘু। ধূসর-গোলাপি এবং ইট-লাল সারা দেহ, ঘাড়ের পিছনে সরু কালো কলার। কনীনিকা হালকা বাদামী, চোখের চারপাশ সীসে, চঞ্চু কালচে, মোমের মতো স্ফীত ঝিল্লীর নাসারন্ধ্রে সীসে ভাব, পা ও আঙুল মলিন লাল, নখর কালো।

বাসস্থান— পাকিস্তানে বেলুচিস্তান, সিন্ধু, পাঞ্জাব থেকে উত্তর প্রদেশ, নেপাল, সিকিম, আসামে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চল, মণিপুর, বাংলাদেশ, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। প্রজননকালে পরিযায়ী হয়ে আসে নেপাল উপত্যকা, ভাবর, দুন, পশ্চিমবঙ্গ, ও আসামের ডুয়ার্সে 1300 মি. উচ্চতার মধ্যে। ভারতের বাইরে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া (তিব্বত ও উত্তর চীন), দক্ষিণে বর্মা, থাইদেশ, ইন্দোচীনীয় দেশসমূহ এবং উত্তর ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে।

8. ছোটো ঘুঘু— (স্ট্রে সেনেগালেনসিস)। হিন্দি— *ছোটা ফাখটা*, অসমিয়া— *রাম কপু*, ইংরেজি— *লিটল ব্রাউন ডাভ, সেনেগাল ডাভ। পাণ্ডুক গণের এক প্রজাতি।*

তিলে ঘুঘুর চেয়ে ছোটো, লম্বায় 27 সেমি (সাড়ে 10 ইঞ্চি)। মাথা, ঘাড় নীলাভ-লালচে গোলাপি, ঘাড়ে কালো ও লালচে-হলুদের দাবার ছক, বাকি উপরের পালক মেটে-পাটকিলে, ডানার কাঁধে ধূসরের ছোপ, মোটা থেকে সরু লেজের বাইরের পালকের ডগা সাদা। বুক গোলাপি-পাটকিলে, বাকি তলাটা সাদা। কনীনিকা পাটকিলে, চোখের পাতা ফিকে ম্যাজেণ্টা, চঞ্চু পাটকিলে-কালো, পা ও আঙুল ম্যাজেণ্টা, নখর পাটকিলে-কালো।

বাসস্থান— পাকিস্তান ও ভারতে সর্বত্র, শুধু নেপাল, সিকিম, ভূটান ও আসামে নেই।

9. রাজ ঘুঘু— (চালকোফাপস্ ইন্ডিকা), মারাঠি— *পাড়ু কভডা*, তেলেগু— *আন্দি বেল্লাগুভ্ডা*, তামিল— *পাডাকি পুরা*, অসমিয়া— *মাটি কুপোহু*, কাছাড়ি— *দাওটুয়ালাই*, ইংরেজি— *ইন্ডিয়ান এমারেলড্ ডাভ। হারীত গণের (চালকোফাপস্) এক প্রজাতি।*

লম্বায় 27 সেমি (সাড়ে 10 ইঞ্চি)। মাথা ও ঘাড় ধূসর, কপাল ও ভুরু, সাদা, পিঠ ও ডানা উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ মেশানো পান্না-সবুজ, নিচের পিঠে আড়াআড়িভাবে সাদা পটি, ডানার ঘাড় দ্রাক্ষারস-ধূসরে সাদা পটি, বস্তিপ্রদেশ ধূসর, লেজ পাটকিলে ও ধূসর, তার উপর চওড়া করে কালো পটি কিন্তু তার মাঝখানটা ভাঙা। কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু প্রবাল-লাল, চঞ্চুর প্রান্তে অনাবৃত স্ফীত ঝিল্লী ম্যাজেণ্টা, পা ও আঙুল গোলাপি বা বেগুনি-লাল, নখর পাটকিলে।

বাসস্থান— কাশ্মীর-জম্মু থেকে পুবে নেপাল, সিকিম, ভূটান, অরুণাচল, আসাম, বাংলাদেশ, দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সমস্ত উপদ্বীপাত্মক ভারত, আন্দামান-নিকোবর। দেখা যায় বাঁশবন মেশানো জঙ্গল, পাহাড়ের পাদদেশের গ্রামসমূহের ধারে জঙ্গলে। ভারতের বাইরে বর্মা, মালয় ও ইন্দোচীনীয় দেশসমূহ, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে পাওয়া যায়।

এমনিতে মোটেই ঘোরাফেরা করে না, একই জায়গায় থাকতে ভালোবাসে।

সৈকত বর্গ

সৈকত বর্গে (চারাড্রায়িফরমেস) 15টি বংশে প্রায় 300 প্রজাতির পাখি এই পৃথিবীতে আছে। বাহ্যত বিভিন্ন বংশ ও প্রজাতির মধ্যে বৈষম্য থাকলেও কতকগুলি আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য আছে, বিশেষত শারীরস্থানে এমন কতকগুলি সাদৃশ্য আছে যার ফলে এদের একই বর্গের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন, স্বরযন্ত্রের গঠন, পায়ের কণ্ডরা অর্থাৎ যে শিরাগুচ্ছ দিয়ে মাংসপেশী, হাড় বা অন্য অঙ্গের সঙ্গে আবদ্ধ সেই শিরাগুচ্ছ, তালু বা টাকরার হাড়ের গঠন, ওড়ার পালকের বিন্যাস এবং তৈলগ্রন্থির উপর লম্বা পালকের গুচ্ছ এই বর্গের সব বংশেই একভাবে উপস্থিত।

ভারতে সৈকত বর্গে 3টি উপবংশ (সাব-ফ্যামিলি) এবং 12টি বংশ, যথাক্রমে— টিট্টিভ (চারাড্রিয়িদি), জলকোপি (জাকানিদি), শণ্ডিখনী (হীমাটোপাডিদি), আরামুখ (স্কোলোপাসিদি), ঝিল্লীপদ (ফালারোপিদি), কুনাল (রাস্ট্রাটুলিদি), কৃষিকানী (রেক্যারভিরোস্ট্রিদি), কর্কটাশ (ড্রোমাটিদি), পার্ণবিক (ব্যরহিনিদি), সৈকত (গ্লারিওলিদি), লুণ্ঠাক (স্টেরকোরারিফিদি) এবং বীচীকাক (লারিদি)। এই সব বংশে 39টি গণ (জিনাস) ও 106 টি প্রজাতি (স্পিসিস) এবং কিছু উপজাতি আছে।

টিট্টিভ বংশ

টিট্টিভ বংশের (চারাড্রিয়িদি) পাখিরা ছোটো থেকে মাঝারি আকারের। এদের পা লম্বাটে এবং চঞ্চু সরু। পা জলের ভিতর দিয়ে চলার উপযোগী, জঙ্ঘাস্থি (টিবিয়া) উন্মুক্ত, পিছনের আঙুল ছোটো এবং সামনের আঙুলের চেয়ে একটু উঁচুতে। ডানা বড়ো এবং সূঁচলো। দেখলেই মনে হয় এরা ক্লান্তিহীন, ওড়াটা বেশ দ্রুত। সাধারণত এদের জলের কাছেই দেখা যায়, যদিও কিছু প্রজাতি আছে তারা শুষ্ক সমতল এবং আধা মরুভূমিতে বাস করে। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। প্রায়ই দেখা যায় প্রজননের পর দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে। চারটি ক'রে ডিম পাড়ে এবং ডিম ফোটার কিছুদিন পরে ছানারা বাসা ত্যাগ করে স্বাধীন জীবনযাপন করে। এই বংশে 3টি গণ— কুযষ্ঠি (ভ্যানেলাস), স্বর্ণটিট্টিভ (প্লুভিয়ালিস) ও সর্ষপী (চারাড্রিয়াস)।

হট্টিমা (Red-wattled lapwing)

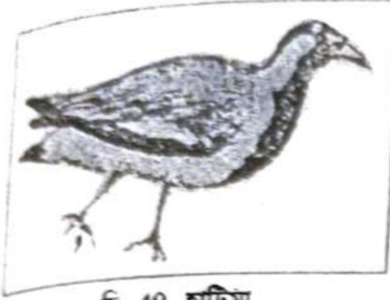
খুব ছোটোবেলায় বয়েস তখন বছর ছয়েক হবে, একটা ছড়া শুনতাম, হট্টিমা টিম টিম/ তারা মাঠে পাড়ে ডিম/ তাদের খাড়া দুটো শিং।

দুষ্টুমি করলে বা অবাধ্য হলে ভয় দেখানো হতো এই হট্টিমা টিমের। ভয়ে সব কিছুই মেনে নিতাম। হট্টিমারা নাকি আমাদের নেড়া ছাতে যে ময়লা জলের ট্যাঙ্ক আছে তার পাশে থাকে।

আমরা তখন থাকতাম সুকিয়া স্ট্রীটে, বর্তমানে কৈলাস বোশ স্ট্রীট।

আমাদের বাড়িটা ছিল দোতলা। ভিতরটা ইংরেজি ইউ প্যাটানের।

একদিন দুপুরে সবাই যখন শুয়ে, পুরোন বাড়ির ইটের মাঝে গোটা গোটা ফাঁক ছিল, অদম্য কৌতূহলে হট্টিমা টিমের খোঁজে ঐসব ছোটো খাঁজের মধ্যে পা দিয়ে আঁকড়ে-মাকড়ে প্রায় ফুট পনের উঠে নেড়া ছাতে এলাম। ঘরগুলোর শেষে ডানদিকে ফুট তিনেকের মতো চওড়া ফালি পথ। তার শেষে ট্যাঙ্ক। ভিতর দিকে নিচে উঠোন, ওধারে সরু গলি প্রাণনাথ সেন লেন। ট্যাঙ্কের কাছে পৌঁছে এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোথাও হট্টিমা টিমের বাসা বা তার টিকি কিছুই দেখতে পেলাম না। প্রাণপণে মাকে ডাকতে লাগলাম, কই হট্টিমা টিম? কোথাও ত খুঁজে পাচ্ছি না!



চি 49. হট্টিমা

চিৎকারে সবাই ঘর ছেড়ে বাইরে এসে আমায় ওই রকম বিপজ্জনক অবস্থায় দেখে আক্কেল গড়ুম। মা বলতে থাকেন, চুপ করে ট্যাঙ্কটা ধরে দাঁড়িয়ে থাক। নাড়িস না। আমার মুখে এক কথা, কোথায় হট্টিমা টিম টিম?

পাশের বাড়ি থেকে মই এসে গেল। একজন উঠে আমায় ধরে ধরে নিয়ে এসে ঝুলিয়ে দিতে আর একজন ধরে নিলেন। তারপরের অবস্থাটা না বলাই ভালো। তবে হট্টিমা নিয়ে আর কেউ কখনও ভয় দেখায় নি।

বহুদিন মনের মধ্যে তোলপাড় করেছে হট্টিমা বলে কি সত্যিই কোনো পাখি নেই? সবই কল্পনা? শেষে দেখা পেলাম পনের-ষোল বছর বয়েসে। গিরিডির উশ্রী প্রপাতের পিছন দিকে অর্থাৎ যেখান থেকে জল পড়ছে তার পিছনে কি আছে তাই দেখার জন্যে ক'জন ডানপিটে ছেলে কসরত করে উঠেছি পাশ দিয়ে। দু'পাশে জঙ্গল, মাঝখানে চ্যাটালো পাহাড়ের খাঁজ দিয়ে চার-পাঁচটি ধারায় দুরন্ত বেগে ছুটে আসছে উশ্রী, নিচে ঝাপিয়ে পড়বে বলে।

হঠাৎ দেখলাম বাঁদিকের জঙ্গলের ধার ঘেঁষে চ্যাটালো পাথরের উপর আধ ইঞ্চি বসে যাওয়া ছোটো খোঁদল। তার চারদিকে ছাগলনাদি দিয়ে গোল করে বেড়া দেওয়া। তার মাঝে ধূসর-পাটকিলের ওপর কালচে ছোপের চারটে ডিম নজরে পড়ল।

আমরা দাঁড়িয়ে পড়তেই কোথা থেকে দুটো পাখি ক্রুদ্ধস্বরে 'টি টি হট্ হট্ টি টি হট্' করতে করতে উড়ে এল। একটা মাটিতে নেমে আমাদের দিকে তাকিয়ে ডাকতে লাগল। মাঝে মাঝে বলতে লাগল 'কব্ কব্ কাব্' করে। অপরটা উড়ছে মাথার উপর ঘুরে ঘুরে।

দুটো পাখিই একরকম দেখতে। সরু লম্বাটে ঠ্যাং। লম্বায় 33 সেমি (13 ইঞ্চি)। উপরটা তামাটে-পাটকিলে, বুক, মাথা ও ঘাড় কালো, নিচটা সাদা। মোরগের ঝুঁটির মতো টুকটুকে লাল মাংসল উপাঙ্গ, দু'চোখের গোল পাতাকে নিয়ে পাশ থেকে বেরিয়ে আছে। চোখের নিচ থেকে একটা চওড়া সাদা পটি ঘাড়ের পাশ দিয়ে এসে মিশেছে তলার সাদার সঙ্গে। কনীনিকা লালচে-পাটকিলে। চঞ্চু মেটেলা-লাল, ডগাটা কালো। পা ও আঙুল সবজেটে-হলুদ, নখর কালো. পরে কিছুর পা দেখেছি উজ্জ্বল হলুদ।

বাড়ি ফিরেই ছুটলাম সেই জ্ঞানী দাদার কাছে, তিনি তখন গিরিডিতেই ছিলেন। তিনি শুনে

বললেন, ও ত টিট্টিভ, টিটি পাখি (ভ্যানেল্লাস ইন্ডিকাস) হিন্দি— *টিটোরি*, ইংরেজি— *রেডওয়াটলড ল্যাপউইং প্লোভার*। পরে জেনেছিলাম এরা টিট্টিভ বংশে (চারাড্রিয়িদি) কুযষ্টি গণের (ভ্যানেল্লাস) এক *প্রজাতি*। কুযষ্টি গণে 7টি *প্রজাতি*। এই প্রজাতির (ভ্যা ইন্ডিকাস) আরও দুটি উপপ্রজাতি আছে। *প্রথম*— 'কিরালা' (ভ্যা ই লানকি), তামিল *আলক্যাট্টি*, ইংরেজি— *সিলোন রেডওয়াটলড ল্যাপউইং*। *বাসস্থান*— শ্রীলঙ্কায় 300 মি উচ্চতার মধ্যে। *দ্বিতীয়*— কাছাড়ি— *দাও ডুইপ* (ভ্যা ই অ্যাট্রিন্যুচালিস)। ইংরেজি— *বার্মিজ ল্যাপউইং*। আসামে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে, মণিপুর, বাংলাদেশ। বর্মা, ইউনান, মালয় ও ইন্দোচিনীয় দেশসমূহ।

বললাম, এ কি সেই পাখি, যার ডিম সমুদ্র ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপাখ্যান আমাদের সংস্কৃত পড়ার বইতে আছে? জবাব পেলাম, হ্যাঁ। টি টি নামটাও হিন্দি। মাথার মধ্যে খেলে গেল, মাথায় না হক কানের পাশ দিয়ে শিঙের মতো ঝুঁটি উঠেছে, ডিমও খোলা জায়গায়। বললাম, তবে এই-ই তো হট্টিমা। বললেন, তা নিশ্চয়ই বলতে পার। বাংলা নাম ত নেই। সাহেবরা বলে— *ডিড ইউ ডু ইট। পিটি টু ডু ইট।*

বাসস্থান— সারাভারত এবং তার বাইরেও। যেখানে জল আছে তাঁরই কাছে, যেমন নদী, জলা, বাদা, সমুদ্রের খাঁড়ি সর্বত্র, সাধারণত জোড়ায়, কখনও বা তিনটিও দেখা যায়। লবণ হ্রদে ও অন্যত্র দেখেছি 6টা থেকে 12টা পর্যন্ত।

খাদ্য— পিপঁড়ে, শুঁয়োপোকা, নানারকম পোকামাকড়, কম্বোজ ও কিছু শাকসবজি। সকাল ও সন্ধ্যেতেই খাদ্য সংগ্রহ করে, রাতেও করে, বিশেষত জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাতে।

স্বভাব— এমনি আস্তে ওড়ে। কিন্তু প্রয়োজনে অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঘুরতে-ফিরতে পারে যা দেখলে অবাক হতে হয়। একবার দেখেছিলাম বহেরি বাজ (পেরিগ্রিন ফকন),-এর তাড়া খেয়ে তাকে কি সাবলীল ভঙ্গিতে কাটাতে। কেউ বাসার কাছে বা ছানাদের কাছে এলে তাকেও তাড়িয়ে বহুদূর নিয়ে যায়।

প্রজননকাল— মার্চ থেকে আগস্ট-সেপ্টেম্বর। মাটির মধ্যে একটু খোঁদল করে বেড়া দেয়, কাদার ডেলা বা ছাগল নাদি, কখনও বা পাথরের নুড়ি দিয়ে। ডিম পাড়ে 4টি প্রায় লাট্টুর আকারে, খানিক ধূসর, পাটকিলে রঙের তার উপর কালচে ছোপ। দু'জনেই ডিমে তা' দেয়। কতদিনে ফোটে তা এখনও নির্ণয় হয় নি। ডিমের গড় মাপ— 42×30 মিমি।

অন্যান্য কুযষ্টি

টিট্টিভ বংশের অন্তর্গত কুযষ্টি গণের অন্যান্য প্রজাতির মধ্যে কয়েকটিকে পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়, তারা হল—

(White tailed Lapwing)

1. **সাদালেজা টিট্টি**— (ভ্যানেল্লাস লিউক্যুরাস)। ভারতীয় কোনো ভাষাতেই নামকরণ হয় নি। ইংরেজি— *হোয়াইট টেইলড ল্যাপউইং*।

লম্বায় 24 সেমি (11 ইঞ্চি)। মাথা ও পিঠ গোলাপি-পাটকিলে, কপাল ও ভুরুর উপরে অস্পষ্টভাবে ফিকে ধূসর-সাদা, লেজের ধার সাদা। চিবুক, গলা ও ঘাড়ের দু'পাশ ছাই-ধূসর, বুক গাঢ় ধূসর, তলপেট গোলাপি-হলুদ, লেজের তলার আচ্ছাদক গোলাপি-সাদা। ওড়ার সময় পিঠের শেষের দিক ও লেজের সাদা এবং ডানার তলায় কালো ও সাদা পটি দেখে চিনতে অসুবিধে হয় না। কনীনিকা পাটকিলে থেকে লাল, চঞ্চু কালো, পা ও আঙুল ফিকে হলুদ। স্ত্রী ও পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান— কিরঘিজের স্তেপভূমি, ট্রান্সকাসপিয়া, সিরিয়ার কিছু অংশ, ইরাক ও ইরান। শীতে (সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ) পরিযায়ী হয় পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, সিন্ধু, পাঞ্জাব, ভারতে পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাটে; কিছু ভাগ হয়ে ঢোকে উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর বিহার, নেপাল তরাই থেকে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বড়ো ঝিলের ধারে জলজ ঘাসের মধ্যে। কিছু পরিযায়ী হয় মিশর ও সিনাইতে।

(Sociable Lapwing)

2. **মিশুকে টিট্টি**— (ভ্যা গ্রেগারিয়াস)। ভারতীয় নাম নেই। ইংরেজি— *সোশিয়েবল ল্যাপউইং।*

লম্বায় 33 সেমি (13 ইঞ্চি)। প্রজননকালীন রূপসজ্জার সঙ্গে আমরা পরিচিত নই। শীতে পরিযায়ী হয়ে আসা রূপই দেখি। চাঁদি পাটকিলে, কপালে সাদাটে লালচে-হলুদের একটা চওড়া টান ভুরুর সাদা টানের উপর দিয়ে ঘাড়ের পিছনে মিশেছে, একটা পাটকিলে লাইন চঞ্চুর গোড়া থেকে চোখের পিছন দিয়ে গিয়ে মিশেছে ঘাড়ের পিছনে। বাকি উপরের পালক ছাই-ধূসর, পিঠের শেষভাগ থেকে লেজ পর্যন্ত সাদা, লেজের শেষে একটা কালো পটি। চিবুক ও গলা সাদা, বুক ধোঁয়াটে-সাদা তার উপর পাটকিলের ছোটো ছোটো ছোপ, বাকি তলাটা ধোঁয়াটে-সাদা। কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু, পা ও আঙুল কালো। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান— দক্ষিণ ও মধ্য রাশিয়া, কিরঘিজ স্তেপভূমি, ট্রান্সকাসপিয়া, পশ্চিম সাইবেরিয়া থেকে টোমাস্ক এবং জেইসান-নর। শীতে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর থেকে মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত পরিযায়ী হয় উত্তরপূর্ব আফ্রিকা থেকে সুদান, পাকিস্তানে বেলুচিস্তান, সিন্ধু ও চিত্রল উপত্যকা, উত্তরপশ্চিম ভারত (কাশ্মীরে মাঝে-সাঝে), উত্তরপ্রদেশ, উত্তর বিহার, পশ্চিমবঙ্গে (সুন্দরবনে প্রতি বছর দেখি না); রাজস্থান, গুজরাট, বোম্বাই (আহমেদনগর, রত্নাগিরি), মাঝে-সাজে কেরালা এবং শ্রীলঙ্কায় দেখা যায়, চাষবাসের কাছে একটু খোলা শুষ্কভূমি, লাঙলচষা খেত ও শস্যকাটার পর শস্যের গোড়ার আশপাশে।

(Northern Lapwing)

3. **সবুজ টিট্টি**— (ভ্যা ভ্যানেল্লাস)। বাংলা ছাড়া অন্য কোনও ভাষায় নামকরণ হয় নি। ইংরেজি— *গ্রীন প্লোভার, পীউইট ল্যাপউইং।*

লম্বায় 31 সেমি (12 ইঞ্চি)। শীতে পরিযায়ী হয়ে এলে আমরা যাদের দেখি— সরু ঝুঁটি সহ চাঁদি কালচে-পাটকিলে, মুখ, চিবুক, গলা ও ঘাড়ের দু'পাশ সাদা, তার উপর পাটকিলে ও কালোর ছোপ ছোপ, ভুরুর উপর ও ডানার দ্বিতীয় সারির একদম ভিতরের পালক এবং বুকের কালো পালকের উপর লালচে-হলুদের ছোপ। বুক কালো, বাকি নিচের পালক সাদা, কেবল লেজের তলার

আচ্ছাদক ফিকে দারচিনি। কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু কালো, পা ও আঙুল কমলা-পাটকিলে।

বাসস্থান— ইওরোপ ও উত্তর এশিয়ায়, পুবে সাইবেরিয়া, দক্ষিণে স্পেন, উত্তর ইটালি, ট্রান্সকাসপিয়া, তুর্কিস্তান এবং উত্তর চীন। শীতে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর থেকে মার্চ-এপ্রিল, পরিযায়ী হয় পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, সিন্ধু, চিত্রল ও পাঞ্জাবসহ উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, গিলগিট, লাডাখ ও কাশ্মীরসহ উত্তরপশ্চিম ভারত, উত্তর প্রদেশ, উত্তর বিহার, নেপাল উপত্যকা ও নিম্নভূমি, অরুণাচল, কাছাড়, লখিমপুর, ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ও পূর্বাংশ, মণিপুর, উত্তরবঙ্গ এবং বাংলাদেশে। দেখা যায় কর্ষিত কিন্তু অনাবাদী জমি, ধানকাটার পর তার গোড়ার আশপাশে, জলসেচক ভূমি এবং ঝিলের পাশের চাষজমিতে।

(Grey-headed Lapwing)

4. **সালাং**— (ভ্যা সিনেরিউস)। নামটা মণিপুরী, অন্য কোনও ভাষায় নামকরণ হয় নি। ইংরেজি— *গ্রে-হেডেড ল্যাপউইং।*

লম্বায় 37 সেমি (সাড়ে 14 ইঞ্চি)। মাথা ও ঘাড় ধূসর, পিঠ হালকা পাটকিলে, বস্তিপ্রদেশ ও লেজের উপরের আচ্ছাদক এবং লেজ সাদা। ডানার প্রথম সারির পালক কালো, দ্বিতীয় সারির সাদা। গলা ও বুক ছাই-ধূসর, তার নিচে একটা চকোলেট আর একটা কালো পটি, বাকি নিচের অংশ এবং ডানার তলা সাদা। কনীনিকা লাল, চোখের গোল পাতা উজ্জ্বল হলুদ, চঞ্চুর গোড়া ও দুই-তৃতীয়াংশ উজ্জ্বল হলুদ, বাকি অংশ কালো, পা ও আঙুল উজ্জ্বল হলুদ, নখর কালো। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান— মঙ্গোলিয়া, চীনে দক্ষিণে ইয়াংসি উপত্যকা পর্যন্ত, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, জাপান। শীতে পরিযায়ী হয়ে আসত কলকাতার লবণ হ্রদে, এখন বহুদিন দেখি না। আসামের খুবই সাধারণ পাখি। মণিপুর, নেপাল, উত্তর বিহারেও আসে। কখনও কখনও কাশ্মীর, দেরাদূন এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে দেখা যায়।

(River Lapwing)

5. **কাঁটা টিট্টি**— (ভ্যা স্পিনোসাস)। ভারতের কোনো ভাষাতেই নামকরণ হয় নি, একমাত্র মণিপুরী— *ঙাহাইবি* (অর্থাৎ 'মাছ শিকারী'), ইংরেজি— *স্পারউইংগড ল্যাপউইং।*

লম্বায় 31 সেমি (12 ইঞ্চি)। দূর থেকে হট্টিমা বলেই ভুল হয়। কপাল, চাঁদি এবং মাথার খুলির শেষপ্রান্তের ঝুঁটি কালো, বাকি উপরটা দ্রাক্ষারস-ধূসর ও বালি-পাটকিলে। লেজের উপরের আচ্ছাদক ও লেজ সাদা, শেষপ্রান্ত কালো ; ডানার প্রথম সারি ও তার আচ্ছাদক কালো, দ্বিতীয় সারির মাঝখান সাদা। চিবুক, গাল ও গলা কালো,পাড় সাদা ; উপরের বুক সাদা থেকে দ্রাক্ষারস-ধূসর, সেটা আছে গলার দু'পাশেও, তলার বুক পাটকিলে-ধূসর। তলপেটের মাঝখান কালো, বাকি সাদা। ডানা গোল, ডানার বাঁকের মুখে লম্বা বাঁকানো এক কাঁটা। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে, চঞ্চু কালো, পা ও আঙুল শিঙে-পাটকিলে বা লালচে-পাটকিলে। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান— আসাম, মণিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তর ও পূর্ব মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, নেপাল, সিকিম, তরাই ও ভাবর 700 মি. উচ্চতার মধ্যে। দেখা যায় বালির

চড়া ও নুড়ি ভর্তি নদীর তীরে। খবর পাওয়া যায় একবার এইরকমই নুড়িভর্তি নদীর তীরে এক বহেরি বাজকে দেখা গিয়েছিল (পেরিগ্রিন ফকন) কাঁটা টিটিকে আক্রমণ করতে। কাঁটা টিটিটি বহেরির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সাবলীল ভঙ্গিমায় সাঁতার কাটতে থাকে। বহেরি যেই ছোঁ মারে অমনি পাকা সাঁতারুর মতো জলের মধ্যে ডুব দেয় এবং জলের তলায় তিন-চার সেকেণ্ড থাকে। এইরকম বার কতক হবার পর বহেরি হাল ছেড়ে দেয়। টিটি তখন সাঁতার কেটে পাড়ে এসে যেন কিছুই হয় নি এমনভাব দেখিয়ে খাদ্য অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

(Yellow - wattled Lapwing)

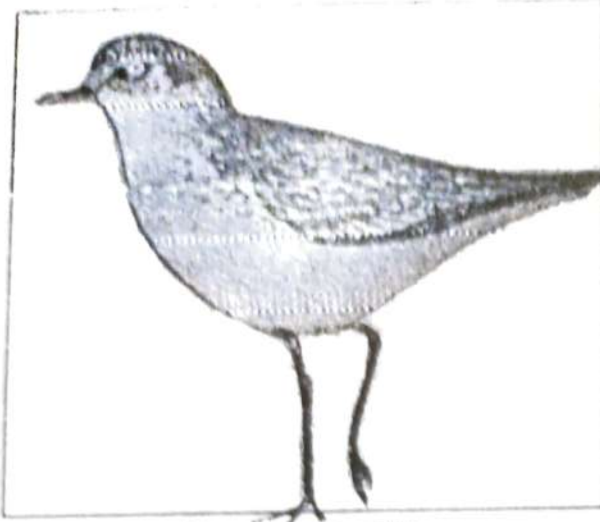
6. **জিরদি**— (ভ্যা মালাবারিকাস)। হিন্দি নামও ওই। বাংলায় বলা যেতে পারে— হলদে টিটি। তেলেগু— *চিতাওয়া*, তামিল— *আলকাট্টি*, মালয়ালী— *মনজাক্কাল্লি*, ইংরেজি— *ইয়েলো-ওয়াটল্ড ল্যাপউইং।*

লম্বায় 27 সেমি (সাড়ে 10 ইঞ্চি)। চাঁদি রেশমী-কালো তাকে ঘিরে সরু সাদা লাইন, উপরে বালি-পাটকিলে, লেজ সাদা, শেষ প্রান্তে চওড়া কালো পটি। চিবুক ও গলা কালো. বুক বালি-পাটকিলে, বাকি নিচের অংশ সাদা। বুকের শেষে সাদা শুরু হবার আগে একটা সরু কালো লাইন। কনীনিকা সাদা থেকে রূপোলি-ধূসর অথবা ফিকে হলুদ, চঞ্চু কালো, গোড়া হলদে বা সবজেটে-হলদে; পা ও আঙুল উজ্জ্বল হলুদ। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান— পাকিস্তানে নিম্ন সিন্ধু থেকে পুবে উত্তর ভারত, সেখান থেকে পুবে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ; দক্ষিণে সমগ্র উপদ্বীপাত্মক ভারত ও শ্রীলঙ্কা। দেখা যায় অনুর্বর চাষের অযোগ্য জমি, ফসলকাটার পর তার গোড়ায় এবং কর্ষিত কিন্তু অনাবাদী জমিতে। জল থেকে একটু দূরেই থাকতে ভালোবাসে। হট্টিমার মতো জলের ধারের পাখি নয়।

সোনালি বাটান (Pacific Golden Plover)

গঙ্গাসাগরের মেলায় সেই প্রচণ্ড ঝড় ও স্টিমার উল্টে যাওয়ার পর 24 জানুয়ারি 1969 সালে কাকদ্বীপ থেকে নৌকো করে গিয়েছিলাম কচুবেড়িয়া। সেখান থেকে বাসে বেগুয়াখালি বা সাগরসঙ্গমে। সঙ্গী হয়েছিলাম কিছু সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধবদের। তাঁরা এক সাহিত্য মেলায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। নৌকো করে যখন যাচ্ছিলাম তখন জোয়ারের জল সরে যাওয়াতে পলির চড়াতে ষাট-সত্তর কি তারও বেশির ছোটো পাখির এক ঝাঁক দেখেছিলাম। এত বড় ঝাঁক এর আগে কখনও দেখি নি। দূরে থেকে পাখিগুলি সবাই একসঙ্গে মাটি বা জলের গা ঘেষেই খুব সরু সুঁচলো ডানা মেলে আর লেজের মতো পালক ছড়িয়ে অত্যন্ত দ্রুতবেগে উড়ছিল। একসঙ্গে সবাই এই বাঁক নিচ্ছে, ঘুরছে, দেখে মনে হচ্ছিল একদল সৈন্য শূন্যে কুচকাওয়াজ করে চলেছে। হঠাৎ সবাই কাদার উপরে ডানা গুটিয়ে একযোগে নেমে পড়ল। নেমেই সব স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল কারও কমাণ্ডের অপেক্ষায়। একেবারে নট নড়ন-চড়ন নট কিচ্ছু। মুহূর্তে সব যেন পাথর হয়ে গেছে। দূরবীন লাগিয়ে


চি 50. সোনালি বাটান

দেখলাম উপর দিকে পাটকিলে, সাদা আর সোনালি-হলুদের ছোপ ছোপ। তলার দিক সাদাটে, বুকের উপর পাটকিলে, ধূসর ও হলুদের ছিট ছিট, বাকি সব সাদা। কালো চঞ্চু, পায়রার মতো গোড়াটা একটু ফোলা।

আবার এঁকেবেঁকে ওড়া শুরু করে দিল। এই পাখিদের আগেও অনেক দেখেছি, শিকারও করেছি, মাংসও সুস্বাদু। কিন্তু এত বড় ঝাঁকে কখনও দেখি নি। দেখেছি বড়জোর কুড়ি-ত্রিশের ঝাঁকে। আবার দেখেছি ট্রেনে করে যেতে দমদম ছেড়ে যেখান থেকে বনগাঁর লাইন ডানদিকে বাঁক খেল আর ডানকুনির লাইন চলল, সেই লাইনের অদূরে ভিজে ঘাসের মধ্যে একটি-দুটিকে, গঙ্গার কূল থেকে একটু দূরেই।

সঙ্গীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, দেখ দেখ এই পাখিরা হচ্ছে সৈকত বর্গের অন্তর্গত স্বর্ণ টিটিভ গণের (প্লুভিয়ালিস) *এক প্রজাতি*। নাম— সোনালি বাটান, 'সোনা বাটান', (প্লুভিয়ালিস ডমিনিকা ফালভা), হিন্দি— *ছোটো বাটান*, ইংরেজি— *ইস্টার্ন গোল্ডেন প্লোভার*। এখানে নেই বটে কিন্তু অনেক সময়ে ঝাঁকের সঙ্গে মিশিয়ে থাকে একটু বড়ো 27 সেমি-র 'সোনা বাটান' (প্লুভিয়ালিস আপরিকারিয়া), ইংরেজি— *গোল্ডেন প্লোভার*।

সোনালি বাটান লম্বায় 24 সেমি (সাড়ে 9 ইঞ্চি)। আমরা দেখি শীতের চেহারা। গ্রীষ্মে প্রজননকালে কপালের উপর থেকে চওড়া সাদা পটি চোখের উপর দিয়ে ঘুরে আসে ঘাড় এবং বুকের নিচ পর্যন্ত। উপরের বাকি পালকে কালচে-পাটকিলের উপর সাদা এবং সোনালি-হলুদের ছোপ। নিচে গলা থেকে তলপেটের শেষ পর্যন্ত কালো। শীতে বা গ্রীষ্মে দেহের যে অংশের কোনো রঙ বদল হয় না তাহল পাটকিলে কনীনিকা। চঞ্চু, পা এবং আঙুল স্লেট-ধূসর।

বাসস্থান— উত্তর সাইবেরিয়ার ইয়ালমান উপদ্বীপ থেকে ইয়েনিসি নদী, পুবে পশ্চিম আফ্রিকা, দক্ষিণে পূর্ব সাইবেরিয়া থেকে স্টানোভয় পর্বতমালা এবং কামচাটকায়। শীতে পরিযায়ী হয় ভারত, বর্মা, থাইদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোচীনীয় অঞ্চল, দক্ষিণ চীন, ওসেনিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে। মাঝে মাঝে হাজির হয় পূর্ব আফ্রিকা এবং উত্তর আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে।

খাদ্য— ঘাসফড়িং, নানারকম পোকামাকড় এবং ছোট কবচী। মনে হয় নিজের বাসভূমিতে বাদার জলজ আগাছার বীজ এবং খুব ছোটো বেরি জাতীয় ফল খেয়ে থাকে।

স্বভাব— প্রধানত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ভারতে পরিযায়ী হয়। দেশে ফেরা এপ্রিলের মাঝে শুরু হলেও মে এবং তার পরেও দেখা যায় গ্রীষ্মের সাজ পরতে শুরু করে ফিরছে। ডঃ সালিম আলি 17 জুলাই 1969 তারিখে চারটি পাখিকে বোম্বাই শহরের উপকণ্ঠে দেখেছেন পূর্ণ প্রজননকালের সাজে; কিছু কিছু পাখি শীতের সাজে সারা বছরই থেকে যায়। তাদের আর ঘরে ফেরা হয় না।

খুব অল্প আসে পাকিস্তানের সিন্ধু এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত, দক্ষিণে মহীশূর, মাদ্রাজ, কেরল, শ্রীলঙ্কা, আন্দামান-নিকোবর, লাক্ষা এবং মালদ্বীপের কর্দমাক্ত ঝিল, সমুদ্রের খাঁড়ির পাড়, চষা খেত, জলে ডোবা মাঠ-ময়দান এবং ভাঁটার জল সরে যাওয়া কাদার পলিতে।

শীতের ডাক শুনি খুব জোরে শিস্ দিয়ে টি, টু-ই, টিই-টিউ। সোনালি বাটান দলবদ্ধ হয়েই বাস করে। অন্যান্য জলচারী পাখিদের সঙ্গেও মিলেমিশে চরতে দেখা যায়। দলবদ্ধ হয়ে খাদ্যান্বেষণের জন্য যখন চরে তখন দেখা যায় দু-চারটি পাখিকে দলছেড়ে একটু দূরে প্রহরীর কাজ করতে। ওরা সামান্য বিপদের আশঙ্কা দেখলে অন্যান্যদের সতর্ক করে দেয়। বন্দুকবাজদের পক্ষে তখন শিকার করা খুবই শক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু দূরত্ব রেখে পিছন দিক থেকে তাড়া দিলে ওরা বন্দুকের আওতার মধ্যে সহজেই চলে আসে এবং নির্বুদ্ধিতার মাশুল দেয়। পারিযায়ীর সময়ে একনাগাড়ে ওড়ার যেসব পাখির রেকর্ড আছে, সোনালি বাটান তার অন্যতম। পরিষ্কার আবহাওয়ায় 3200 কিমি উড়ে যায় সমুদ্রের উপর দিয়ে আলিউশিয়া দ্বীপপুঞ্জ থেকে হাওয়াই, মাত্র 35 ঘণ্টায়।

গত 12 মে 1983 সুন্দরবনের সজনাখালি থেকে ফিরছি, গোসাবার রেঞ্জ অফিসার অরুণ চক্রবর্তী, ভারতীয় পরিসংখ্যান সংস্থার কুমার চট্টোপাধ্যায় আর অনিরুদ্ধ চক্রবর্তীর সঙ্গে ভটভটি চেপে। ভটভটি 'জয় জগন্নাথ' দুর্গা দোমহানীর খালে ঢুকেছে। বেলা 12 - 45 মিনিটে সোনাগাঁও-এর কাদার পলির উপর পূর্ণ প্রজননসাজে এক সোনালি বাটান। অভিভূত হয়ে গেলাম। কপাল থেকে সাদার একটা টান চোখের উপর দিয়ে ঘাড়ে ও বুকের পাশে। চিবুক ও গাল থেকে তলপেট পর্যন্ত কুচকুচে কালো। পিঠের উপরের কালচে-পাটকিলের উপর সাদা এবং সোনালি-হলুদের ছিট।

ভটভটির এঞ্জিন থামিয়ে বেশ খানিকক্ষণ দেখলাম। নিজের প্রজননভূমিতে ফিরে যায় নি। হয়তো যাবেও না। প্রজনন সাজ পেলেও যাওয়া হয়ে ওঠে নি কোনো কারণে। বোম্বাইয়ের কাছে 17 জুলাই 1959 সালে ডঃ সালিম আলিও সোনালি বাটানের এই রূপ দেখেছেন।

অন্যান্য স্বর্ণটিট্টিভ

টিট্টিভ বংশের অন্তর্গত স্বর্ণটিট্টিভ গণের (প্লুভিয়াস) আরও দুটি প্রজাতিকে পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়, তারা হল—

1. **বড়ো বাটান—** (প্লুভিয়াস স্কোয়াটারোলা), হিন্দি— *বড়া বাটান*, ইংরেজি— *ব্ল্যাকবেলীড প্লোভার*, গ্রে প্লোভার। (Grey plover)

লম্বায় 31 সেমি (12 ইঞ্চি)। কপাল, চঞ্চু ও চোখের মাঝখানের অংশে সাদার উপর কালো ছিট, মাথা ও ঘাড়ের দু'পাশে সাদার উপরে পাটকিলের ছোটো ছোটো টান। বস্তিপ্রদেশ, লেজ ও লেজের উপরের আচ্ছাদক সাদা, তার উপর পাটকিলের সরু সরু রেখা। নিম্নাংশে গলা, বুক ও বুকের দু'পাশে পাটকিলের ছিট ও ছোপ, বাকি সাদা। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে, চঞ্চু কালো, পা ও আঙুল ছাই-ধূসর। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। শীতের এই সাজে আমরা ভারতে দেখে থাকি।

বাসস্থান— ইওরোপ ও এশিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চলের কানিন উপদ্বীপ থেকে পূর্ব সাইবেরিয়া ; কলগুয়েভ, গ্রেট লাইয়াকভ এবং র‍্যাঙ্গেল দ্বীপপুঞ্জ, শীতে পরিযায়ী হয় আফ্রিকা, মালাগাসী, বর্মা, থাইদেশ, মালয়েসিয়া, পাকিস্তানের মাকরান ও সিন্ধু প্রদেশ, ভারতে কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র থেকে দক্ষিণ উপকূল ধরে কন্যাকুমারিকা, সেখান থেকে পূর্ব উপকূল ধরে সুন্দরবন, বাংলাদেশ, আন্দামান, লাক্ষাদ্বীপ ও মালডিভ দ্বীপপুঞ্জ এবং শ্রীলঙ্কা। কখনও কখনও সমুদ্রোপকূল ছেড়ে ভারতের অভ্যন্তরে কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, নেপাল, আসাম, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং অন্যত্রও পরিযায়ী হয়। সাধারণত দেখা যায় বালুপূর্ণ সমুদ্রের ধার, জোয়ারভাঁটা খেলা নদীর মুখ, পলি কাদা ও খাঁড়ির মুখে দলবদ্ধ হয়ে চরছে।

(European Golden Plover)

2. **ছোটো সোনা বাটান**— (প্ল আপরিকারিয়া), হিন্দি— *ছোটো বাটান*, ইংরেজি— *গোল্ডেন প্লোভার।*

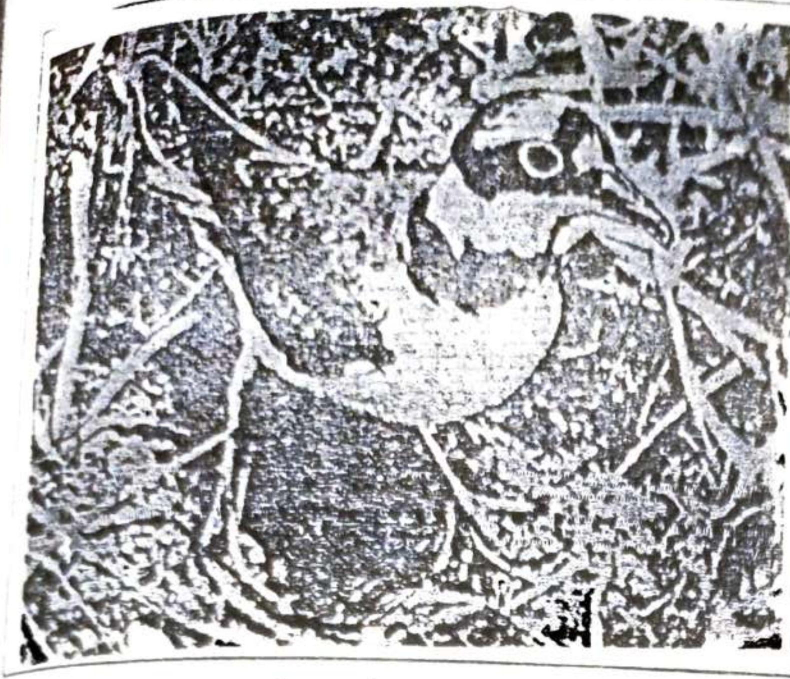
লম্বায় 27 সেমি (সাড়ে 10 ইঞ্চি)। প্রায় সোনালি বাটানের মতো দেখতে কিন্তু আকারে 3 সেমি বড়ো এবং আরও উজ্জ্বল কালো। নিম্নাংশে সোনালি ছিট, ওড়ার সময় ডানার তলা ধবধবে সাদা। কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু, পা ও আঙুল কালো। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান— ইওরোপ-এশিয়ার মেরু অঞ্চল স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে ইয়েনিসে নদী, দক্ষিণে লাটভিয়া ও পশ্চিম সাইবেরিয়া। পরিযায়ী হয়ে আসে পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, সিন্ধু, মাকরান, করাচি ও সেওয়ান ; ভারতে উত্তরপ্রদেশ থেকে আসাম, উত্তরবঙ্গ ও নিম্ন পশ্চিমবঙ্গ। দেখা যায়, ঝিলের কর্দমাক্ত পাড়, ভিজে গোচারণভূমি এবং ঘেসো মাঠে। ডাকে 'ট্‌লুই-ইই'। অনেক সময় শিকারীদের গুলিতে সোনালি বাটানের সঙ্গে এরাও মারা পড়ে।

জিরিয়া (Little-ringed Plover)

সুন্দরবনের সন্দেশখালি থেকে ভটভটি চড়েছি। ভটভটিটা চলেছে ছোটো কলাগাছিয়া নদীর অপর পাড় ঘেঁষে। নদীর একদম ধারে পলিকাদা তারপর ঘেসোজমি একটু, আর সেখান থেকে পাড়ের মাথাটা অল্প উঁচু পাড়ের ধারে ঐ ঘেসোজমিতেই দৌড়ে বেড়াচ্ছে কয়েকটা পাখি। এদের আগে দেখেছি সুন্দরবনে এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্রও এমনকি কলকাতার আশপাশে।

পাখিগুলোর কপাল সাদা, চাঁদির সামনেটা কালো, বালি-পাটকিলে চাঁদির মাঝখানে খুব সরু করে সাদা একটা লাইন গেছে চোখের উপর দিয়ে কানের উপরকার ঢাকা পর্যন্ত। একটা কালো পটি চোখের গোল হলদে পাতার এপাশ দিয়ে ওপাশে কানের ঢাকনার উপর দিয়ে ঘাড়ের পিছনে গেছে। ঘিরে গলা উপরে সাদা ও নিচেয় কালো কলার, তারপর পিঠ ও লেজ অর্থাৎ উপরটা বালি-পাটকিলে। চিবুক গলা ও ঘাড়ের দু'পাশ সাদা, সরু হয়ে এসে মিশেছে সাদা কলারের সঙ্গে। ঘাড়ের সরু কালো পটি এসে মিশেছে অপেক্ষাকৃত চওড়া বুকের উপর কালো পটির সঙ্গে। বাকি তলাটা সাদা। কনীনিকা



চি 51. জিরিয়া

পাটকিলে, পালকহীন চোখের পাতা হলুদ। শিঙে-কালো চঞ্চু ছোটো দেখতে অনেকটা পায়রার মতো. তলার চঞ্চুর গোড়াটা হলুদ, পা ও আঙুল ধোঁয়াটে সবজেটে-হলুদ, নখর শিঙে-কালো। স্ত্রী পুরুষ একই দেখতে।

এরা সৈকত বর্গে টিট্টিভ বংশের (চারাড্রিয়াদি) অন্তর্গত সর্ষপী গণের (চারাড্রিয়াস) এক *প্রজাতি*। নাম— জিরিয়া (চারাড্রিয়াস ডবিয়াস জার্ডনি), হিন্দি—*মেরওয়া*, তামিল— *সিন্না কট্টান*, মালয়ালী— *মোটিরা কোব্বি* ,তেলেগু— *রেওয়া*, ইংরেজি— *লিটল্ রিংগড প্লোভার*। লম্বায় 17 সেমি (সাড়ে 6 ইঞ্চি)

বাসস্থান— হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে কন্যা কুমারিকা। পাকিস্তানের সিন্ধু থেকে পুবে নেপাল, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা। জলের অবস্থা বুঝে এদিক-ওদিক করে। ভারতের বাইরে বর্মা, থাইদেশ. মালয়, ইন্দোচীন, নিউগিনি, বিসমার্ক আর্চিপেলাগো এবং সুন্দা দ্বীপপুঞ্জ। দেখা যায় নদী স্রোতস্বতী, পুষ্করিণী, দীঘি ইত্যাদির ভিজে মাটিতে। আর দেখা যায় সমুদ্র সৈকতে জোয়ারভাটা খেলা পলিকাদা বা খাঁড়ির ধারে।

খাদ্য— যাবতীয় পোকামাকড় ও তাদের শূক, ছোট কাঁকড়া ইত্যাদি। ঘাস-ফড়িং একটু বেশি মাত্রায় খায় বলে ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছে।

স্বভাব— ডাকে ছোট শীসের মত 'ফি-ই ফিই উউ'। সাধারণত জোড়ায় কিংবা ছোটো দলে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে খাদ্য সংগ্রহ করে। সেই দল 6 থেকে 12 বা তারও বেশি হয়। অনেক সময় অন্যান্য সৈকতবাসীদের সঙ্গেও মিলে-মিশে চরে। দৌড়ায় খুব দ্রুত। একটু কায়দামাফিক এঁকাবাঁকা চলনে চলে। মাঝে মাঝে থামে, একটা-দুটো কীটপতঙ্গ তুলে নিয়ে আবার উৎক্ষেপ ভঙ্গিতে দ্রুত চলতে থাকে। কোন ছোটো পোকা বা কাঁকড়া-চিংড়ি জাতীয় প্রাণী ওদের আগমনে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকলে বা কিছুর আড়ালে লুকিয়ে থাকলে একটা পা দিয়ে মাটিতে ঘনঘন ঠুকতে থাকে। তখন আত্মগোপনকারী ক্ষুদ্র প্রাণী প্রাণভয়ে বেরিয়ে পালাবার চেষ্টা করলেই টুক করে চঞ্চু দিয়ে তুলে নেয়। পরিবেশের সঙ্গে দেহের রঙ এমন মিশে যায় যে, খুব কাছে গিয়ে পড়লেও যতক্ষণ না জিরিয়া উড়ছে ততক্ষণ একদম বোঝা যায় না। কোনরকম বিপদাশঙ্কায় ওরা সব একসঙ্গে ওড়ে এবং এমন সাবলীল ভঙ্গিতে এঁকে-বেঁকে ওড়ে যে, সূর্বের আলো গিয়ে দেহের নিম্নাংশে পড়ে ঝিকমিকিয়ে ওঠে। সূঁচলো ডানার দ্রুত ঝাপটে মাটি থেকে চকিতে উঠলেও কিন্তু কয়েক মিটারের বেশি উঁচুতে ওড়ে না।

প্রজননকাল— ভারতে প্রধানত মার্চ থেকে মে। দক্ষিণ ভারতে ডিসেম্বর থেকে জুন হলেও মার্চ-

এপ্রিল ও মে মাসেই বেশি দেখা যায়। শ্রীলঙ্কায় জুন-জুলাই, কখনওবা আগস্ট পর্যন্ত গড়ায়। বাসা বানায় জলের ধারে মাটিতে অল্প খোঁদল করে। কিছু বিছয় না, ডিম পাড়ে মাটির উপরে সরাসরি। কখনও দেখা যায় ঝোপের ধারে বা শিলাখণ্ডের পাশে। ডিম পাড়ে 4টি লাট্টুর মত, উপরটা গোল নিচটা সরু কিন্তু রঙে নানা তারতম্য দেখা যায়। যেমন পাথুরে, ফিকে লালচে-হলুদ থেকে সবজেটে-ধূসর, তার উপর গাঢ় পাটকিলে ও বেগুনির নানা ঢঙের আঁকিবুঁকি ও ছিট। ডিমের গড় মাপ 27·5×20·7 মিমি।

দুই প্রত্যক্ষদর্শী ডঃ সালিম আলি ও লোক ওয়ান থো-র রিপোর্টে এঁদের প্রজননকালীন রীতিনীতির খবর পাই। ডঃ সালিম আলি বলেছেন— একজোড়া জিরিয়া খাদ্য সংগ্রহ করছে। পুরুষ আনুভূমিকভাবে শরীরটাকে রেখে বুকের দু'পাশের পালক ফুলিয়ে দিল। মাথাটা গুটিয়ে ঘাড়ের মধ্যে গুঁজে চঞ্চুটা স্ত্রী-পাখির দিকে নিচু করে সড়সড় করে এগিয়ে গেল। স্ত্রীটিও সামনের দিকে ঐভাবে 3-4মি. এগিয়ে গিয়ে থামল। পুরুষ এসে তার চঞ্চু দিয়ে স্ত্রীর বুকের খাঁচায় যেন বিঁধিয়ে দিচ্ছে এমন ভঙ্গি করার সঙ্গে লেজের পালক পাখার মতো ছড়িয়ে দিয়ে ঘনঘন উপরনিচ করতে থাকল। তার সঙ্গে তাল রেখে প্রতিটি পা মাটিতে ফেলতে লাগল। কয়েক সেকেণ্ডে পর পুরুষ জোড় পায়ে আনুভূমিকভাবে খাড়া স্ত্রীর পিঠের উপর লাফ দিয়ে উঠে 10-12 সেকেণ্ড ধরে গা কাঁপাতে লাগল। এর পর স্ত্রী মাথা নিচু করে পিছন দিকটা তুলে ধরল এবং পুরুষ খুব দ্রুত মিলন সাধন করে নেমে পড়েই খানিকটা সড়সড় করে দ্রুত হেঁটে গিয়ে খাদ্যসংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

লোক ওয়ান থো বলেছেন— স্ত্রী জিরিয়া খাদ্য সংগ্রহ করছে। পুরুষ দ্রুত পাখা নাড়িয়ে উত্তেজিত সুরে 'সুইট-ইউ সুইট-ইউ' সুইট-ইউ' ডাক দিতে দিতে কাছে এসেই নামল। নেমেই বুকের দু'পাশের পালক ফুলিয়ে চঞ্চু বাড়িয়ে তেড়ে গেল যেন খোঁচা মেরে তাকে ওখান থেকে তাড়িয়েই দেবে। স্ত্রীটি শুধু একটু সরে গেল মাত্র। পুরুষ নিচু হয়ে তাকে অনুসরণ করে কয়েক সেমি বাকি থাকতে একদম খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর ধীরে ধীরে লম্বা লম্বা পা ফেলে এসে সামনে দাঁড়াল। প্রথমে একটা পা তুলে নিজের মুখের সামনে আনল। সেটিকে নামিয়ে অপর পাটি তুলে নানারকম ভঙ্গি করার পর এমনভাবে পা দুটোকে করে এগিয়ে গেল যেন মনে হবে কেউ যেন কাঁচি খুলছে আর বোজাচ্ছে। কাছে আসতেই স্ত্রী-পাখি একটু নিচু হয়ে গুঁড়ি মারা ভঙ্গি করল। দেখা গেল পুরুষ তার পিঠের উপর লাফিয়ে উঠে প্রায় 20 সেকেণ্ড কষ্ট করে নিজের ভারসাম্য বজায় রাখে। এর ভিতর দ্রুত মিলন সাধন হয়ে যায়। তারপর পিঠ থেকে নেমেই বুকের দু'পাশের পালক ফুলিয়ে পাখার মতন লেজ ছড়িয়ে উপর নিচ করতে করতে দৌড়ে চলে গেল।

বিলিতি জিরিয়া (Kentish Plover)

আর-একটি জিরিয়াকে প্রথম দেখেছি কলকাতার গা ঘেঁষে বজবজ লাইনে কালিঘাট-মাঝেরহাট স্টেশনের পরেই ব্রেস-ব্রিজের জলায়, পরে সুন্দরবনে। জিরিয়ার সঙ্গে তফাত বিশেষ নেই। দূর থেকে তফাত করাও শক্ত। চোখের উপর দিয়ে পাটকিলে টানটা অপেক্ষাকৃত সরু। জিরিয়ার যেমন

উপরের বুকের পটিটা পুরো, এদের তা নয়, শুধু দুটো ছোটো ব-দ্বীপ বুকের দু'পাশে। জিরিয়ার পা থৌয়াটে সবজেটে-হলুদ, এদের পা কালচে। লম্বায় জিরিয়ার মতই 17 সেমি (সাড়ে 6 ইঞ্চি), তবে লেজের পালকের বিন্যাসে তফাত আছে। এই পাখির নাম রেখেছি— বিলিতি জিরিয়া (চারাড্রিয়াস আলেকজান্ড্রিনাস), তামিল— *সিন্না কট্টান*, মালয়ালী— *মানাল কোন্নি*, ইংরেজি— *কেন্টিশ প্লোভার*।

বাসস্থান— ক্যানারি, মদিরা, অ্যাজোরস্ এবং কেপ ভার্দ দ্বীপপুঞ্জ, ইংলন্ডের দক্ষিণ উপকূলে এবং ইওরোপের বিভিন্ন অংশ, মধ্য এশিয়ায় সুইডেন, ল্যাটভিয়া থেকে পুবে কোরিয়া, উত্তর সাহারার দক্ষিণে, মিশর, আরব,এবং সিন্ধুপ্রদেশ। শীতে পরিযায়ী হয় দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, দক্ষিণ চীন, জাপান, ফরমোসা এবং সুন্দা দ্বীপপুঞ্জে। কিছু পাখি স্থায়ী বাসা বেঁধেছে পাকিস্তানের বেলুচিস্তান ও সিন্ধু, উত্তর ভারতে উত্তর বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলা, গুজরাটে ভাবনগর, পোরবন্দর ও খরাগোদায়। মনে হয় ভারতের আর কোথাও না কোথায় বাসা বাঁধে।

খাদ্য ও স্বভাব— জিরিয়ার মতই। তবে ডাকে 'টুউ-ইট টুউ-ইট ইট্রাপ ইট্রাপ'।

জলকোপি বংশ

সৈকত বর্গে জলকোপি বংশের (জাকানিদি) পাখিদের দেখা যায় যেসব ঝিল, বাদা, পুকুর বা জলাশয়ে ভাসমান জলজ উদ্ভিদ আছে অর্থাৎ শালুক, পদ্ম, পানিফল, পাটাকুল (ময়রা) শেওলা (হাইড্রিলা) ইত্যাদি আছে, সেইখানে দামের উপর বিচরণ ও বাস করতে। এছাড়া অন্যত্র নদী বা জলাশয়ে দেখা যায় না।

এই বংশে মাত্র দুটি গণ— বৃহদাঙ্গুল (মেটোপিডিয়াস) ও জল-জীবঞ্জীব (হাইড্রোফাজিয়ানাস) এবং প্রজাতিও মাত্র দুটি। দুই প্রজাতির স্ত্রী-পাখিরা আকারে একটু বড়ো। প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এদের মাকড়সার মতো লম্বা আঙুল এবং সেইকারণেই হালকা শরীর নিয়ে জলজ দামের উপর স্বচ্ছন্দে হেঁটে ও দৌড়ে চলাফেরা করতে পারে, মাটির উপর তেমনভাবে পারে না। ওড়ার মধ্যেও স্বাচ্ছন্দ্য নেই। খুব দ্রুত ডানা নাড়লেও তত জোরে উড়তে পারে না। একটু গিয়েই হয় দামের উপর না হয় জলের ধারে মাটিতে বড়ো ঘাসের মধ্যে আত্মগোপন করে। তবে সাঁতার ও ডুব সাঁতারে পটু।

জলপিপি (Bronze-winged Jacana)

এই পাখিকে গ্রামগঞ্জের পদ্ম, শালুক বা কচুরিপানায় ভরা দীঘির পাড় ঘেঁষে দেখেছি। লক্ষ্য করেছি শীতের চেয়ে বর্ষায় বেশি দেখা যায়।

যখন কলেজে পড়ি তখন এবং তারপরেও ছিল অসম্ভব মাছধরার সখ। ছুটি-ছাটায় তো যেতামই, তাছাড়া পাসের পুকুরে ভিড় হবে না বলে অন্যান্য দিনেও কলেজ বা কাজকর্ম ফাঁকি দিয়েও যেতাম। মাছধরা ছাড়া পাখি দেখাও হতো। সবচেয়ে প্রিয় জায়গা ছিল বরানগরে ডানলপ ব্রিজের আশপাশে সি সি আর কাটিং। এখন আর সেসব জলাশয় নেই। সেখানে হয় হয়েছে কোনো কলোনি, না হয় কোনো কারখানা। ওখান দিয়ে ট্রেনে করে যেতে যেতেও চিনতে পারি না সেই সব জায়গা, যেখানে আমার যৌবনের অনেকগুলি দিন কেটেছে।

এক বে-ছুটি অর্থাৎ ছুটির দিন নয় এমন একদিনে গিয়ে বসেছি অন্য একটা খোলে, যেখানে নিত্য বসি সেখানে নয়। সঙ্গী ছিল শচীন বিশ্বাস যার ডাকনাম ছিল হুনে। উৎসাহটা ছিল হুনেরই বেশি। বেশ বড় খোল। লোকজনের যাওয়া-আসা আছে। আর আছে কচুরিপানার দাম। মৎস্যশিকারীরা ছুটির দিনে বসে বলে কচুরিপানার মধ্যে লেন বা গলি কাটা আছে। এখানে কাছে

মাছ খায় না, ঝিমেই টোপ ফেলতে হয়।

চারটার ফেলে বেশ গোছগাছ করে দুজনেই গুছিয়ে বসেছি, আমাদের ডানদিকে কিছু বৌ-ঝিরা বাসন মাজছে। তাদেরই পাশে আরেকটু দূরে ডানদিকে পাটাতনের উপর এক ধোপা ধুতি-শাড়ি কাপড় পেটাচ্ছে। ফাতনার দিকে তাকাতে তাকাতে জলের ছিটে দিয়ে ফাতনার উপর থেকে ফড়িং তাড়াতে তাড়াতে মাঝেমাঝে এদিক-ওদিক দেখছি। হঠাৎ দেখলাম কয়েকটা পাখি ধোপা ও মেয়েদের কলরবের মাঝে পাড় ঘেঁষে কচুরিপানার দামের উপর বেশ স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মোটেই শঙ্কিত বোধ করছে না। যেন সব পোষা।



চি 52. জলপিপি

পাখিদের মাথা, গলা, ঘাড়, বুক চকচকে কালো, চোখের পাশ থেকে চওড়া একটা সাদা টান ঘাড় পর্যন্ত। পিঠ ও ডানা সবজেটে-ব্রোঞ্জ, বেঁড়ে লেজ বাদামী-লাল। কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু সবজেটে-হলুদ, গোড়ায় একটু লালের ছোপ, ডগাটা হলুদ। চঞ্চুর গোড়া থেকে কপাল পর্যন্ত একটা সীসে-লাল বর্ম। পা ও আঙুল ময়লাটে সবুজ।

এই পাখিরা সৈকত বর্গে (চারাড্রিয়িফরমেস) জলকোপি বংশের (জাকানিদি) অন্তর্গত বৃহদাঙ্গুল গণের (মেটোপিডিয়াস) *এক প্রজাতি।* বৃহদাঙ্গুল গণে *একটিই প্রজাতি।* নাম— জলপিপি, দলপিপি (মেটোপিডিয়াস ইন্ডিকাস), হিন্দি— *পিপি, কুভাই,* গুজরাটি— *কালো জল মনজর,* মণিপুরী— *থামনাচেনবি* (পদ্মপাতায় দৌড়বাজ), ইংরেজি— *ব্রোঞ্জউইংড জাকানা।* লম্বায় পুরুষ 28 সেমি (11 ইঞ্চি), স্ত্রী 31 সেমি (12 ইঞ্চি)। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে, কেবল স্ত্রী-পাখি আকারে একটু বড়ো।

বাসস্থান— পশ্চিম পাঞ্জাব ও পশ্চিম রাজস্থান ছাড়া ভারতের সর্বত্র, নেপাল থেকে পুবে মণিপুর, দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা এবং বাংলাদেশ। পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় নেই। দেখা যায় সমতলের ঝিল ও পুষ্করিণীর ভাসমান জলজ উদ্ভিদের মাঝে। ভারতের বাইরে বর্মা, শ্যামদেশ, ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া, মালয় উপদ্বীপের নানা স্থানে।

খাদ্য— প্রধানত উদ্ভিদ, বিভিন্ন বীজ, উদ্ভিদের কচিপাতা, শিকড় ইত্যাদি। এছাড়া জলজ পোকামকড় ও তাদের শূক এবং কম্বোজ।

স্বভাব— লুকোবার জায়গা থেকে একটু বাইরে যখন আসে, তখন হঠাৎ কোনকারণে বিপদের আশঙ্কা বুঝলে চঞ্চুটি ভাসিয়ে বাকি দেহটা জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে। স্থানীয় শিকারী বা ছেলেপুলেদের তাড়া খেলে পাড়ে ঘাসের মধ্যে গিয়ে লুকোয়। ডুব সাঁতারে ও সাঁতারে খুব দক্ষ কিন্তু ওড়ায়

একদম দ্রুত নয়। গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে লম্বা ঠ্যাং ঝুলিয়ে ল্যাগব্যাগ করতে করতে ওড়ে। কয়েক মিটার দামের একটু উপর দিয়ে উড়ে আবার নেমে পড়ে ঐ দামেরই উপরে।

একটা ছোট্ট কর্কশ ডাক আছে, সেটা ব্যবহার করে পরস্পরের মধ্যে সংযোগ রাখার জন্যে। একটা আক্রমণাত্মক বিরক্তিপূর্ণ বাঁশির মত ডাক দেয় 'সিইক সিইক সিইক' করে।

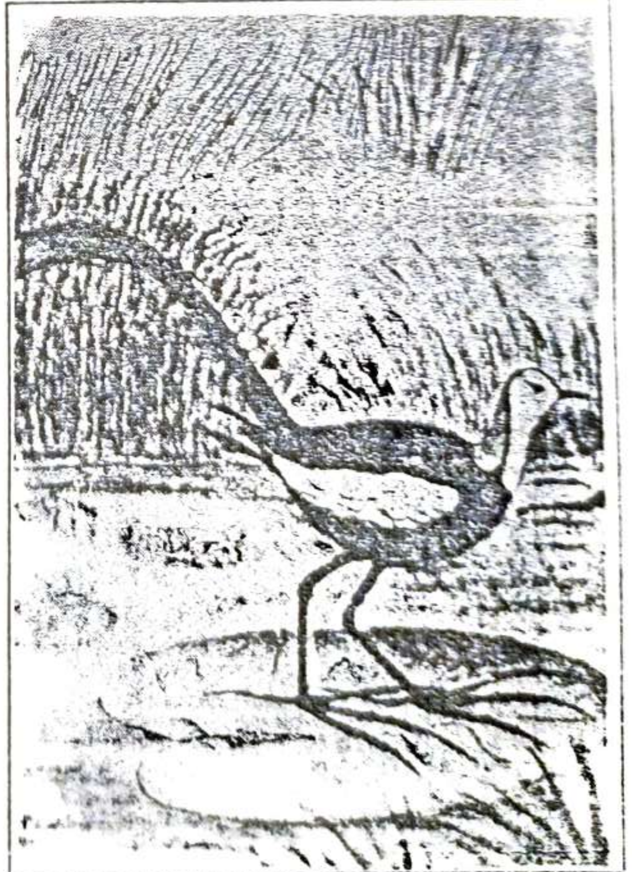
প্রজননকাল— জুন থেকে সেপ্টেম্বর। দক্ষিণপশ্চিম মৌসুমী বায়ু শুরু হবার পরেই। ভাসমান উদ্ভিদের চাপড়ার উপর কিছু ঘাস ও আগাছার টুকরো দিয়ে বাসা বানায়। অনেকসময় বাসা না বানিয়ে দেখা যায় সরাসরি পদ্মপাতা বা পানিফলের পাতার উপর ডিম পাড়তে। ডিম সাধারণত 4টি চকচকে লাট্টুর মাথার মতো ব্রোঞ্জ-পাটকিলে, তার উপরে খাপছাড়া কালচে আঁকিবুকি জালবোনা। কতদিনে ডিম ফোটে তা এখনও সঠিক নির্ণয় হয় নি, তবে আন্দাজ করা যায় 14 - 16 দিনে ফোটে।

ডিমের গড় মাপ— 36·4×25·1 মিমি।

জলময়ূর (Pheasant-tailed Jacana)

এই পাখিকে যেমন দেখেছি লবণহ্রদে কচুরিপানার দামে, তেমনই দেখেছি মোটরে করে শান্তিনিকেতন যাবার পথে, ইলামবাজার ছাড়িয়ে পদ্মবন ও শালুকদামে। এছাড়া অন্যত্রও দেখেছি। পদ্মবনে দেখেছিলাম একসঙ্গে কুড়ি-পঁচিশটা, তার সঙ্গে গোটা কতক জলপিপিও ছিল।

বর্ষকাল। শ্রাবণের এক দুপুর। আকাশে মেঘ থাকলেও মেঘের ফাঁকে সূর্যদেব তাঁর তেজ চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। বুঝতে পারছি একটু বাদেই বরুণদেব তাঁর তেজকে ঘন কালো মেঘে ঢেকে দিয়ে জব্দ করে দেবেন। তখনই দৃষ্টিপথে পড়ল খুব নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকটা পাখি পদ্মপাতার উপরে। মোটর থামিয়ে একটু হেঁটে আমরা ক'জনে গিয়ে বসেছি পদ্মবিলের ধারে। আমার চোখে দূরবীন। পাখিগুলোর কোন ভয়ডর নেই, নির্বিবাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখতে ধবধবে সাদা আর চকোলেট-পাটকিলে, আঙুল মাকড়সার মত খুবই বড়ো, লম্বা লেজ সরু কাস্তের মতো বাঁকানো, মাথা ও গলা সাদা, ঘাড় ফিকে রেশমী সোনালি-হলুদ। মাঝে মাঝে অল্প উড়ে যখন এদিক-ওদিক করছিল, তখন চকচকে সাদা



চি ৭২ জলময়ূর

পালক ও বাঁকা কাস্তের মত সরু লেজ বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছিল। ডানার ঘাড়ের বাঁকের কাছে ধারালো বাঁকানো কাঁটা যেমন থাকে, কাঁটা টিটির (স্পারউইংগড ল্যাপউইংগ)। যারা একটু আকারে বড় তারা স্ত্রী-পাখি। নাহলে স্ত্রী-পুরুষ চেনাই যায় না। এটা এদের প্রজননকালীন রূপ। আমি ঘাসের উপর বসে আপনমনে এদের এক একজনের স্বল্প দূরে উড়ে যাওয়া দেখছি। কোন সময়ে সূর্যকে কালো মেঘে ঢেকে ফেলেছে তার খেয়াল নেই। আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে সহসা খাপ থেকে বেরিয়ে আসা এক তলোয়ারের মত বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল, আর তার পরমুহূর্তে মেঘদেবের বজ্র-নিনাদ। আসন্ন বৃষ্টির ভয়ে সবাই ছুটলাম গাড়ির দিকে।

শীতকালে দেখেছি এদের দেহ প্রধানত ফিকে পাটকিলে ও সাদা। বুকের উপর একটা কালো নেকলেস, লম্বা কাস্তে লেজটা নেই। ওড়ার সময় কেবল দেখা যায় পাটকিলে মাথা ও পিঠ সাদা, ডানার শেষে ছোট্ট করে কালো ছোপ।

প্রজননকালে এদের কনীনিকা পাটকিলে, সরু চঞ্চু স্লেট-নীল, ডগাটা একটু ফিকে, পা ও আঙ্গুল ফিকে সীসে। অন্য সময় কনীনিকা ফিকে হলুদ, চঞ্চুর গোড়ার খানিকটা হলুদ, বাকিটা পাটকিলে, পা ও আঙুল ময়লাটে সবুজ বা ফিকে সীসে।

এই পাখিরা জলকোপি বংশের (জাকানিদি) অপর গণ জল-জীবঞ্জীব (হাইড্রোফা জিয়ানাস)-এর এক প্রজাতি। নাম— জল ময়ূর (হাইড্রোফাজিয়ানাস চিরুরগাস), হিন্দি— *পিহো, পিগুইয়া, কুকরা, ভেগি,* তামিল— *মিওয়া,* মালয়ালী— *তামরা কঝি,* কাছাড়ি— *রানি ডিভাও গোফিটা* ...ট, ফর্সা জল রাজকন্যা), ইংরেজি— *ফেঝান্ট টেইলড জ্যাকানা*। লম্বায় লেজ ছাড়া 31 সেমি (12 ইঞ্চি), লেজ 32 সেমি (13 ইঞ্চি)। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে তবে স্ত্রী-পাখি আকারে একটু বড়। জল-জীবঞ্জীব গণে (হাইড্রোফাজিয়ানাস) *একটিই প্রজাতি।* এই গণের পাখির চঞ্চু বৃহদাঙ্গুল গণের (মেটোপিডিয়াস) পাখির চেয়ে সরু। সামনের আঙুল বৃহদাঙ্গুলের মত বড় কিন্তু পিছনের আঙুল ছোট। ডানার কাঁধে শক্ত ধারাল বাঁকা কাঁটা।

বাসস্থান— পাকিস্তান, নেপাল, আসাম, মণিপুর, পশ্চিমবঙ্গসহ সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা। পাওয়া যায় বিল, বাদা, দীঘি, পুকুর ইত্যাদিতে যেখানে পদ্ম, শালুক, কচুরিপানা, পানিফল এইসব ভাসমান জলজ উদ্ভিদ আছে সেখানে। ভারতের বাইরে বর্মা, থাইদেশ, দক্ষিণ চীন, ফরমোসা; দক্ষিণে মালয়, জাভা, ইন্দোচীন ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে।

খাদ্য— প্রধানত উদ্ভিদ অর্থাৎ বিভিন্ন বীজ, শিকড় ইত্যাদি, জলজ পোকামাকড় ও তাদের শূক, ঝিনুক (বাইভালভেস) ও অন্যান্য কম্বোজ।

স্বভাব— জলজ উদ্ভিদের উপর মাকড়সার মত লম্বা আঙুল ছড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে ভারসাম্য রেখে খাদ্য খুঁজে বেড়ায় ঝিল, বাদা, এমনকি মন্দিরের পাশে ডোবাতেও। মাঝে মাঝে জলের মধ্যে মাথা সমেত পুরো দেহটা ডুবিয়ে দেয়। পরে চঞ্চুটাকে শুধু ভাসিয়ে রাখে। বেশ লাগে দেখতে শালুক ও পানিফলের দামের উপর একপা একপা ফেলে যখন চলে। অনেক সময় দেখা যায় সামনের পা ফেলার সময় পিছনের পায়ের ভারে পেট পর্যন্ত ডুবে গেছে, কিন্তু নির্বিবাদে সামনের পায়ের উপর ভর দিয়ে উঠে এসেছে দামের উপর। ভয়ডর একটু কম। পুকুর বা দীঘিতে

বাসনকোসন মাজা, সাঁতার কাটা বা কাপড়চোপড় কাচায় ওরা বিব্রত বোধ করে না, ভ্রূক্ষেপও করে না, আপন মনেই চলাফেরা করে। শীতে দলবদ্ধ হয় বেশি। দেখা গেছে 50 থেকে 100-র দলে। সেই সময় কোঁচবকদের সঙ্গে দেহের রঙে এমন মিশিয়ে যায় যে ধরাই যায় না। ওড়াটা দুর্বল, খানিকটা হট্টিমাদের মতো, 2-3 মিটারের বেশি উঁচুতে ওড়ে না, খানিকটা গিয়েই দামের উপর নামে। সেই সময় ল্যাগব্যাগ করা ঝুলন্ত সরু ঠ্যাং দেখা যায়। ডানার কাঁটায় যে কি প্রয়োজন তা বোঝা যায় না। তবে প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়াইয়ে যে ব্যবহার হয় না সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই।

শীতে কিরকম যেন বেড়ালছানার মত একটা ডাক দেয়। যেন হঠাৎ ওড়ায় বিপদজ্ঞাপক সংকেত— 'মি ই-ও মি ই-ও মি-ওপ্'। নানা রকম ছোটখাটো অভিব্যক্তি আছে, তার মধ্যে 'টিউ টিউ' আর 'কুউ' প্রধান।

প্রজননকাল— জুন থেকে সেপ্টেম্বর, কাশ্মীরে মে মাসের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে, শ্রীলঙ্কায় প্রধানত মার্চ থেকে জুলাই। বাসা বাঁধে আধা-ডুবন্ত জলজ উদ্ভিদের উপর ঘাস ইত্যাদির চাপড়া দিয়ে। কখনও দেখা যায় পদ্ম বা শালুক ইত্যাদির পাতার উপর কোনো কিছু না বিছিয়ে সরাসরি ডিম পাড়তে। ডিম পাড়ে লাট্টুর মাথার মত চকচকে সবজেটে-ব্রোঞ্জ বা লাল-পাটকিলের 4টি ছোপছাপহীন। ডিম ফোটে 26 দিনে। ডিমের গড় মাপ 37·4 × 27·6 মিমি।

কুনাল পাখিদের (পেইন্টেড স্নাইপ) মত এদের স্ত্রী-পাখিরা বহুগামিনী। পুরুষ তার চৌহদ্দি অন্যান্য পুরুষের সঙ্গে লড়াই করে ঠিক করে নেয়। লড়াইয়ের সময় মনোনীতকে মনোনীতা সবলে সাহায্য করে, জেতার জন্যে কিন্তু সেই সাহায্য একমাত্র তার প্রয়োজনের তাগিদেই। তারপর আর ফিরে তাকায় না, অন্য পুরুষের সঙ্গে গিয়ে ভেড়ে। ডিম পাড়ে 24 ঘণ্টা অন্তর অন্তর। সকালবেলায় প্রথম ডিম পাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষ তা' দিতে থাকে। কোন কারণে বিরক্ত বোধ করলে মাথা নিচু করে গলা আর বুকের মধ্যে ডিম চেপে ধরে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। কখনও বা ডিমকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যায় একটু দূরে। ডিম ফোটার পর বাচ্চাদের খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পুরুষই প্রতিপালন করে। শত্রু তাড়াতে শত্রুর বিভ্রান্তির জন্য আহত হবার ভঙ্গি দেখিয়ে তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। বাচ্চারা বাপের ইঙ্গিতে চুপ করে লুকিয়ে পড়ে। অনেক সময় পাতার আড়ালে চঞ্চু ভাসিয়ে রেখে শরীর জলের তলায় রাখে। ভারতে স্ত্রী-পাখি কবার পুরুষ সঙ্গ ক'রে ডিম পাড়ে তা জানা যায় নি। মনে হয় দু থেকে তিনবার। চীন দেশে 7 থেকে 12 দিন অন্তর সঙ্গ করে। ডিম পাড়ে 7 থেকে 10 বার।

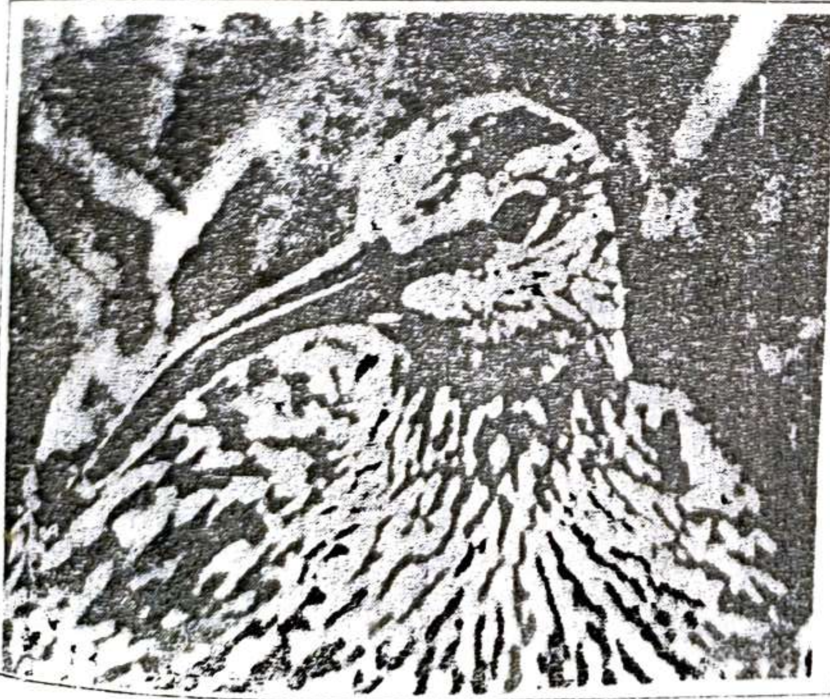
আরামুখ বংশ

সৈকত বর্গের অন্তর্গত অন্যতম বংশ আরামুখ (স্কোলোপাসিদি)। এই বংশে 12টি গণ। যথাক্রমে নক্তকুররী (ন্যুমেনিয়াস), আরা (লিমোসা), নীররঙ্ক (ট্রিংশ), বালুক (আরেনারিয়া), পঙ্কচারি (লিমনোড্রম্যাস), গোভণ্ডীর (ক্যাপেল্লা), আরামুখ (স্কোলোপাকস্), বারিরঙ্ক (ক্যালিড্রিস), চমসচঞ্চু (ইউরাইনর হিনচ্যাস), পঙ্কবাসী (লিমিকোলা), কালিরঙ্ক (ট্রাইনগিটেস) ও ভট (ফিলোমাচ্যাস)।

ছোটো গুলিন্দা (whimbrel)

সুন্দরবনে গেলেই একটা-দুটো পাখি আমায় খুব চিন্তায় ফেলে। একই জাতের পাখি হলেও দুটো উপজাতি। হাতে না পেলে দুটো উপজাতির তফাত করা যায় না। যে অবস্থায় থাকি এবং যে অবস্থায় দেখি তাতে নমুনা সংগ্রহ করাও অসম্ভব। কুড়ি বছর বন্দুক ছেড়ে খুবই মুশকিলে পড়েছি।

প্রথম দেখি বাংলাদেশের খুলনা জেলার সুন্দরবনে। অবশ্য তখন বাংলাদেশ হয় নি। এখনত প্রায়ই দেখি পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে। 11-3-81 বেলা তিনটে নাগাদ মণিপুর থেকে সন্দেশখালি ফিরছি নৌকোয়। নদীতে হাজারে হাজারে কালীহাস (স্কপ ডাক)। ভাটা শুরু হয়ে গেছে। জল সরে গিয়ে পাড়ের কাদা বেরিয়ে পড়েছে। তার উপর ইতস্তত বেশ দূরে দূরেই এক একটা মুরগির আকারে পাখি কিন্তু তার গাঢ় শিঙে-পাটকিলে চঞ্চুটা বেশ বড়, প্রায় 80 90 মিমি এবং নিচের দিকে বাঁকানো। তলার চঞ্চুর গোড়াটা গোলাপি। ভালো করে দেখার জন্যে দূরবীনটা চোখে লাগিয়ে



চি 54. ছোট গুলিন্দা

নিলাম। মাথায় সাদার উপর গাঢ় পাটকিলে, প্রায় কালোর একটা করে টান, চঞ্চুর গোড়া থেকে

ঐরকম একটা টান চোখের পিছন পর্যন্ত, তারপর আবার সাদা টান। দেহের উপরে বালি-পাটকিলের উপর সাদা ছোপ বা ছিট, পিঠের শেষ ও কোমর সাদা, লেজের উপরের আচ্ছাদকে সাদার উপর পাটকিলের লম্বা লম্বা টান, লেজে ছাই-পাটকেলের উপর কালো টান। চিবুক গলা ও পেট সাদা, তার উপর কালচে লম্বাটে সব টান। পা ও আঙুল সবজেটে-ধূসর। স্ত্রী-পাখি পুরুষের চেয়ে আকারে কিছুটা বড়ো।

কাদার উপর দ্রুত পায়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। দেখি একটা একদাঁড়া বেউলে কাঁকড়া (ইউকা মারিওনিস), ইংরেজি ফিডলার ক্র্যাব-কে গর্ত থেকে লম্বা চঞ্চু দিয়ে লম্বা দাঁড়াটা ধরে টেনে তুলেছে। মনে হল, কাঁকড়টা এক ঝাঁকানি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মাটিতে পড়ল। দাঁড়াটা পাখির চঞ্চুতেই রয়ে গেল। সরসর করে কাঁকড়াটা এগিয়ে গিয়ে গর্তে ঢোকবার আগেই পাখিটা দাঁড়াটাকে ফেলে দিয়ে খুবই ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ওটাকে ধরে গিলে ফেলল। পাখিটার মধ্যে কোনো চাঞ্চল্যই দেখলাম না, যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। তারপর ধীরে-সুস্থে আরেকটা গর্তে চঞ্চু ঢোকাল। আর দেখা গেল না। নৌকো তখন ওদের অনেকটা ছাড়িয়ে এসেছে।

লম্বা বাঁকানো চঞ্চুর জন্যে পাখিটাকে চিনতে অসুবিধে হয় না। লম্বায় 47 সেমি (17 ইঞ্চি)। তবে দুই উপজাতির মধ্যে কোনটা যে কে তা ধরা বেশ শক্ত। সৈকত বর্গের অন্তর্গত আরামুখ (স্কোলোপসিদি) বংশের নক্তকুররী গণের *এক প্রজাতি*, নাম ছোটো গুলিন্দা, সরলা বাটান (ন্যুমেনিয়াস ফাইওপাস), হিন্দি— *ছোটো গৌঙঘ্, ছোটো গুইন্যায়ার*, মালয়ালী— *টেট্রি কোক্কু*, তামিল— *কুথিরাই মলাই কোট্টান*, ইংরেজি— *হুইমব্রেল। উপজাতি* 2টি। *প্রথম* (ন্যু ফা ফাইওপাস) উত্তর স্ক্যান্ডিনেভিয়া ল্যাপল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, উত্তর রাশিয়া, পশ্চিম সাইবেরিয়া থেকে তরলস্ক এবং উত্তর আইরতাইস্কোর-এর বাসিন্দা। শীতকালে পরিযায়ী হয় পাকিস্তান, পশ্চিম ভারতের গুজরাট উপকূল ধরে কেরালা, শ্রীলঙ্কা, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং পূর্ব উপকূল ধরে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে। *দ্বিতীয়টি* (ন্যু ফা ভ্যারিগাটাস) পূর্ব সাইবেরিয়া থেকে পশ্চিমে লেনা নদীর বাসিন্দা। শীতে পরিযায়ী হয় আসামের উত্তর কাছাড়, লখিমপুর, মণিপুর, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ এবং পূর্ব চীন থেকে অস্ট্রেলিয়ার আশপাশের দ্বীপপুঞ্জে।

দুটি উপজাতিকে হাতে পেলে চেনা যায়। *প্রথমটির* (ন্যু ফা ফাইওপাস) গায়ের রং মলিন, গায়ের লম্বা টান, দাগ ও ছিটগুলো একটু ফাঁক ফাঁক। *দ্বিতীয়টির* (ন্যু ফা ভ্যারিগাটাস) গায়ের রং গাঢ়, গায়ের টানা দাগ ও ছিটের রং গাঢ়, চওড়া এবং অজস্র।

খাদ্য— প্রধানত কম্বোজ ও কবচী।

স্বভাব— ডাকে মিষ্টি সুরে 'টেট্রি-টেট্রি-টেট্রি-টেট। উড়তে উড়তে ডাকটা বেশি ডাকে। যে একবার শুনেছে তার মনে থাকবেই।

পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে দেখা যায় 5 থেকে 15-র দলে। কখনও বা জোড়ে বা একা। যেখানে জোয়ার-ভাঁটা খেলে এমন নদীর পাড়ে, বিশেষত ভাঁটার সময় কাদার উপর খাদ্য অন্বেষণে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র এরা শীতে পরিযায়ী হয়ে আসে এবং সাধারণত এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে মে মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই চলে যায়।

11.5.83 তারিখে সুন্দরবনে দেখে আশ্চর্য হই। অবশ্য কিছু পাখি যারা প্রজনন করবে না, তাদের দেখেছি অনেক সময় আরও কিছুদিন থেকে যেতে। লক্ষ্য রাখছি, কোনও পাখি নিজ আবাসস্থলে ফিরে না গিয়ে এক বছরের মতো থেকে যায় কিনা। এখানে খাদ্যের কোনো অভাব এদের কখনই হবে না। বাসা বেঁধে বাচ্চা তুলছে কিনা তাও দেখতে হবে।

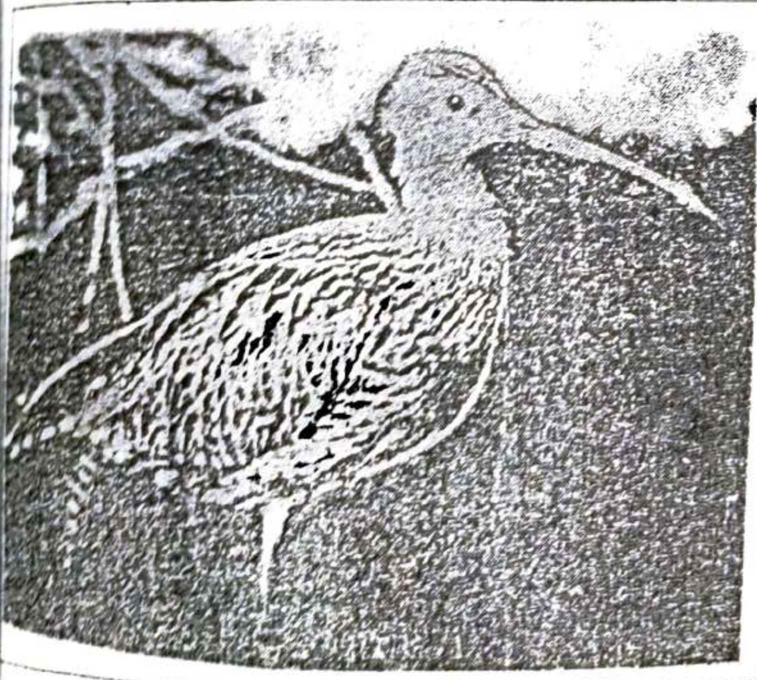
প্রজননকাল— মে-জুন। বাসা বানায় বাদা অঞ্চলে। ঘাসের লাইনিং দেওয়া একটু খোঁদল করা গোলাকার বাসা। ডিম পাড়ে 3-4টি পেয়ার ফলের আকারে জলপাই সবুজ রঙের, তার উপর পাটকিলের ছিট ও ছোপ। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। পুরুষই ডিমে তা দেওয়া এবং বাচ্চাদের মানুষ করায় অগ্রণীর ভূমিকা নেয়।

ছোট গুলিন্দার বাসা বাঁধার হদিস এখনও পর্যন্ত না পেলেও বড় গুলিন্দা, সাদা কাঠচূড়া বা চোপ্পা (ন্যুমেনসিস আরকোয়াটা ওরিয়েন্টালিস), ইংরেজি— *কারলিউ*-কে দেখা গেছে 3টি সদ্যফোটা বাচ্চাকে নিয়ে কাদার উপর ঘুরতে। এদের আবাসভূমি কিন্তু দক্ষিণ বৈকাল অঞ্চল এবং ডওরিয়ায়।

চোপ্পা (Eurasian Curlew)

সুন্দরবনে এই পাখিটি আমার চোখে কম পড়েছে, কিন্তু ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধিকর্তা শ্রী প্রণবেশ সান্যাল মহাশয় দেখেছেন তিনটি সদ্যফোটা বাচ্চা নিয়ে কাদার উপর ঘুরতে।

এই সেদিন গত 10-10-85 -তে মায়াদ্বীপে পৌঁছে বঙ্কখালি দিয়ে চলেছে আমাদের ছোট লঞ্চ রাঙাবেলিয়া। খুব ধীরে ধীরে চলছে। দূরে দেখছি পাড়ের একদম ধারে অল্প জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটা পাখি। প্রথমে ভেবেছি ছোট গুলিন্দা বা সরলা বাটান (হুইমব্রেল) দেখছি। তারপর মনে হল সরলা বাটান বা ছোট গুলিন্দা নয়। আকারে একটু বড়। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এসে নিচের ঘর থেকে একটা ছবিও তুলে নিলাম। গাঢ় বালু-পাটকিলে, উপরটা-তার উপর অর্ধবৃত্তাকারে লালচে-হলুদের খোলা কাটা, সরু বাঁকা চঞ্চু তলাটা সাদা, তার উপর আঁকাবাঁকা



চি 55. চোপ্পা

কালো ডোরা দাগ। ও উড়ল। তখন দেখলাম পিঠের তলা ও বস্তিপ্রদেশ সাদা। আকারে ছাড়া ছোট গুলিন্দার সঙ্গে যে পার্থক্য এটা তখন দেখা গেল। ছোট গুলিন্দার মাথা চাঁদিতে যে কালো ও সাদার টান থাকে এর তা নেই। কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু গাঢ়

পাটকিলে কিন্তু গোড়ার অংশ মাংসল পাটকিলে, পা ও আঙুল ফিকে ধূসর, কখনও বা নীলচে ধূসর। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

সৈকতবাসী এই পাখি আরামুখ বংশের (স্কোলোপাসিদি) অন্তর্গত নক্তকুররী গণের (ন্যুমেনিস) এক প্রজাতি। নাম— চোপ্পা, সাদা কাস্তেচুড়া (নুমেনিস আরকোয়াটা ওরিয়েন্টালিস)। হিন্দি— বড় গুলিন্দা, গুজরাটি— খালিলি, তামিল— কুথিরাই মালাই কট্টান, মালয়ালী— ভালকোক্কু, ইংরেজি— কারলিউ। লম্বায় 58 সেমি (23 ইঞ্চি)।

বাসস্থান— দক্ষিণ বৈকাল ও ডওরিয়া অঞ্চল থেকে পশ্চিম সাইবেরিয়া। শীতে পরিযায়ী হয় পূর্ব আফ্রিকা, মালাগাসি, বর্মা, ইন্দোচীন, মালয়, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও ভারতে। ভারত ও পাকিস্তানে দেখা যায় সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল সমূহ, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, মালদ্বীপ ও লাক্ষাদ্বীপে। সমুদ্রকূল ছাড়াও শীতকালে দেখা গেছে উত্তর বেলুচিস্তানের কোয়েটা ও চমন হ্রদ, পাঞ্জাবে সিন্ধু ও অন্যান্য বড় নদীর কূলে ; রাজস্থানে ভরতপুর ও সম্বর হ্রদ, দিল্লির যমুনা তট, নেপালের উপত্যকা ও হিমালয় অঞ্চল, উত্তর বিহারের দ্বারভাঙা জেলা, আসামে উত্তর লখিমপুর ও উত্তর কাছাড়, মণিপুরে লগটাক হ্রদ, উত্তরপ্রদেশে লখনৌ জেলা, মধ্যপ্রদেশের মহানদী, দাক্ষিণাত্য এবং পশ্চিম খান্দেশে। দেখা যায় বন্দর, বালুকাপূর্ণ সমুদ্রতীর, জোয়ারভাঁটা খেলা পলি-কাদা, নদীর মোহানা, খাড়ি এবং গরান-বাইনপূর্ণ জলের ধারে। সুন্দরবন ওদের পক্ষে একটি আদর্শ মনোরম পরিবেশ। খাদ্যেরও অভাব নেই। ছোট গুলিন্দা ওখানে বাসা বেধেছে বাচ্চাসহ, ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধিকর্তা শ্রী সান্যাল যখন তা দেখেছেন তখন চোপ্পাদের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়াটা মোটেই আশ্চর্যের নয়। সাধারণত এরা এপ্রিলের শেষে বা মে মাসের গোড়ায় নিজের বাসভূমিতে ফিরে যায়। সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে অনেকসময় সেপ্টেম্বরের শেষেও দেখা যায়। তখনও ফিরে যায় নি। এটা বেশি দেখা যায় রামেশ্বর ও কচ্ছের উপসাগরে।

খাদ্য— কম্বোজ, কবচীদের মধ্যে প্রধানত বেউলে ও বালু-কাঁকড়া, মনুমাছ (মাডস্কিপার), বিভিন্ন পোকামাকড় এবং মাঝে-মধ্যে ফলসা, বৈঁচি জাতীয় খুব ছোটো ফল। আবার কেউ কেউ দেখেছেন গরু-মহিষদের চারপাশে ঘুরে ঘুরে শুকনো গোবরের মধ্যে থেকে পোকা খুঁটে তুলতে।

স্বভাব— শীতকালে যে ডাক আমরা শুনতে পাই তা তীক্ষ্ণ কিন্তু মিষ্টি 'কু-ইট, কুউর-লিই, কার লিউ'। উড়তে উড়তেও ডাকে। ছোট গুলিন্দার মত একবার যে এই পাখির ডাক শুনেছে সে কখনও ভুলবে না। প্রজননকালে এমনভাবে ডাকে যেন মনে হয় দূরে কোথায় এক কুকুরছানা মার খেয়ে চেঁচাচ্ছে 'ঔক ঔক ঔক' করে।

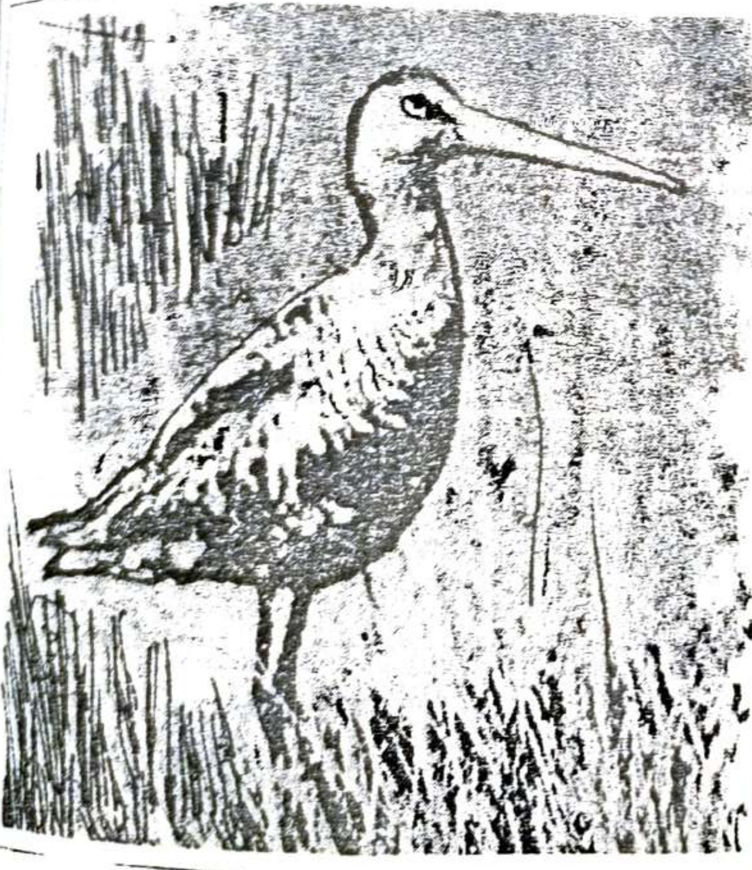
সাধারণত এরা একা বা জোড়ায় ঘোরাফেরা করে। কখনও বা দেখা যায় মাত্র পাঁচ-ছটি পাখি পলি-কাদা বা খাঁড়ির ধারে দৌড়াদৌড়ি করে খাদ্য সংগ্রহ করছে। অনেক সময় ওদের দলে জৌরালি (গডউইট) ও অন্যান্য সৈকতবাসীদের মিলেমিশে চরে বেড়াতে দেখা যায়। ছোট গুলিন্দার মত বড় দলে কখনও বিচরণ করে না। শীতের গোড়ায় পরিযায়ী হয়ে আসার আগে খবর পাওয়া যায়, খুব বড় ঝাঁক বাঁধে। সেই ঝাঁক কখনও দু'শও ছাড়িয়ে যায়। পরিযায়ী হয়ে আসার পর অনেক সময় সমুদ্রতীর থেকে দেশের অনেক ভিতরে ঢুকে ঝিল, কাদা বা বর্ষার পর তখনও ভিজে

ঘাসজমিতে খাদ্য খোঁজে। কাঁকড়ার গর্তে অর্ধেকের উপর বাঁকা চঞ্চু ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের বের করে এনে খায়। খুবই বন্য স্বভাবের, তাই খুব কাছে যাওয়া যায় না। শিকারীদের পক্ষে এদের মারা খুবই শক্ত। খুবই সতর্ক পাখি। পাখা ঝাপটিয়ে খানিকটা দৌড়ে মাটি ছেড়ে শূন্যে ওঠে। সেই সময় মুখে ডাক ছাড়ে এবং খুব দ্রুতই ওড়ে। তবুও এরা শিকারীদের কাছে খুবই প্রিয়, কারণ মারা রীতিমত এলেমের ব্যাপার। এদের মাংস অন্যান্য পাখিদের চেয়ে অনেক সুস্বাদু।

প্রজননকাল— সুন্দরবনে এখনও নির্ধারিত হয় নি। তবে এদের নিজেদের বাসভূমিতে মে-জুনে। ডিম পাড়ে ছোট গুলিন্দার মতো এবং আকারে একটু বড়ো।

জৌরালি (Black tailed Godwit)

শীতকাল শুরু হলেই একটা হারানো আবাসভূমির কথা বারবার আমার মনের মধ্যে এসে তুফান তোলে। জানি সেসব দিন আর ফিরবে না। হারিয়ে গেছে কলকাতার পটভূমি থেকে। সেই আকাশ-বাতাস দিগন্তবিস্তৃত শান্ত জলরাশি, নল ও শরবনের বাতাসে দোলা, পাখিদের নানারকমের কলগুঞ্জন, পাখসাট, ছোটখাটো জীবজন্তু, খালি নৌকো ভাসিয়ে তার চারদিকে জলের উপর ছেলেদের লগি পিটিয়ে সকালের আলোয় রূপোলি ছটা ছড়িয়ে লাফানো মাছ নৌকোয় ভরা,এসব আর কখনও দেখতে পাব না। এখন সেখানে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'ইটের পরে ইট, মাঝে মানুষ কীট' বাসা বেঁধেছে, বাসা বেঁধেই চলেছে। থামা নেই, ছেদ নেই। হারিয়ে গেছে আমার গুরুগৃহে যাত্রা। প্রকৃতির মাঝে প্রকৃতির পাঠ নিতে যাওয়া। আমাদের সঙ্গে যারা এই ধরণীর বুকে সহাবস্থান করে তাদের জানা, তাদের বোঝা। সেটা ছিল আমার একান্ত নিজের দেশ। যা আজও মনের মধ্যে ঘা মেরে আকুলতা জাগিয়ে তোলে। ইরেজিতে যাকে বলে 'নস্ট্যালজিয়া' তাতে ভুগি।



চি 56. জৌরালি

সেই হারানো দেশ খুঁজতে সুন্দবনকে আশ্রয় করেছি। কিন্তু সুন্দরবন অত্যন্ত সজীব চলমান, বহমান, সক্রিয়, যাকে বলে 'ডাইন্যামিক'। আর আমার লবণহ্রদ ছিল শান্ত, স্থির, নিশ্চল, যাকে

বলে 'স্ট্যাটিক'। সক্রিয় সুন্দরবনের মাঝে নিশ্চলকে খুঁজছি। মনে হয় এই শীতে পেয়ে যাব একটা শান্ত স্থির উপহ্রদ, যাকে বলে 'লেগুন' যেখানে সব গতি হারিয়ে গেছে।

আমার হারিয়ে যাওয়া সেই লবণ হ্রদেই গিয়েছি ডিসেম্বরের মাঝামাঝি এক সকালে। হাঁটতে হাঁটতে চলেছি। একটা খোলের কাছে এলাম, সেখানে নলবন নেই। সবটাই পরিষ্কার। কিন্তু পাড় ঘেঁষে বেশ কিছু পাখি ঘোরাফেরা করছে। সবার পা বেশ লম্বা। কিছু পাখি বুক পর্যন্ত জলে গিয়ে লম্বা চঞ্চু দিয়ে জলের মধ্যে থেকে খাদ্য খুঁজছে। প্রথমে মনে হয়েছিল ভাসমান শরাল (হুইস্লিং টিল)। সন্তর্পণে একটু এগিয়ে ভালো করে দেখলাম। না, শরাল নয়, ছোট গুলিন্দার (হুইমব্রেল, ন্যুমেনিয়াস ফাইওপাস) মতো লম্বাটে কিন্তু চঞ্চুটা নিচের দিকে বাঁকার বদলে সোজা। বেশ বড়সড়ো অল্পজলের জলচারী (ওয়াডার)। গাঢ় বালি-পাটকিলে উপরটা, তলা সাদাটে। আমরা কাছে যেতে দু'চারটে উড়ল। তখন দেখলাম কালো দুই ডানার শেষের দিকে সাদা পটি, লেজের উপরের আচ্ছাদকও সাদা। দূর থেকে ইংরেজি v-র মতো দেখায়। সাদা লেজের শেষে চওড়া কালো পটি।

পাখিগুলো পরিযায়ী হয়ে এসেছে। সৈকত বর্গের (চারাড্রিইফরমেস) অন্তর্গত আরা গণের (লিমোসা) *এক প্রজাতি।* নাম— জৌরালি (লিমোসা লিমোসা), ইংরেজি— *ব্ল্যাক টেইলড গডউইট।* পুরুষ লম্বায় 41 সেমি, স্ত্রী 50 সেমি। স্ত্রী আকারে একটু বড়ো। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে। চঞ্চু মলিন কমলা-লাল, গোড়ায় লালভাবটা বেশি, ডগাটা ময়লাটে। পা ও আঙুল ধূসরাভ-সবুজ।

এখান থেকে ফিরে যাবার ঠিক আগে প্রজননকালের রূপ ফুটে ওঠে। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনের তখন মাথা, বুক মলিন লালচে অর্থাৎ মরচে পড়া লাল, তলার বুক ও দু'পাশে আঁকাবাঁকা পাটকিলে লাইন। চিবুক, গলা, তলপেট এবং পিঠের নিচের অংশ সাদা।

বাসস্থান— উত্তর ও মধ্য ইউরোপ এবং পশ্চিম এশিয়া থেকে পশ্চিম তুর্কিস্থান। শীত কাটায় ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, দক্ষিণে আফ্রিকার অত্যুষ্ণ অঞ্চল, পাকিস্তান তার মধ্যে সিন্ধু প্রদেশেই বেশি, উত্তর ভারত থেকে বিহার, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গে। দক্ষিণে খুব বেশি দূর যায় না, তাই দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলঙ্কায় ক্বচিৎ দেখা যায়। ঝিল, কাদা, জোয়ার-ভাঁটা খেলে এমন খাঁড়ি, ঈষৎ লোনা হ্রদের ধারে আড্ডা গাড়ে।

আগস্টের শেষ সপ্তাহ থেকে সেপ্টেম্বরের গোড়ায় আসে সিন্ধু, গুজরাটে, সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি উত্তর ভারতে, তারপর বাকি অংশ ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। প্রজননকালীন সাজে ফিরে যেতে শুরু করে মার্চ থেকে জুন-জুলাইয়ের মধ্যে। অনেক সময় দেখা যায় কিছু পাখি প্রজননকালীন রূপ পায় না, তারা সেবারের মত সে বছর থেকে যায়।

খাদ্য— কম্বোজ, কবচী, নানারকম কৃমিজাতীয় পোকা, ঘাস ও জলজ চারার বীজ। এমনিতে চুপচাপ, তবে ডাক শোনা যায় 'উইট- উইট- উইট'।

একটা স্বভাব লক্ষ্য করা যায় যে, জলের ভিতর বা ডাঙায় মাটির ঢিবির উপর সবাই মাথা গুটিয়ে খুব ঘোঁষাঘেঁষি করে বাতাসের দিকে মুখ করে বসে থাকে। সবাই একসঙ্গে দল বেঁধে খুব দ্রুত এঁকে-বেঁকে ওড়ে, তখন সূঁচলো ডানার উপর সাদা পটিটা পরিষ্কার দেখা যায়। আবার বসে যখন, তখন সবাই একসঙ্গে, যেন সৈনিকের দল। যাঁরা শিকার করেন তাঁরা যদি এই পাখির দর্শন

পান, তবে আর কিছু শিকার না করে কেবল জৌরালিই শিকার করেন।

প্রজননকাল— প্রধানত মে-জুন। ঘেসো মাঠে ঝোঁদলের মধ্যে 4টি করে ডিম পাড়ে।

এছাড়া আরও দু'জাতের জৌরালি দেখেছি। সকলের একই নাম, আলাদা নাম নেই। প্রথমটাকে (লি লিমেলাইট্রয়ডেস) দেখেছি লিমোসা লিমোসা'র সঙ্গে যোগদান করেছে। কয়েকদিন পরে ঝাঁক দেখেছি চিল্কায় একসঙ্গে মিলেমিশে। আকারে একটু ছোট্ট, চঞ্চু বেশ বড়ো, তলার অংশে একটু কালো ভাব। এরা পরিযায়ী হয়ে আসে পূর্ব এশিয়ার উত্তর-পশ্চিম মঙ্গোলিয়া থেকে কামচাটকা, চীন, ভারত, বার্মা, ফিলিপাইনস, সুন্দা দ্বীপপুঞ্জ থেকে উত্তর অস্ট্রেলিয়া। ভারতে আসাম, মণিপুর, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশা। ওড়া এবং নামার সময় মিষ্টিসুরে ডাকে 'তির-রিই-উইই'।

দ্বিতীয় জৌরালি (লি লাপপোনিকা), ইংরেজি— *বারটেইলড় গডউইট*, হিন্দি— *মাংগরালকে*, প্রথম দেখি পাটনায় গঙ্গার ধারে, পরে চিল্কায় দেখি কয়েক শ' বা হাজারই হয়ত বা হবে। তিন জাতের জৌরালি আড্ডা গেড়েছিল একসঙ্গে। বারটেইলডদের পুরুষ 36 সেমি। স্ত্রী একটু বড়ো, 41 সেমি। সব জৌরালির লেজের পালক 12টি। এই জৌরালির লেজের বিশেষত্ব সাদা লেজের মাঝামাঝি থেকে তলা পর্যন্ত 7টি কালো পটি। তলার পটিটা একটু চওড়া। চঞ্চু একটু উপর দিকে বাঁকানো। এদের ওড়ার সময় ডানার উপর সাদা পটিটা দেখা যায় না, অর্থাৎ নেই। আচার-ব্যবহার, খাদ্যগ্রহণ তিনজনের একই। ডাকে অন্যান্য জোরালিদের মতো তিন শব্দে নয়, মিষ্টি করে সুশব্দে, 'তি-তেন, কিটিউ, কিটিউ'।

বাসস্থান— উত্তর ইউরোপ থেকে সমগ্র উত্তর এশিয়া। অন্যান্যরা যেখানে পরিযায়ী হয়ে আসে এরাও আসে সেই খানে।

বাটান (Spotted Redshank)

একটা পাখিকে প্রায়ই দেখতাম সেই ফেলে আসা যুগে, লবণ হ্রদে। যেখানে পক্ষীবিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়েছিলাম। একটি মাঝারি আকারের ধূসরাভ পাটকিলে-সাদা পাখি জলের ধারে কাদার উপর লম্বা কমলা-লাল পা ও সরু পাতলা লম্বাটে সোজা চঞ্চু নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনওবা অল্প জলে নেমে বুক ছুঁয়ে চলেছে তার খাদ্য অন্বেষণ করতে করতে, চঞ্চু ও মাথাটা পুরো ডুবিয়ে দিয়ে একের পিছনে এক লাইন বেঁধে।

বেশিরভাগ দিনই শীতের সকালে লবণ-হ্রদের সেই অসীম নিস্তব্ধতা ভেঙে যেত পাশ থেকে আশা বজ্রনিনাদে। দেখতাম যারা জলের মধ্যে দিয়ে বাদার কূল ধরে চরছিল তারা তাদের শুভ্র বুক উলটে শ্বেত পদ্মের মতো ভাসছে। তখন হাতে নিয়ে দেখেছি তার শীতকালীন রূপ। প্রজননকালীন রূপ হাতে নিয়ে দেখার কোনো সুযোগ আমার হয় নি। কারণ এরা যে দেশের পাখি আমার মতো লোকের সেখানে গিয়ে দেখার কোনো সম্ভাবনা ছিল না এবং নেইও।

লবণহ্রদে দেখতাম. সরু কপাল, চাঁদি ঘাড়ের পিছন ও উপরের পিঠ ছাই-পাটকিলে, চঞ্চু ও চোখের মাঝখানটা গাঢ় পাটকিলে, চঞ্চুর গোড়া থেকে চোখের উপর দিয়ে স্পষ্ট একটা সাদা টান : পিঠের তলার অংশ, বস্তিপ্রদেশ, লেজের উপরের আচ্ছাদন সাদা, কিন্তু লেজের সাদা আচ্ছাদনের উপর কালো কালো টান। লেজ ছাই-পাটকিলে, ধারে সাদা সাদা টান তলাটা সাদা, হাতে নিয়ে খুব কাছ থেকে দেখলে দেখা যায়, অস্পষ্ট পাটকিলের ছিট ও ছোপ ঘাড়ে এবং উপরের বুকে। বুকের দু'পাশে খুব ফিকে ছাইয়ের ছোপ। কনীনিকা কালচে-পাটকিলে, তলার চঞ্চুর গোড়াটা লালচে-কমলা, পা ও আঙুল কমলা-লাল, নখর কালচে-পাটকিলে। স্ত্রী-পুরুষ এঁকই দেখতে।



চি 57 বাটান

সুন্দরবনে এই পাখিকে খুবই দেখি। দূর থেকে চিনি এদের কমলা-লাল পা দেখে। তবে এখন সুন্দরবনে বন্দুক দাগার শব্দ বিশেষ শুনতে পাই না, একমাত্র চোরাগোপ্তা ছাড়া। দুষ্টু ছেলেদের হাতের গুলতি চলে নিঃশব্দে সাঁই সাঁই করে. তাতে দু'একটা পড়েও।

বাংলায় একেই বলে বাটান (ট্রিংগা এরাইথ্রপাস)। সৈকত বংশে নীররঙ্ক গণের এক *প্রজাতি*। হিন্দি— *গাটনি, সুরমা*, তামিল— *ইয়েররা কাল্ উলাংকা*, মণিপুরী—*ঙুহ্‌ইরি*, ইংরেজি— *স্পটেড রেডশ্যাংক, ডাস্কি রেডশ্যাংক*। লম্বায় 33 সেমি (13 ইঞ্চি)।

আর একটি এই জাতের পাখিকে লবণ হ্রদেও যেমন দেখেছি, সুন্দরবনেও তেমন দেখে থাকি। সেটা বড়ো আকারের এক বালুবাটান (স্যান্ডপাইপার), নাম— ছোটো বাটান (ট্রিংগা টোটানাস), তামিল— *মাল কট্টান*, সিংহলী— *মাহা ওয়াটুওয়া*, ইংরেজি— *ইস্টার্ন রেডশ্যাংক, কমন রেডশ্যাংক*। লম্বায় 28 সেমি (11 ইঞ্চি)। এরাই ভারতে বেশি আসে। ছোটো বাটানের উপরটা ধূসর-পাটকিলে, নিচের পিঠ ও বস্তিপ্রদেশ সাদা, লেজ সাদা, তার উপর পাটকিলের টান। নিচটা সাদা, বুকের উপর খুব সরু করে পাটকিলের ছোট ছোট লাইন টান। কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু কালো এবং গোড়াটার এক তৃতীয়াংশ কমলা-লালচে, পা ও আঙুল কমলা, নখর কালো।

বাসস্থান— মেরুবৃত্তের উত্তর স্ক্যান্ডিনেভিয়া, উত্তর রাশিয়া থেকে দক্ষিণে মস্কো, কাজান, ওরেনবার্গ, উত্তর এশিয়া থেকে পুবে কামচাটকা। শীতে পরিযায়ী হয়ে আসে প্রথমে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে আগস্টের মাঝামাঝি, তারপর আসতে থাকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পাঞ্জাব, কাশ্মীর, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মণিপুর, ওড়িশা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মহীশূর এবং মাদ্রাজে। বেশিরভাগই ফিরে যায় এপ্রিলের মাঝামাঝি। কিছু আবার মে মাসের গোড়া পর্যন্ত থাকে।

ছোটো বাটানের দেশ মধ্য এবং পূর্ব এশিয়া থেকে পুবে ট্রান্সবৈকালিয়া এবং পশ্চিম কানসু। শীতে পরিযায়ী হয় ভারত, শ্রীলঙ্কা, বর্মা, মালয়, দক্ষিণ চীন, ফিলিপিন, সুন্দা ও সেলিবিস দ্বীপপুঞ্জে।

কাছাড় ও সিকিমে বাসা বাঁধে। বাটানকে ভারতের কোনখানে বাসা বাঁধতে এখনও দেখা যায় নি।

খাদ্য— কম্বোজ, কবচী, ভূমিজ ও জলজ কীট ও তাদের শূক, খুব ছোট মাছ।

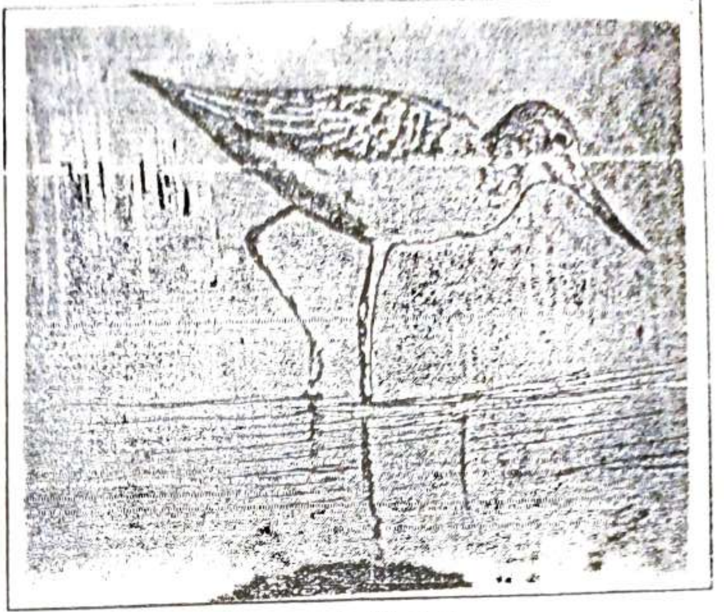
স্বভাব— ডাকে তীক্ষ্ণস্বরে বাঁশির সুরে, 'টিইউ-ইট, টিইউ-টিইউ-টিইউ'। ওড়ার আগে এবং উড়তে উড়তে এই ডাক দেয়। ডাকটা ছোট বাটানের সঙ্গে গুলিয়ে যায়। তাদের ডাকটা 'টিউইই-টিউইই-টিউইই'। দেখা যায় নদী, ঝিল বা বাদার ধার, জোয়ার-ভাটা খেলা খাঁড়ির মুখ ইত্যাদিতে। হয় একা, না হয় ছোট দলে, কখনওবা বেশ বড় ঝাঁকে। অনেক সময় দেখি অন্যান্য ছোট জলচারীদের সঙ্গে মিলেমিশে চরছে। জলের কর্দমাক্ত ধার দিয়ে ছুটতে ছুটতে পোকামাকড় তুলে খায়। অল্প জলে মাথা পুরো ডুবিয়ে দিয়ে খাদ্য খোঁজে। আবার দেখেছি গভীর জলে সাঁতার কাটতে এবং মাঝে মাঝে হাঁসের মত মাথাটা ডুবিয়ে পিছনটা তুলে ধরতে।

বাটান নিজের বাসভূমিতেই প্রজনন করে। সুন্দরবনে করে কিনা তা এখনও নজরে পড়ে নি। বাসা বাঁধে জলের উপর ভাসমান ঘাসের চাপড়ার উপর খোঁদল করে। সাধারণত 4টি জলপাই-পাটকিলে ছোপের ডিম পাড়ে। ছোটো বাটান (রেডশ্যাংক) যারা কাশ্মীরে ডিম পাড়ে তারাও 4টি ফিকে পাথুরে বা উজ্জ্বল লালচে-হলুদ ডিম পাড়ে। বেগুনি-পাটকিলে বা কালচের ছিট ও ছোপ থাকে বড়ো মুখটার দিকে। স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই ডিমে তা' দেয়, সন্তান প্রতিপালন করে। ডিম ফোটে 23-25 দিনে। কাশ্মিরী ডিমের গড় মাপ— 46·1×31·8 মিমি। পাখির তুলনায় ডিম বেশ বড়ই।

গোত্রা (Common Greenshank)

লবণ হ্রদে এদের মাঝে মাঝে দেখলেও খুব বেশি ঔৎসুক্য জাগে নি, কারণ তখন নজর ছিল নানা জাতের পরিযায়ী হাঁসের প্রতি। সাধারণত এদের একাই চরতে দেখেছি। আকর্ষণ করেছিল পা ও আকারের জন্য। নমুনাও সংগ্রহ করেছিলাম। তারপর দেখি সুন্দরবনে। গত তিন বছরে শীতকালে বা শীতের শেষে মার্চে যখনই গিয়েছি তখনই নজরে পড়েছে। 10ই মার্চ 1981 বিকেল 5টা নাগাদ সন্দেশখালিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট শ্রীধীরেন দত্তের আতিথ্যে ডঃ সুধীন সেনগুপ্ত, পীযূষ দাশগুপ্ত ও আমার বড় কলাগাছিয়া নদীর মুখে বেড়াতে গিয়ে নজরে পড়ল, জলের ধারে বাইন গাছের পাশে পলিপড়া কাদার উপর একা একটা পাখি খুব সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে চলছে। বেশ বড়সড়ো পখিটা। মাথা-গলা ছাই-রঙা সাদার উপর পাটকিলের আঁকাবাঁকা ডোরা, পিঠের উপর দিক, ভ্রূর উপর ও ডানার আচ্ছাদক ছাই-পাটকিলে, পালকের ধার হলদেটে সাদা। পিঠের তলার দিক ও লেজের আচ্ছাদক ধবধবে সাদা, ওড়ার পালক কালচে, কিছু পালকে সাদা ছিট। লেজ সাদা, তার উপর আড়াআড়িভাবে পাটকিলের টান। বুকের মাঝখান ও শেষাংশ ধবধবে সাদা, বুকের দু'পাশে সাদার উপর পাটকিলের টান, কিছুটা ছাই। কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু গাঢ় ধূসর-পাটকিলে বা সবজেটে-পাটকিলে, ডগাটা কালচে, পা ও আঙুল হলদেটে-সবুজ বা জলপাই-সবুজ। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

পাখিটা সৈকত বর্গের (চারাড্রিইফরমেস) অন্তর্গত আরামুখ বংশে (স্কোলোপসিদি) নীররঙ্কগণের (ট্রিংগা) *এক প্রজাতি।* নাম— গোত্রা (ট্রিংগা নেব্যুলারিয়া), ইংরেজি— *গ্রীনশ্যাঙ্ক,* হিন্দি— *টনটনা, টিমটিমা।* লম্বায় 36 সেমি (14 ইঞ্চি)। ভারতে যত বালুবাটান (স্যান্ডপাইপার) দেখা যায় তার মধ্যে গোত্রাই সবচেয়ে বড়ো।



চি 58. গোত্রা

বাসস্থান— উত্তর ইওরোপ, দক্ষিণে লেনিনগ্রাদ, কাজান থেকে উত্তর এশিয়ায় কামচাটকা, দক্ষিণে 55 উঃ। শীতে পরিযায়ী হয় ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহ, আফ্রিকা, পূবে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, পাকিস্তান, পশ্চিমবঙ্গ সহ সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, আন্দামান-নিকোবর ও মালডিভ দ্বীপপুঞ্জ, শ্রীলঙ্কায়। ভারতের বাইরে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড।

খাদ্য— কম্বোজ, কবচী, কীটপতঙ্গ, কেঁচো, কৃমি ও ব্যাঙাচি।

স্বভাব— শীতকালে শোনা যায় তীব্র বাঁশির সুরে 'টিউইই-টিউইই-টিউইই.... টিউ-টিউ-টিউ, চমকে উঠে ডেকে ওড়ে। জানা গেছে প্রজননকালে বাসার উপর খুব উঁচতে উঠে দ্রুত চক্কর দিতে দিতে ওরা খুব মিষ্টি লম্বা তানের গান গায়। প্রায় বেশিরভাগ জলচারী বা সৈকতবাসীদের মতো আগস্টের দ্বিতীয়ার্ধে পরিযায়ী হয়ে এসে প্রায় সকলেই এপ্রিলের শেষে বা মে মাসের প্রথমে ভারত থেকে নিজের আবাসভূমিতে ফিরে যায়। আবার কিছু পাখি থেকে যায় সারা বছর। সুন্দবনে এমন গোত্রার দেখা পেয়েছি। মার্চের মাঝামাঝি পরিযায়ী হয়ে আসা সব গোত্রারই গ্রীষ্মের সাজ পরা শুরু হয়। এপ্রিলের মাঝামাঝি বেশিরভাগ পাখিই আপন আবাসে ফেরার জন্যে দেহে চর্বি জমিয়ে নেয়।

সাধারণত একাই বিচরণ করতে দেখা যায়। 3 থেকে 5-এর দলেও দেখেছি। পরিযায়ী হয়ে আসা এবং যাবার সময় 15 বা 20-র দলে সমবেত হয়। প্রায়ই দেখা যায় ছোট বাটান (ট্রিংগা টোটানাস ইউরহিনাস) ইংরেজি— *ইস্টার্ণ রেডশ্যাংকসদের* সঙ্গে মিলেমিশে চরছে। যখন বুক সমান অল্প জলে নেমে চরে তখন খাদ্য অন্বেষণে মাথা ও গলা জলের মধ্যে পুরো ডুবিয়ে দেয়। আরও অল্প জলে গলাটা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে কেবলমাত্র চঞ্চুটা ডুবিয়ে সামনে দৌড়ে চলে, কখনও এদিক-ওদিক বা আঁকাবাঁকাভাবে চলে না। সন্দেহজনক পরিস্থিতি হলে মাথাটাকে যেমন উপরনিচ করতে থাকে, তেমনি করে দেহের শেষে লেজটাকেও।

প্রজননকাল— নিজের আবাসভূমিতে মে থেকে জুন। জলার মধ্যে ঘাসের চাপড়ার ভিতর লুকিয়ে একটু গভীর করে ঘাসের খোঁদল বানিয়ে বাসা করে। সাধারণত ফিকে পাথুরে থেকে উজ্জ্বল লালচে-হলুদের উপর বেগুনি-পাটকিলে বা কালচে রঙের ছিট ও ছোপের 4টি ডিম পাড়ে। পুরুষ ও স্ত্রী

দু'জনেই ডিমে তা' দেওয়া থেকে সন্তান প্রতিপালন সবই করে। ডিম ফুটতে সময় নেয় 23-25 দিন। ডিমের গড় মাপ— 44·3×30·4 মিমি।

বালুবাটান (wood sandpiper)

এই পাখির দলকে দেখেছি সেই লবণ হ্রদে, পাখি শিকারের প্রথম যুগ থেকে। এত দেখতাম যে তাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোনও ঔৎসুক্য জাগে নি। প্রায়ই নজরে পড়ত কুড়ি-ত্রিশের ঝাঁক। রবিবার বা অন্য কোনও ছুটির দিনে বহু খাঁটি সাহেব ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা আসতেন কাদাখোঁচা (স্নাইপ) শিকার করতে। তখন তাঁদের ঝুলিতে কাদাখোঁচার সঙ্গে এদেরও দেখেছি। ওড়ার স্টাইল বা ভঙ্গিটা এমন যে, কাদাখোঁচা বলে ভুল হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। তাঁদের কাছ থেকে দু-তিনটি পাখি নিয়ে দেখেছি তাদের শীতকালীন চেহারা। প্রজননকালীন চেহারা বইয়ে পড়েছি, চোখে দেখি নি। এখন শীতকালে সুন্দরবনে ঘোরার সময় পলি-কাদার উপর হরদম নজরে পড়ে।



চি 59. বালুবাটান

কপাল, চাঁদি, পিঠ ও ডানা গাঢ় পাটকিলে, তার উপর সাদা ও ধূসরাভ ছিট এবং তা পিঠেই বেশি। সাদাটে সরু টান ভুরুর উপর দিয়ে। চঞ্চুর গোড়া থেকে চোখ পর্যন্ত ছাই রঙের টান। গাল ও ঘাড় ময়লাটে সাদা, তার উপর ছাই-পাটকিলের ছিট। লেজের উপরের আচ্ছাদক ধবধবে সাদা, লেজে খুব সরু করে কালো-সাদার আড়াআড়ি টান। লেজের দু'পাশের শেষ দুটো করে পালক সাদা। গলা সাদা, ঘাড়ের দু'পাশ ও বুক ময়লাটে সাদা, তার উপর ছিট ও সরু টান ছাই-পাটকিলের, বুকের দু'পাশও তাই। পেট ও লেজের তলার আচ্ছাদক ধবধবে সাদা। কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু কালচে-পাটকিলে, গোড়াটা জলপাই-সবুজ, পা ও আঙুল সবজেটে বা জলপাই-সবজেটে, নখর পাটকিলে। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

এই পাখিরা সৈকত বর্গে আরামুখ বংশের (স্কোলোপাসিদি) অন্তর্গত নীররঙ্ক গণের (ট্রিংগা) এক প্রজাতি। নাম— বালুবাটান (ট্রিংগা গ্লারিওলা), হিন্দি— *চপকা, চোবাহো, টিটওয়ারি*, তেলেগু— *চিনা উলাঙ্কা*, তামিল— *কট্টান*, মালয়ালী— *কটা কোক্কু*, ইংরেজি— *স্পটেড স্যান্ডপাইপার*, উড স্যান্ডপাইপার। লম্বায় 21 সেমি (সাড়ে 8 ইঞ্চি)।

বাসস্থান— উত্তর ইউরোপ এবং উত্তর এশিয়ায় পুবে আমুর নদী পর্যন্ত, কামচাটকা ও কুরাইল

দ্বীপপুঞ্জের উত্তর অঞ্চল সমূহ। শীতে পরিযায়ী হয় পাকিস্তান, পশ্চিমবঙ্গ, নেপাল, আসাম ও মণিপুর সহ সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ, আন্দামান ও মালদীপ দ্বীপপুঞ্জ, ও শ্রীলঙ্কায়। ভারতের বাইরে শীতে পরিয়ায়ী হয় সমগ্র আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, জাপান, ফিলিপিনস ও মালয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে অষ্ট্রেলিয়ায়। দেখা যায় ঝিলের ধার, ভিজে ধানখেত, বাদা ও জলসেচের দীঘির ধারে, প্রধানত নিচু জমি থেকে 2000 মি. উচ্চতার মধ্যে। তাছাড়া দেখা যায় সমুদ্রের কাছে জোয়ার-ভাঁটা খেলা খাঁড়ি ও নদীর মুখে, যেমন দেখি সুন্দরবনে।

খাদ্য— খুব ছোট কম্বোজ, কবচী, পোকামাকড় ও কেঁচো এবং তেচোকো, ডানকুনি জাতীয় খুব ছোট মাছ।

স্বভাব— মাটিতে দাঁড়িয়েই ডাক দেয় খুব দ্রুত, বেশ জোরে চিপ্ চিপ্ চিপ্, সকলেমিলে একসঙ্গে ডাকে না। কখনও একা-একাই, কখনওবা দলের মধ্যে থেকে একজন-দুজন করে ডেকে ওঠে। প্রতি সেকেন্ডে দু-তিনটে 'চিপ্' একসঙ্গে। এ ছাড়া দলবেঁধে হঠাৎ উড়ে চলে যাবার সময় সকলে সমস্বরে তীক্ষ্ণ ধাতব সুরে ডাকে 'পিই-পিই-পিই'। নীররঙ্ক গণের অন্যান্য পাখিদের চেয়ে এরা সাধারণত বেশি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বাস করে, কিন্তু আমি দেখেছি কখনো-সখনও একা চরতে। 20-30-শের ঝাঁক প্রায়ই দেখা যায়। এরা পরিযায়ী হয়ে আসবার মুখে খুব বড়ো দল বেঁধে যাত্রা শুরু করে।

খাদ্যসংগ্রহে অনেক সময় অল্প জলের মধ্যে নেমে পড়ে, পেট পর্যন্ত ছুঁয়ে মাথা, গলা পুরোটা ডুবিয়ে দেয় কাদার মধ্যে। দেখে মনে হয় সাঁতার কেটে চলেছে বুঝি। পরিযায়ী হয়ে প্রথম এসে পৌঁছবার পর এবং ফিরে যাবার মুখে, নিজ নিজ চৌহদ্দি নিয়ে এক-একজনকে লড়াই করতে দেখা যায়।

একটি বালুবাটান হঠাৎ শূন্যে লাফিয়ে তেড়ে গেল কাছের একজনের সঙ্গে লড়াই করতে, পায়ের অদৃশ্য কাঁটার সাহায্যে। ভাবটা যেন তাকে মেরেই ফেলবে কাল্পনিক কাঁটা দিয়ে। আক্রমণকারীর ভয়াবহ রূপটি দেখে অন্যটি আক্রান্ত হবার ঠিক আগের মুহূর্তে মাথা নিচু করে আঘাত বাঁচিয়ে নেয়। আবার এও দেখা গেছে আক্রমণকারী কারুর মাথা ও ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে জলের তলায় চেপে ধরেছে, ভাবটা যেন ডুবিয়েই মেরে ফেলবে। দেখেছি ছররা গুলি খেয়ে একটি আহত হয়ে জলে পড়েছে, কিন্তু ধরা পড়ার ভয়ে পাকা সাঁতারুর মত বেশ কয়েক সেকেন্ড জলের মধ্যে ডুবে থেকেছে। যে জলায় কাদাখোঁচার আড্ডা সেখানে এদের বিপদ খুব বেশি। অর্ধবৃত্তাকারে শিকারীর দল যখন কাদাখোঁচা শিকার করা শুরু করে, তখন এদের ওড়ার কায়দায় এবং আলোর বিপক্ষে চেনা দুরূহ হয়ে ওঠে, আর সেকারণে মারাও পড়ে বেশ কিছু।

প্রজননকাল— নিজ বাসভূমে নীররঙ্ক গণের আন্যান্য প্রজাতির মতো মে-জুন মাসে, এবং ডিম পাড়ে 4টি ফিকে পাথুরে রং থেকে লালচে-হলুদ, তার উপর বেগুনি-পাটকিলে বা কালচে ছিট।

ভারতে পরিযায়ী হয়ে আসতে শুরু করে আগস্টের শুরু থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে, ফিরে যায় সাধারণত মার্চ-এপ্রিলে। আবার কিছু থাকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত।

বিলের বালুবাটান (Marsh Sandpiper)

গোত্রার চেয়েও আকারে ছোট একটি পাখিকে দেখেছি বহু জায়গায়, যেমন চব্বিশ পরগণার সোনারপুরের কাছে কালিকাপুর, লবণ হ্রদের ধারে-কাছে, সুন্দরবনে সন্দেশখালির দ্বারিক জঙ্গলে, শ্যামনগরের কাছে বর্তুর বিল ইত্যাদিতে। আমার একটা ধারণা ছিল সুন্দরবনের নদীর ধারে বা খাঁড়ির মুখে যেখানে জোয়ার-ভাঁটা খেলে তার পলি-কাদার উপর এদের দেখা যায় না, কারণ নোনাজলের চেয়ে মিষ্টিজল পছন্দ করে বেশি, কিন্তু সেখানেও এই ছিপছিপে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পাখিদের কিছু কম দেখি নি।

এদের উপরটা ফিকে ছাই-পাটকিলে, ঘাড়ে গাঢ় পাটকিলের আঁকাবাঁকা ডোরা দাগ, চাঁদি, গলা ও ভ্রূর উপরের পালকের ধার সাদাটে, গালে সাদার উপর পাটকিলের ছিট। ডানার আচ্ছাদক ফিকে ছাই, ধার সাদাটে, দ্বিতীয় স্তরের আচ্ছাদক ছাই-পাটকিলে, ধারটা ফিকে, গোড়া কালো। ডানার ওড়ার পালক পাটকিলে-কালো, কয়েকটা সাদা। লেজ সাদা তার উপর পাটকিলের পটি। নিম্নাংশ সাদা কিন্তু ঘাড়ের দু'পাশ, বুক ও বুকের দু'পাশে সাদার উপর পাটকিলের ছিট। এই হল এদের শীতের সাজ, পশ্চিমবঙ্গে যেমন আমরা দেখি। গ্রীষ্মে বা প্রজননকালে উপরটা বালু-ধূসর এবং প্রতিটি পালকের মাঝে ত্রিকোণাকার কালো ছিট। নিচুটা সাদা কিন্তু ঘাড়ের দু'পাশ ও বুকের উপরাংশে পাটকিলের ছোট টান, বুক ও পেটের দু'পাশেও ইতস্তত টান। কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু গাঢ় শিঙে-পাটকিলে থেকে কালচে, তলার চঞ্চুর গোড়া সবজেটে, পা ও আঙুল নিষ্প্রভ সবজেটে। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

এই পাখিরা সৈকত বর্গের (চারা-ড্রিইফরমেস) অন্তর্গত আরামুখ বংশে (স্কোলোপাসিদি) নীররক্ষ গণের (ট্রিংগা) *এক প্রজাতি।* নাম—বিলের বালুবাটান, ছোটো গোত্রা (ট্রিংগা স্ট্যাগনালিটিস), ইংরেজি— *মার্শ স্যাণ্ডপাইপার, লিটল গ্রীনশ্যাংক।* লম্বায় 25 সেমি (10 ইঞ্চি)।

বাসস্থান— দক্ষিণপূর্ব ইউরোপ, মধ্য ও দক্ষিণ রাশিয়া থেকে মধ্য এশিয়ার ভিতর দিয়ে পুবে ট্রান্সবৈকালিয়া, দক্ষিণে তুর্কিস্তান এবং উত্তর মঙ্গোলিয়া। শীতে পরিযায়ী হয় আফ্রিকা, আরব, ভারত, বাংলাদেশ, বার্মা, ইন্দোচীনীয় দেশসমূহ, সুন্দা ও মলাক্কা দ্বীপপুঞ্জ থেকে অস্ট্রেলিয়ায়। উত্তর ভারতে আসে আগস্টের মাঝামাঝি, তারপর ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিমবঙ্গ সহ উপদ্বীপাত্মক ভারতে সর্বত্র। বেশিরভাগ নিজেদের আবাসস্থলে ফেরে এপ্রিলের শেষ থেকে মে মাসের গোড়ায়। কিছু বিলের বালুবাটান যারা সে বছর বাসা বাঁধবে না তাদের ভরা গ্রীষ্মেও ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়, নিজের দেশে ফিরে যায় না। দুটি বিলের বালুবাটান বা ছোট গোত্রাকে আঙটি পরিয়ে ছাড়া হয়েছিল মাদ্রাজের পয়েন্ট কালিমেয়ার (10° উঃ 79° পূ) থেকে 12 নভেম্বর 1962। তারমধ্যে একটিকে সংগ্রহ করা হয়েছিল 4 মে 1963 রাশিয়ার নভোসিবিরস্ক অঞ্চলে 54° থেকে 55° উঃ এবং 76° - 77° পূ-র মধ্যে। মানচিত্রের উপর সোজাসুজি লাইন টানলে দূরত্ব হয় 5100 কিমি। আরেকটিকে পাওয়া গিয়েছিল ঐ অঞ্চলেই চারবছর বাদে 8 মে 1967। ঐ অঞ্চলই ছিল ওদের প্রজননক্ষেত্র।

খাদ্য— ছোট ছোট কম্বোজ, কবচী, পোকামাকড় এবং কেঁচো-কৃমি।

স্বভাব— মুখে আওয়াজ নেই বললেই চলে। একটা তীক্ষ্ণ বাঁশির সুরে 'চি উইপ-চি-উইপ' ডেকে মাটি ছেড়ে আকাশে ওঠে। খুব ছোট ছোট দলে অন্যান্য বালুবাটানদের সঙ্গে বিল,বাদা বা নদীর পলি-কাদার উপর ছুটে বেড়ায়। থেকে থেকে খাদ্যের জন্যে চঞ্চুটাকে কাদার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে এদিক থেকে ওদিক করতে থাকে। প্রায়ই দেখা যায় অল্প জলে মাথা ও চঞ্চু পুরোটা ডুবিয়ে দিয়ে খাদ্য খুঁজতে। প্রজননকাল এবং সেই সময়কার আচার-ব্যবহার গোত্রার মতন।

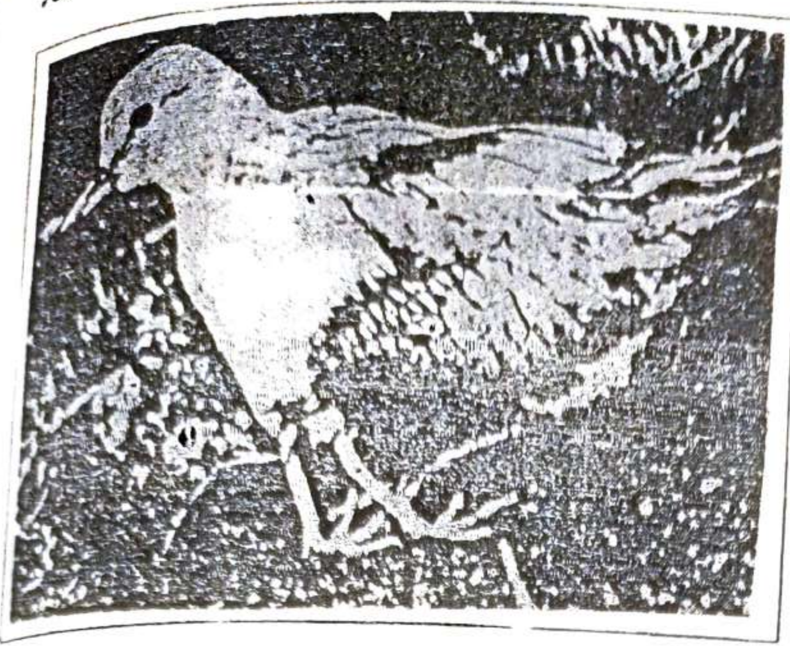
জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া থেকে ডঃ বিশ্বময় বিশ্বাস-এর তত্ত্বাবধানে কিছু বালুবাটানকে আঙটি পরানো হয়। তাতে দেখা গেছে 26 মার্চ 1965 তারিখে কলকাতার লবণ হ্রদ (22°35' উঃ 88°21' পূ) থেকে যাদের ছাড়া হয়, তার মধ্যে একটি ধরা পড়ে 25 মে 65-তে স্রেভনাইয়া, ওলেকমা, টুনগিরো, ওলেকমিস্ক, সোবিয়েত রাশিয়ার চিতা অঞ্চলে (55°14' উঃ, 120° পূ)। অপর একটি 2 এপ্রিল 65 তারিখে ছাড়ার পর, রাশিয়ার আলমাজার্নীয়, ইয়াকুতিয়ানের মিরনীয়ির কাছে (62°30' উঃ, 113°50' পূ) পৌঁছয় 25 মে 65 তারিখে। মানচিত্রের উপর সোজাসুজি লাইন টানলে দেখা যায় দুটির দূরত্ব যথাক্রমে 4500 ও 5200 কিমি। আরও কিছু আঙটি পরিয়ে ছাড়া হতে থাকে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে। তার মধ্যে একটিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। 6 এপ্রিল 67-তে আঙটি পরিয়ে যাদের ছাড়া হয়, তাদের মধ্যে একটিকে পাওয়া যায় 48 দিন পর 24 মে 67-তে রাশিয়ার সুসুমানের কাছে মাগাভান অঞ্চলে (62°48' উঃ, 148°12' পূ)। মানচিত্রে দেখা গেল সোজাসুজি দূরত্ব 6200 কিমি। সংগ্রহ তারিখ থেকে বোঝা যায় তাদের প্রজননক্ষেত্র ওখানেই। কতদূর থেকে যে আমাদের দেশে পরিযানে আসে ভাবলে বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হতে হয়।

কুশিয়া বালুবাটান (Terek sandpiper)

আরও একটি বালুবাটানকে পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়। যেটিকে দেখেছিলাম সুন্দরবনে, সেটি হয় গুলি খেয়ে না হয় অন্য কোন কারণে আহত হয়েছিল। তার পা বাঁকা ও আঙ্গুল উলটানো ছিল। গত 23 জানুয়ারি 86 তারিখে বিজয়নগরে যেতে দেখেছিলাম কম করে দশ-পনেরটা। ফাঁক ফাঁক হয়ে জলের ধারে কাদার উপর চরছিল। এক-একটা কাদার ভিতর থেকে কোনো খাদ্যবস্তু তুলে নিয়ে দুর্গা-দোয়ানির জলে চঞ্চু ডুবিয়ে কাদা পরিষ্কার করে গলাধঃকরণ করছিল। সবচেয়ে যেটি আশ্চর্যের সেটি এদের চঞ্চু,সেটি সোজা বা নিচের দিকে বাঁকানো নয়, উপরদিকে উলটানো।

এই বালুবাটান পশ্চিমবঙ্গে দেখা যে যায় তার খবর পেয়েছিলাম এক পক্ষিপ্রেমিক শ্রী অনন্ত মিত্র-র কাছে। তিনি নভেম্বর 1974-এর প্রথম সপ্তাহে একজোড়া দেখেছিলেন দীঘায়। নাম— কুশিয়া বালুবাটান, টেরেক বালুবাটান (ট্রিংগা টেরেক), ইংরেজি— *অ্যাভোসেট-স্যান্ডপাইপার, টেরেক স্যান্ডপাইপার।* নীররঙ্ক গণের *এক প্রজাতি*, লম্বায় 24 সেমি (সাড়ে 9 ইঞ্চি)।

প্রায় 49 মিমি সরু লম্বা চঞ্চু উপর দিকে অল্প বাঁকানো এবং বেঁটে কমলা-হলুদ পা দূর থেকে চিনিয়ে দেয়। উড়ন্ত অবস্থায় দেখা যায় ফিকে ছাই-পাটকিলে, বস্তিপ্রদেশ এবং লম্বাটে কালো ডানার ধার বেশ প্রকট।



চি ৬৩ কুশিয়া বালুবাটান

শীতকালে উপরটা ছাই-পাটকিলে, কপাল ও অংসফলক সাদা। নিচটা পুরোপুরি সাদা। গ্রীষ্মে বা প্রজননকালে কালো 'V' এর মতো দাগ পিঠে; মাথা, গলার ধারে এবং বুকে পাটকিলের অনেকগুলি ছোটো টান। কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু কালো এবং গাঢ় পাটকিলে, গোড়াটা হলদেটে-কমলা। পা ও আঙ্গুল ময়লাটে হলদে থেকে উজ্জ্বল কমলা-হলুদ। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান— উত্তর রাশিয়া থেকে সাইবেরিয়া, পুবে কলাইমা নদী, দক্ষিণে দক্ষিণ উরাল থেকে বৈকাল হ্রদ, বাতারও কিছু পুবে। শতে পরিযায়ী হয় পূর্ব আফ্রিকা, মালাগাসিয়া, মরিশাস, ভারত, বর্মা, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, অস্ট্রেলিয়া ও তাসমানিয়া। ভারতে আগস্টের গোড়ায়, পাকিস্তানের সিন্ধুর মাকরান থেকে কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের (সৌরাষ্ট্র) সমুদ্র উপকূল থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত, সেখান থেকে পূর্ব উপকূল ধরে পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং শ্রীলঙ্কার উত্তরপশ্চিম উপকূল। দেখা যায় সমুদ্রের ধার, গরান-বাইনের জলা, জোয়ার-ভাঁটা খেলা খাঁড়িমুখ ও সমুদ্রের উপকূলের উপহ্রদে। ক্কচিৎ দেখা যায় সমুদ্রের ধার থেকে একটু ভিতরে মিষ্টি জলের জলায়। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বড়ো বড়ো নদী যেখানে সমুদ্রে পড়ছে, দেখা যায় তার তটভূমিতে জোড়ায় বা 13-14-র ছোট দলে, তাদের খাদ্য ছোটো কম্বোজ, কবচী ও পোকামাকড় সংগ্রহ করছে।

ছোটো বালুবাটান (Common Sandpiper)

পুরনো মেঠো-খসড়া বা ডায়েরির 15-9-82 তারিখের পাতা ওলটাতে ওলটাতে দেখি একটা ছোট্ট পাখির নাম উল্লেখ আছে। সুন্দরবনের মণিপুর থেকে সন্দেশখালি ফেরার পথে পাড় ঘেঁষে নৌকোটা আসার সময় নজরে পড়ে। দেখি পাড়ের কিনারায় জলের উপর দাঁড়িয়ে আছে। নৌকোটা কাছে আসতেই হঠাৎ উড়ল কলাগাছিয়া নদীর প্রায় জল ঘেঁষে ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে। ডানার উপর সরু সাদা টান, মুখে তীক্ষ্ণ সুর 'টিই-টিই টিই'। আরও দু'একটিকে দেখলাম এদিক-ওদিক জলের ধারে পাড়ের উপর। উপরের সবটাই ছাই-পাটকিলে, তার উপর চকচকে সবুজের আভা, পিঠ ও ডানার আচ্ছাদনের উপর খুব সরু সরু আড়াআড়িভাবে পাটকিলে লাইন, ভ্রূর উপর সাদা টান, ওড়ার প্রথম সারির পালক পাটকিলে এবং প্রথম দুটো পালক ছাড়া বাকি পালকে একটা সাদা


চি ৬। ছোটো বালুবাটান

ছোপ। লেজের পালকের মাঝের চারটে পালক পিঠের মত ছাই-পাটকিলে, তার পরের দু'টোয় সাদা ছোপ। তলাটা সাদা, কেবল ঘাড় ও বুকে ধূসরাভ-পাটকিলের আঁকাবাঁকা ডোরা কাটা। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে, চঞ্চু শিঙে-পাটকিলে এবং তলার চঞ্চুর গোড়াটা ধূসরাভ-সবজেটে, পা ও আঙুল সবুজাভ ধূসর, নখর ছাই-রঙা। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

যাদের দেখলাম তারা সৈকত বর্গে আরামুখ বংশে (স্কোলোপাসিদি) নীররঙ্ক গণের *এক প্রজাতি।* নাম— ছোটো বালুবাটান (ট্রিংগা হাইপোলিউকস), তেলুগু— *পলটে উলাগা,* তামিল— *কট্টান,* মালয়ালী— *নীরকটা,* গুজরাটি— *সামান্য টাটওয়ারি,* মালদ্বীপীয়— *ফিনডন,* ইংরেজি— *কমন স্যাণ্ডপাইপার।* লম্বায়— 21 সেমি (৪ ইঞ্চি)।

বাসস্থান— সমগ্র ইউরোপ ও এশিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চল, দক্ষিণে উত্তর স্পেন, উত্তর ইতালি, দক্ষিণ রাশিয়া, ইরান, মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া, জাপান। ভারতে কিছু বাসা বাঁধে কাশ্মীর, লাডাখ ও গাঢ়োয়ালে 3200মি. উচ্চতার মধ্যে। পাকিস্তানের বেলুচিস্তানেও বাসা বাঁধে। শীতে পরিযায়ী হয়ও প্রচুর নেপাল, সিকিম, আসাম, অরুণাচল, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর ও পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ, আন্দামান-নিকোবর, মালদ্বীপ ও লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ এবং শ্রীলঙ্কায়। ভারতের বাইরে পরিযায়ী হয় আফ্রিকা, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, উত্তরে দক্ষিণ চীন, তাইওয়ান, ফিলিপাইন, মালয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে অস্ট্রেলিয়ায়। দেখা যায় যেমন দেশের অভ্যন্তরে নদী, স্রোতস্বতী, পুকুর-দীঘি, খানা-খন্দ, ডোবার ধারে, তেমনই পাথুরে সমুদ্রকূল, বন্দর, পোতাশ্রয়ের ধার, সমুদ্রকূলের উপহ্রদ, জোয়ারভাটা খেলা খাঁড়ি ও গরান-বাইন পূর্ণ জঙ্গলে জলের ধারে।

এদের পথের নিশানা আঙটি পরিয়ে দেখা হয়-নি কিন্তু পরিযায়ী হয়ে ভারতে ঢুকতে দেখা যায়, এপ্রিল-মে মাসে দিল্লি, শরৎ-হেমন্তে কোহাট ও কুর্‌রম, এপ্রিল-মেতে পাকিস্তানের উত্তর বেলুচিস্তান এবং আগস্ট মাসের গোড়া থেকে নেপাল উপত্যকার ভিতর দিয়ে। এই বিভিন্ন পথ দিয়ে এসে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। মুশকিল বাধায় যখন শীতে এসে কিছু পাখি প্রথম গরম পড়ার মুখে ফিরে যায় না। বহুদিন থাকে এবং তাদের মধ্যে কেউ বাসা বাঁধে কিনা সে সম্বন্ধে এখনও কোন হদিস পাওয়া যায় নি।

খাদ্য— ছোট ছোট কম্বোজ, কবচী এবং পোকামাকড়।

স্বভাব— 'টিই-টিই-টিই' ডাক ছাড়াও একটা লম্বা সুরেলা টান দেয়, ঠিক যেন মনে হয় বলছে 'হুইইট, হুইইট কিটি হুইইট কিটি হুইইট'। বারবার ডাকতে থাকে। এই ডাক শোনা যায় যখন সে শান্ত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে তখন। এটা সাথীকে আহ্বান জানানর ডাক। এটা ডাকে হয় মাটিতে

দাঁড়িয়ে কিংবা পাথরের উপর থেকে না হয় গরান-বাইনের ঝোপে বসে।

সাধারণত একাই দেখা যায়। আবার দেখা যায় জলের ধারে ছড়িয়েছিটিয়ে দু'তিনটে, যেমন আমি দেখেছিলাম। জল ঘেঁষে পাড়ের উপর দিয়ে ছুটে চলতে চলতে মৃদু ঢেউয়ে পাড়ে এসে-পড়া কোন পোকামাকড় পেলে চঞ্চুতে তুলে নেয়। ছুটে চলার সময় ঘনঘন লেজ নাড়া আর মাথা ঝাঁকি দেওয়া চলতে থাকে। এই মাথা ঝাঁকি দেওয়াটা খুব বেশি বাড়ে যখন কোন কারণে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। খুব বড় দল কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না, তবে পড়েছি, জোয়ারের সময় সমুদ্রতীরে 40-50-এর দল বেঁধে পাথর খণ্ডের উপর অপেক্ষায় বসে থাকে কখন পূর্ণ জোয়ার শেষ হবে। জোয়ারের মুখে যখন জল এগিয়ে আসে তখন যাতে ঢেউয়ে চাপা না পড়ে তার জন্যে খুব দ্রুত ছুটে ঢেউ এড়িয়ে যায়। আবার ঢেউ যখন পিছিয়ে যায় তখন তার পিছু পিছু ছোটে যদি কিছু খাদ্য এসে থাকে। তাদের কিছু না কিছু খাদ্য ঢেউয়ের সঙ্গে এসে থাকেই।

গত 20-10-85 সুন্দরবনে মায়াদ্বীপে সাইমারির চরে ঝাউবনের পাশে শুকনো জমিতে একটি-দুটিকে দেখেছি খঞ্জনের (হোয়াইট ওয়্যাগটেল) সঙ্গে চরতে।

আহত হলে দেখা গেছে শত্রুকে এড়িয়ে যাবার জন্যে ডানার সাহায্যে জলের দু-ফুট নিচে গিয়ে ডুব সাঁতার দেয়, দম নিতে উপরে উঠেই আবার ডুব সাঁতার দিয়ে চলে।

পরিযায়ী হয়ে এসে খাদ্যসংগ্রহের চৌহদ্দির জন্যে পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালায়। দুটি পাখি সমান্তরালে ছুটতে থাকে। মাঝে মাঝে রোষকষায়িত নেত্রে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ একটি লাফিয়ে উঠে আক্রমণ করে প্রতিদ্বন্দ্বীকে। প্রতিদ্বন্দ্বী আকমণকারীর দিকে ডানা নামিয়ে ছড়ান লেজটাকে ঘোরাতে থাকে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে। তারপর অপরপক্ষ পাল্‌টা একই ভাব প্রদর্শন করে। কিন্তু কেউ কাউকে আঘাত করে না। সবটাই যেন কেমন একটা আচার-আচরণ পালনের আতিশয্য দিয়ে কোন ক্ষতি না করে মেজাজ দেখানো।

প্রজননকাল— ভারতে কাশ্মীর, লাডাখ, গাঢ়োয়াল প্রভৃতি জায়গায় মে-জুন মাসে। বাসা বানায় শুকনো পাতা ও ঘাস দিয়ে, হয় কোন ঝোপের না হয় কোন শিলাখণ্ডের তলায় মাটিতে অল্প খোঁদল করে। ডিম পাড়ে 4টি পেয়ার ফলের মতন। ডিম্বাকার ঘি-রঙা, তার উপর লালচে-পাটকিলের ছিট ও ছোপের মধ্যে মিশিয়ে থাকে গোলাপী-ধূসরের প্রায় অদৃশ্য ছায়া। ডিম পাখির আকারের তুলনায় রীতিমত বড়ো। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই বাসা বাঁধা থেকে তা' দেওয়া, সন্তান প্রতিপালন সবই করে। ডিম ফুটতে 22-23 দিন লাগে। পোষা মুরগির চেয়েও বেশিদিন। ভারতীয় ডিমের গড় মাপ— 35˙6 × 26˙2 মিমি।

কাদাখোঁচা (Common snipe)

মানিকতলা বিবেকানন্দ রোডের মোড় থেকে যে বাসে করে শীতের শেষ রাত্রে বেঙ্গল কেমিক্যাল যেতাম, তার নম্বর ছিল 13।


চি 62. কাদাখোঁচা

যাই হোক, নৌকোতে খাল পার হয়ে বাদায় গিয়েছি। শীত প্রায় শেষ। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে। সেদিন নতুনের সন্ধানে ঘুরেছি অনেক। কোন নতুন পাখি বা সুবিধেমত কোন পাখি না পাওয়াতে বন্দুকের গুলিও খরচ হয় নি। খাদ্যযোগ্য পাখিরা এত দূরে যে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসে না। মাথায় গামছা বেঁধে আদুড় গায়ে জলে নেমে কাছে যাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু বন্দুকের ঘা খেয়ে খেয়ে তারা এত সেয়ানা হয়েছে যে, সামান্য নড়াচড়ায় তারা দূরে চলে যাচ্ছে। নিরীহ স্থানীয় জেলে বা ঐ ধরনের কিছু বলে বিশ্বাসই করছে না।

বেলা বাড়ছে দেখে ফেরার পথ ধরেছি। হঠাৎ আমাদের সামনে দশ-বার হাত দূরে মাটি থেকে দশ-বারটা পাখি গলাভাঙ্গা ফ্যাসফেঁসে শব্দে 'স্কেপফেঁচ' করে দ্রুতগতিতে এঁকে-বেঁকে উড়তে শুরু করে দিল। দেখলাম পাখিগুলোর উপরদিকটা গাঢ় পাটকিলের উপর কালো, লালচে ও হলদেটের আঁকা-বাঁকা ডোরা টানা, তলাটা সাদা। খুব বড় করে চক্কর দিয়ে উড়ছে। আমরা পিছিয়ে কাছে এক গাছ ছিল তার তলায় দাঁড়ালাম।

খানিকক্ষণ ওইভাবে চক্কর দিয়ে ওড়ার পর সোজা গোঁওা খেয়ে নেমে এল, লেজের পালকগুলো ছড়িয়ে দিয়ে, যেমন মেমসাহেবরা গোটানো হাতপাখা খুলে দেয় তেমনি করে। মাটির একদম কাছে এসে ডানা বন্ধ করে দিল। মাটি ছোঁওয়ার ঠিক আগে ডানা খুলে ঝটপট করতে করতে টাল সামলাল। অবাক হলাম, ঠিক যে জায়গা থেকে উড়েছিল আবার সেই জায়গাতেই ফিরে আসাতে। আমরা কাছেই দাঁড়িয়ে, তা সত্ত্বেও ভ্রূক্ষেপ করল না।

আমি আগে এই জাতের যেসব পাখি দেখেছি এবং মেরেছি তাদের সঙ্গে এদের তফাৎ, এদের রঙটা একটু বেশি গাঢ়। তাদের লেজ সরু আর এরকমভাবে লেজের পাখনা মেলে দেয় না। ওড়া এত দ্রুত এবং আঁকা-বাঁকা নয়। অনেক বেশি মন্থর। আর জলের এত কাছেও তাদের দেখি নি। শুকনো ডাঙাতেই দেখেছি। তারা 'কাদাখোঁচা' (কাপেল্লা স্টেনিউরা), ইংরেজি— *পিনটেইল স্নাইপ*। এরা তাহলে কোন কাদাখোঁচা ?

মাটিতে বসে আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। কোনরকমে দুটোকে এক লাইনে পেয়ে ডবল ব্যারেল 'লায়ন অ্যাণ্ড লায়ন' এর প্রথম ঘোড়াটা টানলাম। উড়তেই ডানদিকেরটাও টানলাম। মাটিতে দুটো আর জলে গিয়ে পড়ল চারটে। এভাবে গুলি ছোঁড়াটা ভুল হয়েছিল, কারণ গোঁত্তা খেয়ে একসঙ্গে যখন মাটির কাছে নামে তখন মারলে ঐ বারটাকেই ফেলা যেত।

বাড়ি ফিরে বই খুলে সনাক্ত করলাম, এটি আরমুখ বংশের (স্কোলোপাসিদি) গোভভীর গণের (ক্যাপেল্লা) এক *প্রজাতি*। নাম— 'কাদাখোঁচা বা চেগ্গা' (ক্যাপেল্লা গাল্লিনাগো), ইংরেজি— *কমন স্নাইপ, ফ্যানটেইল স্নাইপ*। জানলাম বাংলাভাষায় যত প্রজাতির স্নাইপ আছে তাদের সকলকেই কাদাখোঁচা বলা হয়।

কাটাকুটি ও মাপজোক করে পেলাম, সরু লম্বা চঞ্চু 6 সেমি (আড়াই ইঞ্চি), যার একদম আগাটা

কাদামাটির ভিতর থেকে খাদ্য তুলে নেবার সুবিধের জন্যে একটু বাঁকা। চঞ্চুর গোড়ার দিকের অর্ধেকটা রঙ হলদেটে-শিঙে, বাকি অংশ গাঢ় শিঙে-পাটকিলে। লম্বায় 27 সেমি (সাড়ে 10 ইঞ্চি)। ডানা গোটা চারেকের পেলাম 13 সেমি (5 ইঞ্চি), দুটি 13.5 সেমি (প্রায় সাড়ে 5 ইঞ্চি)। শেষের দুটি পুরুষের; লেজ 6 সেমি (2.5 ইঞ্চি); ওজন ছিল প্রায় দেড় ছটাক (100 গ্রাম)।

বাসস্থান— ইওরোপের ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে পূর্ব সাইবেরিয়া, বলকান অঞ্চল, ককেশাস, কিরঘিজ স্তেপভূমি, পামির ট্রান্সবৈকালিকা, আমূর নদীর অঞ্চল, হোক্কাইডো এবং কুরিল দ্বীপপুঞ্জ, ওড়িশার বালেশ্বর এবং নিম্ন পশ্চিমবঙ্গে বিশেষত সুন্দরবন অঞ্চলে। পরিযায়ী হয় ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, মিসর, পূর্ব আফ্রিকা থেকে দক্ষিণে কেনিয়া, পারস্য, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, বর্মা, দক্ষিণ চীন, ইন্দোচীন অঞ্চল এবং জাপানে।

ভারতে কাশ্মীর, গাড়োয়াল প্রভৃতি হিমাচল প্রদেশে বাসা বাঁধে। অন্যত্র বাসা বাঁধে কিনা সঠিক জানি না। কিন্তু ওদের প্রজননকালীন দেহসজ্জা দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে মে-জুন মাসেও দেখা গেছে।

ভারতে ডিম পাড়ে সাধারণত 4টি, মাঝে মাঝে 3, কখনওবা 5টি সবুজাভ ধূসর কিংবা জলপাই-ধূসরের উপর গাঢ় পাটকিলের ছিট ও ছোপের। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই ডিমে তা' দেয়। ডিম ফোটে 19-20 দিনে। প্রজননকালে পুরুষ স্ত্রী-পাখির মনোরঞ্জনের জন্য খুব তাড়াতাড়ি ডানা ঝাপটিয়ে সোজা 50 কি 100 মিটার শূন্যে উঠে চক্কর দিতে থাকে, আর মুখে ডাকতে থাকে 'চিপ-পার, চিপ-পার'। তারপরেই সোজা গোঁত্তা খেয়ে নামে, তখন ছড়ান লেজের পালক বাতাসের সংস্পর্শে এসে এক অদ্ভুত আওয়াজ সৃষ্টি করে। সেই শব্দের সঙ্গে ছাগলের ডাকের সাদৃশ্য পেয়ে জার্মানরা এদের বলে আকাশের ছাগল।

অন্যান্য কাদাখোঁচা বা চাহা

আরামুখ বংশের (স্কোলোপাসিদি) গোভণ্ডীর গণের আরও কিছু পাখি পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়, তারা হল—

(Solitary Snipe) (Wood Snipe)

1. **বনচাহা**— (ক্যাপেল্লা সলিটারিয়া) এবং একই নামে আর একটি *প্রজাতি* (ক্যা নেমোরিকোলা)। লম্বায় দুই *প্রজাতিই* এক— 31 সেমি (12 ইঞ্চি)।

প্রথমটির নাম, নেপালী— *ভার্‌কা*, খাসি— *সিমপু*, কাছাড়ি— *দাওডিডাপ গোফু*, ইংরেজি— *ইস্টার্ন সলিটারি স্নাইপ*।

জলার চারপাশের রঙের সঙ্গে মিশিয়ে থাকা পাখি। দেহে বাঁকাচোরা পাটকিলে-কালো, তামাটে-লাল, লালচে-হলুদ, আর সাদার সমাবেশে সোজা সরু লম্বা জলপাই-পাটকিলে, চঞ্চু 7 সেমি (3 ইঞ্চি)। হাতে করে না নিলে একমাত্র আকারে বড়ো ছাড়া কাদাখোঁচার চেয়ে আলাদা করা শক্ত। কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু জলপাই-পাটকিলে, উপরের চঞ্চুর কিছু অংশ কালচে, তলার চঞ্চুর আধখানা কালচে, পা ও আঙুল জলপাই-রঙা, নখর শিঙে-পাটকিলে। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান— মধ্য এশিয়ার উচ্চ পার্বত্যভূমি তারবাগাটাই, সাইয়ান ও খাঙ্গাই পর্বত থেকে দক্ষিণে তিয়েন শান ও হিমালয়, পুবে কোকোনর এবং বর্মার উত্তরাংশ। গ্রীষ্মে দেখা যায় সমগ্র হিমালয়ে 2800 থেকে 4600 মি. উচ্চতার মধ্যে। লাডাখ, কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, কুমায়ুন, গাড়োয়াল, নেপাল, সিকিম থেকে উত্তরপূর্ব আসামে খুব বাসা বাঁধে। শীতকালে কখনওসখনও নেমে আসে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে আসাম পাহাড়, মণিপুর, উত্তরবঙ্গ, বেনারস ও ওড়িশার চিল্কা হ্রদে।

খুবই দুষ্প্রাপ্য পাখি। ডাকে কাদাখোঁচার মতো 'স্কেপ' বা 'পেনচ্' করে, তবে অনেক জোরে ও কর্কশ সুরে। গাছের উপরেই বাস করে। একা-একাই ঘোরাফেরা করে। দু'একটি একই জলাশয়ে থাকলেও পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব থাকে বেশ। কাদাখোঁচারই মতো এঁকেবেঁকে ওড়ে, তবে অনেক আস্তে।

দ্বিতীয় প্রজাতির হিন্দি নাম— *চাহা।* সব *প্রজাতির* কাদাখোঁচাকে হিন্দিতে তাই বলে। তামিল— *কাট্টু উল্লান*, ইংরেজি— *উড স্নাইপ।* খুবই দুষ্প্রাপ্য পাখি।

দেহের উপরাংশ গাঢ় পাটকিলে, তার মধ্যে মিশিয়ে আছে কালো, লালচে-হলুদ এবং ঘি-রঙা সব ছোটো ছোটো টান। বুকে লালচে-হলুদের উপর পাটকিলের টান, বাকি তলায় পেটসমেত সাদা, তার উপর খুব ঘন করে সরু সরু পাটকিলের টান। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে, চঞ্চু শিঙে-পাটকিলে, তার উপর সবুজের আভা, ডগাটা গাঢ়, তলার চঞ্চুর দুই-তৃতীয়াংশ হলদেটে, পা ও আঙুল গাঢ় সীসে-সবুজ। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান— হিমালয়ের হিমাচল প্রদেশের ডালহৌসি থেকে পুবে নেপাল, সিকিম, ভূটান, উত্তরপূর্ব আসামের শেষপ্রান্ত অবধি। শীতে পরিয়ায়ী হয় উত্তরবঙ্গ, বাংলাদেশ, মণিপুর, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, মাদ্রাজ, কেরালায়। ক্বচিৎ শ্রীলঙ্কায় দেখা যায়। দেখা যায় ছোটখাটো জলার ধারে বা বড় জলার ঘাসের ঘন জঙ্গলে।

খাদ্য— দুই প্রজাতিরই এক। ভূমিজ কীট, ছোটো জলজ পোকামাকড় ও আবর্জনার মধ্যে থেকে কীটপতঙ্গের শূক।

স্বভাব— মাঝে মাঝে ঝোপের মধ্যে থেকে নিঃশব্দে চটপট উঠে উড়তে দেখা যায়। কখনওবা মৃদুস্বরে' টক-টক' আওয়াজ করে। পাহাড়ী জলা-জঙ্গলের পাখি। সাধারণত একাই বিচরণ করে, মাঝে মাঝে দুই বা তিনটি কাছাকাছি থেকেই ওড়ে। ওড়ার সময় চঞ্চু নিচের দিকে করে রাখে। পঞ্চাশ বা একশ' মিটার উড়েই আবার ঝোপের মধ্যে নেমে পড়ে।

2. **চেগ্গা**— (ক্যা স্টেন্যুরা)। সর্বত্রই কাদাখোঁচার যা নাম তাই। ইংরেজি— *পিনটেইল স্নাইপ।* লম্বায় 27 সেমি (সাড়ে 10 ইঞ্চি)।

কাদাখোঁচারই মতো দেখতে, শুধু রঙটা একটু গাঢ়। প্রায়ই দেখা যায় শুকনো জমিতে। আর তফাত ধরা যায় হাতে নিলে। চেগ্গার লেজের পালক ছাব্বিশ থেকে আটাশটি এবং দু'দিকের বাইরের আট-নটি পালকের শেষে সরু আলপিনের মতো কাঁটা বার হয়ে থাকে।

বাসস্থান— পূর্ব সাইবেরিয়ার পশ্চিম থেকে ইয়েনেসি নদী, দক্ষিণে পূর্ব তুর্কিস্তান, উত্তর তিব্বত,

হোয়াং-হো নদী, আয়ারল্যান্ড ও শাখালিন। শীতে পরিযায়ী হয় পাকিস্তান, নেপাল, সিকিম, সহ সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ, আন্দামান, নিকোবর ও মালদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জে এবং শ্রীলঙ্কায় মিটার উচ্চতার মধ্যে। ভারতের বাইরে বর্মা, ইন্দোচীনীয় দেশসমূহ, দক্ষিণ চীন, হাইনান, সুন্দা দ্বীপপুঞ্জ, তাইমোরে। কাদাখোঁচার (ফ্যানটেইল) সঙ্গে মিলেমিশে বেশি দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ। সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় আসে দক্ষিণ ভারত, আন্দামান ও শ্রীলঙ্কায়। যায় বাদা, ঝিলের ধার, ভিজে ধানখেতের কাটা গোড়ায়, পাহাড়ের তলায় কোনো নদীর ধারে কাদাখোঁচার সঙ্গে বিচরণ করতে, এমনকি নিচু জমির ঝোপেও।

প্রধানত ভূমিজ কীট, বিভিন্ন শূক এবং ছোটো কম্বোজ।

— নাকি সুরে কর্কশ 'স্কেপ' বা 'পেনচ্' করে ওড়ার মুহূর্তে ডাক দেয়। কিংবা উড়তে ডাক দেয় প্রায় প্রতি সেকেন্ডে, তারপর দূরপাল্লা ওড়ার মাঝে থেকে থেকে ডেকে থাকে। কটা মনে পড়ায়, ভিজে জুতো পরে চলার সময় যে আওয়াজটা হয় অনেকটা সেইরকম। ঝোপ থেকে একাই ওড়ে। যেখানে খাদ্য বেশি সেখানে তিন-চারটিকে একসঙ্গে উড়তে যায়। ওড়ে খুব দ্রুত বিদ্যুৎগতিতে আঁকাবাঁকাভাবে। এই কারণে পাকা স্নাইপ বা কাদাখোঁচা খুব প্রিয়। মাঝারি শিকারীদের শুধু গুলি নষ্ট করতেই দেখেছি। প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় রাতেই বিচরণ করে বেশি। রোদেভরা দুপুরে ঝোপের তলায় আশ্রয় নেয়। ব্যতিক্রম হল বাতাসের মেঘলা দিনে ভরদুপুরেও দেখা যায়। বন্দুকের পাল্লার বাইরে ডাক দিতে দিতে উঠে যায় এবং বড়ো করে চক্কর মারতে থাকে। আবার ফিরে আসে ঠিক যেখান থেকে প্রায় সেখানেই। পাকা শিকারীরা অপেক্ষা করে থাকে। ওদের ফিরে আসা এবং নামার শিকার করে।

ও বাংলাদেশে এদের প্রজননের খবর পাওয়া যায়। বিশেষত উত্তর কাছাড়, শ্রীহট্ট-সীমান্ত এলাকা, বরাইল পর্বতশ্রেণী ও শিলচরে এরা বাসা বাঁধে। বাসা বাঁধা, প্রজনন, সবই কাদাখোঁচার মতন।

(Great Snipe)

বড়ো কাদাখোঁচা— (ক্যা মিডিয়া)। ইংরেজি— *গ্রেট স্নাইপ*। লম্বায় 28 সেমি (11 ইঞ্চি)। খোঁচা বা চেগ্গার চেয়ে দেখতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট। গায়ের রঙও গাঢ় এবং তলায় কাদাখোঁচার টান বা দাগ। ওড়াটা বেশ ধীরে। আঁকাবাঁকা ভঙ্গিটাও কম এবং প্রথম ওড়ার সময়কার ডাকও দেয় না। লেজের দু'দিকের বাইরের চারটে করে পালকের শেষপ্রান্তে কোনো দাগ নিকা গাঢ় পাটকিলে, চঞ্চু পাটকিলে বা শিঙে-পাটকিলে, পা ও আঙুল সবজেটে বা টে। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

— উত্তর ইওরোপে এবং পশ্চিম এশিয়ার উত্তর নরওয়ে, দক্ষিণ ফিনল্যান্ড, হোয়াইট-ইয়েনিসি নদীর নিম্নভাগে, দক্ষিণে ডেনমার্ক, পূর্ব জার্মানি, পোল্যান্ড, কিরঘিজের স্তেপভূমি আলতাই পার্বত্য অঞ্চল। শীতে পরিযায়ী হয় দক্ষিণ ইওরোপ ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার আফ্রিকার উত্তরাংশ ও পূর্বাংশে। ভারতে মাদ্রাজ, মহীশূর, আন্দামান, শ্রীলঙ্কায়, ক্বচিৎ,

পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণাংশে ও ওড়িশার বালেশ্বরের নিকটবর্তী স্থানে। ব্যক্তিগতভাবে লবণ হ্রদে দেখেছি বার পাঁচেক, তাও চিনতে পারতাম না। কেবল কাদাখোঁচার সঙ্গে এরাও শিকার হয়েছিল বলে হাতে নিয়ে তফাত ধরেছিলাম। সুন্দরবনে দেখেছি বার তিনেক। সেপ্টেম্বর থেকে মার্চের মধ্যেই দেখা যায়।

Jack Snipe) **ছোটো চাহা**— (ক্যা মিনিমা), নেপালী— *ছোটো ভকা*, তামিল— *উল্লান*, ইংরেজি— *জ্যাক স্নাইপ*। লম্বায় 21 সেমি (সাড়ে ৪ ইঞ্চি)।

প্রায় কাদাখোঁচার মতই দেখতে তবে আকারে বেশ ছোটো, চঞ্চু বেশ শক্তপোক্ত, উপরের পালকে ধাতব-সবুজ ও বেগুনি আভার ভিতর গাঢ় বাদামীর টান, লেজ অনেকখানি কীলকাকার, তবে কাদাখোঁচার মতো বাইরের পালকের ডগায় সাদাটে ভাবটা নেই। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে, চঞ্চুর ডগাটা প্রায় কালো, বাকি অংশ শিঙে-পাটকিলে, গোড়া সবজেটে-শিঙে, পা ও আঙুল ফিকে জলপাই-সবুজ, তার উপর একটু হলদেটে বা ধূসরের আভাস পাওয়া যায়।

বাসস্থান— উত্তর ইওরোপ ও এশিয়ার উত্তরাংশ, নরওয়ে থেকে পুবে কলাইমা ব-দ্বীপ (70° ডিগ্রি উত্তর বাদ), দক্ষিণে ডেনমার্ক, পূর্ব জার্মানি, বালটিক রাজ্য, মধ্য রাশিয়া ও মিনুস্‌সিনসক-এর জঙ্গলের স্তেপভূমি। শীতে পরিযায়ী হয় পশ্চিম ইওরোপ, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, মিসর, ইরাক, পারস্য, ভারত ও বর্মায়, ক্বচিৎ নাইজেরিয়া ও কিনিয়ায়। ভারতে আসে খুব অল্প সংখ্যায়। দেখা যায় পাকিস্তান, পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের পশ্চিমাঞ্চল ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ এবং বাংলাদেশে। কখনওসখনও আন্দামান ও শ্রীলঙ্কায়। কাদাখোঁচার সঙ্গে মিলেমিশে থাকে।

স্বভাব— আচার-ব্যবহার কাদাখোঁচা ও চেগ্গার মতই। ঝোপের মধ্যে থেকে একাই নিঃশব্দে ওড়ে। মুখে জাতিগত 'স্কেপ' বা 'পেনচ্' নেই। অল্প উড়ে কিছুদূর গিয়ে আবার ঝোপের মধ্যে নামে। কাদাখোঁচার মতো আঁকাবাকা ওড়ে না, ওড়ে অনেক আস্তে, তাই শিকারীদের মারার খুব সুবিধে। ব্যক্তিগতভাবে লবণ হ্রদে বারকতক এবং সুন্দরবনে এখনও পর্যন্ত মাত্র বার দুই দেখেছি।

গুলিন্দা-বাটান (Curlew Sandpiper)

এই পাখিদের প্রথম দেখি প্রথম যৌবনে আমার স্বর্গরাজ্য লবণ হ্রদে। তারপর এখন জীবনের বেলা শেষে দেখি সুন্দরবনে। ভারত ভাগ হবার আগে অখণ্ড সুন্দরবনে যেমন দেখেছি এখন তেমনই দেখছি পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে। আবার দেখেছি ওড়িশার চিল্কা হ্রদেও। ওদেরই জ্ঞাতি ডানলিন-বাটানের (ক্যালিড্রিস আলপিনাস) সঙ্গে মিলেমিশে চরতে। দূর থেকে তফাত ধরা খুবই শক্ত কিন্তু যৌবনে হাতে থাকত বিলিতি বজ্র। চিল্কায় সেই বজ্র গর্জে উঠেছিল এবং বজ্রাঘাতে পড়েছিল দুই জাতের পাখি। তফাত একজনের চঞ্চু ঈষৎ বাঁকা, অপরজনের একটু ছোট এবং সোজা। একজনের লেজের উপরের আচ্ছাদক কালো, অপরজনের সাদা। সেই যুগে লবণ হ্রদে দু'জাতকেই দেখা যেত। চঞ্চু বাঁকা সরলা বাটান বা ছোট গুলিন্দার (হুইমব্রেল) মত হলেও ডানলিন-বাটান আকারে অনেক



চি 63. গুলিন্দা-বাটান

ছোট, [illegible] [illegible] দেখি সুন্দরবনে। [illegible] পাটকিলে, তার [illegible] ছোট ছোপ, [illegible] কালো, নিচটা সাদা। [illegible] বুকে কিছু ছোট ছোট [illegible] কনীনিকা পাটকিলে, [illegible] বাঁকা চঞ্চু কালো, পা ও [illegible] ধূসরাভ-সীসে বা কালো। [illegible] একই দেখতে।

এই পাখিদের ভারতীয় কোন ভাষাতেই নাম নেই। স্থানীয় লোকজনদের জিজ্ঞেস করে দেখেছি, তাঁরা সৈকতবাসী প্রায় সব পাখিদেরই বাটান বলেন, কোন তফাত করেন না। তাই বাঁকা চঞ্চুর জন্যে আরামুখ বংশে বারিরঙ্ক গণের (ক্যালিড্রিস) এই পাখির নাম রেখেছি— গুলিন্দা-বাটান (ক্যালিড্রিস টেস্টাসিউস), ইংরেজি— *কারলিউ স্যান্ডপাইপার*। লম্বায় 20 সেমি (8 ইঞ্চি)।

বাসস্থান— উত্তর এশিয়ার ইয়েনিসি নদীর মোহনা, পশ্চিম তাইমীর বলচেই বারানভ অন্তরীপ এবং নব সাইবেরীয় দ্বীপপুঞ্জ। ভারতে পরিযায়ী হয়ে আসতে শুরু করে জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ থেকে। পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারতের সমুদ্রকূল থেকে অভ্যন্তরের প্রায় সর্বত্রই এসে হাজির হয়। মালদ্বীপ, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং শ্রীলঙ্কাতেও আসে। ভারতের খুব বেশি অভ্যন্তরে আসে অল্পমাত্রায়, বড় বড় ঝাঁক সমুদ্র উপকূল, জোয়ার-ভাটা খেলা নদী ও খাঁড়ির মুখের পলি-কাদা, ভিজে ধানক্ষেত, বাদা ইত্যাদিতে, অন্যান্য সৈকতবাসীদের সঙ্গে একত্রে বিচরণ করতে দেখা যায়। ভারতের বাইরে আফ্রিকা, মালাগাসি, বর্মা, মালয় দ্বীপপুঞ্জ ও অস্ট্রেলিয়া।

খাদ্য— কম্বোজ, কবচী পোকামাকড় ইত্যাদি।

স্বভাব— অন্যান্য সৈকতবাসীদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে বলে শীতকালে এরা কোন ডাক ডাকে কিনা ঠিক বোঝা যায় না। পক্ষিবিদ স্টুয়ার্ট-বেকার তাঁর আট খণ্ডের বই *'ফনা-অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া বার্ডস'*-এ বলেছেন, ক্ষীণ কিচিরমিচির শব্দ ও তীক্ষ্ণ উচ্চগ্রামে একটি আওয়াজ দেয়। আঙটি পরিয়ে পরিযায়ী হয়ে আসা-যাওয়ার পথ সঠিক নির্ণয় হয় নি। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ বা আগস্টের প্রথমে মাকরান, সিন্ধু ও গুজরাটের সমুদ্রতীরে অনেক সময় আসে, প্রজননকালের পূর্ণ সাজ পরে।

বেশিরভাগ পাখি ফিরে যায় এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে। কিছু প্রজননকালের পূর্ণ সাজে থাকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এই সময়ে শরীরে বেশ মেদ জমিয়ে নেয় লম্বা পাড়ি দেবার জন্যে। প্রজননকালে দেহের উপরের ধূসরাভ-পাটকিলে বদলিয়ে বাদামী হয়ে যায়। আবার কিছু শীতের

সাজে থেকে যায় গ্রীষ্মের শেষ পর্যন্ত, এমন কি তারপরেও ভারতের সমুদ্র উপকূলবর্তী স্থানে।

অন্যান্য বাটান

আরও কয়েকটি বাটানকে পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়, তারা হল—

1. ডানলিন-বাটান— (ক্যালিড্রিস আলপাইনাস)। ভারতীয় কোনো ভাষাতেই নামকরণ হয় নি। বারিরত গণের (ক্যালিড্রিস) প্রজাতি। ইংরেজি— *ডানলিন*। লম্বায় 19 সেমি (সাড়ে 7 ইঞ্চি)। এরা আকারে একটু শীতকালে দূর থেকে দেখে গুলিন্দা-বাটানকে চেনার একমাত্র উপায় হল, এরা আকারে একটু ছোটো এবং চঞ্চুর বাঁকা ভাবটা খুবই অল্প। উপরের পালক ধূসর-পাটকিলে, তার উপর কিছু খুব ছোটো গাঢ় ছোপ, নিচটা সাদা, শুধু বুকে অস্পষ্ট ধূসর ছিটের একটি পটি। বুকের তলায় সাদাটে একটা পটি, সেটা ওড়ার সময় স্পষ্ট হয়। কনীনিকা বাদামী, চঞ্চু, পা ও আঙুল কালো। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

গুলিন্দা আর ডানলিন-বাটানের তফাতটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছিল আমার এক বন্ধু 'কে-কে' অর্থাৎ কল্যাণকুমার রায় চৌধুরীর জন্যে। বহুদিন আগে এক দুপুরে কয়েকটা পাখি কে-কে কোত্থেকে এনে বলেছিল রেঁধে দিতে। পাখিগুলি নাকি স্নাইপ বা স্নিপেট। কে-কে একা থাকে, রাতে কে যেন বন্ধু আসবে এবং খাবে। স্নিপেট বলে কোনো পাখি নেই। ওগুলো স্নাইপও ছিল না, ছিল এক জাতের বাটান।

সবই ছিল গুলিন্দা-বাটান, তার মধ্যে তিনটে ছিল ভিন্ন জাতের। তফাতটা লক্ষ্য করেছিলাম এদের লেজের আচ্ছাদকের মাঝখানটা কালো, গুলিন্দা-বাটানের সাদা। দু'জনেরই লেজে ছটা করে বারোটা পালক। গুলিন্দার চেয়ে এই বাটানের লেজের পালক একটু সূঁচলো। দু'দিকের পাঁচ-পাঁচটা পালকের মাঝে দুটি পালক একটু চওড়া।

এই ডানলিন-বাটানকে মুক্ত আঙিনায় দেখেছি কলকাতার উপকণ্ঠে ব্রেস ব্রিজে আর সুন্দরবনে।

বাসস্থান— আইসল্যান্ড, ইওরোপ ও এশিয়ার উত্তরে স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে ইয়ালমাল উপদ্বীপ, কলগুয়েভ, ভাইগাচ দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর নোভা জেমলাইয়া ও স্পিৎস্বার্জেন, দক্ষিণে প্স্কভ্, আপার ভলগা, লোয়ার ওব। শীতে পরিযায়ী হয় ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায়। ভারত ও পাকিস্তানের সমুদ্রোপকূল ধরে আসতে আরম্ভ করে আগস্টের শুরুতেই। করাচি, গুজরাট, তারপর সমুদ্রোপকূল ও তার নিকটবর্তী স্থানসমূহে ছড়িয়ে পড়ে ভারতের পশ্চিম উপকূল ধরে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত। সেখান থেকে পূর্ব উপকূল ধরে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে বর্মায় এসে থামে।

খাদ্য— কম্বোজ, কবচী, পোকামাকড় ও তাদের শূক। মাঝে মাঝে কিছু শস্যবীজও খেয়ে থাকে।

স্বভাব— ডাকে তীব্রস্বরে বিশেষত, ওড়ার মুহূর্তে 'টই-এপ্, উইই-উইই-এট'। দল বেঁধে বিচরণ করে। দেখা যায় গুলিন্দা-বাটান, পানলৌয়া, বালুবাটান ও অন্যান্য ছোটো আকারের জলচারীদের

সঙ্গে। সমুদ্রতীর ও নদীর খাঁড়ির মুখে ভাঁটার সময় নরম পলি-কাদার উপর দৌড়ে দৌড়ে খাদ্য সংগ্রহ করে। থেকে থেকে শূন্যে ওড়ে, মোচড় খায়, আবার এসে নামে পলি-কাদার উপর। জোয়ারের সময় উঁচু পাড়ে শুকনো জমিতে দলবদ্ধ হয়ে অপেক্ষা করে কখন ভাঁটা শুরু হবে।

2. পানলৌয়া— (ক্যা মাইনুটাস), হিন্দি— *রুন্নি*, বেলুচি— *টাক্কি*, ইংরেজি— *লিটল, স্টিনট*। বারিরক্ষ গণের *এক প্রজাতি*। লম্বায় 15 সেমি (6 ইঞ্চি)। (Little Stint)

এর চেয়ে ছোটো জলচারী দেখা যায় না। চড়াইয়ের চেয়ে একটু বড়ো। উপরটায় ধূসরাভ-পাটকিলের ছোপ, নিচটা পুরো সাদা। দেখলেই মনে হয় ডানলিন-বাটান, কিন্তু এদের চঞ্চু ছোটো ও সোজা। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। এরই মতো দেখতে আরও দু'একটি ছোটো আকারের পানলৌয়া দেখা যায়—

(Temminck's Stint)

3. **ছোটো পানলৌয়া**— (ক্যা টেম্মিনকিই), ইংরেজি— *টেম্মিনক'স্ স্টিনট্*। লম্বায় 15 সেমি (6 ইঞ্চি)। এদের লেজের বাইরের পালক দু'দিকে তিনটে করে পুরো সাদা, পানলৌয়ার ধূসরাভ-পাটকিলে।

বাসস্থান— উত্তর মেরু অঞ্চলীয় তুন্দ্রার 30° ডিগ্রি পূ. থেকে পুবে ইয়ানা উপত্যকা, কলগুয়েভ ও ভইগাচ দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণে নোভাজেমলাইয়া, নব সাইবেরীয় দ্বীপবহুল সমুদ্র। শীতে পরিযায়ী হয় আফ্রিকা, কশ্যপ সাগরের দক্ষিণ তীর থেকে পাকিস্তান ও ভারতের সমুদ্রোপকূল ধরে শ্রীলঙ্কা, কন্যাকুমারিকা থেকে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে।

স্বভাব— ডাকে মিষ্টি করে 'উইট-উইট উইট' এবং ওড়ার মুহূর্তে 'টরর্' আওয়াজ করে। এরা সঙ্ঘচারী এবং সবসময়েই দেখা যায় প্রায় শ'খানেক ডানলিন, পানলৌয়া ও গুলিন্দ-বাটানদের সঙ্গে মিলেমিশে চরছে। খাদ্যসংগ্রহের সময় আলাদা হয়ে ছড়িয়ে পড়লেও অন্যান্য বাটানদের সঙ্গে খুব দূরে থাকে না।

(Great Knot)

4. **ছোটো জৌরালি**— (ক্যা টেন্যুইরসট্রিস)। ইংরেজি— *ইস্টার্ন নট* (Knot)। বারিরক্ষ গনের *এক প্রজাতি*। লম্বায় 29 সেমি (সাড়ে 11 ইঞ্চি)।

উপরটা হালকা পাটকিলে-ধূসর, তার উপর কালো টান সর্বত্র। নিচের পিঠ, বস্তিপ্রদেশ এবং লেজের উপরের আচ্ছাদকে গাঢ় পাটকিলের উপর সাদা ছোপ। তলাটা সাদা, ঘাড়ের পাশে ও উপরের বুকে কিছু টান ও ছিট গাঢ় পাটকিলে। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে, চঞ্চু ধূসরাভ-কালো, পা ও আঙুল ধূসরাভ-সবজেটে।

বাসস্থান— পরিষ্কারভাবে জানা যায় না। অনুমান করা হয়, এরা থাকে উত্তর-পূর্ব সাইবেরিয়া, নিম্ন কোলাইমা নদী, আনাডাইর ল্যাণ্ড ও কোরাইয়াক ল্যাণ্ডের পার্বত্য অঞ্চলে। শীতে পরিয়ায়ী হয় ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূল ধরে বাংলাদেশ, আন্দামান ও লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ, বর্মা, মালয় উপদ্বীপ, মলাক্কা, অস্ট্রেলিয়া, চীন ও জাপানে। আসামে ডিব্রুগড় ও কাছাড়, মাদ্রাজ ও কলকাতার লবণ হ্রদ থেকে এদের নমুনা নথিভুক্ত হয়েছে।

স্বভাব— অন্যান্য জলচারী পাখিদের মতই। ছোটো ছোটো বাটানদের মধ্যে ঘোরাফেরা করার

জন্যে এদের আকারে বড়ো চেহারাটা সহজে নজরে পড়ে। জৌরালিদের সঙ্গেও বিচরণ করে। তাই দূর থেকে দেখলে যখন ওড়ে তখন জৌরালির থেকে তফাত করা যায় না।

Sanderlings 5. আঙুলহারা-বাটান— (ক্যা আলব্যাস)। দেশীয় কোনো ভাষাতেই নাম নেই। ইংরেজি— *স্যান্ডারলিং*। লম্বায় 19 সেমি (সাড়ে 7 ইঞ্চি)।

ডানলিন-বাটানের চেয়ে এই জলচারী বাটানটি কিছুটা বড়ো। অন্যান্য বাটানদের মতো এর পিছনের আঙুলটি নেই। উপরটা খুব ফিকে বাদামী, প্রায় সাদাই। ডানার ঘাড়ে কালচে ছোপ, লেজেও তাই। কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু, পা ও আঙুল কালো। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান— পৃথিবীর উত্তরাংশ। ইওরোপ ও এশিয়ার উত্তরাংশ স্পিৎস্‌বার্জেন, মেরু অঞ্চলীয় সমুদ্রতীর, সাইবেরীয় দ্বীপগুলির তাইমীর উপদ্বীপ থেকে লেনা নদীর মুখ পর্যন্ত। শীতে পরিযায়ী হয় ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর সমুদ্র, পাকিস্তান, ভারত, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, চীন, জাপান এবং অস্ট্রেলিয়ায় : দক্ষিণে দক্ষিণ আফ্রিকা ও মালাগাসীতে। পরিযায়ী হয়ে চলে আসে পাকিস্তানের মাকরান, সিন্ধু, ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলের স্থানসমূহ, লাক্ষা ও মালদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জ এবং কিছু শ্রীলঙ্কায়।

স্বভাব— চকিতে ওড়ার মুখে ডাকে তীক্ষ্ণস্বরে 'উইক-উইক'। ডানলিন, গুনিন্দা-বাটান এবং অন্যান্য জলচারীদের সঙ্গে মিলেমিশে চরে। জোয়ার-ভাঁটা খেলা পলি-কাদা বা বালির চরে বিচরণ করে। দৌড়ঝাঁপের জন্যে নানা জাতের জলচারীর মধ্যেও তফাত করা যায় (সাদা রঙ ও অক্লান্ত দৌড়ঝাঁপের জন্যে)। ঢেউ সরে গেলে খাদ্যসংগ্রহ করতে করতে দ্রুত দৌড়ে যায়, আবার ঢেউ আসার মুখে দ্রুত পায়ে পিছিয়ে আসে নিরাপদ জায়গায়। অন্যান্য জলচারীরা তখন জোয়ারের জন্য উঁচু পাড়ে অপেক্ষা করছে কখন ভাঁটা শুরু হবে। একসঙ্গে সৈন্যদের মতো শৃখলাবদ্ধভাবে চক্কর দিয়ে ওড়ে, আবার ফিরে আসে যেখান থেকে উড়ে ছিল সেখানে।

Spoonbilled Sand piper. 6. চামচঠুঁটো-বালুবাটান— (ইউরাইনরহিঙ্কাস পাইগমাইউস)। ভারতীয় কোনো ভাষাতেই নামকরণ হয় নি। ইংরেজি— *স্পুনবিলড্ স্যান্ডপাইপার*। চমসচঞ্চু গণের *প্রজাতি*। লম্বায় 17 সেমি (সাড়ে 6 ইঞ্চি)।

ছোটো পানলৌয়ার মতো এই জলচারীর চঞ্চুটাই অদ্ভুত। চঞ্চুর ডগাটা চ্যাপটা চার-চৌকো। দেহ মোটামুটি সাদা, মাথার চাঁদি থেকে লেজ পর্যন্ত ধূসরাভ-পাটকিলের টান। বস্তিপ্রদেশ ও লেজের উপরের আচ্ছাদকের মাঝখানটা গাঢ় পাটকিলে, ধারের পালক সব সাদা। লেজের মাঝের পালকও গাঢ় পাটকিলে, বাকি ধারের পালক ফিকে, ধারে সাদা ও ফিকে পাটকিলের টান। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে, চঞ্চু, পা ও আঙুল কালো।

বাসস্থান— উত্তরপূর্ব সাইবেরিয়ার সমুদ্র উপকূল থেকে পশ্চিমে চুকোতস্কি উপদ্বীপের উত্তর সমুদ্র উপকূল, দক্ষিণে দক্ষিণ করাইয়াকল্যান্ড। শীতে পরিযায়ী হয় কুরাইল, শাখালিন, উত্তরপশ্চিম আলাস্কা, জাপান, কোরিয়া, চীন সমুদ্র উপকূল ধরে দক্ষিণ চীন থেকে হাইনান ও ইন্দোচীনীয় দেশ সমূহ, ক্বচিৎ আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের সমুদ্র উপকূল ও তার খাঁড়ির মধ্যে এবং বাংলাদেশের চট্টগ্রামে।

স্বভাব— ডাকে ওড়ার মুখে 'চুইই চুইই' করে। একাই বিচরণ করে, কখনওবা ছোটো দলে। জোয়ার-ভাঁটা খেলা পলি-কাদার উপর থেকেই খাদ্যসংগ্রহ করে।

গেওয়ালা (Ruff)

1960 থেকে 1961 সালের মধ্যে যখন 24 পরগণার বেড়াচাঁপার ঢিবি আবিষ্কৃত হয়ে নানারকম সংবাদ পাওয়াতে খুব আলোড়ন উঠেছিল, তখনকার কথা বলছি। আমার মেঠো-খসড়া বা ফিল্ড ডায়েরিটি হারিয়ে গিয়েই ঠিক তারিখটা উল্লেখ করতে পারছি না। দু'জন প্রত্নতত্ত্বে উৎসাহী বন্ধুর সঙ্গে সকালের দিকে মোটরে করে সেখানে হাজির হই। বন্ধুদের জিজ্ঞাসাবাদ ও নমুনা দেখার উৎসাহ মিটলে তাঁদের নিয়ে চললাম ইটিণ্ডাঘাটে ইছামতীর ধারে। গাড়িটাকে রাস্তার উপর এক দোকানীর হেফাজতে রেখে আমরা পাড় ধরে উত্তরদিকে হাঁটতে শুরু করলাম। নদীতে ভাঁটা চলছে। বেশ চওড়া করে পলি পড়েছে। পাশে ধানক্ষেত। ধানকাটা হয়ে গেছে। শীতের বেলা। হাঁটতে বেশ ভালই লাগছে। হঠাৎ দেখি পলির উপর বেশ কিছু বিলের-বালুবাটান (লিটল্ গ্রীনশ্যাংক), গোত্রা (গ্রীনশ্যাংক), কাদাখোঁচা (ফ্যানটেইল স্নাইপ) প্রভৃতি জলচারী (ওয়েডার) পাখিদের সঙ্গে বেশ কয়েকটা অন্য পাখি। ঐ জাতিরই পাখি কিন্তু পা লাল, গোত্রাদের মত সবজেটে নয়। খুবই আশ্চর্য হই। একমাত্র ছোট বাটানেরই (রেডশ্যাংক) পা লাল হয়। সে ত পরিযায়ী হয়ে পশ্চিমবঙ্গে কখনও আসে না। তারা শীতে পরিযায়ী হয় রাজস্থান, গুজরাট থেকে পশ্চিমঘাট ধরে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত। নতুন আবিষ্কারে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়ি। কাটা ধানক্ষেতের আড়ালে গিয়ে লাল ঠেঙ্গোদের দেখতে পারি। খসড়াতে স্কেচ ও বর্ণনা লিখেছিলাম। কয়েকটা আকারে ছোটো এবং দেখতেও অন্য রকমের ছিল। বুঝেছিলাম এরা স্ত্রী-পাখি। যারা বড়ো অর্থাৎ পুরুষরা দেখতে ছিল— উপরটা গাঢ় পাটকিলে, তার উপর প্রতিটি পালকের মাঝে কালো ছোপ, ধারটা লালচে বা সাদাটে, মাথা ও ঘাড় ফিকে, ডানার আচ্ছাদকে কালো ও লালচে টান, ওড়ার প্রথম সারির পালক কালচে, লেজ পাটকিলে-লাল, মাঝের পালকের উপর কালো কালো টান। গলা, ঘাড়ের দু'পাশ ও তলপেট ধবধবে সাদা, কয়েকটার কালচে চিত্রবিচিত্র, বুক লালচে বা ধূসর-পাটকিলে, কয়েকটার কালচে ছিট। স্ত্রী-পাখির উপর-নিচে ছাইয়ের আভা, পালকের মাঝে কালচে ছোপ। উভয়ের কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু গাঢ় পাটকিলে, পা উজ্জ্বল কমলা।



চি 64 গেওয়ালা

বাড়ি ফিরে দেখি জর্ডন ও স্টুয়াট-বেকারের বই, পশ্চিমবঙ্গে আমার নব আবিষ্কারে জল ঢেলে দিল। মোটেই ছোট বাটান (ট্রিঙ্গা টোটানাস) নয়। সৈকত বর্গের (চারাড্রিইফরমেস) অন্তর্গত আরামুখ বংশে (স্কোলোপাসিদি) ভট গণের (ফাইলোম্যাচাস) *এক প্রজাতি।* নাম— গেওয়ালা (ফাইলোম্যাচাস প্যগনাকস), ইংরেজি— *পুরুষ— রাফ, স্ত্রী— রীভ,* হিন্দি— *বাগবাদ।* পুরুষ লম্বায় 31 সেমি (12 ইঞ্চি), স্ত্রী 25 সেমি (10 ইঞ্চি)।

ওদের গ্রীষ্মকালীন রূপ দেখেছি কলকাতার চিড়িয়াখানায়। পুরুষের (রাফ) পালক নানা রঙের, সেখানে কালো, সাদা, বেগুনি এবং হলদেটে-লালের সমাবেশ। অদ্ভুত খাড়া পালকের গলাবন্ধ, কানে কোঁকড়ান শক্ত পালকের গোছা। মুখে পালক নেই, উজ্জ্বল হলুদের ছোট ছোট মাংসল পিণ্ড কখনও কখনও উজ্জ্বল হলুদের বদলে ফিকে গোলাপী। স্ত্রী-রীভের শীতকালীন রূপ—উপরের পালক অনেক বেশি কালো, কখনও কখনও ফিকে-হলদেটে-লাল, বুকের উপর ছোট কালো ছিট বা ভাঙা লাইন দেখা যায়।

বাসস্থান— উত্তর ইউরোপ থেকে উত্তর এশিয়ার কলগুয়েভ ও ভৈগাচ দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত, দক্ষিণে বেলজিয়াম, ব্যাভেরিয়া, হাঙ্গেরি থেকে দক্ষিণ রাশিয়া ও পশ্চিম সাইবেরিয়ার স্তেপভূমি, মিনাসশিলক ও আমুর নদীর উপরাংশ। শীতে পরিযায়ী হয় আফ্রিকার কেপপ্রদেশ পর্যন্ত, পাকিস্তান, ভারতে কাশ্মীর থেকে পুবে আসাম, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, মণিপুর, বাংলাদেশ, মালডিভ দ্বীপপুঞ্জ, শ্রীলঙ্কায়। ভারতের বাইরে বার্মা, পূর্ব অতলান্তিকের দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর আমেরিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের লেসার, অ্যান্টিলেস দ্বীপপুঞ্জ। দেখা যায় জোয়ার-ভাটা খেলা নদীর পলিতে, খাঁড়ির মুখে, কাদা, ভিজে কাটা ধানের গোড়া এবং কর্ষিত কিন্তু অনাবাদী জমিতে। পরিযায়ী হয়ে জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ ও আগস্টের প্রথম সপ্তাহে আসে পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম ভারতের কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র, রাজস্থানে। তারপর সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ মাসের গোড়ায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর শুরু হয় ফেরা। ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় সবাই ফিরে যায়। অল্প কিছুকে দেখা যায় মে মাসে ফিরতে। ফেরার সময় পুরুষরাই স্ত্রী-পাখির আগে ফিরতে শুরু করে।

খাদ্য— বেশি মাত্রায় খায় কম্বোজ, কবচী, কীটপতঙ্গ, কেঁচো, কৃমি ইত্যাদি। মাঝে মাঝে ঘাস ও আগাছার বীজ, বৈঁচি জাতীয় সরস ছোট ফল, বুনো এবং চষাক্ষেতের ধান ইত্যাদি।

স্বভাব— এমনি অসম্ভব চুপচাপ। মাঝে মাঝে খুব নিচু স্বরে 'চাক-চাক' শব্দ করে। ওড়ার আগে বিষাদময় গলায় 'টু-উইট' করে ডাক দেয়। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে থাকে। প্রায়ই দেখা যায় অন্যান্য জলচারী পাখিদের সঙ্গে 5 থেকে 8, কখনও বা 25 ও তারও বেশি সংখ্যার দলে মিশে চরছে। রাজস্থানের ভরতপুরে খাদ্যবস্তুর প্রাচুর্যের জন্য দল বাঁধে হাজারে হাজারে। হাজারেরও বেশি গেওয়ালা অন্যান্য জলচারীদের সঙ্গে কচ্ছের ছোট রান-এ বিচরণ করে। নরম কাদার মধ্যে খাদ্যের জন্য চঞ্চু, কপাল ও চিবুক পর্যন্ত ডুবিয়ে দেয়। কখনওবা পুরো মাথাটাই। প্রধানত নিশাচর। সন্ধ্যার সময় খাদ্যভূমিতে প্রচুর দেখা যায়। ওড়াটা তেজের সঙ্গে জোরে, পাখা আন্দোলন বেশ দ্রুত।

ভারতে কখনও প্রজনন করেছে বলে জানা যায় নি। নিজের বাসভূমিতে প্রাক্‌মিলনের আগে দুই পুরুষে প্রচণ্ড লড়াই চালায়। কিছু পুরুষ বাদার উঁচু ছোটো শুকনো ঢিবির উপর চড়ে তাদের বর্ণময় পালক নানাভাবে দেখাতে থাকে। প্রতিবেশী অন্যান্য পুরুষরাও পাশাপাশি ঢিবির উপর ঊর্ধ্ব খাড়া পালকের গলাবন্ধ ও কানের পালক তুলে, পা বেঁকিয়ে, মাথা নিচু করে চঞ্চু মাটির দিকে নামিয়ে, সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে কাত হয়ে, শূন্যে লাফ দিয়ে ওঠানামা করে পরস্পরকে প্রীতিপ্রদর্শন করে। পরিণত স্ত্রী-পাখিরা এইসব ঢিবিতে থেকে থেকে এসে পছন্দমত পুরুষদের সঙ্গে বাছবিচারহীন সঙ্গ করে। পুরুষ বাসা বাঁধা থেকে সন্তান প্রতিপালনের কোন ধারই ধারে না। পুরুষ-পাখি নিজে বাসভূমিতে তাদের প্রজননকালীন পালকের সাজ দু'বার নির্মোচন করে নতুন পালকের সাজ পরে। আর-একবার করে শীতকালীন বাসভূমিতে। এই বৈশিষ্ট্য আর কোনও পাখির মধ্যে দেখা যায় না। এই জোড়-মিলনের সাজ প্রায় দু'মাস স্থায়ী হয়। ডিম কটি পাড়ে এবং কতদিনে ফোটে তা এখনও জানা যায় নি।

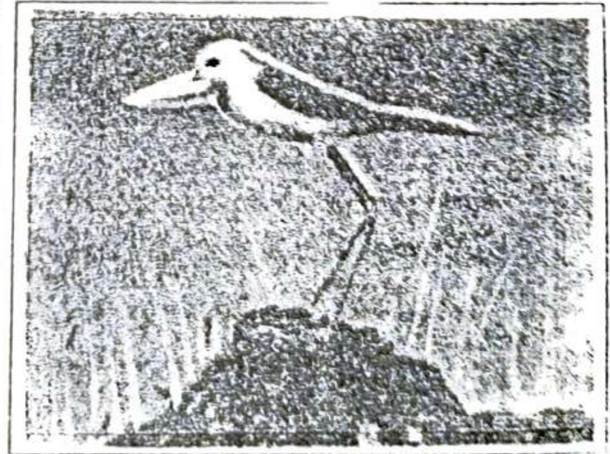
কৃষিকানী বংশ

সৈকত বর্গের অন্তর্গত কৃষিকানী বংশে (রেকারভি রোস্ট্রিদি) তিনটি গণ— ঋজু চঞ্চু (হিমানটোপাস), উল্টামুখী চঞ্চু (রেকারভিরোস্ট্রা) ও নিম্নমুখী চঞ্চু (ইবিডরহাইনচা)। পশ্চিবঙ্গের ঋজু চঞ্চু গণের পাখিদেরই দেখা যায়। উল্টামুখী চঞ্চু গণের পাখিদের মধ্যে একমাত্র কৃশিয়া চাহা-কে (অ্যাভোসেট) মাঝেমধ্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ফ্রেজারগঞ্জ এলাকাতেই দেখা গেছে। নিম্নমুখী চঞ্চু গণের পাখিদের মধ্যে পাগ্গা-কে (আইবিসবিল) কখনও-সখনও দেখা যায় উত্তরবঙ্গে।

ঋজু চঞ্চু গণের পাখিদের বৈশিষ্ট্য— লম্বা পা, জঙ্ঘাস্থি (টিবিয়া) গুলফ (টারসাস) খুবই লম্বা। জঙ্ঘাস্থির তিনভাগের উপর পালকহীন আর গুলফ সবটাই জালকাটা। পিছনে কোনো আঙুল নেই, বাইরের আঙুল মাঝেরটির সঙ্গে চওড়া ঝিল্লী দিয়ে যুক্ত, মাঝের থেকে ভিতরের আঙুলের ঝিল্লী সরু। চঞ্চু লম্বা, সোজা এবং সরু। নাকের ছ্যাঁদা উপরের চঞ্চুর প্রায় মাঝামাঝি খাঁজকাটা। এদের ডানা লম্বা, সূঁচলো এবং প্রথম সারির পালক সবচেয়ে বড়ো। লেজ ছোটো এবং সমান।

লাল ঠেঙ্গি (Black winged stilt)

এসপ্ল্যানেড থেকে বাসে ন্যাজাট বা শিয়ালদা থেকে ট্রেনে ক্যানিং-এ নেমে সুন্দরবন যাওয়া বেশ সময় সাপেক্ষ। আরও কি করে তাড়াতাড়ি পৌছান যায় তার হদিস করার জন্যে শিয়ালদাতে বি আর সিং হাসপাতালের সামনে থেকে বাসে শ্রী পীযূষ দাশগুপ্ত আর আমি 2 নভেম্বর 1981-র সকালে ঘটকপুকুরগামী বাসে উঠলাম। সেখান থেকে বাস বদলে মালঞ্চ হয়ে সরবেড়িয়া যাব। সরবেড়িয়ায় নেমে শেয়ারে সাইকেল- ভ্যানে চেপে ধামাখালি। তাও ছোটো কলাগাছিয়ার পাড়ে ঘাট পর্যন্ত ঐ ভ্যান যাবে না, এক কিলোমিটার পথ হাঁটতে হবে। ঘাটের ডানদিকে ওপারে ভাঙাতুষখালি, বাঁদিকে অপর পাড়ে সন্দেশখালি। ঘাটে পৌছবার চওড়া রাস্তা আছে কিন্তু গাড়ি চলার উপযুক্ত তখনও হয় নি।



চি 65 লাল ঠেঙ্গি

ঘটকপুকুরের বাসে তোপসিয়া, ধাপা পার হয়ে চলেছি। বাঁদিকে কলকাতার খাল যা বিদ্যাধরীতে

পড়েছে তার পাশ দিয়ে বাস চলছে। খালের ধারে ও উপরে উড়ছে নানারকমের পাখি। হঠাৎ বহুদিন পর এক জাতের পাখি দেখলাম বেশ কয়েকটা। জানলার পাশে বসা পীযূষকে দেখালাম। তাদের মধ্যে কেউ খালের জলে মাথা উঁচু করা ময়লা কাঠকুটোর গাদার উপর, কেউ জলের গা ঘেঁষে পাড়ে, কেউবা জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে, আবার কেউ উড়ছে লম্বা ঠ্যাং ল্যাগব্যাগ করতে করতে। বাস থেমেছে, যাত্রী ওঠানামা করছে। দূর থেকে দেখছি ওদের ডানা কালো, চঞ্চু কালো, পালকহীন জঙ্ঘা সমেত লম্বা ঠ্যাং লাল। ঠ্যাং— নয়ত যেন রণ-পা। বাকি দেহ সাদা।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম যা আগে করি নি। বিদ্যাধরীতে পড়ার জন্যে খালের জলে একটা টান আছে। অল্প জলে দাঁড়ান যে দু'চারটে হাঁটছে, তারা সরাসরি লম্বা ঠ্যাং তুলে সামনে জলের মধ্যে ফেলছে না। একটা ঠ্যাং জলের টানে পিছনে ভাসিয়ে দিয়ে উপরে তুলে এনে বড় করে সামনে জলের মধ্যে ফেলে, অন্য ঠ্যাংটাকে ঠিক সেইভাবে পিছনে ভাসিয়ে নিয়ে সামনে এনে জলে ফেলছে।

পাখিগুলো সৈকত বর্গের অন্তর্গত কৃষিকানী বংশের (রেকারভিরস্ট্রিদি) *এক প্রজাতি*। নাম— লাল ঠেঙ্গি, লাল গোরি (হিমানটোপাস হিমানটোপাস), ইংরেজি— *ব্ল্যাক উইংগড স্টিলট্*, হিন্দি— লাল পাও।

পুরুষের ডানা চকচকে ধাতব-কালো, বাকি উপর ও নিচের বেশিরভাগ পালক জ্বলজ্বলে সাদা। ছোট লেজ ধূসর-পাটকিলে, সূঁচলো ডানার তলাটা কালো। স্ত্রী-পাখির পুরুষের কালোর বদলে পাটকিলে। মাথা ও ঘাড়ের পিছনের জ্বলজ্বলে সাদাটা একটু নোংরা পাটকিলে-ধূসর। উভয়ের কনীনিকা উজ্জ্বল লাল, লম্বা চঞ্চু কালো, পা ও আঙুল টকটকে লাল, নখর কালো। পায়ে পিছনের আঙুলটা নেই। বাইরের প্রথম আঙুলটার সঙ্গে মাঝের আঙুলের গোড়ার কিছুটা জালপাদ কিন্তু মাঝের সঙ্গে ধারের আঙুলের জালপাদটা খুবই ছোটো।

বাসস্থান— প্রায় সমগ্র ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। কেরালা, আন্দামান ও নিকোবরে দেখা যায় না। মহীশূরে শীতের অতিথি। শ্রীলঙ্কায় *একটি উপজাতি* (হি হি সিলোনেনসিস)। জলের প্রাচুর্যের উপর নির্ভর করে ওদের বাসা বাঁধা ও থাকা। সেই কারণেই ভারতের মধ্যেই প্রয়োজনে এদিক থেকে ওদিকে যায়। আড্ডা গাড়ে লোনা ও মিষ্টি জলের বাসা, ঝিল, গাঁয়ের পুকুর, জলসেচের জলাধার, জলে ডোবা চষাখেত, উপহ্রদ প্রভৃতিতে। একদম সমুদ্র উপকূলে দেখা যায় না বললেই হয়। ভারতের বাইরে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, ডানিয়ুব নদীর মুখ, দক্ষিণ রাশিয়ার স্তেপভূমি, দক্ষিণ এশিয়ার পূর্ব থেকে চীন, দক্ষিণ আরব, মালয়েশিয়া, মিসর, সাহারার দক্ষিণ ও মালাগাসিতে। নিয়মিতাকারে পরিযায়ী হয় কিনা তার সঠিক তথ্য এখনও উদ্‌ঘাটিত হয় নি।

খাদ্য— কম্বোজ, কেঁচো, জোঁক, ক্রিমি প্রভৃতি জলজ পোকামাকড়, জলজ ঘাস ও বাদার আগাছার বীজ।

স্বভাব— লালঠেঙ্গি সঙ্ঘচারী। নিজেদের ছোটো-বড়ো দলে বিচরণ করে। সময়ে সময়ে একশ' বা তারও বেশি সংখ্যায় জমায়েত হয়। মাঝে মাঝে জৌরালি (গডউইট) ও অন্যান্য জলচারীদের সঙ্গেও মিলেমিশে চরতে দেখা যায়। বুক পর্যন্ত জলেও ঘোরাফেরা করতে অসুবিধে বোধ করে

না। রণ-পা মার্কা পা থাকার জন্যে অন্যান্য জলচারী পাখিদের নাগালের বাইরের খাদ্যও অতি সহজে সংগ্রহ করে। ডাকে সাধারণত উড়তে উড়তে তীক্ষ্ণ বাঁশীর সুরে 'কিপ কিপ'। উত্তেজিত হলে ডাকে কিচকিচ করে 'চেক-চেক-চেক'.খানিকটা জলমুরগি (ময়রহেন) ও হাট্টিমার (রেডওয়াটলড ল্যাপউইং) সুরে। এটা শোনা যায় তাদের আস্তানায় অপরিচিত বা অপছন্দের কারুর আগমন ঘটলে, তখন চক্কর দিয়ে উড়তে উড়তে ডাকে। ওড়াটা দুর্বল, ঘনঘন ডানা নাড়ে।

প্রজননকাল এপ্রিল থেকে আগস্ট। বাসা বাঁধে ঝিলের শুকনো পাড় বা জলের উপর ছোট ঢিবির মধ্যে অল্প খোঁদল করে, অথবা লবনাক্ত চেটাল জমিতে নুড়ি দিয়ে একটু উঁচু করে পাটাতনের মত বানিয়ে। জল থেকে নিয়ে আসা উদ্ভিজ্জ গাঁজলা, ঘাস বা ঐ জাতীয় কোন বস্তু দিয়ে লাইনিং দেয়। অনেক সময় বেশ বড় দলের কলোনি-বাসাও দেখা যায়। সাধারণত 4টি, কখনও বা 3টি, কচ্চিৎ 5টি হালকা মেটে রঙের উপর ছোট ছোট কালো ছোপের ডিম পাড়ে। স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই তা' দেয়। ঠিক কতদিনে ডিম ফোটে তা সঠিক জানা যায় নি। অনুমান করা হয় 25-26 দিনে। বাসার কাছে গেলে ঘোরতর আপত্তি জানায় ঘনঘন ডানা নাড়িয়ে এবং পাগলের মত লাফালাফি করে। কিন্তু তা' দেওয়ার সময় বেশ কাছে যেতে দেয়, তারপরেই হঠাৎ বাসা ছেড়ে ওড়ে এবং অনধিকার প্রবেশকারীর বেশ উপরে উঠে চিৎকার শুরু করে দেয়।

পড়েছে তার পাশ দিয়ে বাস চলছে। খালের ধারে ও উপরে উড়ছে নানারকমের পাখি। হঠাৎ বহুদিন পর এক জাতের পাখি দেখলাম বেশ কয়েকটা। জানলার পাশে বসা পীযূষকে দেখালাম। তাদের মধ্যে কেউ খালের জলে মাথা উঁচু করা ময়লা কাঠকুটোর গাদার উপর, কেউ জলের গা ঘেঁষে পাড়ে, কেউবা জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে, আবার কেউ উড়ছে লম্বা ঠ্যাং ল্যাগব্যাগ করতে করতে। বাস থেমেছে, যাত্রী ওঠানামা করছে। দূর থেকে দেখছি ওদের ডানা কালো, চঞ্চু কালো, পালকহীন জঙ্ঘা সমেত লম্বা ঠ্যাং লাল। ঠ্যাং নয়ত যেন রণ-পা। বাকি দেহ সাদা।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম যা আগে করি নি। বিদ্যাধরীতে পড়ার জন্যে খালের জলে একটা টান আছে। অল্প জলে দাঁড়ান যে দু'চারটে হাঁটছে, তারা সরাসরি লম্বা ঠ্যাং তুলে সামনে জলের মধ্যে ফেলছে না। একটা ঠ্যাং জলের টানে পিছনে ভাসিয়ে দিয়ে উপরে তুলে এনে বড় করে সামনে জলের মধ্যে ফেলে, অন্য ঠ্যাংটাকে ঠিক সেইভাবে পিছনে ভাসিয়ে নিয়ে সামনে এনে জলে ফেলছে।

পাখিগুলো সৈকত বর্গের অন্তর্গত কৃষিকানী বংশের (রেকারভিরস্ট্রিদি) *এক প্রজাতি। নাম*— *লাল ঠেঙ্গি*, লাল গোরি (হিমানটোপাস হিমানটোপাস), ইংরেজি— *ব্ল্যাক উইংগড্ স্টিলট্*, হিন্দি— *গজ পাওঁ।*

পুরুষের ডানা চকচকে ধাতব-কালো, বাকি উপর ও নিচের বেশিরভাগ পালক জ্বলজ্বলে সাদা। ছোট লেজ ধূসর-পাটকিলে, সূঁচলো ডানার তলাটা কালো। স্ত্রী-পাখির পুরুষের কালোর বদলে পাটকিলে। মাথা ও ঘাড়ের পিছনের জ্বলজ্বলে সাদাটা একটু নোংরা পাটকিলে-ধূসর। উভয়ের কনীনিকা উজ্জ্বল লাল, লম্বা চঞ্চু কালো, পা ও আঙুল টকটকে লাল, নখর কালো। পায়ে পিছনের আঙুলটা নেই। বাইরের প্রথম আঙুলটার সঙ্গে মাঝের আঙুলের গোড়ার কিছুটা জালপাদ কিন্তু মাঝের সঙ্গে ধারের আঙুলের জালপাদটা খুবই ছোটো।

বাসস্থান— প্রায় সমগ্র ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। কেরালা, আন্দামান ও নিকোবরে দেখা যায় না। মহীশূরে শীতের অতিথি। শ্রীলঙ্কায় *একটি উপজাতি* (হি হি সিলোনেনসিস)। জলের প্রাচুর্যের উপর নির্ভর করে ওদের বাসা বাঁধা ও থাকা। সেই কারণেই ভারতের মধ্যেই প্রয়োজনে এদিক থেকে ওদিকে যায়। আড্ডা গাড়ে লোনা ও মিষ্টি জলের বাসা, ঝিল, গাঁয়ের পুকুর, জলসেচের জলাধার, জলে ডোবা চষাখেত, উপহ্রদ প্রভৃতিতে। একদম সমুদ্র উপকূলে দেখা যায় না বললেই হয়। ভারতের বাইরে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, ডানিয়ুব নদীর মুখ, দক্ষিণ রাশিয়ার স্তেপভূমি, দক্ষিণ এশিয়ার পূর্ব থেকে চীন, দক্ষিণ আরব, মালয়েশিয়া, মিসর, সাহারার দক্ষিণ ও মালাগাসিতে। বিস্তাকারে পরিযায়ী হয় কিনা তার সঠিক তথ্য এখনও উদ্‌ঘাটিত হয় নি।

খাদ্য— কম্বোজ, কেঁচো, জোঁক, ক্রিমি প্রভৃতি জলজ পোকামাকড়, জলজ ঘাস ও বাদার আগাছার বীজ।

স্বভাব— লালঠেঙ্গি সঙ্ঘচারী। নিজেদের ছোটো-বড়ো দলে বিচরণ করে। সময়ে সময়ে একশ' বা তারও বেশি সংখ্যায় জমায়েত হয়। মাঝে মাঝে জৌরালি (গডউইট) ও অন্যান্য জলচারীদের সঙ্গেও মিলেমিশে চরতে দেখা যায়। বুক পর্যন্ত জলেও ঘোরাফেরা করতে অসুবিধে বোধ করে

না। রণ-পা মার্কা পা থাকার জন্যে অন্যান্য জলচারী পাখিদের নাগালের বাইরের খাদ্যও অতি সহজে সংগ্রহ করে। ডাকে সাধারণত উড়তে উড়তে তীক্ষ্ণ বাঁশীর সুরে 'কিপ কিপ'। উত্তেজিত হলে ডাকে কিচকিচ করে 'চেক-চেক-চেক', খানিকটা জলমুরগি (মুরহেন) ও হাট্টিমার (রেডওয়াটলড ল্যাপউইং) সুরে। এটা শোনা যায় তাদের আস্তানায় অপরিচিত বা অপছন্দের কারুর আগমন ঘটলে, তখন চক্কর দিয়ে উড়তে উড়তে ডাকে। ওড়াটা দুর্বল, ঘনঘন ডানা নাড়ে।

প্রজননকাল এপ্রিল থেকে আগস্ট। বাসা বাঁধে ঝিলের শুকনো পাড় বা জলের উপর ছোট ঢিবির মধ্যে অল্প খোঁদল করে, অথবা লবনাক্ত চেটাল জমিতে নুড়ি দিয়ে একটু উঁচু করে পাটাতনের মত বানিয়ে। জল থেকে নিয়ে আসা উদ্ভিজ্জ গাঁজলা, ঘাস বা ঐ জাতীয় কোন বস্তু দিয়ে লাইনিং দেয়। অনেক সময় বেশ বড় দলের কলোনি-বাসাও দেখা যায়। সাধারণত 4টি, কখনও বা 3টি, কচ্চিৎ 5টি হালকা মেটে রঙের উপর ছোট ছোট কালো ছোপের ডিম পাড়ে। স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই তা' দেয়। ঠিক কতদিনে ডিম ফোটে তা সঠিক জানা যায় নি। অনুমান করা হয় 25-26 দিনে। বাসার কাছে গেলে ঘোরতর আপত্তি জানায় ঘনঘন ডানা নাড়িয়ে এবং পাগলের মত লাফালাফি করে। কিন্তু তা' দেওয়ার সময় বেশ কাছে যেতে দেয়, তারপরেই হঠাৎ বাসা ছেড়ে ওড়ে এবং অনধিকার প্রবেশকারীর বেশ উপরে উঠে চিৎকার শুরু করে দেয়।

কুনাল বংশ

সৈকত বর্গের অন্তর্গত কুনাল বংশে (রস্ট্রাট্যুলিদি) একটিমাত্র প্রজাতিকেই ভারতে দেখা যায়। এদের চঞ্চু সরু ও লম্বা কিন্তু গোভণ্ডীর গণের (ক্যাপেল্লা) পাখিদের চেয়ে ছোটো, ডগাটা সামান্য ফোলা ও নিচের দিকে বাঁকানো এবং দুই চঞ্চুর গোড়ায় খাঁজ কাটা। উপরের চঞ্চুর গোড়ায় নাসারন্ধ্র, পুচ্ছ যা গোড়ালি মাঝারি আকারের এবং শক্ত-সমর্থ। জঙ্ঘাস্থি কিছুটা উন্মুক্ত, আঙুল লম্বাটে, ডানা ছোটো ও চওড়া এবং কিছুটা শিথিল। লেজে 14 টি পালক। স্ত্রী-পাখি আকারে বড়ো এবং পুরুষের চেয়ে রঙের ঔজ্জ্বল্য বেশি।

কুনাল পাখি (Greater Painted-snipe)

কাদাখোঁচা বা স্নাইপ শিকারে আনন্দ আছে। কারণ তাদের গুলি করে মারা একটু শক্ত। লোকের স্নাইপের মাংস সম্বন্ধে একটা আহামরি ভাব আছে। এটা ইংরেজদের কাছ থেকেই পেয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি খেতে এমন কিছু নয়। স্নাইপ খেয়েছি এই বলাতেই যেন একটা আত্মপ্রসাদ লাভ।

মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ। আর ক'দিন বাদে আইনানুযায়ী গুলি ছোঁড়া বন্ধ হয়ে যাবে। বিকেলের দিকে বাদায় গিয়েছি। পশ্চিমে সূর্য অস্ত যাবার মুখে। তার রক্তিম আলোর ছটা দিগন্তব্যাপী জলের উপর পড়েছে। কয়েক জায়গার জল বেশ শুকিয়েছে। নলখাগড়া ও বড়ো ঘাসের তলা থেকে পলিকাদা খানিকটা এগিয়ে এসেছে জলের ধার পর্যন্ত। চারদিকে দেখতে দেখতে চলেছি। হঠাৎ সামনেই একটা ঝোপ থেকে গুঁড়ি মেরে চিত্র-বিচিত্র এক পাখি ঘাস বনের তলা থেকে বেরিয়ে কাদার উপর এল। আমাদের উপস্থিতি বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল। চালচলন এবং সরু চঞ্চু একটু ছোটো হলেও কাদাখোঁচার মতো দেখতে।



চি 66. কুনাল পাখি

আলের উপর স্থির হয়ে বসে পড়লাম। কয়েক মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে এল, যাকে দেখেছিলাম সে-ই। দু-এক মিনিট বাদে-বাদেই পর পর একটি করে বেরিয়ে এল গোটা দশেক। তার মধ্যে গোটা ছয়েকের গায়ে রঙের জেল্লা নেই।

পাখিগুলোকে দেখেই চিনলাম, আগে দেখা না থাকলেও। এদের ছবি অনেক দেখেছি। কাদাখোঁচার সগোত্রীয় হলেও বংশ মর্যাদায় ভিন্ন।

কুনাল বংশে (রসট্রাট্যুলিদি) একটিমাত্র *প্রজাতি* (রস্ট্রাট্যুলা বেংঘলেনসিস)। কুনাল পাখির কথা সংস্কৃত সাহিত্যে পাই। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও লিখেছেন 'কুনাল পাখির সুনীল পাখায়'। পক্ষিতত্ত্বের বইতে বাংলা নাম— 'বাগ্গার্জি'। আমার খুবই অপছন্দের নাম। হিন্দি— *রাজচাহা*, ইংরেজি— *পেইন্টেড স্নাইপ*।

প্রাণিজগতে সাধারণত পুরুষরা দেখতে সুন্দর এবং আকারে বড়ো হয়। কিছু ব্যতিক্রমও আছে। কুনাল পাখি এই ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে।

স্ত্রী-কুনাল লম্বায় 28 সেমি (11 ইঞ্চি)। পুরুষ 25 সেমি (10 ইঞ্চি)। স্ত্রী-পাখির উপরের পালক ধাতব জলপাই-সবুজের উপর লালচে-হলুদ এবং তাতে কালচে টান ও ছোপ। বড় জ্বলজ্বলে চোখকে ঘিরে চশমার মত মাথার মাঝখান দিয়ে চওড়া সাদা পটি, সেটি কাজলটানার মতো একটা সাদা টানে চোখ ছাড়িয়ে পৌঁছেছে ঘাড়ে। ঘাড়ের উপর দিয়ে সেই সাদা পটিই বাদামী, চিবুক, গলা ও উপরের বুককে ঘিরে রেখেছে মনে হয়। যেন ব্রুকস্যাকের পটি। সাদা পটির তলায় বুকের নিম্নাংশ কালচে, তারপরে সাদা।

পুরুষের এত ঔজ্জ্বল্য নেই। বুকেও বাদামী ও কালো রঙ নেই। চিবুক ঘাড়ের দু-পাশ গলা ও বুকে পাটকিলের উপর সাদা ছিট, বুকের শেষে ধারটা কালচে, তারপর সাদা পটি। কনীনিকা পাটকিলে, পাটকিলে সরু চঞ্চুর গোড়টা সবজেটে এবং ডগা বাঁকান কাদাখোঁচার মত। পা এবং আঙুল হলদেটে।

বাসস্থান— সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, হিমালয়ের 1800 মিটার উচ্চতার মধ্যে এবং শ্রীলঙ্কায়। নেপাল ও আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এখনও দেখা যায় নি। ভারতের বাইরে আফ্রিকা থেকে জাভা এবং ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ।

খাদ্য— কবচী, পোকামাকড়, ঘাস-আগাছার ডগা, ধান ইত্যাদি।

স্বভাব— বড় মুখ বোতলের মধ্যে ফুঁ দিলে যেমন আওয়াজ হয়, তেমনি লম্বা টানের ঘন ঘন 'উ-উক' ডাক ডাকে। বাদার জলের 3-4 মিটার উপরে ওঠার পরেও ডাকে। পুরুষ একটা 'কিচ' আওয়াজ করে। মনে হয় স্ত্রীর ডাকের জবাব দেয়।

যেদিনের কথা বলছি সেদিন কোনকিছু মারতে হাত ওঠে নি। পরে এদের বাসা খুঁজে আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করেছি এবং সম্যকজ্ঞানের জন্যে মেরেওছি। তবে মাংস অখাদ্য। দিনের বেলার চেয়ে সাধারণত প্রত্যূষে, সন্ধ্যায় এবং রাতে বেশি চলাফেরা করে। আড়াল থেকে দিনে সহজে বেরতে চায় না। ওড়ার গতি ধীর। ওড়ার সময় ঠ্যাং দুটো বেশ খানিকক্ষণ ঝুলতে থাকে, তারপরে ঠ্যাংকে সোজা করে লেজের সঙ্গে ঠেকিয়ে দেয়, লেজ ছাড়িয়ে তা বেরিয়ে থাকে। মাটিতে দৌড়য় বেশ দ্রুত।

দৌড়ে ঝোপের ভিতর লুকোয়। খাবার সময় লেজটা নাড়ায়। গুলি খাওয়া আহত পাখিকে ধরা পড়ার ভয়ে খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সাঁতার কাটতে দেখেছি।

স্ত্রী-কুনাল মাত্রই মুখ্য ভূমিকা নিয়ে বাছবিচারহীন পুরুষ-সঙ্গ করে থাকে। এর জন্যে অপর স্ত্রী-পাখির সঙ্গে সমানে লড়াই চালিয়ে যায়। একজনকে করায়ত্ত করে ডিম পেড়েই ডিম ফোটাবার

তার পুরুষকে দিয়ে সে খুঁজতে থাকে অপর কোনো পুরুষকে। প্রজননকাল ভারতে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে হলেও অন্য সময়ও ডিম পেড়ে থাকে। ঘাসের চাপড়ার মাঝখানটা অল্প খোঁদল করে পুরুষই বাসা বানায় জলার বা বাঁধের ধারে। সাধারণত 4টি, কখনও 3টি ডিম পাড়ে হলুদের উপর কালচে পাটকিলের ছোপের। কতদিনে ফোটে তা এখনও জানা যায় নি।

পানবিক বংশ

সৈকত বর্গের অন্তর্গত পানবিক বংশে (বুরহিনিদি) দুটি গণ— পানবিক (বুরহিনাস) ও উচ্চশির (এসাক্যাস)। এই বংশের পাখিদের মাথা খুব বড়ো, বড়ো হলদে চোখ পেঁচার মতো, লম্বা পা এবং হাঁটুর জোড়ও বেশ বড়ো।' শক্ত-সমর্থ পায়ে পিছনের আঙুল না থাকাতে বোঝা যায় এরা বেশ দৌড়বাজ। এরা নিশাচর। সন্ধ্যা ও রাত্রিশেষের পাখি।

পানবিক গণের পাখিদের মাথার চেয়ে চঞ্চু ছোটো, মোটা-সোটা, সোজা এবং গোড়া উচ্চতার চেয়ে চওড়ায় বেশি। নাকের ছ্যাঁদা লম্বাটে, কপাল উঁচু, চোখ খুব বড়ো, ডানা লম্বা এবং সূঁচলো। ডানায় দ্বিতীয় সারির পালক সবচেয়ে বড়ো। লেজ 12টি, পিছনে আঙুল নেই, মাঝের আঙুলের নখর চওড়া।

দীর্ঘশির গণের পাখিদের চঞ্চু পানবিকের চেয়ে অনেক বড়ো এবং মাঝের আঙুলও খুব বড়ো আর নখরহীন। বাকি সব পানবিক-এর মতন।

শিলাবাটান (Eurasian Thick-knee)

উত্তর বিহারের পুসাতেই আমি একটি নতুন পাখিকে প্রথম দেখেছিলাম। আর সেটা সম্ভব হয়েছিল আমাদের কাজের লোক রমজানের দৌলতে। প্রকৃতির মাঝে থাকার এবং চোখ মেলে দেখার শিক্ষাটা ওর জন্মগত। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি এই দুই'য়েরই অধিকারী ছিল সে। আমার সঙ্গে বনেবাদাড়ে ঘুরতে পেলে সে আর কিছুই চাইত না।

একদিন রমজানকে বললাম, আজ হাটবার গেছে, আগামীকাল বাজারের ঝামেলা নেই তাই খুব ভোরে বার হব বুড়ি-গণ্ডকের ধার ধরে উত্তর-পশ্চিমের দিকে। নিঃশব্দে একগাল হেসে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

পরদিন ঘুম ভাঙ্গলো চা নিয়ে এসে। ও নিজে রেডি। আমি হাতঘড়িতে দেখি রাত চারটে। আকাশে তারা, চাঁদ এখনও ডোবে নি। শেষ রাতের ঘুম ভাঙ্গানোর জন্য বিরক্তি প্রকাশ করি। রমজান বলে— চিড়িয়া জানবার আর দেখার এই এক সময়, আরেক সাঁজবেলায়। বক্তব্য অস্বীকার করতে পারি না। বিছানার মাদকতাময় আশ্রয় থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে মিনিট কুড়ির মধ্যে তৈরি হলাম।

মার্চ মাসের মাঝামাঝি। শীতের আমেজ তখনও বেশ। নিঃশব্দে চলেছি দু'জনে। পথ ছেড়ে



চি 67. শিলাবাটান

নেমে এসেছি নদীর ধারে। পাথুরে জমি। নিচু নিচু ঝোপঝাড় অসংখ্য। কয়েকটা বুনো শুয়োর দেশলার লাইন ধরে চলে গেল রাস্তার দিকে। পুবের আকাশে লালের আভা জাগছে। দূরে বনমোরগ ডাকছে। হঠাৎ রমজান হাত দিয়ে টেনে আমায় থামিয়ে দিল। দেখি ডানদিকে সামনের ঝোপের পাশ থেকে একটা পাখি ঝোপের তলা থেকে উড়ে গিয়ে নামল আর-একটা ঝোপের কাছে। নেমেই দৌড়ে ঢুকে গেল ঝোপের মধ্যে। ওড়াটা হট্টিমা বা টিট্টিভদের (ল্যাপউইং) মতো। আস্তে আস্তে এ ঝোপ-সে ঝোপ খুঁজি। হঠাৎ পায়ের কাছ থেকে একটা পাখি খানিকটা উড়ে গিয়ে নামল। নেমেই দৌড় দিল হুকনাদের (বাস্টার্ড) মতো। ওটা যে এত কাছে ছিল তা টেরই পাই নি। যেখানে নেমেছিল সেই দিকেই চললাম। একটু গিয়েই দেখি এক-থাবড়া শুকনো গোবর পড়ে আছে। রমজান আমায় একটু টিপে স্থির হয়ে দাঁড়াতে বলে সে নিজে খুব ধীরে পিছু হঠে চলে গেল। খানিকবাদে দেখি সে বেশ খানিকটা ঘুরে গোবরের তালের মতো শুয়ে থেকে পাখিটার পিছন দিক দিয়ে আসছে, মাটিতে শুয়ে-পড়ে ঘেঁষটে ঘেঁষটে। পাখিটা গোলগোল খুব বড় চোখে আমায় দেখছে। এতবড় চোখ কোনো পাখির দেখি নি। মাটিতে শুয়ে আছে গলাটা বাড়িয়ে। যেন প্রাণহীন একটা গোবরের তাল। চোখের পাতা পড়ছে না। কেমন যেন অপার্থিব। রমজান ঝোপের আড়ালে আড়ালে বুকে হেঁটে হাত পাঁচেকের মধ্যে এসে গেছে। আর হাত দুই-তিন বাকি আছে। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে পাখিটাকে ধরে ফেলল।

আমার কাছে নিয়ে এসে বলল, এর নাম 'কারবানক'। যতটা পারি পাখিটার চেহারা নোটবুকে লিখলাম। পরে বইপত্তর ঘেঁটে জেনেছিলাম সৈকত বর্গের (চারাড্রিইফরমেস) অন্তর্গত পানবিক (বুরহিনিদি) বংশের এক প্রজাতি। নাম— ছোটো শিলাবাটান, খরমা (বুরহিন্যাস ওয়েডিকনেম্যাস), ইংরেজি— *স্টোন কারলিউ,* হিন্দি— *কারবানক, বড়শিরি।*

লম্বায় 41 সেমি (16 ইঞ্চি)। উপরের অংশ ছাই-পাটকিলে থেকে বালি লালচে-হলুদ, প্রতিটি পালকের ধার লালচে-পাটকিলে, তার উপর কালো কালো টান, তার ভিতরে সাদা ছোপ। চোখের উপর দিয়ে কালো টান, তার উপরে ও নিচে হলদেটে টান। ডানার পাশ পাটকিলে, তার উপর সাদা-কালো পটি। লেজ ছাই-পাটকিলে, মাঝখানের দু'চারটে পালক ছাড়া বাকি পালকের ডগাটা কালচে, তার উপর সাদা পটি। তলার অংশ সাদা, গলার উপর ও লেজের তলায় একটা ফিকে লালচে-হলুদের ছোপ। বুকের উপর গাঢ় পাটকিলের ছিট। পায়ের হাঁটুটা মোটা। বড় ড্যাবডেবে গোল চোখের কনীনিকা ও পাতা হলুদ। চঞ্চুর গোড়া হলুদ, ডগা কালো। পা ও আঙুল

সবজেটে-হলুদ। তিনটি আঙ্গুল, পিছনের আঙ্গুলটা নেই, সেইজন্য দৌড়তে পারে ভাল। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান— সমগ্র ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল। পাহাড়ে জায়গায় এক হাজার মিঃ উচ্চতার মধ্যে। শ্রীলঙ্কার নিচু জায়গায় শুষ্ক অঞ্চলে। ভারতের বাইরে বর্মা, দক্ষিণ-পশ্চিম ও মধ্য থাইদেশ ও কম্বোজ।

খাদ্য— কীটপতঙ্গ, কেঁচো-কৃমি, গুগলি-শামুক, ছোট সরীসৃপ, কিছু বীজ ও বালি-কাঁকড়ের শক্ত কণিকা।

স্বভাব— ডাকে খুব জোরে তীক্ষ্ণস্বরে— 'পিক-পিক-পিক-পিক'। শেষ করে 'পিক-উইক, পিক-উইক' বলে। 'উইক'টা একটু গলা নামিয়ে। ডাকটা শোনা যায় প্রত্যূষে আর সায়াহ্নে। মাঝে মাঝে চাঁদনি রাতে ডাকে সারারাত ধরে।

শিলাবাটান ঘাড়-গলা গুঁজে জোরে দৌড়য়। ওড়েও বেশ দ্রুত, মনে পড়িয়ে দেয় হাট্টিমা বা হুকনাদের কথা। জঙ্গলের রাস্তায় হঠাৎ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে মোটর গাড়ির আগে হেডলাইটের আলোর মধ্যে একবার দৌড়য়, একবার ওড়ে। ওড়ার সময় ডানার ডগা খুব কাঁপাতে থাকে, তখন সাদা দাগটা খুব প্রকট হয়ে ওঠে।

প্রজননকাল— ফেব্রুয়ারি থেকে আগস্ট, তবে মার্চ-এপ্রিলেই বেশি। বাসা বানায় পাথুরে জমির মাটিতে অল্প খোঁদল করে ঝোপের তলায়, শুকনো নদীর চরে, আমবাগানে কিংবা পরিত্যক্ত জমিতে মাটির ছোট ঢেলা ও নুড়ি দিয়ে। ডিম পাড়ে সাধারণত 2টি, কখনও 3টি ফিকে পাথুরে বা লালচে-হলুদ, তার উপর কালচে পাটকিলে, কখনওবা বেগুনি বা লালচে-হলুদ, তার পাশে ধূসরের ছোপ ও ছিট থাকে। স্ত্রী-পুরুষ ডিমে তা' দিলেও স্ত্রী-পাখি দেয় বেশি। দুজনেই সন্তান প্রতিপালন করে।

বড়ো শিলাবাটান (Great Thick-knee) maybe

এদের বড় ভাইকে দেখেছি সুন্দরবনে খাঁড়ির মুখে। বর্গ ও বংশ এক, শুধু গণ আলাদা— দীর্ঘস্বর (এসকাস), নাম— বড়ো শিলাবাটান, গঙ্গা তিতাই (এসাক্যাস ম্যানিরসট্রিস), ইংরেজি— গ্রেট স্টোন প্লোভার, হিন্দি— *বড় কারবানক।*

লম্বায় 51 সেমি। লম্বা ঠ্যাং, মোটা মাথা, মোটা চঞ্চু উপর দিকে একটু বাঁকানো, তলার চঞ্চু চওড়া ইংরেজি "v"-এর মত। মোটামুটি উপরটা ধূসরাভ-বালি, নিচটা সাদা। চঞ্চুর ডগা কালো, গোড়া সবুজাভ-হলুদ। ড্যাবডেবে বড় গোল চোখ, চারপাশে চশমার মত গোল সাদা পট্টি, তার উপরে ও নিচে কালো টান। কনীনিকা লেবু-হলুদ। পা ও আঙ্গুল সবুজাভ-ধূসর। নখ কালো। ডানা বন্ধ অবস্থায় ঘাড়ের কাছে কালচে পটি। ওড়ে যখন দূর থেকে মনে হয় হাঁস উড়ছে। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান— ছোটর মতই তবে বড় পাথুরে নদীর বুকে বা তার ধারেকাছে পাথুরে জমিতে এবং পর্ণমোচীগাছেদের আশেপাশে খরা জায়গায়। মাঝে মাঝে সমুদ্রের বেলাভূমি, জোয়ার-ভাঁটা খেলা খাঁড়ি এবং নদীর ধারে লবণাক্ত কাদার উপরে দেখা যায়। ভারতের বাইরে বর্মা, মধ্য ভিয়েতনাম এবং হাইনান দ্বীপ।

খাদ্য— প্রধানত কাঁকড়া, ব্যাঙ, কম্বোজ, কীটপতঙ্গ এবং বাসস্থানের আশেপাশে ছোট প্রাণীবিশেষ। ছোট পাখির ডিম আস্ত গিলে খেতে দেখা গেছে।

স্বভাব— ছোটোর মতো ডাকে— কান্নার সুরে 'ক্রি-ক্রি-ক্রি-ক্রে-ক্রে-ক্রে'।

প্রজননকাল— ফেব্রুয়ারি থেকে জুন, তবে এপ্রিলের মধ্যেই বেশি। ডিম পাড়ে নদীর চরে উন্মুক্ত স্থানে একটু খোঁদল করে। কখনও কখনও চ্যাটালো পাথরের উপরের পাড়ে। ডিম পাড়ে দুটি, ঠিক ছোটোর মত রঙ ও আকার। স্ত্রী-পুরুষের দু'জনেই ডিমে তা' দেয় ও সন্তান প্রতিপালন করে। কতদিনে ডিম ফোটে তা এখনও জানা যায় নি।

সৈকত বংশ

সৈকত বর্গের অন্তর্গত সৈকত বংশে (গ্নারিওলিদি) 2টি গণ— ধাবনকারী (কারসরিয়াস) ও জ্বলন্ত দৃষ্টি (গ্লারিওলা)।

ধাবনকারী গণের পাখিদের চঞ্চু লম্বা, পাতলা এবং অল্প বাঁকা। গুলফ্ ও জুঙ্ঘাস্থি উন্মুক্ত, সরু এবং তাদের সামনে ও পিছনে বর্ম। পিছনে কোনো আঙুল নেই, সামনের অর্থাৎ প্রথম আঙুল ছোটো, মাঝের আঙুল পরেরটার চেয়ে বড়ো, নখর অল্প চওড়া এবং শেষের আঙুলের চেয়ে অল্প বাঁকানো। ডানা লম্বা ও সূঁচলো। লেজ ছোটো এবং প্রায় সমান।

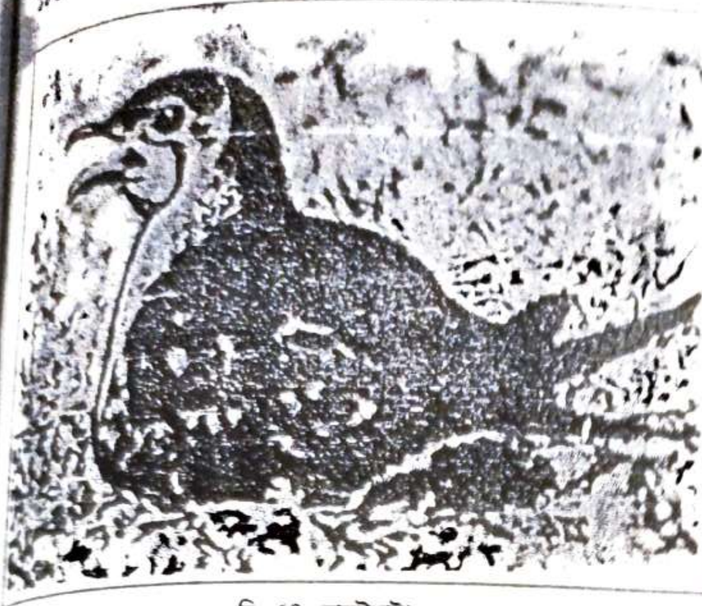
জ্বলন্ত-দৃষ্টি গণের পাখিদের চঞ্চু ছোটো, গোড়াটা চওড়া, উপরের চঞ্চু বাঁকা, মুখের হাঁ বেশ বড়ো। ডানা লম্বা ও সরু, প্রথম পালকটি সবচেয়ে বড়ো। ডানা বন্ধ করলে পালক হয় লেজকে ছোঁয় না হয় লেজকে ছাড়িয়ে যায়। গুলফ্ ছোটো, সামনে ও পিছনে অ্যাঁকিবুকি কাটা। পিছনের পা বেশ বড়ো, অন্যান্য আঙুল ছোটো, বাইরের ও মাঝের আঙুল ঝিল্লী দিয়ে জোড়া, শেষেরটি আকারে ছোটো। নখর বড়ো।

বাবুইবাটান (Small Pratincole)

গত দু'বছর ধরে যতবার সুন্দরবনে গিয়েছি ততবারই যত্রতত্র নদীর ধারে বা খাঁড়ির মুখে একটি পাখিকে দেখেছি, কখনও একা, কখন জোড়ায়, কখনওবা শত শত। ওদের বড়ো ও ছোটো দু'জাতকেই দেখেছি। তবে সুন্দরবনে ছোটোকেই বেশি দেখে থাকি। মাথার উপর উড়ছে। তলাটা সাদাটে, কালো সরু ডানা, পালকের শেষ সাদাটে, চৌকো সাদা লেজের ডগাটা কালো। মনে হয় বুঝিবা বাতাসী (হাউস সুইফটস্)।

বড়োকেও দেখেছি তবে খুব কম। আসামে কাজিরাঙ্গার কাছে সুবনসিরি নদীর পাড়ে দেখেছি শত শতর ঝাঁকে। কেউ নদীর পাড়েতে বসে, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ উড়ে উড়ে উড়ন্ত পোকা ধরছে।

যাঁরা পাখি সম্বন্ধে জানার জন্যে উৎসুক, তাঁরাও অনেক সময় ঠিক চিনতে পারেন না। মনে করেন পাখিটা হয় দণ্ডচারী বর্গের (পাসসেরিফরমেস) অন্তর্গত ভাণ্ডিক বংশের (হিরানডিদি), না হয় অপাদ বংশের (আপোডিদি) কোনো *প্রজাতি*। ভাণ্ডিক বংশের পাখি টেলিগ্রাফের তার, গাছের ডাল আঁকড়ে বসে এবং মাটিতেও নামে। কিন্তু মাটিতে বিচরণটা স্বচ্ছন্দের নয়। অপাদ বংশের কোন *প্রজাতিই* মাটিতে বা গাছের ডাল আঁকড়ে বসতে পারে না। উড়ন্ত অবস্থায় আমার দেখা এই পাখিদের ভাণ্ডিক বা অপাদের



চি 68. বাবুইবাটান

কোনো প্রজাতির সঙ্গে তফাত ধরা খুবই কষ্টকর। বেলা পড়ে এলে আলাদাভাবে মাঝে চামচিকে বলে মনে হতে পারে।

*যে ছোটো প্রজাতির পাখিকে বর্ষাকালে সুন্দরবনে যত্রতত্র নদীর ধারে দেখি, যাকে দেখতাম আগে লবণ হ্রদে, তার নাম— ছোটো বাবুইবাটান (গ্ল্যারিওলা লাকটিয়া), ইংরেজি— স্মল ইন্ডিয়ান প্র্যাটিনকোল, স্মল সোয়ালো-প্লোভার। সৈকত বর্গে (চারাড্রিইফরমেস) সৈকত বংশের (গ্ল্যারিওলিডি) অন্তর্গত সৈকত গণের (গ্ল্যারিওলা) এক প্রজাতি।

ছোটো বাবুইবাটান চড়ুইয়ের চেয়ে একটু বড়, লম্বায় 17 সেমি। উপরটা ফিকে বালি-ধূসর। কপাল পাটকিলে, চোখের কোণ থেকে কালো দাগ চঞ্চু পর্যন্ত। লেজের আচ্ছাদক ও গোড়াটা সাদা, ওড়ার পালক কালো। নিচের অংশে ধূসর-পাটকিলের উপর লালচে আভা, বুকের তলা থেকে সাদা, কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে। চঞ্চু কালো, গোড়া লাল, মুখের ভিতরটা হলুদ, পা ও আঙ্গুল কালো, একটু সীসের আভা। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান— পাকিস্তানের সিন্ধু নদ থেকে পুবে কাশ্মীর, সমগ্র ভারত, 750 মি. উচ্চতার মধ্যে নেপাল, আসাম, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার শুষ্ক সমতলভূমি। দেখা যায় ধীরে বহা নদীর তীর, বড় ঝিল ও খাঁড়ির মুখে জলায়।

খাদ্য— প্রধানত উড়ন্ত কীটপতঙ্গ।

স্বভাব— ডাকে নানারকম। একটি ডাক, যেটি বেশি ডাকে তার সঙ্গে ঘরের টিকটিকির সাদৃশ্য আছে, 'টাক টাক টাক'। যেখানে কলোনি করে বাসা বাঁধে সেখানে কোন কারণে উত্তেজিত হলে উড়তে উড়তে ডাকে—'তিরিরিট-তিরিরিট-তিরিরিট'। স্বভাবে সঙ্ঘচারী। জলের ধারটাই পছন্দ করে বেশি। বড় দীঘি, ঝিল বা নদীর তীরে ঝাঁকে ঝাঁকে দেখা যায়। দিন- দুপুরের চেয়ে সকাল এবং সন্ধ্যার আগেই নজরে পড়ে বেশি। অন্ধকার নেমে এলেও দেখা যায় উড়ন্ত মশামাছি ধরে বেড়াচ্ছে। ওড়াটা তখন চামচিকের মত। কখন বাঁয়ে, কখন ডাইনে, কখন উঠে গেল সোজা উপরে, তারপর এঁকেবেঁকে নেমে এল নদীর তীরের বালি বা ভাঁটায় সরে যাওয়া কাদার উপর, কিন্তু ঝাঁক বেঁধে নয়, এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। তখন কেউ স্থির হয়ে দাঁড়ায়। কেউ পা ফেলে হাঁটে। হঠাৎ টিট্টিভদের (প্লোভারস) কায়দায় শূন্যে নিজেদের উৎক্ষেপ করে খাদ্যের পিছনে ধাওয়া করতে থাকে, ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এঁকেবেঁকে, কখনও একটু থমকে, পরমুহূর্তে দমকা বেগে উড়তে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় বাতাসী, চামচিকে বা কীটভোজী পাখিদের সঙ্গে একযোগে উড়তে, তখনই আলাদা করে চিনে নেওয়া শক্ত হয়ে পড়ে।

প্রজননকাল— ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল, শ্রীলঙ্কায় মার্চ-এপ্রিল। বন্যায় প্রথম পাড়া ডিম ভাসিয়ে

নিয়ে গেলে আবার ডিম পাড়তে দেখা গেছে জুনে। পর পর পাশাপাশি বেশ কয়েক কুড়ি কলোনি-বাসা বানায় নদীর ধারে, বালির উপর পা দিয়ে আঁচড়ে একটু খোঁদল করে, সেই বাসাগুলো কখনও দেখা যায় একদম নদীর কিনারায়। অনেক সময় আশপাশে পানপায়রা (টার্ন) ও গাংচষাদের (স্কিমার) বাসাও দেখা যায়। বালির উপরেই ডিম পাড়ে সাধারণত 2টি, ক্বচিৎ 3টি, (আসামে 4টি) বালি-রঙা তার উপর পাটকিলের ছিট ও ছোপ। ডিম ও সদ্য প্রসূত ছানা বালির সঙ্গে এমন মিশিয়ে যায় যে ধরা যায় না। ঘরগেরস্থালীর সব কাজ স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই করে। ডিমে তা' দেওয়া পাখিদের একটা অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্যপথে পড়ে। ওদের কলোনিতে কোন অবাঞ্ছিতের প্রবেশ ঘটলে, তাকে উপর থেকে গোঁৎ খেয়ে ছোঁ মারে, তারপর মাটিতে পড়ে দুই ডানা ঝাপটাতে থাকে, এমন করে যে, মনে হবে ডিমে তা' দিতে বা ছানাদের আগলে রেখে বসছে। অবাঞ্ছিতটি যদি আরও একটু এগিয়ে আসে, তখন তারা সয়ত্নে থাকে, এমন ভাবে যেন একটা ডানা ভেঙ্গে গেছে, তাই আরেকটা ডানা বালির উপর ঝাপটিয়ে একটু সরে বাসায় ডিমে তা' দেবার জন্যে যাচ্ছে। আরও এগুলে জলের ধার থেকে উপরে উড়ে যায় অন্যান্য সঙ্গীদের কাছে।

বড়ো বাবুইবাটান (Oriental Pratincole)

বড়ো বাবুইবাটান (গ্লারিওলা প্রাটিনকোলা মালডিভারাম), ইংরেজি— *লার্জ সোয়ালো-প্লোভার,* লম্বায় 24 সেমি (সাড়ে 9 ইঞ্চি)। প্রায় রোগাটে শালিকের মতো। মাথা ও পিঠ জলপাই-পাটকিলে, চোখের নিচ দিয়ে একটা কালো লাইন গলায় মালার মত ঘুরে গেছে। লেজের উপরের আচ্ছাদক সাদা, কালো লেজ অল্প চেরা, গোড়াটা সাদা। চিবুক ও গলা লালচে-হলুদ, তাকে ঘিরে একটা কালো লাইনের মালা। উপরের বুক পাটকিলে, নিচের দিক লালচে-হলুদ, তলপেট ও লেজের আচ্ছাদক সাদা, সরু সূঁচলো ডানা, তলায় একটা বাদামী লাইনিং, ডানার ওড়ার পালক কালো। সেটা ওড়ার সময় ভাল দেখা যায়। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে, চঞ্চু কালো, মুখের হাঁ লালচে, প্রজননকালে লাল রঙটা গাঢ় হয়। পা ও আঙুল ছাই-কালো। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান— পাকিস্তান, সিন্ধু, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা। শীতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিযায়ী হয়। ভারতের বাইরে ট্রান্স-বৈকালিকা, উত্তর-পূর্ব মঙ্গোলিয়া, দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া, বার্মা থেকে হাইনান।

খাদ্য— উড়ন্ত কীটপতঙ্গ। মাটিতে পায়ে আঁচড়েও পোকা সংগ্রহ করে।

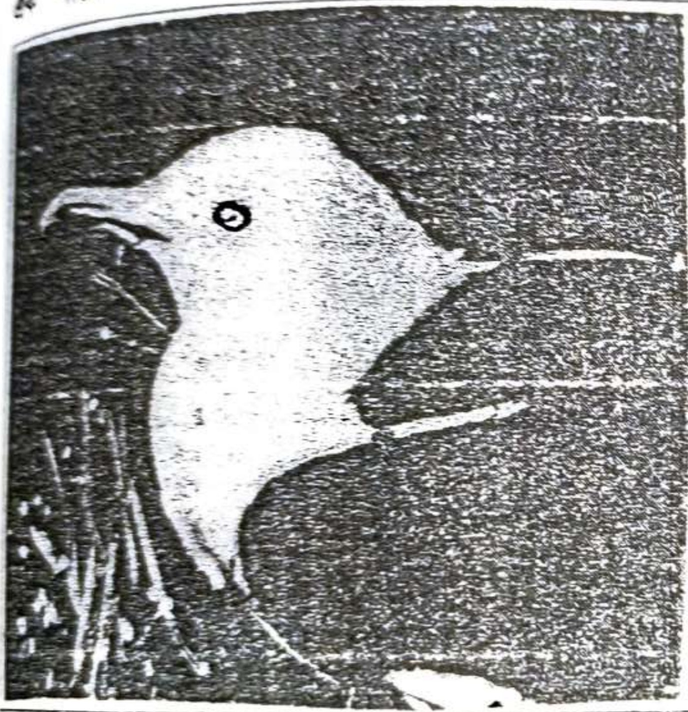
স্বভাব— সঙ্ঘচারী। উড়তে উড়তে ডাকে 'কির্‌রি-কিররি-তে। 30-40 -এর দলেই সাধারণত দেখা যায়, কখনওবা কয়েকশ'র। খাদ্য সংগ্রহ করে সকালে ও গোধূলি লগ্নে। ওড়ে যখন তখন মনে হয় হাওয়াশীল (সোয়ালো) উড়ছে। মাঝে মাঝে গাছের ডালে এসে বসে। আবার চষা খেত ও ঘাসের মাঠে নেমে দৌড়াদৌড়ি করে। থেকে থেকে খুব নিচু দিয়েও ওড়াওড়ি করে।

প্রজননকাল— এপ্রিল-জুন। ডিম পাড়ে 2-3টি মাটি বা বালি আঁচড়ে খোঁদল করে। ডিমের রঙ পাথুরে-হলদেটে, তার উপর ঘন করে কালো ও ধূসরের ছিট ও ছোপ। 18 দিনে ডিম ফোটে। আচার-ব্যবহার সব ছোটো বাবুইবাটানের মত (এখানে ছবিতে তা' দিচ্ছে সেই অবস্থায়-বড় বাবুইবাটান —পৃ. ১৮৬)।

বীচীকাক বংশ

গাঙচিল

আজ আর সন তারিখ মনে নেই, সঙ্গে ফিল্ড ডায়েরিও ছিল না যে লিখে রাখব। এক শীতের প্রায় শেষে ক'জনের সঙ্গে ডায়মণ্ড হারবার গিয়েছিলাম বেড়াতে। বিকেলের দিকে ফেরি-স্টিমারে চড়ে ওপারে গিয়েছিলাম কুঁকড়াহাটিতে, মেদিনীপুর জেলায়। ফিরতি-স্টিমারে সারেঙের ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ন্ত বিকেলে হুগলীর শোভা দেখছি। হঠাৎ নজরে পড়ল জলের উপর ভাসছে বিরাট একটা পাখি। হাঁস নয়। কোন্ জাতের পাখি তা তখনই চিনলাম। সঠিক কোন্ প্রজাতির তা জানার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠলাম। আমার অস্থিরতা দেখে সারেঙসাহেব পাখিটার দিকে স্টিমারের মুখটা একটু ফেরালেন।



চি 69. গাঙচিল

এবার ভালো করে দেখলাম, চিনলামও। শীতের সাজে আছে। সাদা মাথায় পাটকিলে-কালো ছোপ অর্থাৎ ধীরে ধীরে মাথা ও গলা কালো হচ্ছে। আসল রূপের বিকাশ হবে ফেব্রুয়ারিতে, মাথা-গলা তখন কালো হবে, শুধু চোখের উপরে ও নিচে একটা করে অর্ধচন্দ্রাকারে সাদা ছোপ থাকবে। বুকে মুক্তধূসরের উপর জুড়ে নীলচে-ধূসরের আভা। বাকি দেহ ধবধবে সাদা। কেবল ডানায় ওড়ার প্রথমসারির পালকের প্রান্তদেশে কালো পটি, ডগায় সাদা। মোটা হলদে চঞ্চু, দুই চঞ্চুর ডগাটা টকটকে লাল। কনীনিকা কালচে বাদামী, তাকে ঘিরে গোল চামড়া প্রবাল-লাল। পা ও আঙুল টকটকে হলুদ, নখর শিঙে-কালচে। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

পাখিটা সৈকত বর্গের (চারাড্রিয়িফরমেস) অন্তর্গত বীচীকাক বংশের (লারিদি) ও গণের এক প্রজাতি। নাম—কালোমাথা গাঙচিল (লারুস ইকথাইটিয়াস), ইংরেজি— *গ্রেট ব্ল্যাকহেডেড গাল*, হিন্দিতে— সব গ্যাং চিলই *ঢোমরা*। লম্বায় 66-72 সেমি (26-28 ইঞ্চি)।

বাসস্থান— দক্ষিণ রাশিয়ার ক্রিমিয়া, আজভ সমুদ্র এবং সারপা স্তেপভূমি থেকে কাশ্যপীয় ও আরল সাগর সহ পুবে উত্তর পশ্চিম মঙ্গোলিয়া ও ইরতাইশ। শীতে পরিযায়ী হয়ে আসে ভারত, পাকিস্তান, এবং বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূল ও তার মুখের নদী, মাঝে মাঝে দেশের অভ্যন্তরের বড় নদী বা হ্রদে এবং ভূমধ্যসাগরের পর্বাঞ্চল লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরে। তিব্বতীয় হ্রদসমূহে বাসা বাঁধে বলে সন্দেহ করা হয়। শ্রীলঙ্কায় ক্বচিৎ, আন্দামান ও নিকোবরে আসে কিনা তা নথিভুক্ত হয় নি।

স্বভাব— ডাকে হেঁড়ে গলায় 'ক্রা আ' করে।

দিনটা আমার পক্ষে খুবই ভাল ছিল। কারণ ঘাটে ভিড়বার আগে আরেক জাতের গাঙচিল দেখেছিলাম। কালোমাথার চেয়ে খুব বেশি দূরে ছিল না। সেও জলের উপর ভাসছিল। তার মাথা ধূসর-সাদা-কালো অর্ধচন্দ্রাকার টানটা লম্বালম্বিভাবে কানের পিছনে ছিল। বাকি দেহ সাদা, কেবল ওড়ার প্রথমসারির প্রতিটি কালো পালকের ডগায় চৌকো করে আয়নার মত সাদা ছোপ। আকারে কালোমাথার চেয়ে ছোটো। কনীনিকা লালচে-পাটকিলে বা বিস্কুট-রঙা, চোখের গোল পাতা রক্ত-লাল। চঞ্চু কমলা-লাল, পা ও আঙুল গাঢ় রক্ত-লাল। মার্চের শেষে তার আসল রূপ প্রকাশ পায়, তখন মাথাটা পাটকিলে হয়ে যায়। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

এই প্রজাতিটির নাম— পাটকিলে মাথা গাঙচিল (লারুস ব্রুননিকেফালাস), ইংরেজি— *ব্রাউন হেডেড গাল*। লম্বায় 46 সেমি (18 ইঞ্চি)। সঙ্ঘচারী

বাসস্থান— লাডাখ, চৈনিক তুর্কীস্থান থেকে দক্ষিণ মঙ্গোলিয়া। শীতকালে পরিযায়ী হয় ভারত পাকিস্তান,বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কায় সমুদ্র উপকূল এবং তার কাছের নদী, উপহ্রদ ও খাঁড়িতে, কাছে অবশ্য মেছোপল্লী বা বন্দর থাকা চাই। কলকাতার ভূতপূর্ব লবণ হ্রদেও দেখা যেত। অনেকসময় গোদা ও শঙ্খচিলদের সঙ্গে জলের উপর উড়তে দেখা যায়। ডাকে 'কি-ই-য়া'। প্রায় দাঁড়কাকের ডাকের মতো শোনায়।

হেরিং গাঙচিল

আর একটি গাঙচিল দেখেছিলাম 12 মার্চ 1981-র সকাল আটটায় সন্দেশখালিতে। চলেছি বড়ো কলাগাছিয়ার ধারে দ্বারিক জাঙ্গাল জলকর দেখতে। পথপ্রদর্শক গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতি শ্রী ধীরেন দত্ত, সঙ্গী ডঃ সুধীন সেনগুপ্ত (জ্যুওলজিক্যাল সার্ভে) ও পীযূষ দাশগুপ্ত। নানা পাখি দেখছি, নোট করছি। এমন সময় দেখি মাঠের মধ্যে গোল হয়ে 8-10 -টা বেশ বড় পাখি। ডাকছে 'কী আই' করে, অনেকটা তেলহীন কাঠের পুলি দিয়ে কুয়ো থেকে জল তুলতে গেলে যেমন আওয়াজ হয় তেমন শুনতে।

টিটিভ বর্গগত ভঙ্গিতে ডানা নাড়িয়ে শূন্যে অল্প উঠে নামছে। কি যেন খাচ্ছেও। পোকামাকড় বলে মনে হল। অন্য কোনো হাট্টিমাও (ল্যাপউইং) নয়। তবে কি সাধারণ বা কমন গাল (লারুস ক্যানুস)? কিন্তু সে ত এদেশে আসে বলে কোন রেকর্ড নেই। তবে কি?

পীযূষকে বললাম, তোমার দূরবীনে প্রতিটি অংশ দেখ আর বল, আমি নোট করি। পীযূষ বলতে লাগল, মাথা ও ঘাড়ে সাদার উপর পাটকিলের সরু টান, চঞ্চু উজ্জ্বল হলুদ, তলার চঞ্চুর প্রায় ডগায় সিঁদুরে-লালের ছোট ছোপ, পা ও আঙুল গাঢ় হলুদ।

পরে বই দেখে বুঝতে পারি পাখিগুলো ছিল 'হলদে-পা হেরিং গাঙচিল' (লা আরজেনটেটাস)। লম্বায় 60 সেমি (23 ইঞ্চি)। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান– উত্তর সাইবেরিয়া ও তার আশপাশের অঞ্চল। শীতে পরিযায়ী হয়ে আসে পাকিস্তানের সমুদ্রকূল ধরে একেবারে কেরালা এবং শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত। ভারতে পূর্ব উপকূলে আসে কিনা তার রেকর্ড নেই। সুন্দরবনে দেখে হতবাক হয়েছি।

কালোপিঠ গাঙচিল

শেষ যে প্রজাতির পাখিকে দেখেছি 21 ডিসেম্বর 1982-তে সুন্দরবনের রায় মঙ্গলের উপর জেলেদের নৌকার কাছে শয়ে শয়ে। এবারে হাঁসের বদলে এদেরই দেখেছি। হেরিং-এর মতই দেখতে, তবে মাথায় পাটকিলে সরু টান অনেক ঘন, চঞ্চু ও পায়ের হলুদ-রঙ অনেক ফিকে। পিঠের রঙ ফিকে স্লেট-ধূসর। প্রজননকালে মাথা, গলা, ঘাড়, নিচের অংশ এবং লেজ তুষার-শুভ্র।

নাম– 'কালোপিঠ গাঙচিল' (লা ফুসকাস্)। লম্বায় 60 সেমি (23 ইঞ্চি)। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। ডাকে হেরিংদের চেয়ে আরও অনেক জোরে ও গাঢ় স্বরে।

বাসস্থান– উত্তর স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে বোথনিয়া ও ফিনল্যান্ড উপসাগর, লাডোগা ও অনেগা হ্রদ। শীতে পরিযায়ী হয় ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার সমুদ্র উপকূল ও তার ভিতরের নদী ইত্যাদিতে।

সকলের প্রধান খাদ্য মাছ, জাহাজ-স্টিমার ও নৌকো থেকে ফেলে দেওয়া অভুক্ত জঞ্জাল। এছাড়াও কয়েকটি প্রজাতি পোকামাকড়, কাঁকড়া ও কম্বোজ ইত্যাদি খেয়ে থাকে। সব প্রজাতিই স্কুয়াক বংশের (স্টেরকোরারিয়িদি) স্কুয়াদের মতো চুরি, বাটপাড়ি, ছিনতাইতে খুবই দক্ষ।

পানপায়রা

বাদা বা লবণ হ্রদে যখন ঘুরতাম, তখন বিশেষ বিশেষ অংশে এক ধরনের ছিপছিপে গড়নের রুপোলি ধূসর ও সাদা রঙের পাখি দেখতাম। লম্বা সরু সূঁচলো ডানা এবং অল্প চেরা প্রায় চৌকো, লম্বা লেজ নিয়ে বেশ দল বেঁধে বাদার জলের উপর উড়ছে, চঞ্চু আর চোখ জলের দিকে রেখে। সব সময় নজর কোথাও সামান্যতম প্রাণের স্পন্দন দেখা যায় কিনা। তাহলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে তার উপর। শুধু জলের উপর নয়, ডাঙাতেও উপর থেকে ঝাঁপিয়ে ঘাসফড়িং ধরতে দেখতাম। জলের ধারে পাড়ের উপর বসা অবস্থায় দেখেছি, খুব ছোট লাল পা ও লাল চঞ্চু এবং বন্ধ ডানা লেজ ছাড়িয়ে যায়। শীতকালে দেখেছি এই চঞ্চু কালচে হয়েছে আর সেইসঙ্গে মাথার উপর কালচে

কিছু ফুটকি দাগ। গ্রীষ্মে মিশমিশে কালো রং চাঁদি থেকে চোখ পর্যন্ত গেছে। গাল ধবধবে সাদা, মনে হয় যেন দু'গালে দুই জুলপি। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

এরা বীচীকাক বংশের (লারিদি) অন্তর্গত গাঙচিলের জ্ঞাতি, পুষ্করসাদি (ক্লিমিয়) গণের এক *প্রজাতি*। নাম— বাদার পানপায়রা (ক্লিডোনিয়াস হাইব্রিডা)। ইংরেজি— *মার্শ টার্ন, হুইস্কার্ড টার্ন*, হিন্দিতে— সব পানপায়রাই *গঙ্গা চিল, মাছ লৌকা*। লম্বায় 25 সেমি (10 ইঞ্চি)। কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু লাল, পা ও আঙুল প্রবাল-লাল, নখর কালো।



চি 70. পানপায়রা

বাসস্থান— কাশ্মীর, উত্তর ভারত থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকা ধরে আসাম, বাংলাদেশ, নেপালের নিম্নভূমি ও শ্রীলঙ্কায়। শীতে ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পরিযায়ী হয় পারসীক বেলুচিস্তান, বেলুচিস্তান, সিন্ধুপ্রদেশ, পেশওয়ার এবং চিত্রল। দেখা যায় ঝিল, বাদা, জলে ডোবা ধানখেত, সমুদ্রতীরবর্তী উপহ্রদ, জোয়ার-ভাটা খেলা কর্দমাক্ত নদীতট এবং খাঁড়িতে।

খাদ্য— গাঙফড়িং ও তাদের শূক, ঘাসফড়িং, জলজ পোকামাকড়, ব্যাঙাচি, কাঁকড়া ও চুনোমাছ।

স্বভাব— ডাকে 'ক্রিয়াক ক্রিয়াক'।

প্রজননকাল— সাধরাণত জুন থেকে আগস্ট। বাসা বাঁধে কলোনি করে শালুকের ডাঁটা ও পাতা দিয়ে পানিফলের ভাসমান ঝাড়ের উপর। বাসা বাঁধতে দেখেছি বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলায় ও ধানবাদে এবং বাংলাদেশের খুলনায়। পশ্চিমবঙ্গে এখনও নজরে পড়ে নি। ডিম পাড়ে একটু বড় আকারের 2-3টি, সমুদ্র-নীলের উপর পাটকিলে ছোপ ও ছিটের। কাশ্মীরের মাঝিমাল্লারা এদের ডিম বিক্রি করে, তাই অনেক অঞ্চলে এরা বেশ কমের দিকে।

ত্রিশ দশকের একদম শেষে এক শীতে দেখি লবণ হ্রদে বাদার পানপায়রার সঙ্গে কয়েকটা পানপায়রা উড়ছে, তারা যেন একটু অন্য রকমের। সন্দেহভঞ্জনের জন্যে নমুনা সংগ্রহ করি। দেখি লম্বায় 23 সেমি। উপরটা মলিন-ধূসর, বাদার পানপায়রার মত রূপোলি-ধূসর নয়। কপাল সাদা, মাথার পিছনে কালচে ছোপ, তলাটা ঝুল-ধূসর, ধবধবে সাদা লেজ প্রায় চৌকো। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে. কালো চঞ্চুর উপর লালের আভা, পা ও আঙুল উজ্জ্বল সিঁদুরে-লাল, নখর কালো।

বইপত্তর ঘেঁটে সনাক্ত করি— 'কালো পানপায়রা' (ক্লি লিউকপটেরা), ইংরেজি— *হোয়াইট উইংগড ব্ল্যাক টার্ন*। বাসা বাঁধে দক্ষিণপূর্ব ইউরোপের হাঙ্গেরি থেকে মধ্য রাশিয়া, সাইবেরিয়া, ট্রান্সবৈকালিয়া ও আমুর প্রদেশ এবং দক্ষিণে তুর্কিস্তান ও উত্তর মঙ্গোলিয়ায়। পরিযায়ী হয় আফ্রিকা, পারস্য উপসাগর, ভারত, শ্রীলঙ্কা, বার্মা, দক্ষিণ চীন, মালয়েশিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়ায়। বর্তমানে সুন্দরবনে আসে কিনা তা খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ছেলেবেলায় যখন গঙ্গার ধারে বা আউট্রাম ঘাটে বেড়াতে গিয়েছি বা স্টিমারে করে বটানিকসে গিয়েছি, তখনই দেখেছি গঙ্গার বুকে তনুদেহী সৌষ্ঠবপূর্ণ নদীজ কয়েকটা পাখি ওড়া-ওড়ি করছে।

...দের দেহের উপর মলিন-ধূসর, নিচে সাদা, লম্বা সরু সূঁচলো ডানা, হাওয়াশীলের (সোয়ালো) ...ও গভীরভাবে চেরা কাঁচিমার্কা লেজ, খুব ছোটো লাল পা এবং লম্বাটে সূঁচলো হলুদ চঞ্চু। পাখিটা দিব্যা (স্টার্না) গণের পাখি। নাম— পানপায়রা (স্টার্না অরানটিয়া), ইংরেজি— রিভার ...র্ন। লম্বায়— 38-46 সেমি (15-18 ইঞ্চি)। শীতে চাঁদি ও ঘাড়ে কালচে ফুটকি ও সরু সরু টান। ...ীষ্মে কপাল, চাঁদি, ঘাড় ও চোখের তলা পর্যন্ত চকচকে গাঢ় কালো। কনীনিকা পাটকিলে।

বাসস্থান— সমগ্র ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপালের নিম্নভূমির বড়ো নদী, খাঁড়ি, বড়ো ...াঁধ ও জলাধার। ভারতের বাইরে বর্মা, মালয়েশিয়া থেকে পুবে মেকং নদী। শ্রীলঙ্কায় দেখা যায় না।

খাদ্য— প্রধানত মাছ, কবচী ও জলজ পোকামাকড়।

স্বভাব— এমনি ডাক শোনা যায় না, তবে কলোনি-বাসায় অবাঞ্ছিত কারুর আগমন ঘটলে উপর থেকে ঝড়ের বেগে নেমে আসে একটা হাওয়ায় ভাসা 'পিং' শব্দ করে। মনে হয়, এক ঝাঁক গুলি কানের পাশ দিয়ে চলে গেল।

পানপায়রা একা, জোড়ায়, তিন বা তারও বেশি সংখ্যায় ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে জলের উপর উপর-নিচ করতে করতে ডানা বন্ধ করে জলের উপর ঝপ করে পড়ে, ডুবে গিয়ে তুলে আনে ঠোঁটে আড়াআড়িভাবে একটা ছোট মাছ। উড়তে উড়তেই ডানা ঝেড়ে জল ঝরিয়ে ঝাঁকি দিয়ে মাছটাকে বাগিয়ে নিয়ে মাথার দিক থেকে গেলে।

প্রজননকাল— মার্চ থেকে মে। বাসা বানায় নদীর ধারে বালির উপর খোঁদল করে। অনেকসময় দেখা যায় বাবুইবাটান (প্রাটিনকোল), অন্যান্য পানপায়রা ও গাঙ্গচষাদের (স্কিমার) সঙ্গে মিলে-মিশে বাসা বাঁধছে। ডিম পাড়ে 3টি, ক্বচিৎ 4টি পাথুরে-হলুদ থেকে সবজেটে-ধূসর, তার উপর বেগুনির ছিট-ছোপ ও সরু টান (পাটকিলে ও বেগুনির)।

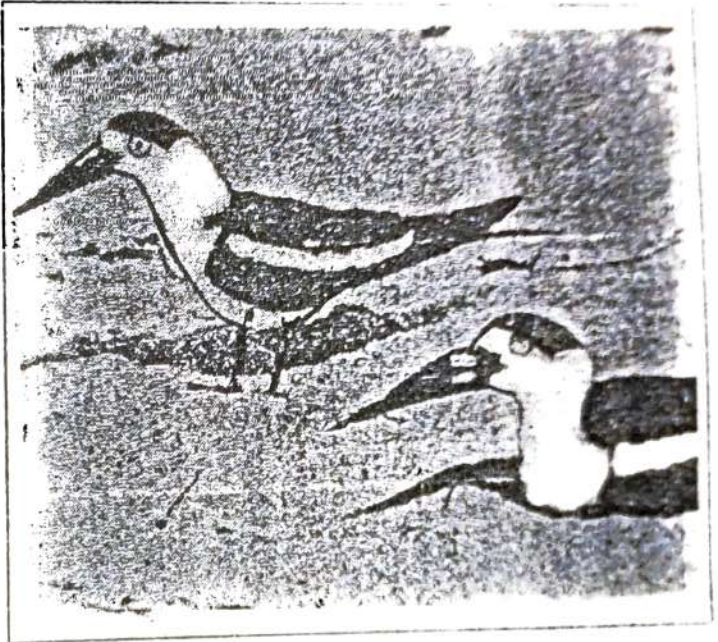
ক'দিন আগে ফেব্রুয়ারি-মার্চে, পশ্চিমবঙ্গের বার্ড ওয়াচার্স সোসাইটি-র দুই সভ্য তপন গঙ্গোপাধ্যায় ও বিশ্বরঞ্জন গোস্বামী, শ্যামনগরের কাছে বর্তুর বিলে একটা পাখির যা বর্ণনা আমার কাছে পেশ করেছে, তাতে মনে হয় ওরা কাকতুণ্ডকগণের (গেলোচেলিডন) এক *প্রজাতি*, নাম— গাঙচিলচঞ্চু পানপায়রা (গেলোচেলিডন নিলোটিকা অ্যাফিনিস), ইংরেজি— *জাভান গালবিলড টার্ন* দেখেছে। একেবারে অসম্ভব নয়। শীতে দেখা যায়। আমিও দেখেছি বহু আগে কিন্তু নমুনা না পেলে বিশ্বাস করতে রাজি নই। খুবই দুর্লভ-দর্শন। গত 17-7-81 ক্যানিং থেকে গোসাবা যাচ্ছি এম ভি চক্র ...প। বেলা 10-35-এ বড়তলা ছাড়তেই স্টিমারের পিছু নিল দুটো পানপায়রা। চলল গোলমণি ...খোলা পর্যন্ত। আমাদের সঙ্গে দূরত্ব ছিল মাত্র হাত-পনের। লবণ হ্রদে দেখার পর এতদিন বাদে আবার দেখলাম। সঙ্গী সুমিত সান্যালকে বললাম, পাখি দুটোর চেহারা খুব ভালো করে দেখ ও নোট কর। পাখি দুটো ছিল —দিব্যা গণের *প্রজাতি*, নাম— 'আন্দামানী পানপায়রা' (স্টার্না সুমাত্রা...), ইংরেজি— *ব্ল্যাকনেপেড টার্ন*। লম্বায় 35 সেমি (সাড়ে 13 ইঞ্চি)। আঙুলসহ পা ও চঞ্চু কালো। ...ধূসর ও সাদা রঙের সামুদ্রিক পানপায়রা। এক চোখ থেকে আরেক চোখ পর্যন্ত ঘাড় ঘুরে ...লো পটি।

বাসস্থান— আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

স্বভাব— মে থেকে জুলাই প্রজননকালের পর তারা পাড়ি দেয় প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের ছোট ছোট দ্বীপে। বাংলাদেশের ও পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে বাসা বাঁধাটা আশ্চর্যের হবে না।

গাঙচষা

ছেলেবেলায় ইস্কুলে যখন পড়ি তখন থেকেই একটা বদরোগ ছিল, একটু ফাঁক পেলেই কলকাতার আশপাশে ঘুরতে চলে যাওয়া। থাকতাম শ্যামবাজারে। মাঝে মাঝে উল্টোডাঙ্গা রোড স্টেশন থেকে ট্রেনে চেপে চলে যেতাম খড়দায়। সেখান থেকে ছায়া-ঘেরা বি টি রোড ধরে শ্যামবাজার। এখন সেসব ঘন গাছপালা আর নেই। পাখি পোষা তখন শুরু করে দিয়েছি। রবিবারের সকালটা কাটাতাম হাতিবাগানের হাটে। আর এইসব আউটিং-এ নানারকম পাখি দেখতাম। নাম জানতে চেষ্টা করতাম অজানা যাদের দেখতাম, তারা হাতিবাগানে বিক্রির জন্যে আসে কিনা তাও খুঁজতাম। পেলে খুবই আনন্দ হত।



চি 71. গাঙচষা

একদিন ইস্কুলে গিয়ে শুনলাম কে এক কর্মকর্তা মারা গেছেন, তাঁর সম্মানে ছুটি। তখনি দু'তিনজন বন্ধুর সঙ্গে ঠিক হয়ে গেল বাড়ি ফিরে কি হবে, চল আউট্রাম ঘাটে। বিকেল সাড়ে চারটার মধ্যে বাড়ি ফিরলেই হবে। বাড়ি ম্যানেজ হয়ে যাবে। বাকি তিনজন সঙ্গী তখনই রাজি। এরা সবসময় আমার এইসব আউটিং বা অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গী।

হাইকোর্টগামী ট্রামে সেকেন্ড ক্লাসে চেপে আউট্রাম ঘাটের কাছে নামি। গঙ্গার পাড় ধরে চলি পশ্চিম মুখো। জাহাজ, স্টিমার, নৌকার যাওয়া-আসা, পানপায়রা (টার্ন) ও গ্যাঙচিলের (গাল) ওড়াউড়ি দেখছি আর চলছি। ভাঁটা পড়ে গেছে। জলে ঢেউ নেই। নির্জন রাস্তা। ফোর্ট উইলিয়ম ছাড়িয়ে গেছি, হঠাৎ নজরে পড়ল পানপায়রার আকারে পাখি গোটা চারেক জল ঘেঁষে প্রায় ছুঁয়ে উড়ছে। শুধু উড়ছে নয়, তাদের তলার চঞ্চু জলের মধ্যে ডুবিয়ে, উপরের চঞ্চু তুলে ফাঁক করে, পাশাপাশি প্রায় লাইন বেঁধে যেন জল চষে চলেছে। আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। এরকম পাখি তো কখনও দেখি নি। বেশ খানিকটা উড়ে গিয়ে আবার ঐভাবে ফিরে আসছে। থেকে থেকে এক-একটা ছোট মাছ তাদের চঞ্চুর ফাঁকে পড়ছে, আর উপরের চঞ্চু ঝপ করে বন্ধ হয়ে তাকে ধরছে, আড়াআড়ি ভাবে একটু উপরে উঠেই মাথাটা গলার দিকে করে গিলে ফেলেই আবার গঙ্গা চষতে শুরু করে দিচ্ছে। আমরা তাজ্জব। পানপায়রা নয়। তারা ত একটু দূরেই উড়ছে। গাঙচিলও নয়, তারা বেশ বড়সড়।

তবে কোন পাখি ? মাথার চাঁদি ও পিঠ-ডানা কালো, ডানায় কালোর উপর সাদা টান, বাকি সব সাদা, লেজ অল্প চেরা।

আমরা রাস্তা থেকে নেমে পাড়ে বসে ওদের অপরূপ ভঙ্গিতে মাছ ধরা দেখেছি বেশ অনেকক্ষণ। কে একজন যেন বলল, আর দেরি করলে সময়ে বাড়ি ফিরতে পারব না।

বেশ কিছুদিন পর ইংরেজি নাম জানলাম আমার সেই জ্ঞানী দাদার (৺হিতেন্দ্র মোহন বসু) কাছ থেকে, যিনি আমহার্স্ট স্ট্রীটে থাকতেন।

পাখিগুলো ছিল বীচীকাক বংশের (লারিদি) অন্তর্গত *এক প্রজাতি*, নাম— গাঙচষা (রাইনচপস্ অ্যালবিকলিস), হিন্দি— *পানডিরা*, ইংরেজি— *ইন্ডিয়ান স্কিমার*, *সিজরবিল*।

গাঙচষা লম্বায় 40 সেমি (সাড়ে 16 ইঞ্চি)। মাথার চাঁদি, পিঠ এবং ডানা কালচে-পাটকিলে। ডানা খুব বড়, লেজ ছাড়িয়ে যায়। ওড়ার পালকগুলোর মাঝে সাদা ছোপ একটা সাদা লাইনের মত দেখায়। বস্তিপ্রদেশের মাঝখান থেকে অল্প চেরা লেজের মাঝের পালক পর্যন্ত একটা লাইন কালচে-পাটকিলে, বাকি সব পালক সাদা। কনীনিকা পাটকিলে। চঞ্চু কমলা-হলুদ, গোড়াটায় লালভাব বেশি, ডগায় হলুদ-ভাব প্রকট। উপরের চঞ্চুর তলার চঞ্চু চেয়ে ছোট। তলার চঞ্চুর দুই ধার ছুরির ফলার মত ধারাল। পা ছোট ও আঙুল উজ্জ্বল সিঁদুর-লাল। আঙুল ঝিল্লি দিয়ে অল্প জোড়া। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে, তবে স্ত্রী আকারে একটু ছোটো। এই গণে একটি করে তিনটি প্রজাতিকে দেখা যায় আমেরিকা, আফ্রিকা এবং ভারতে।

বাসস্থান— পাকিস্তান, উত্তর ভারত থেকে পুবে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের শাখা-উপশাখায়। দক্ষিণে অন্ধ্রপ্রদেশের ভিতর দিয়ে নর্মদা, তাপ্তি, মহানদী, গোদাবরী ও কৃষ্ণার শাখা-উপশাখায়। ভারতের বাইরে বর্মা ও ইন্দোচীনীয় অঞ্চল। সাধারণত বড় নদীর উপর বা ধারে-কাছে জলা, বিল ইত্যাদিতে থাকে। সমুদ্রের ধারে খাঁড়ির মুখেও দেখা যায়। পছন্দ বড় বালির চর সহ যে কোন বড় নদী।

খাদ্য— প্রধানত ছোটো মাছ। পেট চিরে দেখা গেছে পাকস্থলীতে অনেকসময় কোন মাছ নেই, শুধু তৈলাক্ত তরল পদার্থ। আবার মাছ যখন থাকে তখন টিনের সার্ডিন মাছের মত পরপর সাজান যেমন থাকে তেমনি।

স্বভাব— ডাকে নাকিসুরে 'কাপ কাপ', ঠিক যেন দিশি বা ফক্স-টেরিয়ারের আওয়াজ। সাধারণত একা বা ছোট দলে নদী বা জলা চষে মাছ ধরে। পরে সকলে একত্রিত হয় নদীর ধারে বালির চরায়। সেই দল বেশ বড়। সকলেই হাওয়ার দিকে মুখ করে দাঁড়ায় বা বসে। চাঁদনি রাতেও গাঙচষা এমনিভাবেই মাছ ধরে। সময়ে সময়ে তলার চঞ্চুটা জলের মধ্যে 3 সেমি পর্যন্ত ডুবিয়ে দেয়। উপরের চঞ্চু যেদিকে ইচ্ছে সেদিকে ঘোরাতে পারে। অল্প ঢেউয়ে জল চষতে কিছুমাত্র অসুবিধে বোধ করে না।

প্রজননকাল— ফেব্রুয়ারির মাঝ থেকে এপ্রিলের মাঝ পর্যন্ত। কলোনি-বাসা বানায় নদীর বালি চরায় অল্প খোঁদল করে। এদের মধ্যে থাকে পানপায়রাদের বাসাও। ডিম পাড়ে সাধারণত 3, কখনও 4। ডিমের গায়ের রং নানারকমের, ফিকে গোলাপী-হলুদ, বাদামী, পাথুরে, ধূসরাভ অথবা

সবুজাভ-সাদা, তার উপর ছোপ ও ছিট থাকে চকোলেট ও লালচে-পাটকিলে, কখন-সখন এর মাঝে বেগুনির ছিট। ডিমে তা' প্রধানত স্ত্রী-পাখিই দেয়, মাঝে মাঝে পুরুষ সাহায্য করে। কেউ কেউ বলেন 20 দিনে ডিম ফোটে, সঠিক সময় এখনও জানা যায় নি। বাবা-মা মাঝে মাঝে জলে নেমে গা ভিজিয়ে বালির অতিরিক্ত তাপমাত্রা কমাবার জন্যে হয় ডিমের উপর না হয় বাচ্চাদের উপর ছিটোয়। বিপদাশঙ্কায় বাচ্চারা বালির উপর নিজেদের একদম বিছিয়ে দিয়ে চুপ করে থাকে। বালির ঝড় উঠলে বাচ্চা বা ডিম একদম ঢেকে যায়, তখন আর পরিত্রাণের উপায় থাকে না।

ক্রৌঞ্চ বর্গ
(buttonquail)

ক্রৌঞ্চ বর্গে (অর্ডার গ্রুইফরমেস) পাঁচটি বংশ। যথা— লব (টার্নিকিদি), ক্রৌঞ্চ (গ্রুইদি), অম্বুকুক্কুট (রাললিদি), জলাস্ফুলিক (হেলিওর নিথিদি) এবং সারঙ্গ (ওটিডিদি)।

লব বংশের (টার্নিকিদি) পাখিরা ভূমিজ পাখি। দেখতে অনেকটা বিষ্কির বংশীয় (ফাদিয়ানিদি) ... (যেমন কোয়েল, কোটুনিকস্) মতো। তবে হাতে নিলে বোঝা যায়, কারণ এদের পিছনের ... থাকে না। এই বংশের পাখিদের প্রজননকালীন আচরণই এদের বৈশিষ্ট্য। স্ত্রী-পাখিরা বহুগামিনী ... পুরুষদের চেয়ে আকারে বড়ো হয়। স্ত্রী-পাখিদের বর্ণসুষমাও পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি।

ক্রৌঞ্চ বংশের (গ্রুইদি) বয়স্কদের মাথা পালকহীন কিন্তু মাথার দু'পাশ ও ঘাড়ে পালক থাকে। ... সারসের, তাদের পুরো মাথা ও গলা পালকহীন। এই বংশের সব প্রজাতিরই বাচ্চাদের ... ও ঘাড়ে পালক। ডানা লম্বা ও চওড়া। প্রাথমিক পালকের তিন নম্বরটি সাধারণত সবচেয়ে ... ভিতরের দ্বিতীয় সারির পালক লম্বা ধরণের এবং প্রাথমিক শ্রেণীর পালকের চেয়ে বড়ো। ... ছোটো, এবং চতুষ্কোণ কোণগুলি গোলাকার। জঙ্ঘাস্থির শেষের দিক পালকহীন, আঙুল ছোটো ... এবং সেই সঙ্গে ছোটো ভোঁতা নখর। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। ক্রৌঞ্চদের গলার স্বরে খুব ... এবং সেটা সম্ভব হয়েছে তাদের কণ্ঠনালীর গঠনে। সেটা বেশ বড়ো এবং একত্রে পাকানো, ... ফলে এই অঙ্গটি খুবই অনুনাদী।

অম্বুকুক্কুট বংশীয়দের (রাললিদি) ডানা ছোটো, লেজ আরও ছোটো, ডানার প্রায় অর্ধেক। নাকের গর্ত ... উপরের চঞ্চুর দু'পাশে খাজকাটা। কপালের পালক একটু খোঁচা খোঁচা। গুল্‌ফ ছোটো, সাধারণত ... মাঝের আঙুলের চেয়ে অল্প ছোটো। আঙুল লম্বা, পাতলা এবং মুক্ত, জোড়া নয়।

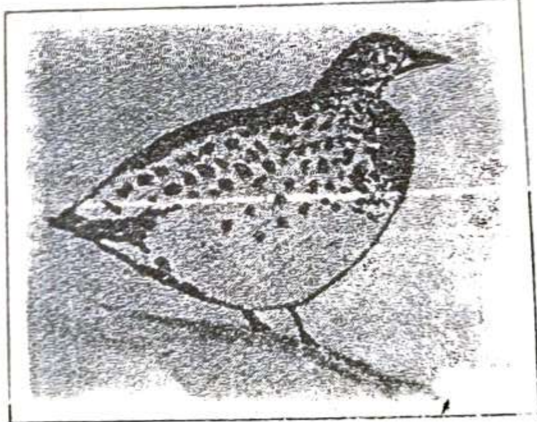
জলাস্ফুলিক বংশের (হেলিওর নিথিদি) পাখিদের চঞ্চু মোটা। উপরের চঞ্চু মোটামুটি বাঁকা, গুল্‌ফের ... বড়ো। কারণ্ডবদের মতো মাথার উপর বর্ম নেই, কিন্তু প্রজননকালে উপরের চঞ্চুর ডগায় ... মাংসল চঞ্চু দেখা যায়। নাকের গর্ত সরু লম্বাটে, উপরের চঞ্চুর মাঝামাঝি অবস্থিত। গুল্‌ফ ... শক্তিসম্পন্ন। নখর বিনা মাঝের আঙুল ছোটো। পায়ের আঙুলের ফাঁকে ঝিল্লি। ডানা গোলাকার। ... পালক পঞ্চম-ষষ্ঠটির সমান। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সবচেয়ে বড়ো। স্ত্রী-পুরুষে খুবই অল্প তফাৎ। ... এদের দেখা যায় না। এরা বাংলাদেশ, পূর্ব আসাম ও মণিপুরের জঙ্গলের মাঝে জলার ...

সারঙ্গ বংশের (ওটিডিদি) পাখিদের ডানায় পালক বেশী। জঙ্ঘাস্থি ডানার প্রায় এক চতুর্থাংশ। ... পালকহীন অংশে ছোটো-খোটো খাঁজ কাটা। পিছনের আঙুল নেই। সামনের তিনটি ... ছোটো এবং মোটা। চঞ্চু মাথার চেয়ে ছোটো, ডগাটা চওড়া। মাথায় ঝুঁটি বা পালক নেই, ... কয়েক প্রজাতির পুরুষের মাথায় কয়েকটি লম্বা পালক থাকে।

লব বংশ

বটের (Yellow legged buttonquail)

আমি এক সময় বারাসাত-মধ্যগ্রামের কাছে ছোটো জাগুলিয়া বলে একটা গ্রামে বানীভূষণ বসু মহাশয়ের কাছে বেশ কিছুদিন ছিলাম (দ্র. ভাটারি)। সেখানে একদিন একটা ভাটারি বা বড় বটেরকে বেড়ালের মুখ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারলাম না। তার দু'দিন পরেই সকাল দশটা নাগাদ আর একটি পাখির সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম, সানবাঁধানো পুকুরের পিছন দিকে অন্য লোকের ভুট্টার ক্ষেতে। পুকুরের পাড় থেকে দেখছি একটা খুব ছোটো পাখিকে, ভাটারির চেয়ে ছোটো ঐ জাতীয় কোনো পাখি কিন্তু দেখতে অনেক তফাত। ভালো করে দেখব বলে ওর দিকে নজর রেখে পিছনের পাড় বেয়ে নেমে এলাম একটা নালার মধ্যে। নালাটা হচ্ছে শশীবাবুর জমির চৌহদ্দি। নালাটা আগাছার ঝোপঝাড়ে ভর্তি। তার মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রেখে ধীরে ধীরে বুকে হেঁটে নালার উপরে মাথাটা তুললাম। দেখি পাখিটা হাত দশেক দূরে। আমার উপস্থিতি পাখিটা বুঝতে পারে নি। বেশ নির্বিঘ্নে মাটি থেকে খুঁটে খাচ্ছে। মাঝে মাঝে পা দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে। আমার দিকে খানিকটা চলে এসে ব্যবধান আরও কমিয়ে ফেলল।



চি 72. বটের

চাঁদি হাল্কা পাটকিলে, প্রতিটি পালকে একটা কালচে সরু পাড়, চাঁদির মাঝখান দিয়ে সরু রঙ্গিন টানা দাগ, ভ্রূর উপর এবং কানের আচ্ছাদক হালকা তামাটে, ঘাড় উজ্জ্বল মরচে, পিঠ ছাই-পাটকিলে, ক্রমে নিচের দিকে লালচে-হলদেটে ভাব, তার উপর কালোকালো পটি, সেটা বেশি পরিস্ফুট হয়েছে নিচের পিঠে ও বস্তিপ্রদেশে, অসংফলক ও পিঠের কিছু পালকের ধার ঘিয়ে-হলুদ। ডানার আচ্ছাদক হাল্কা বালি-পাটকিলে, তার প্রতিটি ডগায় কালো-ফুটকি, ডানার বড়ো পালকগুলি মেটে-পাটকিলে. প্রথম সারির পালকের একদম ধার হলদেটে-সাদা। চিবুক ও গলার প্রথমার্ধ সাদা, বাকি নিচের সব পালক সবজেটে, গাঢ় ভাব বুকে এবং পেটের উপরাংশ। স্ত্রী-পাখির শুধু ঘাড়ের দুই ধার ও পিঠে লালচে-কমলার আধা-কলার। কনীনিকা খড়-রঙা, চঞ্চু মাংসল-সাদা বা ধূসরাভ-সাদা, গোড়ায় একটু হলুদের আভা। মাঝে মাঝে উপরের চঞ্চুতে পাটকিলে আভা দেখা যায়। পা, আঙ্গুল ও নখর হলুদ, কখনও বা তার উপর কমলার আভা। পরে এই পাখিকে দেখেছি পুরনো লবণ হ্রদের ধারে খেত-খামারে. পাতিপুকুর, দমদম, গড়িয়া, যাদবপুর ইত্যাদি স্থানে।

এই পাখি ক্রৌঞ্চ বর্গের (গ্রুইফরমেস) অন্তর্গত লব বংশের (টার্নিকিদি), নাম— বটের (টার্নিকস টার্কি), হিন্দি— *লৌওয়া*। ইংরেজি— *ইয়েলো লেগেড বাটন-কোয়েল*। লম্বায় 15 সেমি (6 ইঞ্চি)

স্ত্রী-পাখি আকারে অল্প বড়ো। এই গণে আরও *দুটি প্রজাতি* আছে। *প্রথম*— ছোটো বটের (টা সাইলভাটিকা), ইংরেজি— *লিটল বাস্টার্ড-কোয়েল*। লম্বায় 13 সেমি (সাড়ে 5 ইঞ্চি)। *দ্বিতীয়*— গুলু (টা স্যাসকিটেটর), ইংরেজি— *বাস্টার্ড-কোয়েল*।

বাসস্থান— বহিহিমালয়ের 2000 মি. উচ্চতার মধ্যে পাকিস্তান এবং হিমালয়ের 1200 মি. উচ্চতা থেকে সমগ্র ভারতের পর্বত ও সমতলে, বাংলাদেশ, আন্দামান-নিকোবরে, শ্রীলঙ্কায় নেই। কিছুটা যাযাবরও। একস্থান থেকে অপর স্থানে দল বেঁধে যায়। দেখা যায় ঘেসোজমিতে, যার মাঝে বেঁটে ঝোপঝাড়, একটু ভিজে হলে পছন্দ বেশি এবং যব, গম, বাজরা, ভুট্টার ক্ষেতে।

খাদ্য— ঘাস ও আগাছার বীজ, খাদ্যশস্য, শস্যের সবুজ ডগা, উঁই, কালো পিঁপড়ে ইত্যাদি ছোটো পোকামাকড়। বন্দী অবস্থায় দু-ইঞ্চি ডানা ছড়ান প্রজাপতির সবটাই খেতে দেখা যায়। এই গণের সকলের খাদ্যই এক।

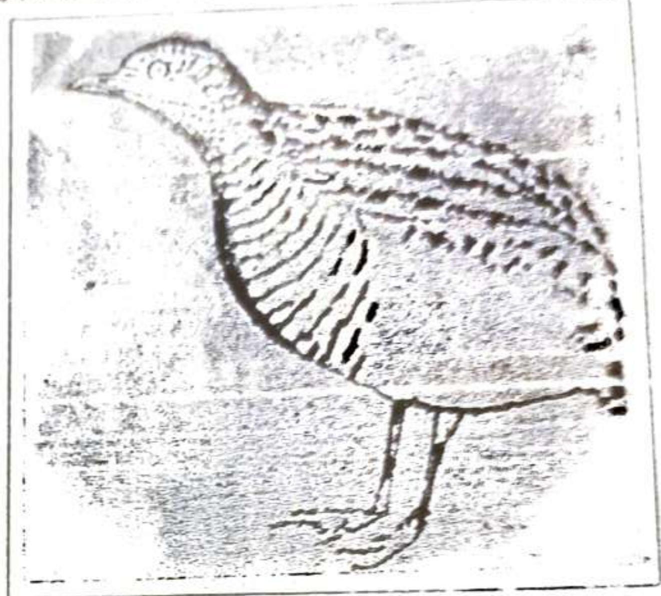
স্বভাব— বেশ জোরে প্রায় ঢাকের মত 'ড্র-র-র-র' করে ডাকে। দূর থেকে শোনায় অনেকটা মোটর সাইকেলের মতো। এই ডাক দিয়ে ঝগড়াটে বহুগামিনী স্ত্রী-পাখি অন্যান্য স্ত্রী-পাখিদের জানান দেয়: আমি একটি পুরুষ পাকড়েছি, আর কেউ ধারে-কাছে এস না। এক এক পলক ডাক চলে প্রায় 15 সেকেন্ডের মতন। প্রজননকালে দিনের যে কোনও সময়ে যেমন এই ডাক দেয়, তেমনি রাতের বেলাতেও দেয়। এর আগে তিন-চারবার ভারি গলায় দু-সেকেন্ডে তিনবার 'গ্রুউস' করে ডাকে। এছাড়া যা বেশ দূর থেকে শোনা যায় গুরুগম্ভীর গর্জনের মত 'হূন-হূণ হূণ-হূণ' উউফ' উউফ' ডাক। এই শেষের ডাক পুরুষ কি স্ত্রী ডাকে তা এখনও সঠিক জানা যায় নি। পক্ষিতত্ত্ববিদ্ স্টুয়ার্ট বেকার বলেছেন, আধ-খাড়া অবস্থায় স্ত্রী-পাখি ডাক শুরু করে ডানা দু-পাশে ছড়িয়ে দিয়ে মাটিতে বুক ঠেকিয়ে। প্রতিটি আওয়াজের সঙ্গে নিজের সব পালক ফোলাতে থাকে। এইভাবে একটা পালকের বেলুনে পরিণত হয়।

সাধারণত দেখা যায় একা, মাঝে মাঝে জোড়ায়, ক্বচিৎ কোথাও বা ছোটো দলে। বড়ো বেশি বসে থাকে, একই জায়গায় দিনের পর দিন বিচরণ করে। এই স্বভাব এই গণের সব পাখিরই। অনেক সময় গুলু (বাস্টার্ড কোয়েল) এদের সঙ্গে মিশে থাকে। আচরণও তাই। যাযাবরী অবস্থায় প্রায়ই আলো দেখে কাছে চলে আসে এবং ধরা পড়ে। বহুগামিনী স্ত্রী-পাখি একবার ডিম পাড়বার পরেই পুরুষ-পাখির উপর তা' দেওয়া থেকে সন্তান প্রতিপালনের সব ভার দিয়ে অন্য পুরুষের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। এরকম করে বেশ কয়েকবার।

প্রজননকাল— মার্চ থেকে নভেম্বর, তবে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বৃষ্টির সময় জুন, বিশেষত আগস্ট-সেপ্টেম্বরেই বেশি। বাসা বানায় ঘেসোজমিতে মাটি আঁকড়ে। বড়ো বড়ো ঘাস নামিয়ে গম্বুজের মত করে। একটা প্রবেশপথও থাকে। ডিম পাড়ে সাধারণত 4টি ধূসরাভ-সাদা, তার উপর ঘন ছাপ ও ছিট থাকে লালচে-পাটকিলে বা কালচে-বেগুনির। ডিমের গড় মাপ 22.8×17.9 মিমি.।

গুলু (Barred buttonquail)

আর একটি বটের প্রজাতির পাখিকে দেখেছিলাম হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বর, নদীয়ার পূর্বস্থলী, চব্বিশ পরগণার বারাসত ও সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থানে খেতখামারের ধারে। হাতে নিয়ে দেখেছিলাম বলে বটেরের (টারনিকস্ টাংকি) সঙ্গে তফাত ধরতে পেরেছিলাম, নাহলে দূর থেকে বটেরই (ইয়েলো-লেগেড বাটন-কোয়েল) ভেবেছিলাম। কেমন একটু সন্দেহ হওয়াতে স্ত্রী-পুরুষ দুইই সংগ্রহ করি।



চি 73 গুলু

এটিও লব বংশের (টার্নিকিদি) অন্তর্গত এক *প্রজাতি*। নাম— গুলু (টার্নিকস্ সাসকিটাটার বঙ্গলেনসিস) হিন্দি— *গুন্দ্রা*, ইংরেজি— *বেঙ্গল বাস্টার্ড-কোয়েল, ব্ল্যাক-ব্রেস্টেড বাস্টার্ড-কোয়েল।*

গুলু লম্বায় 15 সেমি (6 ইঞ্চি)। স্ত্রী-পাখি লম্বায় একটু বড়ো প্রায় 17 সেমি (প্রায় সাড়ে 6 ইঞ্চি)। স্ত্রী-পাখির দেহের উপর লালচে-হলুদ, পিঠ, ভ্রূর উপর এবং বস্তিপ্রদেশের প্রতিটি পালকে কালো রেখার পাশে হলদেটে-সাদা দাগ। চাঁদি লালচে-হলুদ, তার উপর কালো ও সাদা, পালকের সারি, মনে হয় যেন সাদা ফোঁটা। এই রং একটু চওড়া করে দুই চোখের উপরে, তৃতীয়টি গলার ধারে, যেটা গলার অগ্রভাগে বুকের ঠিক শুরুতে সেটা ফিকে হলদে। বুকের মাঝখান দিয়ে একটা কালো লাইন নিচে নেমে গেছে, লাইনের পাশে একটা চওড়া করে কালো ভাঙ্গা রেখা। বুকের নিম্নাংশ হালকা কিন্তু উজ্জ্বল মরচেটে। পুরুষ-পাখির গলা, ঘাড় এবং চিবুক সাদাটে। মাথায় সাদাটে-হলদের দাগ, কালো ছোপ নেই,। গলা ও বুকের পটি খুবই হালকা, দেহের সমস্ত পালকই ফিকে এবং স্ত্রী-পাখির চেয়ে অনেক হালকা। উভয়ের কনীনিকা সাদা, মাঝে মাঝে হলদেটেও দেখা যায়। চঞ্চু নীলচে-স্লেট, উপরের চঞ্চুতে তারই গাঢ় আভা, ডগাটা গাঢ় পাটকিলে, পা ও আঙ্গুল সীসে-ধূসর।

বাসস্থান— নিম্ন পশ্চিমবঙ্গের 24 পরগণা, হুগলী ও নদীয়া জেলা, খুব সম্ভবত খুলনা ও যশোহর জেলা। 3টি উপজাতি আছে। *প্রথমঃ* অসমিয়া— *'ছানছরাই'* , কাছাড়ী— *'দাওডুমা'* (টা স্যা প্লামবিপেস)।

বাসস্থান— নেপাল, উত্তর বিহার, উত্তরবঙ্গ, সিকিম, ডুয়ার্স থেকে আসাম, বাংলাদেশে সমতল থেকে 2400 মি. উচ্চতার মধ্যে। *দ্বিতীয়ঃ* হিন্দি— *গানডলু, সালুই গুন্দ্রা* (টা স্যা টাইগ্র), ইংরেজি— *ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড-কোয়েল*। *বাসস্থান*— পাঞ্জাবের পশ্চিম থেকে উপদ্বীপাত্মক ভারতে সর্বত্র। *তৃতীয়ঃ* সিংহলী— *'বোলা ওয়াটুওয়া'* (টা স্যা লেগেগেই), ইংরেজি— *সিলোন বাস্টার্ড-কোয়েল*। এদের সবাইকে দেখা যায় ঘেসোজমি ও ছোটো গুল্মের জঙ্গলে। আমাদের গুলুকে দেখেছি শহর কলকাতার আশপাশে

জংলী বাগান ও আঙ্গিনায়।

খাদ্য— বটের এবং অন্যান্য উপজাতি সকলেরই এক।

স্বভাব— বটেরের সঙ্গে কোনো তফাত নেই। সেই কারণে ডাক শুনে গুলু বা বটের কোনটা যে তা বোঝা যায় না। বটেরের মতই ভয়ানক অলস, পায়ে চাপা পড়ার আগের মুহূর্তে অনেক কষ্ট করে উঠে পড়ে। প্রথমে ওড়ে বটেরের মতো নিচু দিয়ে, পাখায় অল্প 'হুইরর' আওয়াজ, শেষে মাথা নিচু করে গোৎ খেয়ে ঝোপের মধ্যে লুকোয়। যখন কোনো উত্তেজনা-অশান্তি বা বাধা না ঘটে তখন ঝোপের তলায় শান্তভাবে পা আঁচড়ে পাতা উলটে খাদ্য খোঁজে। গুলুর অবস্থান বোঝা যায় যখন সে কোনো ঝোপের তলায় ধূলায়ানের জন্যে বসে তখন যে গোলাকার কৌদল হয় তা দেখে।

প্রজননকাল— বছরের যে কোনও সময়, তার মধ্যে জুন থেকে অক্টোবরের মধ্যেই বেশি দেখা যায়। স্ত্রী-পাখি বহুগামিনী কিন্তু একসঙ্গে বহু জনের সঙ্গে নয়। একজনের সঙ্গে মিলিত হবার পর ডিম পাড়ার শেষে পুরুষের উপর ডিম ফোটান থেকে সন্তান প্রতিপালনের সব ভার দিয়ে স্ত্রী-পাখি বেরিয়ে পড়ে অন্য পুরুষের সন্ধানে। অন্য স্ত্রী-পাখির সঙ্গে ঝগড়া করে, লড়াই করে, অন্য স্ত্রী-পাখির বাঞ্ছিত পুরুষকে ছিনিয়ে নেয় বা নেওয়ার চেষ্টা করে। সেই পুরুষকে পেলে তার সঙ্গে মিলিত হয়। অপর স্ত্রী-পাখিকে লড়াইয়ে হারাতে না পারলে অন্য পুরুষের সন্ধান করতে থাকে। কিন্তু ডিম পাড়ার পর তার আর সেই পুরুষের প্রতি কোন আকর্ষণ থাকে না। একটি স্ত্রী-পাখি এইভাবে কবার ডিম পাড়ে তা এখনও স্থির হয় নি। এই স্বভাব বটের বা লব বংশের সব পাখির মধ্যেই দেখা যায়।

ডিমও পাড়ে বটেরর মত 4টি এবং রংও একই রকমের। ডিম ফোটে 13-16 দিনে। ডিমের গড় মাপ 24˙7 x 19˙4 মিমি।

ক্রৌঞ্চ বংশ

ক্রৌঞ্চ (Demoiselle Crane)

ছেলেবেলায় যখন স্কুলে পড়ি তখন পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে একটি পাঠে দু'লাইনের একটি সংস্কৃত কবিতা ছিল— 'মা নিষাদ'

'প্রতিষ্ঠাং তমগমঃ শাশ্বতীসমাঃ/যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম॥'

সংস্কৃত পাঠের গৌতম পণ্ডিত মহাশয় বলেছিলেন, এই হচ্ছে আদি কবি ঋষি বাল্মীকির প্রথম রচিত আদি কবিতা। তখন শুধু শ্লোকই রচিত হত। তিনি ক্রৌঞ্চ বলতে সারসই বলেছিলেন। ব্যাখ্যায় বলেছিলেন, নৃত্যরত সারস দম্পতির পুরুষটিকে ব্যাধ হত্যা করাতে তমসা নদীর তীরে

ঋষি বাল্মীকি এতই ব্যথিত হয়েছিলেন যে তাঁর মুখ দিয়ে হঠাৎ এই দুটি ছন্দোবদ্ধ লাইন আপনা থেকেই উচ্চারিত হয়েছিল।

তারপর কিছুটা বড়ো হয়ে 1934 সালে সদ্য প্রকাশিত সত্যচরণ লাহা মহাশয়ের 'কালিদাসের পাখী'। বইটা হাতে নিয়ে দেখি পৃঃ 87-95-তে তিনি নানা যুক্তি ও উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন কোঁচ-বক (পণ্ডহেরন) হচ্ছে ক্রৌঞ্চ। কিন্তু প্রজননকালে অর্থাৎ মে থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ও তার আগে-পরে গাঁ-গঞ্জ, বন-বাদাড় ঘুরে প্রচুর বক দেখলেও তাদের মিথুন নৃত্য কখনও দেখতে পাই নি। কিন্তু লব বর্গের (গ্রুইফরমেস). ক্রৌঞ্চ বংশের (গ্রুইদি) অর্থাৎ ইংরেজিতে যাদের 'ক্রেনস্' বলে, সেই সব প্রজাতির পাখির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, তাদের দ্বৈত নৃত্যও দেখেছি। তার মধ্যে আছে সারস (গ্রুস আন্টিগোন) ও কার্চ (গ্রুস গ্রুস)। একবার কলকাতার চিড়িয়াখানায় যে পাখি দুটিকে দ্বৈত নৃত্য করতে দেখেছি তার হিন্দি নাম— *কারানচ্*, *কুনজ্*, *করকরা*, নেপালি— *ঘান্টো*, মারাঠি— *করকচা*, দাক্ষিণাত্যীয়— *কালম*, *কালংগ*, ওড়িশী— *গারঅরা*, কানাড়ি— *কারকচা*, বাংলায় একেই বলেছি— ক্রৌঞ্চ (অ্যানথ্রপয়ডেস ভিরগো), ইংরেজি— *ডেময়জেল ক্রেন*। কার্চ, (কমন ক্রেন) হওয়াও আশ্চর্যের নয়। ঋষি বাল্মীকি এদেরও দেখতে পারেন। আচার-ব্যবহার দু'জনেরই এক।



চি 74. ক্রৌঞ্চ

ক্রৌঞ্চ ছিপছিপে গড়নের ধূসর দেহী। মাথা ও ঘাড় কালো, চোখের পাশ দিয়ে বেশ পুরু সাদা, সরু পালকের গুচ্ছ চোখের পিছন পর্যন্ত। তলায় গলার কালো পালক লম্বা ও সূঁচলো এবং তা বুকের উপর এসে পড়েছে। লেজের উপর কাস্তের আকারে পাঁশুটে-ধূসর, দ্বিতীয় সারির পালক বাকি পালকের উপর দিয়ে এসেছে। কনীনিকা লালচে-পাটকিলে, কখনও কখনও টকটকে লাল বা লাল, চঞ্চু মলিন সবজেটে, একদম ডগাটা লাল। পা ও আঙুল কালো। উচ্চতায় দাঁড়ান অবস্থায় মাথা পর্যন্ত 76 সেমি (আড়াই ফুট)। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান— দক্ষিণপূর্ব ইওরোপ এবং মধ্য এশিয়ার উত্তরাংশ 60 ডিগ্রি, দক্ষিণে উত্তর মঙ্গোলিয়া এবং আলজেরিয়ার উচ্চ উপত্যকা। শীতে পরিযায়ী হয় উত্তরপূর্ব আফ্রিকা থেকে সাদা ও নীল (নাইল) নদীর তীরবর্তী স্থানসমূহ, ইথিওপিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, বর্মা, চীনে এবং ভারতে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়, উত্তর-পশ্চিম এবং পশ্চিম মধ্যাংশে, সেখান থেকে পুবে পশ্চিমবঙ্গ, বিহারের পূর্বাংশে ক্বচিৎ, দক্ষিণ মহীশূর পর্যন্ত। কার্চ (কমন ক্রেন) ও ক্রৌঞ্চরা একই সঙ্গে একই পথে পরিযায়ী

হয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে আসে। নেপালের তরাই ও দূনেও আসে। ভারতে আসতে আরম্ভ করে 25-17 আগস্ট, আর প্রজননভূমিতে ফিরে যায় 5 মার্চ। দেখা যায় গম ও ছোলার খেত, ধান কাটার পর ধানের গোড়া সমৃদ্ধ খেত, বালুকাময় নদীর পাড়, ঝিল ও দীঘির পাড় জলের সঙ্গে প্রায় মিশে আছে। কার্চও একই সঙ্গে পরিযায়ী হয়ে আসে সিন্ধুপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ থেকে পুবে বিহার, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গে। দক্ষিণে মধ্য প্রদেশ থেকে অন্ধ্র, মাঝে মাঝে নেপাল তরাই, বোম্বাই ও মহীশূরে দেখা যায়।

কার্চ দেখতে বেশ বড়, ধূসর দেহী। ওড়ার পালক কালো, লম্বা গলা ও পা, মাথা ও উপরের ঘাড় কালচে, ঘাড়ের শুরুতে চামড়ার মলিন লাল ছোপ, একটা চওড়া সাদা পালকের পটি চোখের পিছন থেকে উপরের স্লেট-কালো উপরের ঘাড়ে এসে পড়েছে। লেজ লুকিয়ে পড়েছে ঝাঁকড়া তৃতীয় সারির কোঁকড়ানো পাঁশুটে-ধূসর পালকের আড়ালে। কনীনিকা কমলা-লাল, কখনও টকটকে লাল, চঞ্চু সবজেটে, ডগায় হলুদের ভাব, পা ও আঙুল কালো। দাঁড়ানো অবস্থায় উচ্চতা 140 সেমি (সাড়ে 4 ফুট)। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

খাদ্য— গম, ছোলা, ধান ইত্যাদির সঙ্গে মাছ, ব্যাঙ, টিকটিকি-গিরগিটি, পঙ্গপাল, ঘাস ফড়িং ও অন্যান্য বড় জাতের পোকামাকড়। কিছু খাদ্যশস্যেরও অনিষ্ট করে।

স্বভাব— ডাকে খুবই উচ্চনাদে— 'ক্রুক ক্রুক' করে। ক্রৌঞ্চের চেয়ে কার্চ-এর ডাকের জোরটা বেশী। কার্চ-এর সঙ্গে মিলেমিশে যখন পরিযায়ী হয়ে ভারতে প্রবেশ করে, তখন দেখা যায় একটা চওড়া ফিতে আকাশপথে ভেসে যাচ্ছে দেড় মাইলের মত। খাদ্যান্বেষণ করে সকালের দিকে এবং পড়ন্ত বিকেলে। বাকি সময়টা দিনে ও রাতে অলসভাবে কাটায় একপায়ে খাড়া হয়ে। নদীর ধারে বালির চরে বা কোনও ঝিলের ধারে। সেই সময় মুখটা গুঁজে দেয় পিঠের পালকের ভিতর। শুধু কয়েকজন অতন্দ্র প্রহরী হয়ে সজাগ থাকে। একটু সন্দেহ হলেই প্রহরীরা ডেকে সংকেত দেয়। সঙ্গে সঙ্গেই বাকিরা সব প্রস্তুত। কোথায় ঘুম, কোথায় বিশ্রাম! সেইজন্যে হাজার চেষ্টা করলেও ঘুম বা বিশ্রামের সময় কিছুতেই কাছে যাওয়া যায় না। সকলেই উচ্চনাদে ডেকে উঠেই উড়তে আরম্ভ করে। তখন মনে হয় দূর থেকে যেন সমুদ্রগর্জন শুনছি। যেখানে শিকারী বা অন্য কোনও শত্রু টের পাবে না সেখানে রাত কাটায়। সকাল হলেই 'V' আকারে দল বেঁধে চক্কর মেরে উড়ে খাদ্যসংগ্রহের জায়গায় আসে। গলা সোজা করে বাড়ান পা জোড়া পিছন দিকে টান করে উড়ে চলে। খাদ্যভূমিতে নামার সময় নামে ঠিক যেন শকুন কোনও মৃত জন্তুর শবের উপর নামছে এমন করে ডানা ঝাপটিয়ে ব্রেক কষে। ক্রৌঞ্চ ও কার্চ-এর মাংস শিকারীদের খুব প্রিয়। এক একটির ওজন 2·25 থেকে 3 কেজি। কার্চ-এর ওজন 4·3 থেকে 5·9 কেজি।

প্রজননকাল— মে থেকে জুলাই মাসে, নিজের বাসভূমিতে। কলকাতার চিড়িয়াখানায় একবার জোড়া ক্রৌঞ্চকে দেখেছিলাম পাখা ছড়িয়ে পায়ে তাল রেখে ঘুরে ঘুরে দৌড়তে। তারপর পরস্পরের সামনে এসে পরস্পরকে মাথা উঁচু-নিচু করে অভিবাদন জানাতে, তার সঙ্গে লাফ। কানের পালক ও বুকের পালক সব ফুলিয়ে তুলেছে। ঋষি বাল্মীকি এই ধরনের নাচই দেখেছিলেন পুরুষ পাখিটিকে বাণে হত্যা করার আগে।

ডিম পাড়ে 2টি নিজের বাসভূমিতে জলায়। খড় জলঘাসপাতা ইত্যাদি দিয়ে খাপোছাল করে বাসা বানিয়ে। ডিমের রং সবজেটে বা হলদেটে ধূসর, তার উপর কিছু ইতস্তত লালচে-পাটকিলে বা ধূসরের ছোপ।

সারস (Sarus Crane)

গত ৪২-৪৩ সালের শীতে সুন্দরবনে কয়েকটি সারস দেখেছিলাম। বহুদিন পরে লক্ষ্যপথে পড়ে। স্থানীয় অধিবাসীরা বলেন, 'মালমো'।

ক্রৌঞ্চ বর্গের (গ্রুইফরমেস) অন্তর্গত ক্রৌঞ্চ বংশে (গ্রুইদি) 7টি প্রজাতিকে ভারত ও তৎসংলগ্ন স্থানে দেখা যায়। একমাত্র সারস (গ্রুস আনটিগোনে), ইংরেজি— সারস (ক্রেন), ভারতের এবং বর্মী সারস (গ্রু অ্য শারপি) আসাম, মণিপুর ও বার্মার বাসিন্দা, বাকি সব শীতে পরিযায়ী হয়ে আসে। ক্রৌঞ্চ বংশে পূর্ণবয়স্কদের চাঁদিতে পালক থাকে না, ন্যাড়া কিন্তু মাথার দু'পাশ ও ঘাড়ে পালক থাকে। ব্যতিক্রম শুধু সারস, এদের চাঁদি ছাড়া মাথা ও লম্বা গলার উপরাংশে পালক নেই, লাল চামড়া। প্রজননকালে এই লালের ভাবটা গাঢ় ও উজ্জ্বল হয়।

সারস উচ্চতায় 156 সেমি (5 ফুট)। ভারতের সবচেয়ে উঁচুপাখি; চাঁদি ছাই রঙা, ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় পালকহীন মাথা ও গলার লাল চামড়ার উপর খুব সরু সরু কালো লোম, কানের উপরের পালক ছাই, গলা সাদাটে, নিচে নেমে এসে মিশেছে বাকি দেহের নীলচে ছাই-ধূসরের সঙ্গে। ওড়ার বাইরের পালক কালচে-পাটকিলে, ওড়ার ভিতরের পালক ধূসর এবং সাদাটে। কনীনিকা কমলা, সূঁচলো চঞ্চু মলিন সবজেটে-শিঙে, ডগাটা কালো, চাঁদি ও চোখকে ঘিরে গোল চামড়া ছাই-সবুজ। লম্বা পা ও আঙুল মাংসল-লাল বা লাল। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে, তবে স্ত্রী আকারে একটু ছোট হয়। ওজনে 6.80-8 কেজি।

চি 7৫ সারস

বাসস্থান— সিন্ধু ও পাঞ্জাব থেকে উত্তরপ্রদেশ, নেপাল তরাই, বিহার, উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স অঞ্চল এবং পশ্চিম আসাম, দক্ষিণে পূর্ব রাজস্থান, গুজরাট, উত্তর মধ্যপ্রদেশ বিশেষত গোদাবরীর তটভূমি এবং গাঙ্গেয় উপত্যকা। এছাড়া খরা বা বন্যার জন্যে অন্যত্র যায়। সাধারণত 1650 মি. উচ্চতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। দেখা যায় খোলামেলা চষাজমি, বাদা এবং ঝিলে।

কোথাও জল নেই তেমন জায়গাতেও দেখা যায়। যেমন, উত্তরপ্রদেশ।

ক্রৌঞ্চ বংশের অন্যান্য প্রজাতির চেয়ে উদ্ভিজ্জ গ্রহণ করে খুব কম। মাছই প্রধান খাদ্য, পাওয়ার উপর নির্ভর করে। কবচী, ব্যাঙ, টিকটিকি-গিরগিটি, পঙ্গপাল, ঘাসফড়িং এবং বড় গোছের পতঙ্গ ইত্যাদি খাদ্যতালিকা ভুক্ত। উদ্ভিজ্জ তালিকায় ফসল কাটার পর যে পড়ে থাকে, জলজ আগাছার কন্দ, ঘাস ও শস্যের সবুজ ডগা, কড়াই-মটর-সীম, চীনাবাদাম শুঁটি ইত্যাদি। মাঝে মাঝে নতুন চষাজমির শস্যের বেশ ক্ষতি করে।

ডাকে অত্যন্ত জোরে ভেঁপুর মত। বহুদূর থেকে শোনা যায়। মাটিতে এবং শূন্যে উড়তে সাধারণত স্বামী-স্ত্রীরাই দ্বৈতকণ্ঠে পাল্লা দিয়ে ডাকে। একজন আরম্ভ করলেই অন্যজন, সঙ্গে শুরু করে দেয় তার জবাব। দু'জনেই গলা সোজা করে চঞ্চু আকাশপানে তুলে ডাক দিয়ে শরীরের পালক ফুলিয়ে মৃদু ঝাঁকিয়ে। পা অল্প অল্প ঘষে চলে, এটা চলে আধ মিনিট থেকে মিনিট বা তার কিছু বেশি সময়। বর্ষাকালে কলকাতার চিড়িয়াখানায় একটু লক্ষ্য করলেই দৃশ্য চোখে পড়বে। ডাক নানা অর্থে ব্যবহার করে; যেমন, পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের প্রকাশ, ও সাবধান বাণী, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন, বিপদে সাহায্য প্রার্থনা এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে অপরকে নিজের উপস্থিতি জানান। ডাক দিনে যেমন শোনা যায়, তেমনি শোনা যায় রাতেও।

সারসকে সাধারণত জোড়ায় দেখা যায়। কখনও দেখা যায় পারিবারিক দলে, বাবা মার সঙ্গে প্রজননের সন্তান এবং বর্তমানের একটি কি দুটি সন্তান। কোন কোন মরসুমে শীতের শেষভাগে ও অপ্রাপ্তবয়স্ক সমেত 60-70 এমনি কি তারও বেশি দলে ইতস্ততঃ জমায়েত হয়। এই জমায়েতে প্রচুর ভেপু ডাক শোনা যায়, আর দেখা যায় তিড়িং-বিড়িং নাচ এবং অত্যন্ত ব্যস্তবাগীশতা জাঁকজমক সহকারে চলাফেরা। থেকে থেকে কিছুক্ষণের জন্যে বড় দল ছেড়ে ছোটো ছোটো বেরিয়ে পড়ে নিজেদের স্বাভাবিক পেশায়। পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে বেশ খানিকটা দৌড়ে ছেড়ে ওড়ে। তারপরে সজোরে ধীরস্থির ছন্দে বিস্তারিত পাখা আন্দোলন করে উড়ে চলে। ওড়ে কখনও ইংরেজি V-বৃ্যহ রচনা করে, কখনও পরপর সোজা লাইনে। আবার দেখা যায় থেকে দুপুরে বিশ্রাম নেবার জায়গা কোন ঝিল বা নদীর ধারে উড়ে যেতে। কখনও যায় স্রেফ স্ফূর্তির জন্যে খুব উঁচুতে উঠে অন্যান্য পরিযায়ী ক্রৌঞ্চদের মত চক্কর মারতে।

সারস জোড় বাঁধে আজীবন। বিশ্বস্ততা এবং পরস্পরের প্রতি আমৃত্যু গভীর অনুরক্তি থেকে এদের নিয়ে লোককাহিনী গড়ে উঠেছে। এর ফলে মানুষ এদের সহজে মারে না, যা অন্য প্রজাতির ক্রৌঞ্চদের বেলায় ঘটে থাকে। অবশ্য মাঝে-মধ্যে মাংসের লোভে স্থানীয় অধিবাসীরা দু-একটি মেরে থাকে।

প্রজননকাল— জুলাই থেকে অক্টোবরের শেষ। কখনও কখনও মার্চ পর্যন্ত গড়ায়। এই সময় অনুরাগের প্রকাশ অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও সুবিন্যস্ত, কিন্তু কিছুটা আবার হাস্যকরও। দু'জনে মিলে শুরু করলেও স্ত্রী-পাখি' কিছুটা কম সাবলীল। পুরুষই ইঙ্গিত দেয় পাখা অর্ধেক খুলে, নিচু করে, সামনে ঝুঁকে অভিবাদন জানিয়ে, জোড়পায়ে একটু লাফিয়ে, সামনের অংশ ক্রমাগত করে আর তুলে ধরে, আর মাথাসহ চঞ্চু উপরে তুলে খুব জোরে ভেঁপু ডাক দিয়ে। এই

আমন্ত্রণ স্ত্রী-পাখি সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করে। এরপর চলে দুটি পাখির দু-তিন মিনিট ধরে পরস্পরকে শিষ্টাচার প্রদর্শন ও তিড়িং-বিড়িং নৃত্য। পাগলের মত লাফাতে লাফাতে দু'জনে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে চলে যায় যেন তাদের চিত্তভ্রংশ হয়েছে, কিন্তু নাচ থামে না। এই সবের মধ্যে স্ত্রী-পাখি হঠাৎ পা বেঁকিয়ে গুঁড়ি মেরে বসার ভঙ্গি করে আহ্বান জানায়। পুরুষ এসে মিলন সাধন করে। আবার দেখা যায়, নাচানাচি যখন উত্তুঙ্গে তখন হঠাৎ দু'জনের নাচ থামিয়ে খাদ্য সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

বাসা বাঁধে শর, খড় ও ঘাস দিয়ে, খুব বড় এবং উঁচু করে ধানখেতের বাঁধের উপর না হয় ঝিল বা বাদার মাঝে দ্বীপের মধ্যে। উপরের ফাঁদটা হয় 1 মি-র মত। ডিম পাড়ে 2টি সবুজাভ বা গোলাপি-সাদা, তার উপর পাটকিলে বা বেগুনির ছিট ও ছোপ। বাসা বাঁধা থেকে শুরু করে ডিমে তা' দেওয়া এবং সন্তান প্রতিপালনে স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরকে সাহায্য করে। তবে পুরুষকেই দেখা যায় খুব সতর্কতার সঙ্গে সন্তান রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে। মানুষজন বা কোন শত্রু উপস্থিত হলে পুরুষ বাচ্চাদের সঙ্কেত দেয় 'করর্ করর্' করে। তারা তখনই আত্মগোপন করে। আলিপুর চিড়িয়াখানার ভূতপূর্ব অধিকর্তা শ্রীরামকৃষ্ণ লাহিড়ী লক্ষ্য করেন 28 দিনে ডিম ফুটতে। মুঘল সম্রাট, জাহাঙ্গীর যিনি খুব ভাল করে সারসদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করেন, তিনি স্মৃতিকথায় লিখেছেন, প্রথম ডিমটির পর দ্বিতীয়টি পাড়তে 48 ঘণ্টা সময় নেয়, এবং ডিম ফোটে 34 দিনে।

অম্বুকুক্কুট বংশ

অম্বুকুক্কুট (Water Rail)

বহুদিন আগের এক শীতের দুপুর। গিয়েছি লবণ হ্রদে। নিস্তব্ধ দুপুরের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে করতে বেশ খানিকটা হেঁটে পাড় ঘেঁষে নলখাগড়ার আগাছায় ভর্তি বড় বড় খোলের ধারে পৌঁছেছি। দেখলাম বেশ কিছু নতুন পাখি, যাদের আগে দেখি নি, তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। কেউ খাগড়ার দামের মধ্যে চুপ করে বসে, কেউ দামের বাইরে পাড়ের উপর চুপ করে দাঁড়িয়ে, কেউ বা জল অল্প শুকিয়ে যাওয়া পাড়ের কোল ঘেঁষে যে কাদা দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যে স্থির হয়ে স্ট্যাচু হয়েছে! আবার কেউ কাদার মধ্যে অত্যন্ত সন্তর্পণে খাদ্য খুঁজছে। কাছে গেলাম ভাল করে দেখব বলে। কেউ সরে গেল না, উড়লও না। যারা কাদার মধ্যে খাবার খুঁজছিল তারা শুধু স্থির হয়ে গেল। খুবই অবাক হলাম। কাছে যাচ্ছি বুনোপাখি উড়ছে না, মানুষ দেখে ভয় পাচ্ছে না, এরকম তো হবার কথা নয়! তবে কি এরা সবাই অসুস্থ?

আমি হাত তিন-চারেকের মধ্যে গিয়েছি। তখনও কিন্তু নড়ছে না, উড়ে পালাবার চেষ্টাও করছে না। ডানহাতটা পাশে ঝুলিয়ে রেখে একটু নিচু হয়ে বাঁহাত বাড়িয়ে একটাকে ধরতে গেলাম. পাখিটা হাতটাকে একটু এড়িয়ে যাবার সময় চট করে ডানহাতটা বাড়িয়ে তাকে তুলে নিলাম।

কি নরম পালক ! পাউডার পাফকেও হার মানায়। হাতের মধ্যে ওর ছোট্ট বুক একটু ধড়াস ধড়াস করছে। আমি ওর মাথা-বুক-পিঠে হাত বুলিয়ে আশ্বস্ত করতে করতে সঙ্গী প্রমথ খুড়োকে বললাম, পাখিটাকে চিনতে পারছি না। খুড়ো বললে, খানিকটা জলমুরগীর (মুরহেন) মত দেখতে। বললাম, তারই কোন নিকট জ্ঞাতি বলে মনে হচ্ছে। খুব সম্ভব পরিযায়ী হয়ে আজই পৌঁছেছে। শরীরে শক্তি নেই, বুকের দু'পাশের মাংস খুব কম, মাঝের হাড় দেখা যাচ্ছে। এত দূর থেকে এসেছে যে শরীরের শক্তি নিঃশেষ। তাই এত জবুথবু। বিশ্রাম আর খাদ্যের প্রয়োজন। খুড়োকে বললাম, যা বলছি তা আমার ফিল্ড ডায়েরিটা খুলে লিখে যাও, —সাল ও সময় 1949, বেলা দুটো দশ। বাড়ি গিয়ে বই দেখে জানব কি পাখি।

রোগাটে ধরনের তিতিরের মত পাখি, ঠ্যাং বেশ লম্বা। নলখাগড়ার দামকে আশ্রয় করে আছে। চঞ্চু লম্বাটে, উপরের চঞ্চু গাঢ় পাটকিলে, গোড়ার কাছটায় উজ্জ্বল কমলা-লালের একটা লাইন। তলার চঞ্চুর গোড়াও লাল, তবে গাঢ় নয় ফিকে। কনীনিকা লালচে-পাটকিলে। উপরের পালক গাঢ় জলপাই-পাটকিলে, তার উপর কালো কালো টান। একটা পাটকিলে লাইন চোখের উপর দিয়ে কানের উপরকার পালক পর্যন্ত। চিবুক ও গলা সাদাটে, মাথার দু'পাশ, ঘাড় ও বুক উপরের পালকের মতই গাঢ় পাটকিলে। বুকের নিচের দু'পাশ ও তলপেট কালো-সাদা লাইনে ভরা। পা ও আঙুল মাংসল-গোলাপী।



চি 76. অম্বুকুক্কুট

বাড়ি এসে বইপত্তর ঘেঁটে জানলাম, লব বর্গের (গ্রুইফরমেস) অন্তর্গত অম্বুকুক্কুট বংশের (রাললিডি) এক প্রজাতি। বংশের নামেই নাম, অম্বুকুক্কুট (রাললাস অ্যাকোয়াটিকাস ইন্ডিকাস), ইংরেজি— ওয়াটার রেল। লম্বায় 28 সেমি।

শীতে পরিযায়ী হয়ে আসে আসাম এবং বাংলাদেশে। আর কোথাও আসে কিনা নথিভুক্ত নেই। পশ্চিমবঙ্গে দেখা পাওয়াটা আশ্চর্যের নয়।

বাসস্থান— পূর্ব সাইবেরিয়ার লেনা থেকে পুবে আমুর ও উসুরিল্যান্ড, দক্ষিণে ট্রান্সবৈকালিয়া, চিহিলি, কোরিয়া এবং জাপান দ্বীপপুঞ্জের শাখালিন থেকে কাইউশু। বাস করে খাগড়ায় ভরা বাদায়।

খাদ্য— মিষ্টিজলের খোলাসমেত শামুক, জলজ কীটপতঙ্গ, বাদার আগাছা ও তার ডগা, ঘাসের বীজ, মাঝে-মধ্যে ধান।

প্রায়ই গিয়ে ওদের দেখতাম কিন্তু কোন রকম ডাক শুনি নি। অনেক পাখিই শীতে পরিযায়ী

হয়ে এসে ডাকে না। দেশে ফিরে গিয়ে প্রজনন কালে ডাকে। এরা সেখানে ডাকে খুব জোরে আর সন্ধ্যায়। ডাকটা শোনায় বিপদে পড়লে শূয়োর-ছানা যেমন ডাকে সেইরকম।

সপ্তাহে একবার-দুবার করে গিয়ে এদের আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করেছি। মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে গিয়ে আর একটিকেও দেখি নি। তারা ফিরে গিয়েছে নিজের দেশে। এই সময়ের মধ্যে দেখেছি, তারা হাঁটে শরীরটা খাড়া করে লম্বা লম্বা পা ফেলে।

স্বভাব— আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে খাদ্য সংগ্রহ করে খুব সকালে আর সন্ধ্যেতে। জলমুরগীর মত লেজটাকে উপর নিচু করে। একটু সন্দেহ হলেই লম্বা পা একটু ভাজ করে মাথা আর লেজ নিচু করে খাগড়ার আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। কখন-সখন শূন্যে উঠে ডানা ঝাপটিয়ে পা ঝুলিয়ে খাগড়ার একটা ঝাড় পার হয়ে অন্যদিকে গিয়ে লুকোয়। সাঁতারও কাটে জলমুরগীর মত ঝাঁকি দিয়ে লেজ উপরনিচ করে। পক্ষিতত্ত্ববিদ স্টুয়ার্ট বেকারও লিখেছেন আমার মত অভিজ্ঞতার কথা, ভারতে প্রথম উড়ে এসে এত ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে হাতে ধরা যায়। এদের সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু জানা যায় নি।

প্রজননকাল— মে-জুন। ডিম পাড়ে ৪-10টি। সবুজের আভাসহ ফিকে হলুদ তার উপর লালচে-পাটকিলে বা বেগুনি-পাটকিলের ছিট ও ছোপ।

আর একটি অম্বুকুক্কুটকে (রাললাস স্ট্রায়াটাস আলবিভেনটর), ইংরেজি— ব্লু-ব্রেস্টেড ব্যান্ডেড রেল, দেখা যায়, ভারতের সর্বত্র যেখানে বাদা ও নলখাগড়ার ঝাড় আছে। তাদের মাথা ও ঘাড় লালচে-বাদামী। বাকি উপরের পালক গাঢ় পাটকিলে, তার উপর ঢেউ খেলানো সাদা পটি ও ছোপ। চিবুক ও গলা সাদা, বুক ধূসরাভ-নীল। তলপেট ও বুকের ধার কালচে, তার উপর সাদা পটি। সরু লম্বাটে চঞ্চু লাল। কনীনিকা ইট-লাল, পা ও আঙুল জলপাই-ধূসর।

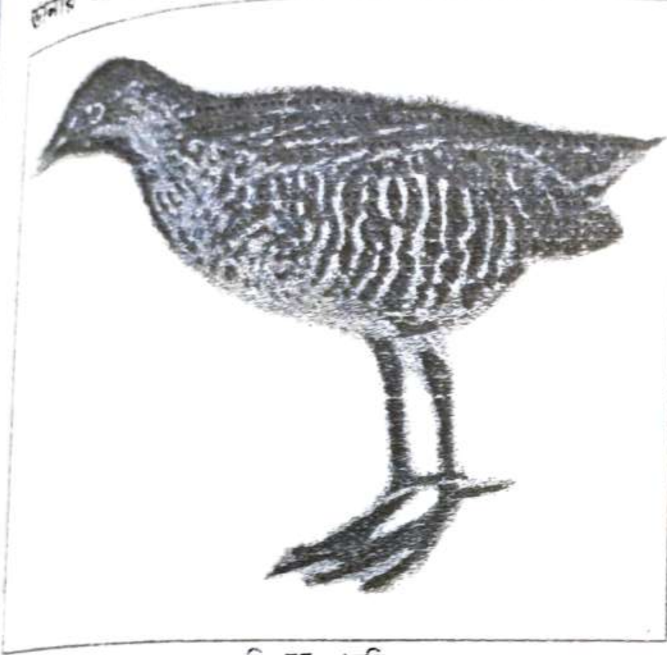
প্রজননকাল— জুনের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবর। ডিম পাড়ে 5-7, কখনও 9টি চকচকে ফিকে লালচে-হলুদ, তার উপর লালচে বা বেগুনি-পাটকিলের অথবা গাঢ় লালের ছিট ও ছোপ, ডিমের মোটা দিকে সেটা ঘনভাবে থাকে।

আমি যাদের বাদায় প্রথম দেখি তার অপর *এক প্রজাতি 'টার্কেস্তান ওয়াটার রেল'* (রা অ্যা ইন্ডিকাস), বাসা বাঁধে কাশ্মীর ও লাডাখে। তাদের দেহের উপর থেকে নিচের রঙ অনেক হালকা।

খয়রি (Spotted crake)

একটি ছোট পাখিকে শীতকালে প্রায়ই দেখতাম লবণহ্রদের ধারে ছোট ঝোপঝাড়ের তলায় এবং নিউ কাট ক্যান্যাল, যাকে বলতাম ভাঙরের খাল, তার আশপাশে বাদার কোলঘেঁষে ছোট ছোট গ্রামের ধানক্ষেতের ধারে। শ্যামবাজারে দেশবন্ধু পার্কের পিছনে ছোট লঞ্চ সার্ভিস ছিল, ভাঙর পর্যন্ত যেত। বটেরের মত দেখতে বাদা বা জলার পাখি। প্রথমে ধারণা হয়েছিল স্থানীয় পাখি। পরে জেনেছিলাম তা নয়। দেখতে বেশ এবং রকম-সকম দেখে ও অজানা বলে কয়েকটা নমুনাও

সংগ্রহ করেছিলাম। তখন হাতে নিয়ে দেখেছিলাম, এদের চাঁদি, পিঠ, অংসফলক ও বস্তিপ্রদেশ জলপাই-পাটকিলে। তার উপর কালচে কালচে দাগ এবং মাথা ছাড়া উপরের সব পালকেই সাদার ছোট ছোপ ও ছিট। কপাল ও চোখের উপরে ছাই-ধূসরের টান, চোখের উপরে সাদার ছোট ছোট ফুটকি, ঘাড়ে ঘন করে কালো-সাদার ফুটকি, গাল দারচিনি রঙা, তার উপর কালো ছিট। ডানার আচ্ছাদক জলপাই-পাটকিলে, তার উপর ছড়ান-ছিটানো সাদা ছিট, ওড়ার পালক পাটকিলে। গলা ছাই-ধূসর, গলা ও বুকের সামনের অংশ ফিকে জলপাই, তার উপর ছাই-ধূসরের আভা এবং সাদা ছিট। পেট-তলপেট ছাই-ধূসর এবং তার দু'পাশে উপর থেকে নেমে এসেছে সাদা-কালো ও জলপাই-পাটকিলের আঁকাবাঁকা ভাঙ্গা লাইন। পায়ুদেশ ও লেজের তলার আচ্ছাদক হলদেটে -লাল। কনীনিকা লালচে-পাটকিলে বা লাল, চঞ্চু হলদে, গোড়াটা কমলা, উপরের চঞ্চুতে সবুজের ভাগ বেশি। পা ও আঙ্গুল উজ্জ্বল জলপাই-সবুজ। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। লম্বায় 23 সেমি (9 ইঞ্চি)।



চি 77. খয়রি

এই পাখি ক্রৌঞ্চ বর্গের (গ্রুইফরমেস) অন্তর্গত অম্বুকুক্কুট বংশের (রাললিদি) এক *প্রজাতি*। নাম— খয়রি, গুড়গুড়ি খয়রি। কোথাও বা আলতি (পরজানা পরজানা), ইংরেজি— *স্পটেড ক্রেক*, হিন্দি— *ঝিল্লি*।

বাসস্থান— ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, ইউরোপ এবং পশ্চিম এশিয়া, উত্তরে নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড, দক্ষিণ ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপসমূহ, উত্তর আফ্রিকার কিছু অঞ্চল এবং উত্তর-পশ্চিম কাশ্মীর। শীতে পরিযায়ী হয় সিন্ধু থেকে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বাংলাদেশ, দক্ষিণে উপদ্বীপাত্মক ভারতে মহীশূরের বেলগাঁও পর্যন্ত। আঙটি পরিয়ে কখনও সঠিক পথ জানা হয় নি। তবে দেখা গেছে উত্তর ভারতে আসে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে, তারপর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। মনে হয় নানা পথ ধরে পরিযায়ী হয়ে ভারতে আসে। তবে ফিরতি মুখে মার্চ-এপ্রিলে পাকিস্তানের কোহাটে বেশ কয়েক ঝাঁক দেখা যায়। পছন্দ করে খাগড়া বা শরভর্তি জলা খাল ও জলাধার।

খাদ্য— প্রধানত আগাছার বীজ, কীটপতঙ্গ, কেঁচো, জোঁক, ক্রিমি এবং কম্বোজ।

ডাক— পরিযায়ী হয়ে এসে বিশেষ কোন আওয়াজ করে না, চুপচাপ থাকে। মৃদুস্বরে একটা 'ক্রেক' আওয়াজ যেন একবার শুনেছিলাম।

স্বভাব— সাধারণত জোড়ায় বা একা বিচরণ করে। ঝোপ বা আগাছার তলায় সব সময় ঘুরঘুর করে, তাই খাগড়ার বনে দেখার চেয়ে ওদের উপস্থিতি বোঝা যায় বেশি। কাদাখোঁচা শিকারীরা

এদের অস্তিত্ব সবচেয়ে বেশি বুঝতে পারে। যেসব ঝিল বা জলাধারের পরিবেশ শান্ত, কোনও রকমে বাধা পায় না, সেখানে এরা নির্ভয়ে ঘোরাফেরা করে। ভাসমান জলজ চাপড়ার উপর ঘোরে পদ্ম বা শালুক পাতার উপর স্বচ্ছন্দে হেঁটে বেড়ায়, সাঁতার কেটে এক দাম থেকে অপর দামে যায়, মাঝে মাঝে বেঁকে লেজ তুলে ঝাঁকুনি দেয়, কামপাখিদের মত শর বেয়ে উপরে উঠতেও পারে। যদি কোনও প্রকৃতি প্রেমিক এদের এই স্বচ্ছন্দ বিহার দেখতে ওদের চোখে পড়ে যান, দেখতে পাবেন ওরা তৎক্ষণাৎ পদ্ম বা শালুক পাতার তলায় লুকিয়ে পড়েছে। সেখান থেকে সন্তর্পণে উঁকি মেরে দেখে বিপদ কেটে গেছে কিনা। সেই সময় যিনি ওদের লক্ষ্য করছেন, তিনি যদি স্থির হয়ে থাকতে পারেন, তবে দেখবেন ওরা আবার বেরিয়ে এসে ঘোরাফেরা শুরু করেছে।

প্রজননকাল উত্তর-পশ্চিম কাশ্মীরে মে থেকে আগস্টের মধ্যে, ঘাস ও শর দিয়ে নরম বাদা ও হ্রদের ধারের ঘাসের উপর কিংবা ঝোপের তলায়, জলাশয়ের পাড়ের ধারে বাসা বানায়। ডিম পাড়ে 8 থেকে 12টি, ধূসরাভ বা সবজেটে লালচে-হলদে, তার উপর খুব ঘন করে লালচে বা বেগুনির ছিট ও ছোপ।

লাল খয়রি (Ruddy brested crake)

খয়রি বা গুড়গুড়ি খয়রি ছাড়া আরেকটি *প্রজাতির* খয়রি পশ্চিমবঙ্গে নজরে পড়েছিল, তার নাম— লাল খয়রি (আমাউররনিস ফুসক্যাস)। ইংরেজি— *রাডি ক্রেক, কাছাড়ি, ডি ডাওবুই গাজাও।*

লাল খয়েরি লম্বায় 22 সেমি (সাড়ে 8 ইঞ্চি)। কপাল, চাঁদির সামনে, ভ্রূর উপর, মুখের দু'পাশ মদ-রঙা-বাদামী, বাকি উপরের অংশ গাঢ় জলপাই-পাটকিলে। নিচে চিবুক ও গলার মাঝখানটা সাদাটে, গলার তলা থেকে বুক মদ-রঙা-বাদামী। পেট ও তার দু'পাশ জলপাই-পাটকিলে, লেজের তলার আচ্ছাদক কালচে, ওর থেকে ঝোলা সরু ঝালর পালক সাদা। কনীনিকা টকটকে লাল, চোখের পাতা সীসে-ধূসর, তাকে ঘিরে লাল গোল আঙটি। চঞ্চু শিঙে-সবুজ থেকে পাটকিলে-সবুজ, তলার চঞ্চুর ডগা হলদেটে। পা ও আঙুল লালচে-কমলা থেকে ইট-লাল। ল্যাগব্যাগ করে ওড়ার সময় এই পা দুটো ঝোলে। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান— স্থায়ী বাসিন্দা, সম্ভবত কিছুটা পরিযায়ীও হয়। পাকিস্তান ও উত্তর ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে কাশ্মীর, সেখান থেকে নিম্ন হিমালয়ের 1800 মি. উচ্চতার মধ্যে আসাম, দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লি, সেখান থেকে পুবে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে। ভারতের বাইরে উত্তর বার্মা ও আরাকানে। দেখা যায় জলা বা বাদা, প্লাবিত ধানক্ষেত, শর ও নলে আচ্ছাদিত খাল প্রভৃতি জলাশয়ের ধারে।

ডাক— নরম সুরে খানিক বাদে বাদে ডাকে 'ক্রোক', ধাতব 'টিউক' করে দু-তিন সেকেণ্ড অন্তর, আর মাঝে মাঝে 'চাক'। এই সবই শোনা যায় প্রত্যূষে এবং সন্ধ্যায়।

স্বভাব— খাদ্য ও স্বভাব খয়রির (স্পটেড ক্রেক)মত।

প্রজননকাল— পাকিস্তান ও কাশ্মীরে জুন থেকে আগস্ট, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সুন্দরবনে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর। ডিম পাড়ে 6 থেকে 9টি, ফিকে কফিতে দুধ মেশালে যে রঙ হয় সেই রঙের, তার উপর গোলাপী-পাটকিলে এবং ফিকে বেগুনি-ধূসর ছিট ও দাগ। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই বাসা বাঁধে, ডিমে তা' দেয় এবং সন্তান প্রতিপালন করে। ডিম কতদিনে ফোটে তা এখনও জানা যায় নি। ডিমের গড় মাপ 32·6 × 21·5 মিমি।

ডাহুক

1933 কি 34 সাল হবে। কোনও এক ছুটির দিনে আমরা আট দশ জনে মিলে সখের বাজারে পিকনিক করতে গিয়েছি এক বন্ধুর আত্মীয়ের বাগানবাড়িতে। গিয়েছি তখনকার 3বি প্রাইভেট বাসে চেপে। ওখানকার দ্বাদশ শিবমন্দিরের কাছেই বাগানবাড়িটা ছিল। গেট দিয়ে একটু ঢুকে বাড়ি। বেশ ছিমছাম। বাঁ-পাশে সানবাঁধান পুকুরের জল কাকচক্ষুর মত। নানা ধরনের ফলের গাছ পুকুরের ধারে। আমবাগানের মাঝে খোলা জায়গায় বন্ধুরা ইট পেতে রান্নার তোড়জোড় করতে লেগে গেল। আমি সরেজমিনে বাড়ির চারধারটা তদন্ত করতে করতে আবিষ্কার করলাম, বাড়ির পিছনে বাঁশঝাড় ও আগাছার ঝোপের মধ্যে একটা ছোট ডোবা। তালগাছ কেটে তার পৈঠা। খুবই নিরিবিলি। বন্ধুদের অস্পষ্ট হাসি-চিৎকার মাঝে মাঝে কানে আসছে। জায়গাটা খুব পছন্দ হয়ে গেল। বাড়ির একটা ঘরের কোণে হুইল ছিপ দাঁড় করান ছিল, সেটা গিয়ে নিয়ে এলাম। আসার সময় বন্ধুদের কাছ থেকে এক স্লাইস পাউরুটি, আর রান্নার ঘি থেকে একটু নিয়ে টোপ বানালাম। মাটি খুঁড়ে কয়েকটা কেঁচোও সংগ্রহ হল।



চি 78. ডাহুক

জলটল মেপে জুতসই করে বসেছি শেষ ধাপের পৈঠার উপর। দেখছি বুলবুল, ফিঙে, সিপাহী বুলবুলের ওড়াওড়ি, দোয়েলের ডাকও শুনছি, আর দেখতে পাচ্ছি ঝরা পাতার উপর তাদের লাফিয়ে চলা, পাতা উলটে পোকা খোঁজা। কানে আসছে কোথায় যেন দূরে ডাকছে পাপিয়া, মাঝেমাঝে কোকিল। এসব শুনছি, দেখছি, আর নজর রাখছি ফাতনার উপর। হঠাৎ বাঁ-পাশে হাত পাঁচেক দূরে ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বেশ বড়সড় এক দাঁড়াশ সাপ। মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে একবার তাকালো। ঐ পরিবেশে গাটা একটু ছমছম করে উঠল। নির্বিষ জানা সত্ত্বেও। সাপটা চলেছে দ্রুতগতিতে ডোবার ধার দিয়ে বাঁশঝাড়ের দিকে। বাঁশবনের ভিতর থেকে চারিদিক কাঁপিয়ে একটা ডাক উঠল... 'করর্-কোয়াক-কোয়াক, করর্-কোয়াক-ওয়াক ওক্-কুক-কুক-কুক'। তারপরেই একটা পিঠ কালো বুক সাদা পাখি লম্বা লম্বা পা ফেলে ডোবার পাড়ে চলে এল। এই

পাখির সঙ্গে আগে চাক্ষুষ হয় নি। কিন্তু দু'একটি আজগুবি গল্প শুনেছিলাম, তাই দেখামাত্র চিনলাম। আমার এক আত্মীয় সন্ত্রাসবাদী দাদা, যিনি বহু বছর জেলে অন্তরীণ ছিলেন, তাঁর মুখে শুনেছিলাম, বালক বয়েসে, পূর্ববঙ্গের দেশগাঁয়ে এই পাখি পুষে এদের ডাকে অন্য পাখিকে আকৃষ্ট করে, ফাঁদে ফেলে তাঁরা ধরতেন।

পাখিটা অম্বুকুক্কুট বংশের (রাললিদি) এক *প্রজাতি*। নাম– ডাহুক, ডাকপাখি, কোথাও বা পানপায়রা (আমাউররনিস ফোএনিক্যুরাস), ইংরেজি– *হোয়াইটব্রেস্টেড ওয়াটারহেন*। সংস্কৃত সাহিত্যে এদের অনেক নাম.... দাত্যোহ, অত্যূহ, কালকণ্ঠ, মাসঙ্গ শিতিকণ্ঠ, কচাটুর। এদের ডাকের খবর পাই কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত 'গোবিন্দলীলামৃত' গ্রন্থে, 'কৃষ্ণং বিনা সুলীলঃ কো বা ব্রজবনমৃতে কু বা নীচ্ছ। .... ঐতি দাত্যূহৈঃ কোকা কোবা ....। আমার শোনা ডাকটার সঙ্গে সংস্কৃত 'কোবা কোবা কুবা কুবা' ডাকটার বিশেষ তফাৎ নেই।

ডাহুক লম্বায় 32 সেমি। চোখের উপর দিয়ে ঘাড়ের পাশ, চিবুক, বুক থেকে পেট পর্যন্ত সাদা, তলপেটের শেষে ছোট লেজের তলা মলিন বাদামী-লাল। উপরাংশ গাঢ় স্লেট-ধূসর, লেজের গোড়া জলপাই-পাটকিলে। ডানা কালচে-পাটকিলে, একটা সাদা লাইন একদম ধারে। ছোট লেজ গাঢ় পাটকিলে। কনীনিকা রক্ত-লাল, অপ্রাপ্তবয়স্কদের পাটকিলে। চঞ্চু শিঙে-সবুজ, উপরের চঞ্চুর ডগা লাল, নিচের চঞ্চুর হলদেটে। লম্বা পা, আঙুলও লম্বা, রং হলদেটে-সবুজ। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান– পাকিস্তান থেকে উত্তর ভারত, নেপাল, সিকিম ও ভূটান ডুয়ার্স, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, দক্ষিণে মহারাষ্ট্র থেকে অন্ধ্রের উপরাংশে 1500 মি. উচ্চতার মধ্যে (বিংশতম প্যারালাল); ভারতের বাইরে বার্মা, থাইদেশ, দক্ষিণ চীন, মালয় উপদ্বীপ থেকে দক্ষিণে মালাক্কা, কাম্পুচিয়া, তাইওয়ান এবং হাইনানে। বর্ষায় ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। আড্ডা গাড়ে জলজ উদ্ভিদপূর্ণ জলায়, প্লাবিত ধানক্ষেতের পাশে, পুকুর, ডোবা, দীঘি, রাস্তার ধারে, নালায় এবং তার আশেপাশে।

খাদ্য– পোকামাকড় ও তাদের শূক, কম্বোজ, জলজ উদ্ভিদের ডগা, শিকড় ও বীজ।

অম্বুকুক্কুট বংশের ভিতর ডাহুক খুবই পরিচিত পাখি। বংশের অন্যান্য প্রজাতির চেয়ে এরা একটু কম লাজুক। গাঁ-গঞ্জের ধারে, রাস্তার পাশে, ঝোপঝাড়ে দৌড়ে বেড়ায়। এমনকি শহরের বুকে ঝোপঝাড়পূর্ণ পার্ক, বাগানবাড়িতে বেঁড়ে লেজটি উপরনিচ করে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। দেখা গেলেও এই আছে এই নেই ভাব। কখন যে টুক করে লুকিয়ে পড়ে তা ধরাই যায় না। প্রজননকালে প্রায়ই দেখা যায় ঘন কাঁটাওয়ালা বাঁশঝাড় স্বচ্ছন্দে বেয়ে একদম উপরে ওঠে পাতার আড়ালে আত্মগোপন করতে। সেখান থেকে চারপাশ দেখে আর ডাকে জোর গলায় 'কোবা কোবা কুবা কুবা'। বিপদের আশঙ্কা দেখলে চটপট নেমে আসে মাটিতে। ওড়াটা বংশগত। স্বচ্ছন্দের নয়, পা দুটো ল্যাগব্যাগ করে ঝুলতে থাকে। জলে ভেসে চলে পায়ের ধাক্কার সঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়ে বেঁড়ে লেজটি উপরে তুলে। ডাকটা একমাত্র বর্ষার সময় শোনা যায় বলে, অন্য ঋতুতে এদের অস্তিত্ব বোঝা শক্ত হয়ে পড়ে। নজরেই পড়তে চায় না।

প্রজননকাল– দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীর সময় অর্থাৎ জুন-জুলাই থেকে অক্টোবর। বাসা বনায়

গভীর পেয়ালার আকারে কাঠিকুটো লতা ইত্যাদি দিয়ে, যে কোনও জলের ধারে মাটিতে ঝোপের আড়ালে। পরপর অনেকগুলি বাসা দেখা যায়। কখনও দেখা যায় ঘর বানিয়েছে বাঁশঝাড়ের ভিতর, জমি থেকে 2-30 মি. উঁচুতে এবং জল থেকে বেশ দূরে। ডিম পাড়ে 6-7টি, লম্বাটে ধরনের পালিশ করা ঘি-রঙা বা ফিকে গোলাপি-সাদার উপর পাটকিলে ছিট ও ছোপের। ডিম ফোটে 20-21 দিনে। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই ডিমে তা' দেয় এবং সন্তান প্রতিপালন করে। ডিম ফুটলেই দেখা যায় দু'জনের একজন বাচ্চাদের পথ দেখিয়ে আগে চলেছে, আর একজন চলেছে পিছনে। সদ্যোজাত বাচ্চারা খুব চটপটে, ডুব দেয় অবলীলাক্রমে, বিশেষত ভয় পেলে বা শত্রু দেখলে।

কোরা (Watercock)

এই পাখিকেও কলকাতার বাদা অঞ্চলে অর্থাৎ লবণ হ্রদেই দেখেছি। ডাক শুনেই আকৃষ্ট হতাম বেশি। বেশ দূর থেকেই শুনতে পেতাম— 'কোক-কোক-কোক-কোক'। তারপরেই গুরুগম্ভীর স্বরে 'উট্টুম্ব-উট্টুম্ব-উট্টুম্ব' বা কখনও 'ক্লাক-ক্লাক-ক্লাক'। শুনেই বুঝতাম জলজ দামের ওপাশে তারা চরছে।

পাখিগুলি অম্বুকুক্কুট বংশের (রাললিদি) অন্তর্গত *এক প্রজাতি*। নাম— কোরা, জলমোরগ (গ্যালিক্রেক্স সিনেরিয়া), ইংরেজি নাম— *কোরা, ওয়াটারকক*, হিন্দি— *কাংগরা*। লম্বায় পুরুষ 43 সেমি (17 ইঞ্চি), স্ত্রী 36 সেমি (14 ইঞ্চি)।

কোরা বাদার পাখি। প্রজননকাল ছাড়া স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। দেহের উপরাংশ গাঢ় পাটকিলে, চওড়া করে খোলার মতো কাটা। নিম্নাংশ অল্প হলদেটে-পাটকিলে, তার উপর সরু করে ঢেউ খেলানো কালো টান। কপালে একটা ছোটো ত্রিকোণাকার হলদেটে শিঙের মতো শিরস্ত্রাণ। স্ত্রী-পাখি আকারে একটু ছোটো। প্রজননকালীন পুরুষের চেহারা মোটামুটি কালো, তার উপরে ধূসরের খোলা কাটা। সবচেয়ে আকর্ষনীয় হলো টকটকে লাল শিং যা সামনে থেকে পিছনের দিকে মাথার উপরে উঠে গেছে। টকটকে লাল চোখ ও পা।

বাসস্থান— হিমালয়ের দক্ষিণে পাকিস্তানের সিন্ধু, পাঞ্জাব থেকে পুবে আসাম, বাংলাদেশ, দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গ সহ সমগ্র ভারত, শ্রীলঙ্কা, আন্দামান ও নিকোবর এবং মালদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জ। দেখা যায় জলজ গাছপালায় পূর্ণ জলায়, নিচু জলভরা ধানখেত ও আখচাষের জমিতে, আগাছাপূর্ণ খাল, পুকুর, নালা ইত্যাদিতে। ভারতের বাইরে দক্ষিণ এবং পূর্ব চীন, কোরিয়া, জাপান, দক্ষিণে মালয়, ইন্দোচীন, সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও, ফিলিপাইন ও সেলিবিস দ্বীপপুঞ্জে।

খাদ্য— প্রধানত উদ্ভিদভোজী, বীজ ও সবুজ চারার ডগা, বুনো এবং চষাখেতের ধান। এছাড়া জলজ কীটপতঙ্গ, তাদের শূক, কম্বোজ, পোকামাকড় ইত্যাদি।

স্বভাব— সকাল-সন্ধ্যেয় বিচরণ করা। দিনের বেলায় জলজ আগাছার আড়ালে থাকে। সকাল ও সন্ধ্যেয় কিংবা মেঘলা বা ঝিরঝিরে বৃষ্টির দিনে আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে খাদ্য সংগ্রহ করে। জলার ধারের আগাছার বাইরে আসে লেজের পিছনটাকে ঝাঁকানি দিতে দিতে, কিন্তু পাড়ের কাছে

ঝোপের থেকে খুব দূরে নয়, যাতে সামান্য বিপদাশঙ্কায় ঝোপের আড়ালে আশ্রয় নিতে পারে। ওড়াটা দুর্বল, ঘন ঘন ডানা নেড়ে ঠ্যাং দুটো ঝুলিয়ে দিয়ে। পুরুষরা প্রজননকালে খুবই ঝগড়াটে। প্রায়ই দেখা যায় প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে ঘোরতর লড়াইতে মত্ত। দু'জনেই লাফিয়ে পরস্পরকে আঁচড়ে চেষ্টা করে প্রতিপক্ষের ঘাড়ে চঞ্চু বসিয়ে নিচে দাবিয়ে রাখার। যদিও দেখা যায় প্রবল লড়াই, আসলে কিন্তু পরস্পরের মধ্যে আঁচড় বা ঘাড়ের কিছু পালকই শুধু নষ্ট হয়, মারাত্মক কিছুই হয় না। ডাকের সময় ঘাড়ের পালক ফোলায়। ডাক চলে প্রায় আধঘণ্টার মতন।

প্রজননকাল— জুন থেকে সেপ্টেম্বর। কোথাও কোথাও কেবল জুন-জুলাইতেও দেখা যায়। বাসা বানায় বড়ো কাপের মতন হোগলা জাতীয় পাতা, ঘাস ইত্যাদি দিয়ে বড়ো জলায়, ঝিলে কিংবা বন্যাবিধ্বস্ত ধানখেতের মধ্যে। ডিম পাড়ে সাধারণত 3 থেকে 6টি, কখনও কখনও দেখা যায় 4টি, এমনকি 7টিও দেখা গেছে। দেখতে প্রায় সাদা থেকে ফিকে গোলাপী কিংবা পাথুরে-হলদে থেকে গাঢ় ইট-লাল, তার উপর লম্বালম্বিভাবে ছোপ ও ছিট থাকে লালচে-পাটকিলের, তবে ডিমের চওড়া অংশে এই লালচে-পাটকিলের একটু ঘন ছোপ ও ছিট থাকে। ডিমের গড় মাপ 42.2 × 31.0 মিমি।

বাংলাদেশের শ্রীহট্ট বা সিলেটে লড়াইয়ে পাখি বলে এর খুব আদর ছিল একসময়। লড়াইয়ের সময় বেশ মোটা বাজি ফেলা হতো। যারা এই লড়াই পরিচালনা করত, তারা বাচ্চা ফোটাত আধখানা নারকেল মালার মধ্যে ডিম রেখে। তারপর সেই মালাকে দিনরাত পেটের সঙ্গে কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখতো। তারা সেইসময় স্নান করতো না। ডিম ফুটতো 24 দিনে, এই জিনিস এখনও চলে কিনা জানা যায় না।

জলমুরগি (Moorhen)

বাদা বা লবন হ্রদের সঙ্গে যিনি আমায় প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, সেই প্রমথ খুড়ো আজ গত। তাঁর সঙ্গেই বহু দেশীবিদেশী জলচারী পাখিদের ওখানে প্রথম দেখি। 13নং প্রাইভেট বাসে মানিকতলার মোড় থেকে বেঙ্গল কেমিক্যালের গেটে স্তবরত গড়ুরের মূর্তি দেখা যায়, গেটে পৌঁছে কয়েক গজ হেঁটে গেলেই পারাণীর ঘর। সেখানে সভ্য সমাজের আবরণ ছেড়ে ঐ বাদার উপযুক্ত সাজ পরে নৌকোয় খাল পার হয়ে বিশাল বিশাল জলকর আর নলখাগড়া শর ইত্যাদি জলজ আগাছার মধ্যে পৌঁছতাম। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির অপরূপ শোভায় সেই পরিবেশে নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম। একাত্ম হয়ে যেতাম।

বেশ মনে আছে সেই প্রথমদিনের ভোরে সূর্য তখনও ওঠে নি, দু-পাশে জলকর, মাঝের আলপথ দিয়ে এসে পৌঁছলাম একটা জমিতে, যার বাঁদিকে শর ও নলবনের ভিতর থেকে আওয়াজ ভেসে এল 'কুঁক,-কুরুক কুরুক, কিররিক-ক্রেক-রেক-রেক'। গলার ভিতর থেকে ডাকটা আসছে। পাখার ঝাপটার আওয়াজ শুনছি কিন্তু কি পাখি জানি না। সেই জলকরটার চারিদিকে নলবনে ঢাকা।

...কোন উপায় নেই। পাড় থেকে নেমে নলবন ঠেলে হাত কুড়ি গেলে উন্মুক্ত জায়গায় পৌঁছলেই ...ডাক শুনছি তাদের দর্শন পাওয়া যাবে। সুতরাং জলে নেমে নলের গোছা ঠেলে দু-চার ...পরেই, আমার জল ঠেলা আর নল ফাঁক করার আওয়াজে কানে এল ফটফট আওয়াজ। ...দু'দিকেই কারা যেন নলবনের ভিতর দ্রুত আত্মগোপন করছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ি। ...পাঁচেক স্থির হয়ে থাকার পর আবার ডাক আর পাখার ঝাপট শুনলাম। বুঝলাম ওরা লুকোন জায়গা থেকে উন্মুক্ত জলে বেরিয়েছে। খুব সন্তর্পণে জলে শব্দ না করে নল ফাঁক করে এক-পা এক-পা করে উন্মুক্ত স্থানের কাছে এলাম। নলের ফাঁকে চোখ লাগিয়ে দেখি দু'দিকে কমপক্ষে গোটা পনের-কুড়ি করে কালো মুরগির ছাঁনার মত পাখি, কেউ জলের উপর বক দেখানর মত মাথা সামনে-পিছনে করে সাঁতার কাটছে, কারুর পিছনটা দেখা যাচ্ছে লেজ তুলে চলেছে, তলাটা সাদা, তার মাঝে কালো ছোপ। চঞ্চুর গোড়ায় লাল ছোপ। দু-একটা নলের উপর পা আঁকড়ে বসেছে, তাদের পা সবুজ, গুলফের নিচে পা যেখানে শুরু হয়েছে সেখানে লাল গার্টারের মত সরু পটি।



চি.70 জলমুরগি

আমার প্রথম দেখা। প্রমথ খুড়ো নাম বলল 'জলমুরগি'। বাড়ি ফিরে বই দেখেও জানলাম। এরা অম্বুকুক্কুট বংশের (রাললিদি) এক *প্রজাতি*, নাম জলমুরগি (গাললিন্যুলা ক্লোরোপাস), ইংরেজি— **ইন্ডিয়ান মুরহেন**।

লম্বায় 32 সেমি। উপর কালো, স্লেট ধূসর এবং পাটকিলে। পাখা বন্ধ থাকলে একটা সাদা বাঁকাচোরা লাইন ...নার তলার দিকে। নিচে স্লেট-ধূসর, ক্রমে ফিকে। সাদাটে ভাব পেটের মাঝখানটায়। লেজের তলা সাদা, মাঝে কালো ছোপ। সবুজ চঞ্চু, কপালে বর্ম বা শীল্ড উজ্জ্বল লাল, লম্বা সরু আঙুলসহ লম্বা সবুজ পা। কনীনিকা লাল। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান— সমগ্র ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা। স্থায়ী বাসিন্দা, আবার কিছু পরিযায়ী হয়েও আসে, সেটা বোঝা যায় তাদের সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে যাওয়াতে। ভারতের বাইরে দক্ষিণ তিব্বত, দক্ষিণ ও পূর্ব চীন, জাপান, বার্মা, থাইল্যান্ড, মধ্য মালয় উপদ্বীপ, কাম্বোডিয়া, ফরমোসা এবং রাইউকিউ দ্বীপপুঞ্জ।

সাধারণত সমতলেই বেশি, তবে বহির্হিমালয়, হিমালয়ের কাশ্মীরে 2400 মি. এবং দক্ষিণ ভারতের নীলগিরিতে 2000 মি. উচ্চতার মধ্যে বাসা বাঁধতে দেখা যায়। ঝিল ও বাদায় যেখানে নলখাগড়া, অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ, পদ্মবন এবং ভাসমান উদ্ভিদের সঙ্গে উন্মুক্ত জলাশয়, পুকুর বা দীঘির ধারে নলখাগড়ার ঝোপের ভিতর এরা বাস করে। জলের অবস্থা বুঝে কিছু কিছু এধার-ওধার সরেও

যায়। এদের পায়ে আঙটি বেঁধে দেখা হয়নি কোথা থেকে পরিযায়ী হয়ে আসে। তবে পাকিস্তানে কুররাম উপত্যকায় মার্চ-এপ্রিলে পরিযায়ী হয়। মে মাসে চিত্রলের ভিতর দিয়ে কিছু আসে। এপ্রিল থেকে অক্টোবরের মধ্যে গিলগিটের ভিতর দিয়ে আসার সময় বেশি দেখা যায়।

খাদ্য— এরা সর্বভুক। বিভিন্ন ধরনের বীজ, ফল, জলজ উদ্ভিদের ডগা, কম্রোজ, কীটপতঙ্গ ও তাদের শূক, ব্যাঙাচি এবং ছোট মাছ। মাঝে মাঝে প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় জলা ছেড়ে বেশ দূরে খেতের জমিতে বিচরণ করতে দেখা যায়। কিছুটা আবার নিশাচরও।

জোড়ায় বা ছোট দলে, তারপর শীতের আগন্তুকরা এসে হাজির হলে 50 বা তারও বেশি দলে জমায়েত হয়। বেশির ভাগ সময় জলের উপরই কাটায়। শালুক, পদ্ম বা অন্যান্য ভাসমান উদ্ভিদের ভিতর পা দিয়ে জল ঠেলে ঠেলে নিঃশব্দে সাঁতার কাটে। হাঁসের মত শরীরটাকে উঁচু করে ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে চলে, থেকে থেকে লেজটাকে তুলে তলার সাদা ও কালো ছোপ দেখায়। কখনও দেখা যায় ভাসমান উদ্ভিদের উপর দাঁড়িয়ে খাদ্য খুঁজতে। সামান্যতম বিপদের আভাস পেলে নল বনের ভিতর খুব দ্রুত আত্মগোপন করে 'কুঁক'-কাররুক' আওয়াজ করে। আত্মগোপন কবার সময় ডানার চেয়ে পায়ের ব্যবহারই বেশি করতে দেখা যায়। খুব অসুবিধেয় পড়লে, খুব অনিচ্ছায় জলের উপর ঝাপটাতে ঝাপটাতে অনেকটা কারণ্ডবদের (কূট) মত জল ছেড়ে ওড়ে। পা-দুটো তখন ল্যাগব্যাগ করে ঝুলতে থাকে। মনে হয় এরা ওড়াটা খুব পছন্দ করে না, কিন্তু পরিযানের সময় অবলীলাক্রমে বড় বড় পাহাড়-পর্বতের উপর দিয়ে সহজেই উড়ে যায় দূরদূরান্তরের দিকে। প্রয়োজনে ডুবসাঁতার দিতেও খুব পটু।

প্রজননকাল— মে থেকে আগস্ট, বিশেষত জুন-জুলাইতে কাশ্মীরের ডাল, আনচর ও অন্যান্য হ্রদে রীতিমত ভিড় করে বাসা বাঁধে। ভারতের অন্যান্য স্থানে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীর সময় অর্থাৎ জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর, শ্রীলঙ্কায় মার্চ থেকে আগস্ট তাদের সময়কাল। বাসা বাঁধে নলখাগড়ার ঝোপের ভিতর কয়েক সেমি উপরে শুকনো কাঠি ও নলের পাতা দিয়ে। ক্বচিৎ জলের ধারে ঝুঁকে-পড়া গাছের উপর এদের বাসা দেখা যায়। ডিম পাড়ে ফিকে হলুদ থেকে পাথুরে-হলদেটে, 5 থেকে 12টি, তার উপর খুব ছোট ছোট ছোপ থাকে গাঢ় লালচে-পাটকিলের। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই বাসা বাঁধা থেকে সন্তানপালনে সমান যত্ন নেয়। ডিম ফোটে 21 দিনে। এই সময় বাপ-মাকে দেখা যায় জলের উপর পাখা ঝাপটিয়ে আহত হবার ভান করে অবাঞ্ছিতকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

কামপাখি

পুরনো লবণ হ্রদে সবসময়েই যে রাতশেষে সূর্যোদয়ের আগেই পৌঁছে এখোল-সেখোল করে বাড়ি ফিরতে দেড়টা-দুটো করতাম তা কিন্তু নয়। মাঝেমাঝে খেয়েদেয়ে বেলা দেড়টা-দুটো নাগাদ শীতের ভরদুপুরে ওখানে পৌঁছতাম। তখন কোন জনমানুষের চিহ্ন দেখা যেত না। শুধু জলের

উপর সূর্যের আলো পড়ে চিকচিক, অল্প বাতাসে মৃদুমৃদু ঢেউ, নলখাগড়ার আড়ালে জলমুরগি ডুবুরিদের আনাগোনা, পাখার ঝাপটানি, তাদের ডাক, পানকৌড়িদের হয় জলে ডোবা বাঁশের খুঁটির উপর বা জলের ধারে প্রায় নেড়া গাছের ডালে বসে দুই ডানা ফাঁক করে, পিঠ পিছন করে রোদে শুকনো পরঘাসের উপর নানা জাতীয় ফুটকিদের ওড়াওড়ি, দোল খাওয়া, ফটকা মাছরাঙাদের শূন্যে খানিক স্থির হয়ে মাথা নিচু করে সশব্দে জলে ঝাঁপ দেওয়া, ছোট মাছরাঙাদের পাড়ের উপর জলে ঝুঁকে থাকা আগাছার উপর বসে একদৃষ্টে জলে তাকান, শঙ্খ চিলের উদাস সুরে 'ঘুরি আঁহা' ঘুরি আঁহা ডাক, মাছমৌরলদের ডানা বিস্তার করে ওড়া, আর কখনও জলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বড়সড় মাছ ধরে উড়ে যাওয়া, শালুক দামের উপর জলপিপি জলময়ূরদের লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে হাঁটা, এই সব দেখতে দেখতে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে চলে যেতাম অনেক দূর। পড়ন্ত বিকেলে ফিরতাম। তখন তার আর এক রূপ।



চি ৪০, কাম পাখি

এমন এক দুপুরে বেরিয়ে সূর্য অস্ত যাবার আগের মুহূর্তে ফিরছি। নীল আকাশে লাল আর হলুদের খেলায় কত রকমেরই যে রূপ সৃষ্টি হয়েছে তা ভাষায় ব্যক্ত করা শক্ত। ফিরছি কেষ্টপুরের খালকে ডানদিকে রেখে। এই খাল ধরে নৌকো বেয়ে ভাঙর পর্যন্ত গিয়েছি। ডানদিকে খাল বাঁদিকে ধানজমি। ধানকাটা হয়ে গেছে। খড়ের গোড়াটা এবড়ো-খেবড়ো জমির মধ্যে ইঞ্চি দুই-তিন করে জেগে আছে। এর পরেই জলকর শুরু। হঠাৎ দেখি বাঁদিকে আলের গা ঘেঁষে খুব সন্তর্পণে চলেছে অপূর্ব-সুন্দর বেগুনি-নীল রঙের একটি বড় পাখি। তার লম্বা পায়ের চেয়ে লাল আঙুলগুলো বেশ বড়। আঙুল ও পায়ের অনুপাতটা একটু বেঢপ। বেটে ভোঁতা লাল চঞ্চু, কপাল পালকহীন লাল চামড়ার। থেকে থেকে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বেঁড়ে লেজটা ঝাঁকি দিয়ে উপরে তুলছে, তখন তার তলার সাদাটা দেখা যাচ্ছে। চিড়িয়াখানায় এই পাখি ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি। তাই মুক্ত স্বাধীন অবস্থায় চিনতে অসুবিধে হল না। পাখিটা আলের গা ঘেঁষে ধীরে ধীরে দামে ভর্তি খোলের মধ্যে নেমে গেল।

পাখিটা ছিল লব বর্গের (গ্রুইফরমেস) অন্তর্গত অম্বুকুক্কুট বংশের (রাললিদি) *এক প্রজাতি।* নাম—কামপাখি, কায়েম (পরফাইরিও পরফাইরিও), ইংরেজি— *পার্পল মূরহেন।*

কামপাখি লম্বায় 43 সেমি। স্ত্রী-পাখির কপালের নেড়া লাল চামড়াটা কেবল একটু ছোট। পুরুষের কনীনিকা গাঢ় রক্ত-লাল, স্ত্রী ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের পাটকিলে-লাল। চঞ্চু ও কপাল রক্ত লাল-পাটকিলে, পা ও আঙুল ফিকে লাল, গাঁটগুলোতে পাটকিলের ভাব, নখর মলিন লাল, ডগাটা গাঢ়।

বাসস্থান— সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা। বড় বাদা বা ঝিলে যেখানে নল-খাগড়ার ঘন ঝোপঝাড়, সেখানে এদের আবাসভূমি।

খাদ্য— প্রধানত নানা ধরনের বীজ, খাদ্যশস্য, উদ্ভিজ্জবস্তু, কীটপতঙ্গ ও কম্বোজ। সন্ধ্যের মুখে

ধানখেতের ভিতর ঢুকে শিকড়ের গোড়ার কাছ থেকে কেটে নরম শীস ও পাকা ধান খায়, কিন্তু এই সময় তাদের লম্বা ও ভারি পায়ের চাপে ধানগাছের ক্ষতিও হয় খুব।

স্বভাব— সাধারণত 5 থেকে 10টি দলে দেখা যায়। বড় বাদায় 50 কি তারও বেশি জমায়েতে চরে বেড়ায়। লবণ হ্রদে একরকম এক জমায়েত দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। ভাসমান ঘাসের চাপড়া ও নলের ভিতর বেশিরভাগ চরছিল লেজে ঝাঁকি দিয়ে তলাটা দেখিয়ে। কিন্তু আবার খাগড়ার ডগায় উঠছিল পায়ে পায়ে। ওদের ভারে খাগড়ার ডগা বেঁকে যাচ্ছিল। উঠতে গিয়ে পড়ে গেলেও ওঠার চেষ্টার কামাই ছিল না। জলের উপর ছিল কুয়াশা। রোদ ছিল খাগড়ার ডগায়। এই ওঠাটা রোদ পোহাবার জন্যেই বলে মনে হয়েছিল। সাঁতারও বেশ ভাল কাটে। তবে নিতান্ত বাধ্য না হলে কাটতে চায় না। হাত দশেকের মধ্যে আত্মগোপনের জায়গা কিন্তু দেখা গেল প্রায় জল ঘেঁষে, ঠ্যাং দুটো ল্যাগব্যাগ করে ঝুলিয়ে উড়ে গেল। অথচ জলের উপর গোটা কতক পায়ের ঠেলায় শব্দ না করে লুকোতে পারত। ওড়াটাও যে খুব পছন্দ করে তাও নয়। যত সম্ভব পারে হেঁটে বা একটু দ্রুতগতিতে গিয়ে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। আবার এও দেখেছি, নলের ডগায় কোনরকমে উঠে সেই বড় ঝাড়টা কষ্টে উড়ে পার হয়ে অন্যদিকে নামতে। ওড়াটা খুবই দুর্বল, ডানার ঝাপট খুব স্বচ্ছন্দের নয়, কিন্তু একবার উড়লে তখন বেশ দ্রুত উড়ে চলে, গলাটা সামনে বাড়িয়ে বড় ঠ্যাং দুটো পিছনে ঝুলিয়ে। সব সময়ে মুখে মুরগিদের মত কঁক কঁক ডাক। প্রজননকালে সেটা খুব বাড়ে, তখন ডাকতে ডাকতে পরস্পরের মধ্যে অসম্ভব ঝগড়া করে। একে অন্যকে সেই সঙ্গে তাড়া করে বেড়ায়। অনেকের কাছে এর মাংস খুব সুস্বাদু, তাই স্থানীয় শিকারীদের হাতে মারাও পড়ে।

প্রজননকাল— প্রধানত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীর সময় অর্থাৎ জুন থেকে সেপ্টেম্বর। আবার অন্ধ্রে নভেম্বর ও ফেব্রুয়ারি, মহীশূরে নভেম্বর থেকে জানুয়ারি, শ্রীলঙ্কায় জানুয়ারি থেকে মে, কখনও জুলাই-আগস্টেও। বাসা বাঁধে নলখাগড়ার পাতা, ধানগাছ, ঘাসের গোড়া দিয়ে বেশ শক্ত করে বুনে, ভাসমান ঘাসের চাপড়ার উপর অথবা ঐভাবে জলমগ্ন খাগড়ার ঝোপে জল থেকে এক মিটার উপরে। ডিম পাড়ে 3 থেকে 7টি লম্বাটে গড়নের ফিকে হলদেটে পাথুরে বা লালচে-হলুদ রঙের, তার উপর লালচে-পাটকিলের ছোপ। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই বাসা বাঁধে, কিন্তু ডিম কদিনে ফোটে বা পুরুষও তা দেয় কিনা তা এখন ও জানা যায় নি। পুরুষ মিলনের আগে চঞ্চুতে জলজ আগাছা নিয়ে স্ত্রী-পাখির সামনে মাথা উঁচু-নিচু করতে করতে নানারকম আওয়াজ করে।

কারণ্ডব

কলকাতার উপকণ্ঠে যখন লবন হ্রদে যেতাম, তখন প্রায়ই দেখতাম শীতে উড়ে আসা অনেক পাখি ও অন্যান্য পরিযায়ী হাঁসের মধ্যে মিশ্র কিছু পাখি, যাদের দেহের গড়ন হাঁসের মতো, কিন্তু চঞ্চু হাঁসের মতো চ্যাপটা ও চওড়া নয়, সাদা সূঁচলো তিনকোণা বর্মের আকারে কপালের উপরে।

...জলকে হাঁস বলে দৃষ্টিভ্রম হয়, কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, এদের লেজ নেই বললেই চলে। সাঁতার কাটাটা কিন্তু হুবহু হাঁসের মতো।

এই কালো পাখিগুলোর সম্বন্ধে জানবার অদম্য কৌতূহল হল। মুশকিল হল, এদের কাছে যাওয়া। একেবারে খোলের মাঝখানে উন্মুক্ত স্থানে রয়েছে। জল ভেঙে কাছে যাবার চেষ্টা করলেও জলের উপরে কিছুটা দৌড়ে কিছুটা উড়ে ঝপ করে জলে পড়ে, মাথা ও গলাটা সামনে-পিছনে করতে করতে সাঁতার কেটে দূরে সরে যায়। অনেক চেষ্টা করেও নমুনা সংগ্রহ করতে পারলাম না।

নমুনা সংগ্রহ করলাম কিছুদিন বাদে চব্বিশ পরগণায় কালিকাপুরের জলায়। কালিকাপুর ক্যানিং লাইনে সোনারপুরের পরের স্টেশন। লবণ হ্রদের কিছু অংশ ওখান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সালতি করে নলখাগড়া ও শর আচ্ছাদিত জলার ভিতর চলতে হত। এখন আর সেই জলার চিহ্নমাত্র নেই। মানুষের স্বার্থের জন্যে সেই মনোরম স্বর্গীয় পরিবেশ ধ্বংস হয়েছে। ঐখানে এক জলায় দেখেছিলাম এই পাখি শ'য়ে শ'য়ে। আমাদের সঙ্গে এক স্থানীয় অধিবাসী ছিলেন তিনি নাম বললেন, 'ডোমকুর'। বাড়িতে বই দেখে জেনেছিলাম অম্বুকুক্কুট বংশের (রাললিদি) এক *প্রজাতি*। নাম— কারণ্ডব, জলকুক্কুট (ফুলিকা আট্রা), ইংরেজি— কূট, হিন্দি— *দশারি*। কারণ্ডব সংস্কৃত নাম, কালিদাসের কাব্যে ও নাটকে উল্লেখ আছে। কারণ্ডব লম্বায় 42 সেমি। উপরের পালক কালোচে-ধূসর, মাথা, গলা ও লেজের শেষের দিকে আচ্ছাদক গাঢ় কালো, তলার পালক অপেক্ষাকৃত হালকা, ডানার ধারগুলো একটু সাদাটে। কনীনিকা লাল, ত্রিকোণাকার চঞ্চু ও কপালের উপরের বর্ম ফিকে নীলচে-সাদা, পা সবুজাভ, গাঁট ধূসর, আঙুলিতে ঝিল্লি-ঝালর বা লতি। আঙুল লম্বাটে, প্রত্যেকটি আঙুলে ভাগ ভাগ করা চওড়া লতি। ওজনে 400-875 গ্রাম। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।



চি 81. কারণ্ডব

বাসস্থান— সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। নানা জায়গা থেকে শীতে পরিযায়ী হয়ে এসে একত্র জড় হয়। কাশ্মীর ও হিমালয়ের অন্যান্য অঞ্চলে 2500 মি. উচ্চতার মধ্যে বাসা বাঁধে। ভারতের বাইরে প্রায় সমগ্র ইউরোপ ও এশিয়া, দক্ষিণে উত্তর আফ্রিকা, এশিয়া মাইনর, দক্ষিণ ..., অ্যাজোরস ও আইসল্যান্ডে, 12. 2. 29 তারিখ ইন্দোরে (23উঃ, 76পূঃ) আঙটি পরান পাখিকে পাওয়া যায় উজবেকিস্তানে (41° উঃ 69° পূঃ) মার্চ 1929 তারিখে, আরেকটিকে পরান হয় জুলাই 1934 কাজাকস্তানের আলাকল হ্রদে (47°উঃ, 75° পূ) তাকে পাওয়া যায় কাশ্মীরে (34° উঃ 75° ...) 19. 2. 38 তারিখে। এই দুটি জায়গার দূরত্ব মানচিত্রের উপর সোজা লাইন টানলে পর্যায়ক্রমে ...00 এবং 1600 কিমি।

খাদ্য— প্রধানত জলজ উদ্ভিদের কচি শীষ ও বীজ, বুনো ও চষা খেতের ধান, পোকামাকড়, কম্বোজ এবং মাঝেমধ্যে কুচো মাছ। ডাক শোনা যায় রাত্রে, বেশ জোরে ভেঁপুর মত আওয়াজ। এছাড়া নরম গলায় মুরগির মতো চাপা ডাক এবং হঠাৎ ছাড়া ছোট করে 'কুঁক কুঁক' আওয়াজ, খুব খারাপ শোনায় না।

স্বভাব— কারণ্ডব সংঘচারী। ছোট দলে জমায়েত হয়ে বিচরণ করে। শীতে উত্তর থেকে আসা পরিযায়ী দলও এসে মেশে। আগন্তুকদের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের কখনও মারপিট হতে দেখি নি। ডুব দিয়ে জলের তলায় থাকা আগাছা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। কোনরকম বিপদের আশঙ্কা বুঝলে জলের উপর আধা-দৌড়ে আধা-উড়ে চলে যায় নিরাপদ স্থানে। জাত শিকারীরা এদের মারে না মাংসে আঁশটে গন্ধ বলে, কিন্তু যারা ঝিল বা বাদার কাছাকাছি থাকে তারা শিকার করে এবং মাংসও খেয়ে থাকে। তাদের কাছে মাংস সুস্বাদু। হাঁসেদের মত সঙ্গে সঙ্গে জল ছেড়ে উড়তে পারে না। ওড়ার আগে জলের উপর পতপত করে খানিকটা দৌড়ানো চাইই। নির্মোচন বা কুরীচের সময় এরা ওড়ার ক্ষমতা হারায়, তখন গাঁয়ের ছেলেরা লাঠি পেটা করে মারে। সেই সময় কিছু পাখি ডুব দিয়ে নিচে নেমে জলজ অগাছা চঞ্চু দিয়ে চেপে ধরে শত্রুর হাত এড়ায়। মানবশত্রু ছাড়াও আরও দুটি শত্রু আছে এদের, যাদের হাতে মারা পড়ে। একটি হল— *মাচ্ছল (হালি আঈটাস লিউকোরাইফাস)*, ইংরেজি— *পালাস'স ফিশিং ঈগল*, অপরটি— *কালোজঙ্ঘা* (আকুইলা ক্লাংগা); ইংরেজি— *স্পটেড ঈগল*। এ সত্ত্বেও কারণ্ডবরা বাঁচার লড়াই ঠিক চালিয়ে যাচ্ছে, প্রমাণ করছে তাদের কষ্টসহিষ্ণুতা এবং স্থিতিস্থাপকতা।

প্রজননকাল— মে থেকে আগস্ট। আমাদের অঞ্চলে জুলাই-আগস্ট। এই সময় এদের চঞ্চুতে ঈষৎ গোলাপী আভা দেখা যায়। বাসা বাঁধে জল থেকে একটু উপরে ঘন নলখাগড়া বা শরের দামে, ওদেরই পাতা আর ডাঁটা দিয়ে। ডিম পাড়ে 5 থেকে 12টি, সাধারণত 6 থেকে 10টি হলদে বা পাটকিলে-ধূসরের উপর লালচে-পাটকিলে এবং কালচে-বেগুনি ছিট ও ছোপের। এই সময় খুব ঝগড়াটে স্বভাবের হয়। বাসার কাছাকাছি অন্য কেউ এলে ক্রুদ্ধভঙ্গিতে গলা বাড়িয়ে, বন্ধ ডানা পিঠের উপর তুলে, সীমানা ভঙ্গকারীকে তাড়া করে চৌহদ্দী পার করে দেয়। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই বাসা বাঁধা, ডিমে তা' দেওয়া এবং বাচ্চা প্রতিপালনে পরস্পকে সাহায্য করে। ডিম ফোটে প্রায় 21 দিনে।

সারঙ্গ বংশ

লীখ (Lesser Florican)

7ই আগস্ট 1981 তারিখে প্রকাশিত প্রখ্যাত পক্ষিবিদ ডঃ সালিম আলির 'লিটল ফ্লরিকন্স' পাখি দেখতে পাওয়া নিয়ে যে সংবাদ, তার পরিপ্রেক্ষিতে জানাচ্ছি :


চি 82. লীখ

সংবাদপত্রে যে নাম প্রকাশিত হয়েছে সেই নামে কোন পাখি ভারতে আছে কিনা তার পরিচয় এখনও পাই নি। নাম প্রকাশে ভুল হয়েছে। হবে, 'লেসার ফ্লরিক্যান' (Lesser Florican)। সারস বংশের (ওটিডি) অন্তর্গত, পাখিটির বাংলা নাম—লীখ, ছোট ডাহর (সাইফিওটাইডেস ইন্ডিকা)।

বাসস্থান— এক সময়ে পশ্চিমবঙ্গে একটু খরা অঞ্চলের ঘাসের ঝোপে বেশ দেখা যেত। ওরা ওই রকম জায়গাতেই বাস করে। পাকিস্তানের দক্ষিণ সিন্ধু, মাকরান তটভূমি থেকে পাঞ্জাব, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছসহ গুজরাট থেকে দক্ষিণে মহীশূর ও মাদ্রাজ এবং পূর্বে উত্তরপ্রদেশ, নেপাল তরাই, বিহার, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, এমনকি ভূটান ডুয়ার্সের তিস্তা নদীর পূর্বাঞ্চলেও ছিল এদের বাসস্থান। এখন কোথায় যে দেখা যায় তার খবর জানা নেই। হুকনা বা গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ডের মত এরাও আজ অবলুপ্তির পথে।

পক্ষিবিদ কে এস ধরমকুমার সিংজী 1943 থেকে 1949 পর্যন্ত লীখকে নিয়ে গবেষণা করেন এবং তা প্রকাশিত হয় বম্বে ন্যাচরাল হিস্ট্রি সোসাইটির জার্নাল, 49 খণ্ড, পৃঃ 201-16তে।

এদের এক জ্ঞাতি ডাহর, উলু ময়ূর (ইউপোডটিস বেঙ্গলেনসিস)। ইংরেজি— বেঙ্গল ফ্লরিক্যান। সেও বোধহয় আসামের কয়েকটি জায়গা ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না।

স্বভাব— লীখ বা ছোট ডাহর আকারে একটু মুরগীর মত, কেবল পা-দুটি লম্বা। পুরুষ লম্বায় (18 ইঞ্চি), 46 সেমি, স্ত্রী একটু বড় (20 ইঞ্চি), 51 সেমি।

প্রজননকালে পুরুষের দেহের রং মূলত কালো ও সাদা, মাথার অল্প নিচে ঘাড়ের দু'পাশে উল্টোদিকে ঘোরান 3টে করে 6টা কালো পালক। স্ত্রী-পাখির উপরাংশে ধূলো-হলুদের উপর তীরের ফলার মত কালো দাগ ও বুটি। গলার মাঝখান দিয়ে সমান্তরাল ভাবে দুটো কালো লাইন বুক পর্যন্ত, ঘাড়েও তাই। ঘাড়ের দু'পাশ পালকহীন। শীতকালে পুরুষরা স্ত্রী-পাখির মত দেখতে হয়। কনীনিকা মলিন-হলুদ বা পাটকিলে-হলুদ। উপরের চঞ্চু শিঙে-পাটকিলে, নিচের চঞ্চু হলদেটে-লাল। লম্বা পা এবং আঙুল লোমহীন ছাই-সবুজ।

খাদ্য— নানাজাতের পোকামাকড়, তার মধ্যে ঘাসফড়িংই সবচেয়ে প্রিয়, কখনও-সখনও বিছে, কেন্নো, গিরগিটি ও ব্যাঙ। চঞ্চু দিয়ে মাটি থেকে বা উঁচু ঘাসের উপর বসা পোকামাকড়কে গো-বকের মত কায়দায় ধরে, কিংবা হঠাৎ ওড়া ঘাসফড়িংকে ধরে শূন্যে লাফিয়ে।

ধরমকুমার সিংজী সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছে যেসব লীখকে প্রজনন করতে দেখেছেন, তারা আসে দলবেঁধে নয়, একা একাই উপদ্বীপাত্মক ভারতের অন্যান্য স্থান, বিশেষত গুজরাট ও বোম্বাই থেকে ক্যাম্বে উপসাগর পার হয়ে। এই আসাটা নির্ভর করে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর উপর মে থেকে আগস্টের

পুরুষরা ফেরে স্ত্রী-দের আগে।
ভিতর। ফিরে যায় অক্টোবর-নভেম্বরে। পুরুষরা ফেরে স্ত্রী-দের আগে। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে
প্রজননকাল— লীখদের অবলুপ্তির পথে যাওয়ার প্রধান কারণ— জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে পুরুষ-পাখি
প্রজননকালে স্ত্রী-জাতিদের আকর্ষণ করার জন্যে যে নৃত্য প্রদর্শন করে তার জন্যে। পুরুষ-পাখি
বহু স্ত্রী-সঙ্গ করতে অভ্যস্ত। পুরুষ-পাখি হয় খোলা জায়গায় না হয় ঘাসের ঝোপের ভিতর থেকে
একদম সোজাসুজি দু'তিন মিটার শূন্যে লাফিয়ে ওঠে, সেই সময় পা একদম গুটিয়ে নেয়, গলা
উল্টে প্রায় পিঠের উপর ঠেকায়, ব্যাঙের মত ডাকতে থাকে, আর দেহের দু'পাশে ডানা অল্পবিস্তর
করে ঘনঘন নেড়ে একটু ভাসে। তারপর লেজ ছড়িয়ে পা ধীরে ধীরে নামিয়ে নেয়, কখনও দুটো
পা ছুঁড়তে থাকে যেন শূন্যে দৌড়চ্ছে; আস্তে আস্তে প্যারাস্যুটে নামার মত নামে ঠিক যেখান
থেকে লাফিয়েছিল ঠিক সেখানেই। এই লাফ ও শূন্যে ভাসা ঘনঘন হতে থাকে। এই আচরণ
প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় বেশি দেখা যায়। মেঘলা বা ঝিরিঝিরি বৃষ্টির দিনে সারাদিনই এই ভাবে স্ত্রী-
পাখিকে আকর্ষণ করে। দু'একবার এক জায়গায় লাফিয়ে-দৌড়ে আর এক জায়গায় গিয়ে লাফায়।
এর ফলে শিকারীদের গুলি করার সুবিধে হয়। মাংসও সুস্বাদু। সুতরাং অবলুপ্তির পথে যাবেই।
ডিম পাড়ে জলপাই-সবুজের উপর পাটকিলে ছোপ ও ছিটের, 3টি কখনও 4 বা 5টি। পুরুষেরা
এক স্ত্রী-সঙ্গ করার পরই চলে যায় অন্য স্ত্রীর সন্ধানে। স্ত্রী-পাখিই মাটির উপরে একটু খোঁদলের
মধ্যে ডিম পাড়ে এবং সেই একা তা' দিয়ে ডিম ফোটায়। কতদিনে ডিম ফোটে তা এখনও জানা
যায় নি।

হুকনা - Great Indian Bustard

ঢোলু অহরে - Bengal Florican

কর্ষক বর্গ

কর্ষক বর্গে (অর্ডার গাললিফরমেস) দুটি মাত্র বংশে— দীর্ঘচরণ (মেগাপোডিদি) ও বিষ্কির (ফাজিয়ানিদি)।

দীর্ঘচরণ বংশের (মেগাপোড্ডিদি) পাখি পশ্চিমবঙ্গে কেন ভারতের আর কোনওস্থানে দেখা যায় না, দেখা যায় কেবলমাত্র নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। এই বংশের সঙ্গে বিষ্কির বংশের (ফাজিয়ানিদি) সম্পর্ক আছে। এদের প্রজননকালীন আকার সরীসৃপদের মতই। এরা ডিম পাড়ে হয় মাটির মধ্যে গর্ত করে, না হয় বালি ও গাছের পাতা জড়ো করে স্তূপ নির্মাণ করে, তার মধ্যে সেই ডিম ফোটে সূর্যের তাপে এবং পচা পাতার গরমে। পাখা গজায় পালক সমেত, উড়তেও পারে, এবং নিজেরাই খাদ্যসংগ্রহ করে নেয়। সাধারণত এদের বাস অস্ট্রেলিয়া অঞ্চলে। একমাত্র নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেই এদের দুই প্রজাতিকে দেখা যায়।

বিষ্কির বংশের (ফাজিয়ানিদি) পাখিরা অতি প্রাচীন কাল থেকে খাদ্যের জন্য 'শিকারের পাখি' নামে চিহ্নিত হয়ে আছে। এদের মধ্যে আমাদের মুরগী অতি পরিচিত পাখি। স্থলচর প্রাণী বলেই এই বংশের পরিচয়। মাটির উপর স্বচ্ছন্দ বিহারের জন্যে বলিষ্ঠ পালকহীন পা, পুরুষদের পিছনের পায়ে সাধারণত কাঁটার মতো একটু বেরিয়ে থাকে। কখনও কখনও স্ত্রী-দের পায়েও দেখা যায়। ডানা বেঁটে এবং গোলাকার। বেশির ভাগ প্রজাতি মাটির উপর পা দিয়ে অল্প খুঁড়ে তার মধ্যে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে বাচ্চা জন্মায় পালক সমেত এবং ডিম ফোটার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দৌড়তে পারে।

বিষ্কির বংশ

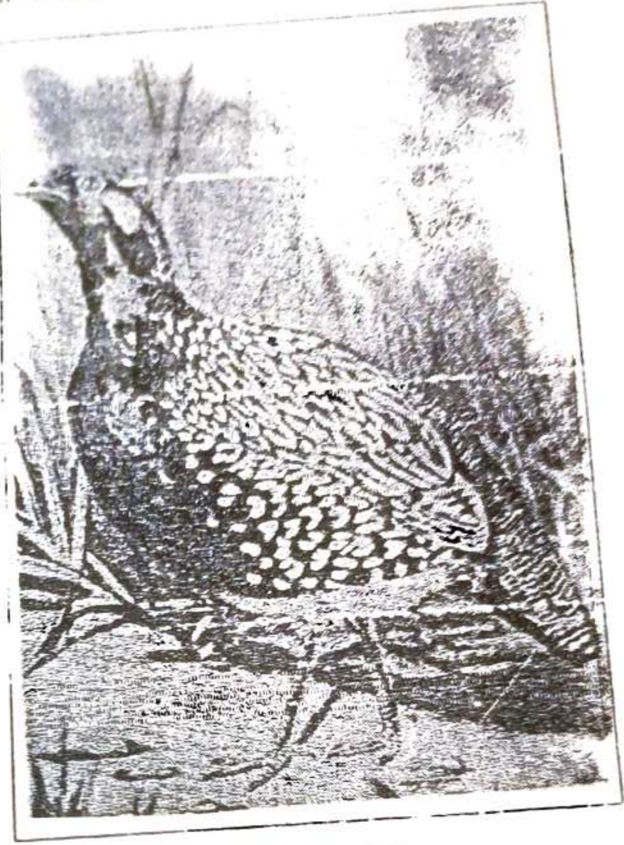
কালো তিতির (Black francolin)

1969 সালে নলহাটি স্টেশনে নেমে মোটরে গিয়েছিলাম বরনা বলে একটা গ্রামে, সারা বাংলা সাহিত্য সভার এক অধিবেশনে। শেষ রাতে ভোর হবার মুখে স্টেশন থেকে বেরিয়ে অপেক্ষারত মোটরে চড়ে চললাম।

চলেছি রাস্তা ধরে, হঠাৎ খুব জোরে একটা ডাক কানে এল। খুবই উচ্চৈস্বরে— 'ক্লিক.... কীক... কীক.... স্নাইকেক'। শোনাচ্ছে, 'শির-ডারেম-কাকরক' অর্থাৎ 'আমার আছে দুধ আর আছে একটু চিনি'।

কখনও শুনছি, 'শোভন, তেরি কুদরত', অর্থাৎ 'ভগবান, তোমারই শক্তি'। ভোজনবিলাসীরা শোনেন, 'লশুন-পিঁয়াজ-আদ্রক'। পাখিটাকে দেখতেও পেলাম, গলা উপর দিকে খাড়া করে তুলে আছে, আর সেই সঙ্গে লেজটাকে নাড়াচ্ছে উপর-নিচে করে।

পাখিটা দেখতে ঘন কালো। উপরাংশে সাদা ও হলদেটে-লালচে খোলাকাটা, সঙ্গে ছিট এবং ছোটো দাগও আছে। গালপাট্টা চকচকে সাদা, ঘাড়ে বাদামী ছোপ, বুকটা কুচকুচে কালো, পেট ও লেজের তলা বাদামী। কনীনিকা পাটকিলে, নখর কালো বা শিঙে-পাটকিলে। পাশেই ওর স্ত্রী-পাখিটা ছিল। সেটাও দেখতে প্রায় পুরুষের মতই তবে অনেক ফিকে রঙের, পাটকিলে ভাবও আছে। গালপাট্টায় সাদা নেই, কলারেও বাদামী ভাব নেই, শুধু ঘাড়ে একটা বাদামী ছোপ। তলায় চিবুক ও গলা হলদেটে-সাদা, বাকি তলার অংশে সরু সরু লাইন, সেই সঙ্গে সাদা-কালো খোলা-কাটা। পিছনদিক এবং লেজের তলা বাদামী। লম্বায় 34 সেমি (13 ইঞ্চি)-র মতো।



চি ৪১. কালো তিতির

বিষ্কির বংশের অন্তর্গত *এক প্রজাতি*। এই পাখির নাম— কালো তিতির (ফ্রানকোলিনাস ফ্রানকোলিনাস) ইংরেজি— *ব্ল্যাক পারট্রিজ*।

বাসস্থান— কাশ্মীর ও উত্তর ভারতের পাহাড়ের তলা ধরে নেপাল, আসাম, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ গুজরাটের দীশা থেকে মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র। সেখান থেকে ওড়িশার সম্বলপুর থেকে চিল্কা। নেপালে 2000 মি. এবং সিমলা অঞ্চলে 2500 মি. উচ্চতার মধ্যে, অন্যত্র 1200 মি-র নিচে। দেখা যায় উঁচু ঘাস ও ঝাউ জাতীয় গাছের জঙ্গলে কোনো খাল বা নদীর ধারে, কাছে ক্ষেত-খামার বিশেষত আখ ও জোয়ার-ভুট্টার ক্ষেত থাকে। এছাড়া হিমালয়ের পাদদেশে চা-বাগান অঞ্চলে।

খাদ্য— সর্বভুক। ঘাস ও ঐ জাতীয় গুল্মের বীজ, শস্যের দানা, নবাঙ্কুর চারা, পাতা, কন্দ, মাটিতে পড়ে থাকা বৈঁচি জাতীয় ফল, ডুমুর ইত্যাদি। শূক ও কোনও পোকা বিশেষত উঁই, ও তার ডিম। এমনকি সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মকথায় আছে, দেখা গেছে নেংটি ইঁদুর এবং গাঁয়ের ধাঁরে মানুষের মলও খেতে।

স্বভাব— কালো তিতিরকে দেখা যায় একা, না হয় জোড়ায় পরস্পরের একটু তফাতে। কখনওবা 3 থেকে 5 এর দলে। ঘাস-পাতায় ঢাকা আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে খাদ্য সংগ্রহের জন্যে, হয় খুব ভোরে না হয় সন্ধ্যের মুখে। তখন দেখা যায় আড়ালের ঠিক বাইরে এসে লেজটা একটু তুলে

...করতে। বিশ্রাম বা আশ্রয় নেয় ঘন বড়ো ঘাস বা আখের ক্ষেতের ভিতরে। অন্যান্যদের ...গাছের ডালে নেয় না। যদিও ডাকের সময় দেখা যায় অনেকসময়েই গাছের ডালে উঠে ...। এরা জঙ্গল-তাড়ুয়া (বীটার) অথবা শিকারীদের হাত থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টায় বেশ দৌড় ...জঙ্গল বা ঝোপের শেষে বাধ্য হয় উড়তে। পাখার দ্রুত ঝাপটের সঙ্গে বেশ খানিকটা ভেসে ...। কখনও দেখা যায় বেশ উঁচুতে উঠে জঙ্গল-তাড়ুয়া বা বীটারদের মাথার উপর দিয়ে ... 300 থেকে 400 মিটারের মতো, তারপর নেমে আবার দৌড়য়। এঁরা শিকারীদের খুবই ... পাখি এবং এদের মাংসও খেতে সুস্বাদু।

...— সাধারণত মার্চ থেকে অক্টোবরের মধ্যে। বাসা বাঁধে একটু লুকানো জায়গায়; ... পা দিয়ে খুব অল্প খুঁড়ে ঘাসের আস্তরণ বিছয়। কখনও কখনও দেখা যায় বেশ ... স্থানেই বাসা বেঁধেছে। ডিম পাড়ে 6 থেকে 9 টি বেশ চওড়া উপবৃত্তাকার এবং মসৃণ। মাঝে-... উপবৃত্তাকার ডিমের একদিকে একটু সূঁচালো ভাবও দেখা যায়। ডিমের রঙ হলদেটে-জলপাই, ...-পাটকিলে অথবা অল্প পাটকিলে। পুরুষ-পাখি স্বভাবে একগামী। ডিমে তা' দেয় একা ...পাখিই। ডিম ফোটে 18-19 দিনে।

1964 সালে উত্তর আমেরিকা সরকারের 'ফিশ অ্যাণ্ড ওয়াইল্ড লাইফ' সংস্থা ওখানকার শিকারের ... উপযোগী কালো তিতির এনে তাদের বাসোপযোগী জায়গায় ছেড়েছেন। তারা বেশ বহাল-...তেই ওখানকার আবহাওয়া ও বাসস্থানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে।

তিতির (Grey francolin)

প্রথম দেখি 52নং আমহার্স্ট স্ট্রীটে প্রয়াত কার্তিক বসুদের বাড়িতে। পাখিটা ছিল ওদের বাড়ির ...জের লোকের। বিহারে তার বাড়ি বলে নাম ছিল বিহারী। পাখিটা থাকত একটা খাঁচায়। বিকেলের ...কে খাঁচা থেকে বের করলে বিহারীর পিছু পিছু চলত। মনে হত যেন একটা কুকুর চলেছে। ...ঝে মাঝে বিহারী পেটের ভিতর থেকে আওয়াজ বের করে বলত— বোল বোল বোল বেটা ...। অমনি পাখিটা গলাটা সোজা করে উপর দিকে মুখ তুলে খুব জোরে ডেকে উঠত— কতিইই-... কতিইইটর কতিইইটর'। কখনও খুব উচ্চৈঃস্বরে ডাকত— 'কিইইররর ....কিইররর.... কিইররর'। ...নো কারণে উত্তেজিত হলেই এই ডাকটা দিত।

একদিন দুপুরের দিকে শুনি এক পানওয়ালার পাখির সঙ্গে বিহারীর পাখির লড়াই হবে। আমরা ...ই উৎসুক। পানওয়ালা তার পাখিকে নিয়ে এল এবং খাঁচা খুলে বের করল। বিহারীও তাই ...। তারপর দুই পাখি পরস্পরে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে মেতে গেল। এক সময় বিহারীর পাখি তার প্রতিদ্বন্দ্বীর ...ড়ের কাছে চঞ্চু দিয়ে চেপে তাকে মাটির দিকে নামিয়ে দিল। পানওয়ালার পাখিটা আর নড়তে ...রে না। সেটার ঘাড়ের কাছে চঞ্চুর আঘাতে তখন রক্ত ঝরছে। যে সব দর্শক দেখাছিল তারা ...ল, পানওয়ালার পাখিটা হেরে গেছে। পানওয়ালাও সেটা কবুল করল। তখন বিহারী তার ...খিটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে খাঁচায় ভরে ফেলল। তখনও পাখিটার কি রোষ। সে সমানে চিৎকার

করে যাচ্ছে, 'কতিইইটর কতিইইটর' করে।

বিহারী সেই পানওয়ালা আর ওদের দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেল। খানিক বাদে হাসিমুখে ফিরে আসাতে বিহারীকে জিজ্ঞেস করি, কত হল? সে কানে হাত দিয়ে বলে, পয়সা অয়সা কিছু নয়। এমনিই লড়াই। কিন্তু ওর মুখে বিজয়ীর সলজ্জ হাসি দেখে আমার সন্দেহ যায় না, কিছু পয়সার লেনদেন নিশ্চয়ই হয়েছে।

চি 84. তিতির

বিহারীর পাখিটা বিষ্কির বংশের (ফাজিয়ানিদি) অন্তর্গত এক প্রজাতি, নাম— তিতির, খৈর (ফ্রানকোলিনাস পনডিসেরিয়ানাস), ইংরেজি— *গ্রে পারট্রিজ*, হিন্দি— *সফেদ তিতার*। লম্বায় 33 সেমি (13 ইঞ্চি)।

তিতির দেখতে গাঁট্টাগোট্টা, বেঁটে লেজ শিকারের পাখি। বেশির ভাগ দেহ ধূসরাভ পাটকিলে-লালচে। উপরাংশ বাদামী, তার উপর ছোটো দাগ এবং খোলাকাটার রঙ লালচে-হলুদ আর কালো। নিম্নাংশ ফিকে লালচে-হলুদ ও লালচে। খুব সরু করে হলদেটে-লালচে ছোপ গলার সামনে, উপরের বুকে এবং পেটে, বুকের দু'পাশ কালো। গলার ছোপকে ঘিরে কালো মালার মতন। লেজ বেশিরভাগ বাদামী। পুরুষ স্ত্রীর চেয়ে আকারে একটু বড়ো। পায়ের পিছনে ধারালো নখরের মতো, মাঝে মাঝে দু'পায়েই এই নখর দেখা যায়। কনীনিকা হালকা বাদামী, চঞ্চু ধোঁয়াটে-সীসে, গোড়াটা মাংসল, পা ও আঙুল ময়লাটে-লাল।

বাসস্থান— পূর্ব সিন্দুদেশ, পূর্ব রাজস্থান, উত্তর ভারত থেকে পুবে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণে পুনা থেকে কাকিনাড়া। দেখা যায় শুকনো ঘেসোজমি ও কাঁটাওয়ালা গুল্মের জঙ্গলে গ্রাম ও খেতের কাছেই। এর আর একটি সংস্করণ আছে, তার নাম— 'হায়দ্রাবাদী তিতির' (ফ্রা প পনডিসেরিয়ানাস), ইংরেজি— *সাউথ ইন্ডিয়া* গ্রে পারট্রিজ। আমাদের তিতিরের চেয়ে একটু বড়ো।

খাদ্য— আগাছার বীজ, খাদ্যশস্য, ঘাস ও খেতের চারার ডগা, ল্যানটানা জাতীয় ছোটো কুঁচ ফল, ঘেসো ফড়িং, উঁই, কীটপতঙ্গের শূক, গাঁয়ের ধারের বাসিন্দাদের মল। বহুক্ষণ জল পান না করে থাকতে পারে।

স্বভাব— সাধারণত দেখা যায় হয় জোড়ায় না হয় পারিবারিক 4 থেকে 8 -এর দলে, প্রাণচাঞ্চল্যে গলা উঁচু করে ঘোরাফেরা করছে। তখন দেখা যায় হয় পা দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে, চঞ্চু দিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা পাতা বা আবর্জনা ঘাঁটছে, না হয় খাদ্যের জন্যে গবাদি পশুর গোবর ঘাঁটছে, অথবা ধূলাস্নান করছে। বিপদের গন্ধ পেলে সঙ্গে সঙ্গে খুব দ্রুত দৌড় লাগায় ঝোপ থেকে ঝোপে।

...নে বিভিন্ন ঝোপের তলায় একা বা জোড়ায় চুপ করে বসে পড়ে। বেশ দ্রুত দৌড়য় এবং ...উড়তে চায় না। কাছে গিয়ে পড়লে দেখা যায়, কেউ কেউ পাখার ঝাপটি তুলে দিকবিদিকে ছুটে চলেছে, না হয় এ ঝোপ থেকে সে ঝোপে ছুটে যাচ্ছে যতক্ষণ না বিপদমুক্ত হচ্ছে। ছোটো ডানার সাহায্যে খুব দ্রুত ঝাপট মেরে ওড়ে এবং সেইসঙ্গে খানিকটা জোরেও চলে। একমাত্র বন্দুকবাজদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যেই কচিৎ উপরে ওড়ে, তখন 50 থেকে 100 মিটার ...উড়ে তারপর নেমে সামনের ঝোপের তলায় আশ্রয় নেয়। বনতাড়ুয়ারা দেখে এইখানে এখানে, ...অপেক্ষা হল। তখন দেখা যায় ঝোপের তলা দিয়ে দিয়ে গিয়ে অনেকটা দূরে সরে গেছে। ...গাছের উপর আশ্রয় নেয়, হয় জোড়ায় না হয় পারিবারিক দলে। মাঝে মাঝে দেখা যায় ...কাঁটাওয়ালা ঝোপের উপর, না হয় তার তলাতেই আশ্রয় নিয়েছে।

প্রজননকাল— সাধারণত মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর। অন্যান্য মাসেও মাঝে মাঝে দেখা যায়। ডিম পাড়ে 4 থেকে 8টা, কখনও বা 9টা চওড়া উপবৃত্তাকার, রঙ ফিকে লালচে-হলদেটে। ডিমের গড় মাপ 32.4 x 25.6 মিমি। পুরুষ একগামী। ডিমে তা' দেয় স্ত্রী-পাখিই। ডিম ফোটে 18-19 দিনে। ছানাদের দু'জনেই দেখা-শোনা করে।

ভাটরি (Common quail)

1934-35 সাল। হঠাৎ সখ হল চাষবাস করতে হবে। 'আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি সুসভ্যতার আলোক', এই ভেবে বারাসাতের কাছে ছোটো জাগুলিয়া গ্রামে পৌঁছিলাম, প্রথম দিনের ভূ-বিজ্ঞানী শ্রদ্ধেয় শশীভূষণ বসু মহাশয়ের ওখানে। ছোটো জাগুলিয়া বিশ্বাস ও বসু পরিবারের দেশ। চিত্রজগতের স্বনামধন্য অভিনেতা ছবি বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ি ছিল ওখানেই। তিনি ছোটো জাগুলিয়ায় এলেই সুপ্রসিদ্ধা মৈত্রেয়ী বসুর বাবা শশীভূষণের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। ওখানেই একবার ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আমার।



চি 85. ভাটরি

সে যাই হোক, একদিন দুপুরে ঢাকা বারান্দায় আমার তক্তপোষের উপর শুয়ে আছি। দেখি ...মাদের বাড়ির বেড়ালটা আমার ট্যাঁড়শ খেতের তলায় চুপ করে বসে থেকে কি যেন লক্ষ্য ...ছে এক মনে। চুপচাপ শুয়ে বেড়ালটাকে দেখছি। ভাবছি ওটা ওখানে কী করছে! হঠাৎ দেখি

ঝাঁপিয়ে পড়ে কি একটা ছোটো পাখি ধরে নিয়ে আসছে। আমি চেঁ চেঁ ক'রে বেড়ালটার দিকে ছুটে গেলাম। সে ওই ছোটো পাখিটাকে নিয়ে লাগাল ছুট। অনেক দৌড়-ঝাঁপ অনেক ধস্তাধস্তির পর ওর মুখ থেকে পাখিটাকে ছিনিয়ে নিতে পারলাম। ততক্ষণে পাখিটা মরে গেছে।

আমার কাছে টি. সি. জার্ডনের তিন খণ্ড 'বার্ডস অফ ইণ্ডিয়া' বই ছিল। তার থেকে মরা পাখিটার পরিচয় বের করলাম। সেই পুরুষ পাখিটার মাথা ছিল পাটকিলে, মাথার ধার ফিকে এবং মাঝে একটা ফিকে লাইন। ভ্রূ, গাল এবং চোখের পাতা সাদাটে, কানের উপরে কিছু পালক কিছুটা পাটকিলে। পিঠের পালক পাটকিলে কিছু প্রতিটি পালক খোলাকাটা, বস্তিপ্রদেশ ও লেজের প্রতিটি পালকের একটা ধার ফিকে-হলুদ তার উপর একটা সরু কালো ছোপ, আবার কিছু সুতোর মতো করে ফিকে-হলুদ রেখার আঁকিবুকি। ডানার আচ্ছাদক ধূসরাভ-পাটকিলে, তার উপর খুব সরু করে ফিকে-হলুদের ছিট ও টান এবং ধারটা কালো। প্রাথমিক পালক গাঢ় পাটকিলে, বাইরের দিকে ফিকে হলদেটে-লালের কিছু ছিট ও টান। চিবুকের তলা ময়লাটে-সাদা, গলা লালচে-পাটকিলে, তার উপর এক জোড়া কালচে সরু পটি ফাঁক হয়ে আছে। বুকে ও ঘাড়ের পাশে কিছু কালো ছিট। বাকি তলার পালক ফিকে লালচে-হলুদ, যেটা আবার গলার তলায় ও বুকে এসেছে, তবে গাঢ় ভাবটা বেশি। পায়ুদেশ ও বুকের দু'পাশ মেটে রঙের। বুকের দু'পাশের লম্বা পালক ফিকে-চকোলেট, তার উপর চওড়া করে হলুদ টান এবং কিছু কালো ছোপ। চঞ্চু শিঙে-পাটকিলে, কনীনিকা হলদেটে-পাটকিলে, পা মাংসল-পাটকিলে।

পাখিটা কর্ষক বর্গের অন্তর্গত বিস্কির বংশের (ফাজিয়ানিদি) এক *প্রজাতি*। নাম— ভাটার (কটুরনিকস্ কটুরনিকস্), ইংরেজি— *গ্রে কোয়েল*, হিন্দি— *বটের*, বড়া বটের। লম্বায় 23 সেমি (9 ইঞ্চি)।

বাসস্থান— কিছু পাখি স্থানীয় আধিবাসী, আবার কিছু পরিযায়ী হয়েও আসে। পাকিস্তান, কাশ্মীরের 2000 মি. উচ্চতার মধ্যে, সেখান থেকে পূবে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশের হোসাঙ্গাবাদ এবং দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের সাতরা পর্যন্ত। মণিপুরে বাসা বাঁধে বলে সন্দেহ করা হয়। দেখা যায় তুলো, গম, চানা, জোয়ার, ভূট্টা প্রভৃতি খেতের তলায়, ধান খেতের গোড়ায়, বা ঘেসো জমিতে। ভারতের বাইরে 65° উঃ অক্ষাংশ থেকে দক্ষিণে ভূমধ্য সাগরের দ্বীপগুলিতে, উত্তর আফ্রিকা, বৈকাল হ্রদের পূর্বাংশ, 61° অক্ষাংশ থেকে দক্ষিণে এশিয়া মাইনর, পারস্য, আফগানিস্থান। শীতে পরিযায়ী হয় পাকিস্তানের চিত্রল, পেশোয়ার, কোহাট, কুররাম প্রভৃতি জায়গা থেকে। রাতেই উড়ে আসে 30-40 কখনও বা 100-র দলেও।

ডাক— পরিষ্কার শীসের মতো "ওয়েট মি লিপ্‌স"। এটা শোনা যায় খুব ভোরে এবং সন্ধ্যেবেলায়। কখনও কখনও রাতেও শোনা যায়। ওড়বার মুহূর্তে একটা শীসের মতো আওয়াজ করে।

খাদ্য— ধান, জোয়ার, ভূট্টা, এবং অন্যান্য শস্য, ঘাস এবং আগাছার বীজ, পিঁপড়ে, শুয়ো পোকা, অন্যান্য পোকা ও তাদের শূক।

স্বভাব— সাধারণত জোড়ায় বিচরণ করে। যেখানে ওদের খাদ্য প্রচুর সেখানে বেশ বড়ো দলে দেখা যায়। পাকিস্তান ও কাশ্মীরে দেখা যায় ফসল কাটার শেষাশেষি, কিছু বা কাটার তখনও

...কি। সেই সময় বনতাড়ুয়াদের দিয়ে তাড়ানো হয়। পাখিরা সোজাসুজি উঠে ওড়ে। তখনই শিকারীরা ...দিয়ে গুলি করে। পাঞ্জাবে একটি বন্দুক দিয়েই এইভাবে প্রায় পঞ্চাশটি পাখি মারা হয়। প্রাচীন কাল থেকে এরা এইভাবে শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে মারা পড়ছে। কেননা এদের মাংস ...সুস্বাদু। এত মারা যাওয়া সত্ত্বেও এদের বংশের কিন্তু কোনো ক্ষতি হয় নি, কারন এদের ...বেশ বেশিই হয়। পাকিস্তান এবং উত্তর ভারতে এদের খাদ্যের জন্যেই মারা হয়। অবশ্য ...কটি রাজ্যে এদের মারার বিরুদ্ধে আইন তৈরি হয়েছে। অনেক সময় এদের ধরে মাটির তলায় ...করে রেখে দেওয়া হয় মোটা করার জন্যে, যাতে খেতে আরও সুস্বাদু হয়ে ওঠে।

পাকিস্তান ও উত্তর ভারতে লড়াইয়ে পাখি বলে আদর আছে। মোটা রকম বাজি ধরে এদের ...হয়। লড়াই শেখার জন্যে এক হাতে পাখিটাকে রেখে সেখান থেকে অন্য হাতের চাটুতে ...য়ে নাচাতে হয়। এতে নাকি এদের পায়ের জোর বাড়ে। লড়াইয়ের সময় তাতে নাকি খুব সুবিধে হয়।

প্রজননকাল— মার্চ থেকে জুলাই। তবে সাধারণত দেখা যায় মার্চ-এপ্রিলেই বেশি। বাসা বাঁধে ...র মধ্যে আঁচড়ে অল্প খোঁদল করে। খেতের মাঝে শস্যের তলাতেই দু'চারটে পাতা ও ঘাস দিয়ে বাসা তৈরি করে। ডিম পাড়ে 3 থেকে 11টি, কখনও কখনও 13টিও পাড়তে দেখা যায়। ডিমের রঙ নানা রকমের হয়। লালচে-হলদেটে থেকে গাঢ় হলদেটে-পাটকিলে বা লালচে-পাটকিলে, তার উপর পাটকিলের ছিট ও ছোপ থাকে। ডিমের গড় মাপ 29·7 × 22·8 মিমি।

গুররু (King quail)

ভাটরির (গ্রে কোয়েল) মত আরেকটি পাখিকে প্রথম দেখেছিলাম পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগে ...বাগান হাট ও কলকাতার মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে চ্যাপ্ট ঝাঁকার মধ্যে। প্রাকৃতিক পরিবেশে দর্শনলাভ কখনও করি নি। পাখিটা ভাটরি, বটের বা গুলুর চেয়ে অনেক ছোট। গুড়গুড়ে ছোট পাখি। দেখতে বেশ। বিক্রেতাদের কাছে জেনেছিলাম ভাটরি, বটের, বগেরীর চেয়ে খেতে অনেক সুস্বাদু, সাহেব-সুবোদের খুব প্রিয়। স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে মনে হচ্ছে এক টাকায় গোটা চারেক কিনেছিলাম।

পুরুষের কপাল, চোখের তলা, ঘাড়ের দু-পাশ স্লেট-নীল। মাথা ও উপরের পালক জলপাই-পাটকিলে, মাথার মাঝখানে সিঁথিতে ফিকে আঁকাবাঁকা দাগ, পিঠ পাটকিলে, তার উপর লালচে-হলুদ, লালচে-পাটকিলে ও কালোর আঁকাবাঁকা ডোরা এবং চিত্র-বিচিত্র দাগ কাটা, চিবুক ও গলা সাদা, তাকে ঘিরে তিন কোণা গাঢ় কালো লাইন, তারপর সাদা, তাকে ঘিরে মালার মত কালো সরু পটি। বুক ও বুকের দু'পাশ স্লেট-নীল, বাকি তলপেট ও লেজের তলার আচ্ছাদক উজ্জ্বল তামাটে-লাল। স্ত্রী-পাখির তলাটা পুরুষের মত নয়, চোখের তলা, কপাল ও সাদাটে গলাকে ঘিরে লালচে-হলুদ, বুক পাটকিলে, তার উপর গাঢ় কালচে আঁকিবুকি, তলপেট সাদাটে, তার উপর লালচে-পাটকিলের আভা। পুরুষের কনীনিকা উজ্জ্বল গাঢ় লাল, স্ত্রী-পাখির পাটকিলে। উভয়ের চঞ্চু কালো, পা ও আঙুল উজ্জ্বল হলুদ, নখর ফিকে পাটকিলে।

এরা কর্বক বর্গের (প্যাসেরিফরমেস) অন্তর্গত বিষ্কির বংশের (ফাজিয়ানিদি) এক প্রজাতি। নাম— গুরগুরু, চিনে বটের (কটুরনিক্স চাইনেনসিস), ইংরেজি— ব্লু-ব্রেস্টেড কোয়েল। লম্বায় 14 সেমি (সাড়ে 5 ইঞ্চি), স্ত্রী-পাখি একটু ছোট, 12 সেমি (5 ইঞ্চি)।


চি ৪৬. গুরগুর

বাসস্থান— বোম্বাই থেকে সিমলা, উত্তর ওড়িশা, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, দক্ষিণে কেরালা ও কিছু পার্বত্য অঞ্চল এবং শ্রীলঙ্কা। এইসব স্থানে স্থায়ী বাসিন্দা হলেও সর্বত্র সমানভাবে নেই, বেশ ছড়ান-ছিটনোভাবে ছোট ছোট দলে থাকে। তাছাড়া বৃষ্টিপাতের হেরফেরে কিছু যাযাবরী (নোমাডিক) বৃত্তি গ্রহণ করে। সাধারণত সমতলবাসী কিন্তু 1800 থেকে 2000 মি. উচ্চতাতেও বাস করতে দেখা যায়। দেখা যায় বাদা অঞ্চলের ঘাসজমি, বর্ষার শেষে যে কোনও ঘাসজমি এবং মাঝে মাঝে কাদাখোঁচা চরা বাদাতে। এছাড়া দেখা যায়, রাস্তার ধারে ঘন ঘেসো বড় জায়গা ও পরিত্যক্ত চাষ-আবাদের ভিতর গজান ঝোপঝাড়ে, ধানখেতের কিনারায় এবং আসামে পাহাড়ের তলায় চা-বাগানে। ভারতের বাইরে পুবে দক্ষিণ পূর্ব চীন এবং সেখান থেকে দক্ষিণে মালয় উপদ্বীপ, থাইদেশ, ইন্দোচীন, হাইনান ও ফরমোসা। ভারত মহাসাগরে মরিশাস ও রিইউনিয়ন দ্বীপে পরিক্ষামূলক ভাবে কিছু ছাড়া হয়েছিল। দেখা গেছে সেখানে তারা খাপ খাইয়ে নিয়েছে। গুরগুরু পরিযায়ী হয় কিনা তা সঠিক জানা যায় নি।

খাদ্য— প্রধানত ঘাসবীজ ও বাজরা, জোয়ার, ভুট্টা ; ছোট পোকামাকড়ের মধ্যে উঁই সবচেয়ে প্রিয়।

ডাক— কোন কারণে ঝোপ বা ঘাসবন থেকে চমকে উঠে যখন ওড়ে, তখন মৃদু 'তির-তির তির' আওয়াজ করে।

স্বভাব— অন্যান্য বটেরদের চেয়ে এরা ভেজা জায়গা পছন্দ করে বেশি। সাধারণত জোড়ায় বা পারিবারিক ছোট দলে বিচরণ করে। দেখা যায় হঠাৎ একটি গুরগুরু আচমকা ঘাসবন থেকে শূন্যে উড়ল, আবার অল্প দূরে গিয়ে নেমে পড়ল ঝোপের মধ্যে, তারপর দ্বিতীয়বার আর উড়তে চায় না। একমাত্র শিকারীরা তাদের শিক্ষিত কুকুর দিয়ে উড়িয়ে থাকে।

প্রজননকাল— কোন স্থিরতা নেই, একেক জায়গায় এক-একরকম। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও আসামে জুন থেকে আগস্টে, দক্ষিণ ভারতে মার্চ-এপ্রিল, শ্রীলঙ্কায় মে, আগস্ট-সেপ্টেম্বর এবং ডিসেম্বর-জানুয়ারি। বাসা বানায় মাটিতে আপনা থেকে তৈরি কোনো খোঁদলে অথবা পা আঁচড়ে অল্প গর্ত করে, তাতে ছড়ান-ছিটনোভাবে কয়েকটি পাতা ও ঘাসের লাইনিং দেয়, কখনওবা দেয় না। এই বাসা

...ঘাসের চাপড়ার পাশে করে। ডিম পাড়ে 4 থেকে 8টি, সাধারণত 5 থেকে 7টি, ...উপবৃত্তাকার, এক দিকটা একটু সূঁচলো। রং ফিকে ধূসর বা সবজেটে-মেটে, কখনও ...জলপাই-কালচে বা উজ্জ্বল পাটকিলে-হলুদ, তার উপর বিক্ষিপ্ত ভাবে থাকে কালোর ...পুরুষ ও স্ত্রী একগামী। স্ত্রী-পাখি একাই ডিমে তা' দেয়। ডিম ফোটে 16 দিনে। দু'জনে ...প্রতিপালন করে। ডিমের গড় মাপ 24.5 × 19.00 মিমি।

...কয়েকটি বটের (Quails) পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়, তারা হল—

...(পেরডিকুলা এরাইথরহাইনচা), ইংরেজি— *পেইন্টেড বুশ-কোয়েল*। লম্বায় 16 সেমি (সাড়ে ...)। ...উপরাংশে জলপাই-পাটকিলের উপর সাদা-কালোর ছিট ও ছোপ। মাথা কালো, একটা ...চিকন সামনে থেকে চোখের উপর দিয়ে ঘাড়ে গেছে। গলায় সাদা ছোপ, তার চারদিকে ...রেখা। বাকি তলার পালক বাদামী, বুকের দু-পাশে কালো-সাদা ছোপ। কনীনিকা পাটকিলে, ...ও আঙুল প্রবাল-লাল।

...— পশ্চিমঘাটে খাণ্ডালা থেকে কেরালা, মহীশূর, মাদ্রাজ, পূর্ব মহারাষ্ট্র, বিহার, ওড়িশা ...। দেখা যায় এক হাজার মিঃ উচ্চতার মধ্যে নিচু পাহাড়ের বনজ পথ ও ঝোপঝাড়ে।

...বটের, লৌয়া (পে মনিপুরেনসিস), ইংরেজি— *আসাম পেইন্টেড কোয়েল*, গোয়ালপাড়া অঞ্চলে ...*পুনহি*। লম্বায় 20 সেমি (সাড়ে 7 ইঞ্চি)। কপাল ও মুখের দু-পাশ হলদেটে-বাদামী, চোখের ...দিয়ে খুব সরু সাদা রেখা। উপরাংশে গাঢ় স্লেট-ধূসর, তার উপর ভেলভেট-কালোর ছোপ ও ...। চিবুক ও গলা হলদেটে-বাদামী, ঘাড় ও উপরের বুকে ছাই-ধূসরের উপর কালোর ছিট। বাকি ...পালক লালচে-হলুদ, প্রতিটি পালকে কালো চিকে এবং লেজের তলার পালকে কালোর উপর ...ছিট।

...স্থান— উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স অঞ্চল এবং আসামে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরে জলপাইগুড়ি থেকে সাদিয়া।

...বটের (টারনিকস্ টাবিক), ইংরেজি— *ইয়োলো-লেগেড বাটন কোয়েল*। হিন্দি— *লৌয়া*। লম্বায় ...সেমি (6 ইঞ্চি)। মাথায় কালচের সঙ্গে লালচে-হলুদের মিশ্রণ, মাঝখান দিয়ে সিঁথির মতো একটা ...। চোখের উপর ও মাথার দু'পাশ লালচে-হলুদ। উপরাংশে ধূসরাভ-পাটকিলে, তার উপর বিস্তৃত ...কালোর ঘোলাকাটা। বয়স্ক পাখিদের এটা থাকে না। ডানার আচ্ছাদকে লালচে-হলুদের উপর ...ছিট। নিম্নাংশে চিবুক ও গলা সাদাটে, বাকি ফিকে লালচে-হলুদ, বুকের মাঝখান গাঢ় মেটে-...। বুকের দু'পাশে কালো ছিট।

...স্থান— হিমালয়ের 2000 মি. উচ্চতা থেকে ভারতের পার্বত্য ও সমতলে, মাদ্রাজ, কেরালা, ...নিম্নপ্রদেশ থেকে কোহাট, সেখান থেকে বাংলাদেশ, আসামের ব্রহ্মপুত্রের উত্তরাংশ, আন্দামান ...দের দ্বীপপুঞ্জে। চিলকায় দেখা যায় না।

4. **ছোট বটের** (টারনিকস সাইলভাটিকা ডুসসুমিয়ার), ইংরেজি— *লিটল বাস্টার্ড কোয়েল*, হিন্দি— *ছোটা লৌয়া।* লম্বায় 13 সেমি (সাড়ে 5 ইঞ্চি)। চাঁদি কালচে-পাটকিলে, মাঝখানে একটা সরু সাদা লাইনের সিঁথি। ঘাড় মরচে, তার উপর অর্ধবৃত্তাকারে হলদেটে-লালচে। উপরের অংশে এলোমেলো ভাবে লালচে-হলুদ ও কালো দাগ। নিম্নাংশে বুকে হলদেটে-পাটকিলের উপর কালো ও বাদামীর গোল গোল ছোট ছোপ ছোপ, বাকি সাদা। কনীনিকা হালকা হলুদ, চঞ্চু শীসে-সাদা, পা ও আঙুল মাংসল-সাদা বা ফিকে নীলাভ ধূসর।

বাসস্থান— বহিঃহিমালয় থেকে নেপাল, সিকিম, দক্ষিণে কেরালা, পশ্চিমে কচ্ছ, রাজস্থান, সিন্ধু, পাঞ্জাব, পূবে উত্তরবঙ্গ, আসামে ডিব্রুগড় থেকে সাদিয়া পর্যন্ত, খাসি কাছাড় ও নাগা পাহাড় এবং বাংলাদেশ।

কিয়া (Swamp Francolin)

আমি যে সময়ের কথা বলছি সেই পঞ্চাশ দশকের শেষাশেষি তখন বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ সংরক্ষণের কথা কেউই চিন্তা করেন নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশিবিদেশী সব সৈন্যরা যখনই সুবিধে পেয়েছে তখনই নির্বিচারে পশু-পাখি হত্যা করেছে। যত্রতত্র গাছ কাটা হয়েছে, এখনও কাটা হচ্ছে। যদিও সরকারি-বেসরকারি মানুষ কিছুটা সচেতন হয়েছে। গাছপালা পশু-পাখিদের সঙ্গে, আমাদের অঙ্গাঙ্গীভাবে একটা সম্পর্ক আছে এবং একের অস্তিত্বহীনতায় অপরের অস্তিত্বে টান পড়ে, তাও জনসাধারণ আজ বুঝতে চেষ্টা করছেন। তখন কিন্তু কেউই করেন নি। তার ফলে আজ বহু প্রাণী অবলুপ্ত বা অবলুপ্তির পথে।



চি ৪7 কিয়া

জলদাপাড়া, হাতিমারা, আলিপুরদুয়ার প্রভৃতি উত্তরবঙ্গের অঞ্চলে তখন হাতি, বাঘ, গণ্ডার ইত্যাদি একটু বেশি পরিমাণেই ছিল। সেই সময় কয়েকজন শিকারীর সঙ্গে বারকতক কয়েকটি চা বাগানে থেকেছি ও জঙ্গলে ঘুরেছি। একবার এক সকালে জংলী পথে জিপে করে চলতে চলতে বন্ধু চালককে বললাম থামতে। আমি নেমে একটু পাশে গিয়ে পায়চারি করছি। জায়গাটা বাদা মতন। ইকরা আর নলখাগড়ায় ভর্তি। আমার দেখাদেখি আরও দু'তিন জন নেমেছে। ফিরব এমন সময় নজরে পড়ল একটা পাখি, তিতিরের (গ্রে পাট্রিজ) মত প্রায় দেখতে, তবে ঠ্যাং দুটো বেশ লম্বা, ইকরা বেয়ে উপরে উঠেছে প্রভাতী রোদে। হঠাৎ সে আমায় দেখতে পেয়ে কর্কশ গলায় 'চাকেরু চাকেরু চাক্ চাক্' করে ডেকে উঠল। ঐ ডাক শুনে আরও পাঁচ ছটা উপরে উঠেছে। হঠাৎ বন্দুকের শব্দে চমকে উঠি আমার পিছন থেকে একজন কেউ গুলি ছুঁড়ছে। বাকি তিনটে ফরফর করে একটু উড়ে গিয়েই নলবনের

লুকিয়ে পড়ল। তাদের উড়ন্ত অবস্থায় গুলি করেও নামাতে পারল না। বলে উঠি, কি দরকার এই সকালে এদের উপর গুলি ছোঁড়ার? ঘাতক বন্ধু এক চা বাগানের ম্যানেজারের ছেলে, সে বলল, তুই জানিস না এদের মাংস খেতে অপূর্ব। বাবা একবার-গোটা চারেক মেরেছিলেন, তখন খেয়েছিলাম। পাখি তিনটেকে জলকাদা ভেঙ্গে উদ্ধার করা হল। তখন দেখলাম, মাথার উপর জলপাই-পাটকিলে, ভ্রূর উপর ও চোখের তলায় একটা ফিকে লালচে-হলুদের লাইন, আর একটা কালচে লাইন চোখের উপর দিয়ে কানের আচ্ছাদকের উপর। উপরের পালক পাটকিলে, তার উপর সাদাটে লালচে হলুদের আঁকিবুকি এবং প্রতিটি পালকের ধার কালো। পিঠের পালকের ভিতর সরু লম্বা লম্বা অনেকগুলি পালক সাদা, পিঠের তলায় ও বস্তিপ্রদেশে এই পালক নেই। ওড়ার প্রথম সারির পালক সাদাটে পাটকিলে, ভিতরটা মরচে পাটকিলে। লেজে মাঝের পালক ছাড়া বাকি মরচে-লাল। নিচে চিবুক গলা হলুদে সবজেটে-পাটকিলে, বাকি তলার পালক ঘাড়ের দু'ধার সহ পাটকিলে, তার উপর কালোর সরু সরু টান, বুক ও পেটে বড় দাগ ও ছোপ। এর জন্য দেখায় বড় সুন্দর। লেজের তলার আচ্ছাদক মরচে-লাল এবং পাখার তলাতেও তাই। কনীনিকা পাটকিলে বা লালচে-পাটকিলে, চোখের পাতা নিষ্প্রভ সবুজ বা সীসে-সবুজ, চঞ্চু কালো, ডগাটা শিঙে-সাদা। পা ও আঙ্গুল কমলা-হলুদ বা নিষ্প্রভ লাল। পুরুষের লালচে ভাবটা বেশি। পুরুষের পায়ে ছোট ভোঁতা কাঁটা স্ত্রী-পাখির নেই তবে মাঝে মাঝে অবর্ধিত অংশরূপ দেখা যায়। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে, পায়ের কাঁটার অস্তিত্ব দেখে তফাত করা যায়।

এই পাখিরা কর্ষক বর্গের (গাললিফরমেস) অন্তর্গত বিষ্কির বংশের (ফাজিয়ানিদি), এক প্রজাতি। নাম— কিয়া, কইজা, কয়ার (ফ্রাংকোলিনাস গুলারিস), ইংরেজি— *সোয়াম্পপাট্রিজ*, হিন্দি— *ভিল তিতরি*। লম্বায় 37 সেমি (15 ইঞ্চি)। ওজনে প্রায় আধ কেজি।

বাসস্থান— পশ্চিম নেপাল ও উত্তরপ্রদেশের তরাই ও পলি জমি থেকে উত্তর বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং বাংলাদেশের সিলেট, চট্টগ্রাম ও সুন্দরবনের কিছু অংশ। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে এখনও আমার চোখে পড়েনি। দেখা যায় ঘন ইকরা ও নলবনের বাদা বা জলায়, যে সব নদী গঙ্গা বা ব্রহ্মপুত্রের শাখা-প্রশাখা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তার ধারে। একমাত্র ব্যতিক্রম 1200 মি. উচ্চতায় মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জি উপত্যকা। বর্তমানে তরাইয়ের বহুস্থানের জলা ইত্যাদি পাম্প করে জল টেনে শুকিয়ে ফেলার জন্যে কচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। তাই অবলুপ্তির পথে।

খাদ্য— সব রকম আগাছার বীজ, খাদ্যশস্য, সরষে, ধান ও অন্যান্য শস্যের কচি ডগা এবং যাবতীয় পোকামাকড়। জলার ধারে যেমন বিচরণ করে তেমনি জলার কাছাকাছি ক্ষেতের মধ্যে আসে, বিশেষত আখ ক্ষেতে। সকাল-সন্ধ্যেতে যখন ধান পাকে তখন আড়াল থেকে বেরিয়ে ভয়ডর না করে সোজাসুজি ক্ষেতের মধ্যে চলে আসে।

ডাক— খুব জোরে ডাকে 'কও-কেয়ার' বলে, মাঝে মাঝে 'কোয়া কোয়া কোয়া' কখনওবা কর্কশ কণ্ঠে ডাকে 'চাক চাক চাকেরু চাকেরু চাকেরু'। এই সময় মনে হয় যেন ডাকবার আগে গলা সাধছে।

স্বভাব— সাধারণত জোড়ায়, কখনওবা 5-6টির দলে বাদার স্বল্প গভীর কাদা-জলে বিচরণ করতে দেখা যায়। যেখানে জলের

কামপাখির (পার্পল মুরহেন) মত এক নলের ডগা থেকে অন্য ডগা ধরে ধরে অপেক্ষাকৃত অল্প জলে বা শুকনো ডাঙ্গায় চলে যায়। ঝোপের মধ্যে আত্মগোপন করলে তখন ওড়ান খুবই শক্ত, একমাত্র হাতি দিয়ে নল বা ইকরার বন মাড়ালেই তবে সম্ভব হয়। ঝোপ থেকে ওড়ে খুবই অগোছালভাবে, ডানায় ফুইর্‌র্‌ শব্দ তুলে, মুখে থাকে বেশ জোরে 'চাক চাক চাকের্‌ চাকের্‌' আওয়াজ। অন্যান্য তিতিররা অবশ্য এত আওয়াজ করে না। এরা ওড়ে বেশ দ্রুত। রাত্রিবাস করে জলার ঘাস-জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা কোন কাঁটাগাছে কিংবা জলমগ্ন নলের ভাঙা শরের উপর। পুং-কিয়া অসম্ভব ঝগড়াটে। লড়াইয়ে-মোরগ বা তিতিরের মত সব সময়ে যুদ্ধং দেহি ভাব। পায়ের কাঁটার চেয়ে লড়াইয়ে চঞ্চুই বেশি ব্যবহার করে। ধুনি খাওয়া পাখিদের ঘাড়, গলা ও বুকে ক্ষতচিহ্ন দেখে বোঝা যায় এরা কিরকম লড়াইবাজ। এই জন্যে এক সময়ে আসামের কোথাও কোথাও উঁচুদরের বাজি ধরে দুই পুং-কিয়ার মধ্যে লড়াইয়ের প্রচলন ছিল। অনেকে লড়াইয়ে-পাখির জন্য ডিম সংগ্রহ করে পেটে কাপড় বেঁধে দিনরাত রেখে তাকে ফুটিয়ে শিক্ষা দিত। এই রীতি বর্তমানে আর নেই বললেই চলে।

প্রজননকাল— ফেব্রুয়ারি থেকে মে হলেও দেখা যায় মার্চ-এপ্রিলেই বেশি। বাসা বানায় 5-10 সেমি পুরু করে নল ও জলজ ঘাস দিয়ে, চওড়ায় 20-30 সেমি, মাঝখানে ডিম পাড়ার জায়গাটা বেশ খোঁদল করা। বাসা জল বা কাদা থেকে কয়েক সেমি উপরেই থাকে। অনেক সময় বাসা দেখা যায় জলার ধারে অপেক্ষাকৃত শুকনো জায়গায়। ডিম 4-5 বা 6টি উজ্জ্বল ফিকে লালচে-হলুদ বা পাথুরে, তার উপর লালচে ছোট ছিট ও ছোপ। পুং-কিয়া মনে হয় একগামী। স্ত্রী-পাখিই ডিমে তা' দেয়, কিন্তু কতদিনে ফোটে তা এখনও নির্ণয় হয় নি। ডিমের গড় মাপ 39 × 43 ̇ ∪ মিমি।

বনমুরগি

ষাট দশকের কোন সময়ে বীরভূমের নলহাটির কাছে বরলা বলে একটা গ্রাম থেকে সাহিত্যবাসর সেরে ফিরছি। রাতের ট্রেন ধরেছি। খুব ভিড়। আর সকলের মোটামুটি জায়গা করে দিয়ে আমি আর শ্রী মিহিরকুমার সিংহ দু'জনে দরজা খুলে বাইরে পা ঝুলিয়ে পাশাপাশি মেঝেতে বসে ধূমপান ও গল্প করছি। গাড়িতে আলো নেই। ভিতর থেকে সঙ্গীতের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের কথায় যোগদান করছেন। একসময় সকলেই চুপ করে গেলেন। নানা জায়গায় থামতে থামতে এক জায়গায় গাড়িটা এসে থামল। স্টেশন না, মাঠ স্টেশন।

অন্ধকার রাত। পুবের আকাশ ফিকে হব হব ভাব নিচ্ছে শুধু। রক্তরাগ দেখা দেয় নি। হঠাৎ কানে এল কঁকর-কোঁ কোঁ-ও-ও। প্রথমে ভেবেছিলাম সামনে দু-চারটে যে আবছা খাপরার ঘর দেখা যাচ্ছে সেখান থেকেই আসছে বুঝি। মিহির বলল— না, ঠিক পিছনের কামরা লাগেজ-ভ্যান, সেখান থেকে আসছে। চালান যাচ্ছে কলকাতার বাজারে। চুপ করে শুনছি করুণ প্রভাতী। মনে হল বলছে বুঝি, আমায় খাও গো খা-ও। বললাম, এই প্রভাতে ওরা আত্মনিবেদন করছে এই আকুল প্রার্থনায়। গাড়ির ভিতরে যাঁরা জেগেছিলেন সকলেই হেসে উঠলেন। বললাম, কান পেতে শুনন এই কথাই বলছে কিনা। তাছাড়া কনফ্যুসিয়াস বলেছেন, যেকোন পশু-পাখি, মাছ সুন্দর করে রান্না করার পর পাঁচজন খেয়ে



চি ৪৪ বনমুরগি

যদি তৃপ্তিলাভ করে, সুখ্যাতি করে, তবে সেই পশু-পাখি বা মাছের মুক্তি ঘটে। পরজন্মে তারা উচ্চতর জীবরূপে জন্মগ্রহণ করে। এদের পরার্থেই জীবন। ...গাড়ির ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠলেন, বাঃ দাদা! কনফুসিয়াসের নামে একটা ছাড়লেন ত? এই সময় গাড়িটা ঘ্যাটাং ঘ্যাটাং আওয়াজ তুলে সর্পিলগতিতে চলতে শুরু করল।

দেশবিদেশে যত গৃহপালিত মুরগি তৈরি হয়েছে তাদের সকলের আদি-জনক ভারতের কর্ষক বর্গের (গাললিফরমেস) অন্তর্গত বিষ্কির বংশে (ফাজিয়ানিদি) কক্কুট গণের এক প্রজাতি। নাম— বনমুরগি, লাল বনমুরগি (গাললাস গাললাস), ইংরেজি— *জাঙ্গল-ফাউল*, হিন্দি— *জংলি মুরব্বি*। ভারতেই প্রথম বনমুরগিকে গৃহপালিত করা হয়। কবে যে প্রথম হয় তা এখনও অজানা। তবে 2500 খ্রিঃ পূর্বে হরপ্পা ও মহেঞ্জদড়োর সভ্যতায় গৃহপালিত রূপের নিদর্শন পাওয়া গেছে। তারপর দেখা যায় খ্রিঃ পূঃ 1500-1400-তে মিশর ও চীনে। কিছুদিন আগেও লোকের বিশ্বাস ছিল, জাভার বনমুরগিই (গাললাস ভেরিয়াস) বুঝি গৃহপালিতের আদি-জনক। এখানের ছবিটি সেই জাভার বনমুরগির। আমাদের রূপ অন্য, সেটি আছে হরপ্পা-মহেঞ্জদড়োর শ্রীলে।

বনমোরগ গৃহপালিত, গ্রামীণদের চেয়ে বড় নয়। লম্বায় 66 সেমি (26 ইঞ্চি), বনমুরগি 43 সেমি (17 ইঞ্চি)। বনমোরগের উপরাংশ প্রধানত গাঢ় চকচকে কমলা-লাল, ঘাড়ের উজ্জ্বল ঝোলান পালক সোনালী-হলুদ, কানের আচ্ছাদক সাদা, পিঠের মাঝখান বেগুনাভ-পাটকিলে, গাঢ় কমলা-পাটকিলে দু'পাশে, লেজের উপরের ঝোলা আচ্ছাদক ভল্লাকার উজ্জ্বল কমলা, ডানার ছোট ও বড় আচ্ছাদক কালোর উপর চকচকে সবুজাভ, মাঝের আচ্ছাদক হালকা বাদামী, ওড়ার প্রথম সারির পালক ঈষৎ কালচে, ধারটা ফিকে, দ্বিতীয় সারির বাইরেটা বাদামী, ভিতরটা ঈষৎ কালচে, তৃতীয় সারি চকচকে কালো। লেজ মাঝের পালকসহ কাস্তের মত বাঁকান, গাঢ় চকচকে সবজেটে-কালো, চকচকে ভাবটা ঘাড়ের পালকে কম। তলায় বুক থেকে উরুতের আচ্ছাদক নিষ্প্রভ কালো। কনীনিকা লালচে-পাটকিলে, ঝুঁটি ও গলার মাংসল উপাঙ্গ টকটকে লাল, গণ্ড চাপটি (ল্যাপেট) সাদা বা গোলাপী। চঞ্চুর গোড়াটা কালচে, উপরের চঞ্চু পাটকিলে, নিচেরটা ফিকে শিঙে। পা ও আঙ্গুল কাঁটা সীসে-পাটকিলে।

স্ত্রী-পাখির সাধারণ রঙ হলদেটে-পাটকিলে, তার উপর গাঢ় পাটকিলের চিত্রবিচিত্র, মাথার উপর থেকে অল্প কালচে রঙ নেমে এসেছে ঘাড়ের গাঢ় পাটকিলে পালকে, ধারটা উজ্জ্বল হলুদ, সেটা একটু বেশি, ঘাড় ও বুকের পাশে। কানের আচ্ছাদক হলদেটে, একটা উজ্জ্বল গাঢ় লালচে-পাটকিলে লাইন গলা থেকে কানের পাশে ভ্রূর উপর, ডানা ও লেজ গাঢ় পাটকিলে, লেজের মাঝের পালকের ধার

চিত্রবিচিত্র পাটকিলে। বুক দিকে লালচে-পাটকিলে, দু'পাশ, পেট, লেজের তলা ও উদুর আচ্ছাদক
নিষ্প্রভ পাটকিলে। ঝুঁটি ও গলা মাংসল উপাঙ্গহীন। চোখের চারদিকে পালকহীন চামড়া লাল।
কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু হলদেটে, গোড়া দিকে, উপরের চঞ্চু পাটকিলে, নিচের দিকে পিঙে, পা-
আঙুল ও নখর শ্লেট-পাটকিলে।

বাসস্থান— বহিঃহিমালয়ে প্রধানত পাদদেশ এবং তরাই, 2000 মি. উচ্চতার মধ্যে উত্তরপূর্ব
পাকিস্তান থেকে কাশ্মীর হয়ে পূবে আসাম, অরুণাচল, দক্ষিণে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা,
পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনেও দেখা যায় প্রচুর। তার বেশিরভাগই বনবিবি
ও ব্যাঘ্রদেবতাদের উৎসর্গীকৃত। তারা গৃহপালিত থেকে বন্য হয়ে গেছে। *একটি উপজাতি*— **বর্মী**
বনমুরগি। বর্মী— *'তও কাইয়েট'* (গা গা স্পাডিসিয়াস), ইংরেজি— *বার্মিজ রেড জাঙ্গল ফাউল*।

বাসস্থান— পূর্ব মিশমি পর্বত, অরুণাচল, বার্মা, দক্ষিণ-পশ্চিম ইউনান, থাইদেশ, উত্তর লাওস,
মালয়, উত্তর সুমাত্রা। আরও *দুটি প্রজাতি*। *প্রথমটি*— **ধূসর বনমুরগি** (গা সননেরাট্টিই), ইংরেজি—
গ্রে জাঙ্গল ফাউল, *বাসস্থান*— দক্ষিণ রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশের পশ্চিম অংশ অন্ধ্র, গুজরাট, মহারাষ্ট্র,
মাদ্রাজ, মহীশূর এবং কেরালা। লাল ও ধূসর দুই জাতিই সীমারেখা অঞ্চলে মিলিত হয়ে বর্ণসঙ্কর
সৃষ্টি করে। *দ্বিতীয়*— সিংহলী— **'ওয়েলি কুক্কুলা'** (গালাফাইয়েট্টিই), ইংরেজি— *সিলোন রেড জাঙ্গল-
ফাউল*। *বাসস্থান*— শ্রীলঙ্কায় সবত্র, সমুদ্র উপকূল থেকে উচ্চতম পর্বতসমূহে। সকলকেই দেখা যায়
সবরকম জঙ্গলে, বাঁশবনে, পাহাড়ী জংলী গ্রামের ধারে, চাষ আবাদের পাশে।

খাদ্য— সবরকম দানা, ঘাস ও খাদ্যশস্যের কচি ডগা, স্ফীতকন্দ, বৈচি জাতীয় ছোট সরস ফল,
বট-পাকুড়, শেয়াকুল ইত্যাদি, ঘাসফড়িং, উই জাতীয় পোকাপতঙ্গ, কীটপতঙ্গের শূক, মাঝেমধ্যে
টিকটিকি-গিরগিটি, এমনকি সাপের বাচ্চা ও বস্তির পায়খানার মল। বাঁশের বীজ সবচেয়ে প্রিয়।
দেখা গেছে বাঁশবনে যখন ফুল আসে তখনই ছানা হয় বেশি। এছাড়া খাদ্যের সঙ্গে অল্পবিস্তর কাঁকরও
খায়।

ডাক— গৃহপালিত মোরগের মতই ডাকে, তবে অত জোরে নয়, শেষের টানটা দেয় না। ডাকে
প্রত্যুষে এবং সূর্যাস্তের সময়, যারপর রাতের বিশ্রামের জন্য বাঁশ বা অন্য কোন বড়গাছে আশ্রয় নেয়।
তার আগে ডানা ঝাপটায়, অন্য মোরগরা ধারেকাছে থাকলে ডানা ঝাপটিয়ে জবাবও দেয়। গৃহপালিত
মুরগির মত বনমুরগিও ডাকে 'কঁক কঁক' করে, কিন্তু গৃহপালিতের মত কখনও ডিম পাড়ার পর পাড়া
মাতিয়ে জানান দেয় না, আমি ডিম পেড়েছি, নিঃশব্দেই থাকে।

স্বভাব— সাধারণত ছোট দলে থাকে, যেমন একটি মোরগ ও 4-5টি মুরগি ঘোরাফেরা করে তেমনি।
জঙ্গল ছেড়ে বার হয় খুব সকালে এবং শেষ বিকেলে। পাঁ দিয়ে মাটি আঁচড়ে খাদ্য খোঁজে। বেলা
বাড়া ও পড়ার মধ্যে দুপুরের রোদে কাছেপিঠে ঝোপের তলায় আশ্রয় নেয়। অত্যন্ত ভীরু এবং বন্য,
সামান্যতম বিপদাশঙ্কায় দ্রুত পায়ে ঝোপের মধ্যে দিয়ে দূরে চলে যায়। প্রায়ই দেখা যায় জঙ্গলের
মধ্যে গরুর গাড়ি চলার পথের উপর এসে গোবরের মধ্যে পোকা খুঁজতে, নাহয় বস্তা থেকে পড়া
শস্যকণা খুঁটে তুলতে, তখন হঠাৎ গিয়ে পড়লে, ঝটপট ডানার আওয়াজ তুলে দ্রুত জঙ্গলের মধ্যে
গাছের উপর উঠে পাতার আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। বিপদ কেটে গেলে বা অবস্থা শান্ত হলে কোন শব্দ

...করে গাছের উপর থেকে নেমে আসে। ওড়াটা খুবই দ্রুত, শিকারীর পক্ষে বন্দুক দিয়ে মারাও ...পর। শিকারীরা ঘিরে ফেলেছে, পালান বেশ কঠিন, তখন ওরা নিঃশব্দে ডাল বেয়ে বেয়ে একদম ...লোকে উঠে যায়, সেখান থেকে গাছের মাথার উপর দিয়ে বন্দুকের পাল্লার বাইরে দিয়ে দ্রুত উড়ে ...অন্য কোন গাছের মাথায় নামে।

মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মকথা 'তুজুক-ই-জাহাঙগীরি'তে অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের কথা লিখেছেন, ...কিন্তু পরবর্তী কোন পক্ষিবিজ্ঞানীই উল্লেখ করেন নি। তিনি লিখেছেন— একটি অদ্ভুত আচরণ দেখি ...যখন এদের পা ধরে মাথা নিচু করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তখন তারা কোন আওয়াজ করে না, কিন্তু গৃহপালিতরা প্রথমেই চিৎকার করে ওঠে।

বিভিন্ন বংশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রাক-মিলনের সময় এদের মধ্যেও দেখা যায়। মোরগ পালক ফুলিয়ে যেদিকে মুরগি আছে সেদিকের ডানাটা প্রায় মাটি পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে মাথা নামিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে ঘোরে, তারপর ঘুরে উলটোদিকে এসে অপর ডানাটা আবার ঐভাবে নামিয়ে দেয়। গৃহপালিতরাও এই আচরণ করে।

প্রজননকাল— প্রধানত মার্চ থেকে মে, কিন্তু মাঝে মাঝে জানুয়ারি থেকে অক্টোবরের মধ্যে ডিম পাড়ে। ঘন ঝোপঝাড়ের তলায় বাসা বানায়, মাটি আঁচড়ে অল্প খোঁদল করে শুকনো ঘাস ও বাঁশপাতা বিছায়। মোরগ সাধারণত একগামী, হারেমের সকল স্ত্রী-পাখির উপর আধিপত্য বিস্তার করে না, তবে ইচ্ছেমত দু'একটির সঙ্গে মিলিত হয়। ডিম পাড়ে 5-6টি, ফিকে হলদেটে -লাল থেকে ফিকে লালচে-পাটকিলে রঙের। স্ত্রী-পাখিই ডিমে তা' দেয়। 20-21 দিনে ডিম ফোটে। ডিমের গড় মাপ 45.3 × 34.4 মিমি।

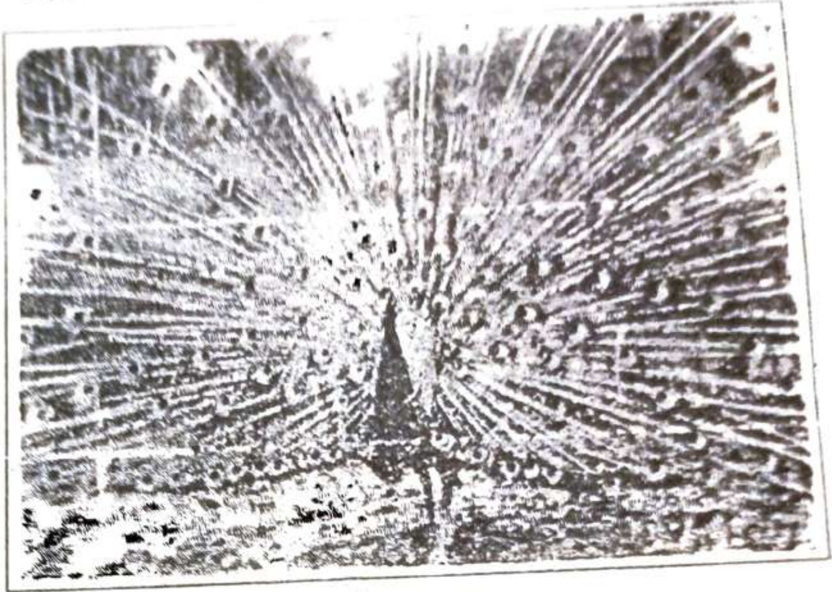
ময়ূর

1975 সালে আমার অনুজপ্রতিম বন্যপ্রাণী প্রেমিক প্রয়াত মহম্মদ সফিউল্লার সঙ্গে ব্যাণ্ডেলের কাছে হুগলি জেলার পোলবা-দাদপুর ব্লকের চুঁচুড়া স্টেশনে নেমে সাইকেল রিকশা নিয়ে গিয়েছিলাম নীলমনি চক্রবর্তী মহাশয়ের পোড়ো ভিটেতে। সেখানে এদের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। নীলমনিবাবুর কাছে শুনেছিলাম তিনি ছেলেবেলা থেকেই এদের দেখছেন। তারপর গত 27 জুন 85 তারিখে ZSI-এর ডঃ সুধীন সেনগুপ্ত ও শ্রীমনোময় ঘোষের সঙ্গে ওঁদের জিপ-এ চড়ে পাড়ি দিয়ে অনেক হাঙ্গামা করে পৌঁছেছিলাম। তখন দেখলামও কয়েকটা।

নিম্ন পশ্চিমবঙ্গে এদের বন্য অবস্থায় দেখব তা কখনও আশা করিনি। তবে এরা প্রকৃত বন্য না, একসময় পোষা ছিল, পরে কোনোকারণে বন্য হয়েছে অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে feral তা নিয়ে আমার নিজেরই সন্দেহ আছে।

5 জুলাই 85, ভারতীয় পরিসংখ্যান সংস্থার শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে পাড়ি দিলাম ডঃ সুধীন সেনগুপ্তর সঙ্গে রাজাহাটে, যেখানে তাদের দেখা পাওয়া যাবে। পৌঁছলাম রাজাহাটে। জিপটাকে একটু দূরে রেখেই ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে কার্তিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ওখানে পৌঁছিলাম। কার্তিকবাবু স্বর্গত

নীলমণি চক্রবর্তীর বড়ো জামাই। বৃষ্টি একটু ধরতেই কার্তিকবাবু আমাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। উত্তরে মুদির দোকান, রাজাহাট স্কুল, পূবে 6নং জাতীয় সড়ক রাজাহাট-ব্যান্ডেল-এর মোড়, দক্ষিণে ইটখোলা, পশ্চিমে কুন্তী নদী। প্রায় আড়াই বর্গ মাইল জুড়ে এদের আবাসভূমি। মনে হল,কোনান ডয়েলের 'লস্ট ওয়ার্লড'-এর মতো আটকা পড়ে আছে এই বন্যপাখিরা অতীতেরা সাক্ষ্য বহন করে। কোন এক শতাব্দীতে উপযুক্ত পরিবেশে এই বন্য পাখিরা ভারতের অন্যান্য স্থানের মতো এই নিম্নবঙ্গেও যত্রতত্র বিচরণ করতো।



চি 89. ময়ূর

কার্তিকবাবুর স্ত্রী শ্রীমতী অনিমা দেবীর কাছে জানলাম, নীলমনিবাবুর বাবা সতীশচন্দ্র 90 বছর বেঁচে ছিলেন। সতীশচন্দ্রের বাবা সারদাপ্রসাদ এখানে বাস করেছেন, তিনিও এই পাখিদের দেখেছেন। হিসেব করে দেখলাম তা প্রায় 250 বছরের উপর। সুতরাং পোষা থেকে বন্য হওয়া নয়। বন্যই।

বৃষ্টি ধরতেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। হঠাৎ কুমার দেখাল একটি বড়ো আমগাছের মাথায় দুটো পাখির গলা দেখা যাচ্ছে। ডঃ সেনগুপ্ত তাদের অবস্থান বুঝতে পেরে ক্যামেরা বাগিয়ে একটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেলেন। দূরবীন দিয়ে সেই পাখি দুটোর গলা দেখছি। তার মধ্যে হঠাৎ একটা উড়ল। কী তার লম্বা লেজ! কিন্তু ওড়ার গতি খুবই দ্রুত। নেবে এসে দৌড়ে ঝোপের তলায় আত্মগোপন করল। ডঃ সেনগুপ্ত খানিকটা অনুসরণ করলেন। কিন্তু এমন নিঃশব্দে, নিঃসাড়ে সে লুকিয়ে পড়ল যে, তার আর হদিস পাওয়া গেল না। এইভাবে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে গোটা-বারো এই পাখি দেখলাম।

বিষ্কির বংশের (ফাজিয়ানিদি) অন্তর্গত এই পাখির নাম হচ্ছে ময়ূর (পাভো ক্রিস্টাটাস), ইংরেজি— *পী ফাউল*, হিন্দি— *মনজুর মোর।* লম্বায় 92-122 সেমি (40-46 ইঞ্চি), সেই সঙ্গে লেজ 2 থেকে 2·5 মিটার। লম্বা লেজহীন স্ত্রী-পাখি লম্বায় 86 সেমি (38 ইঞ্চি)।

পুরুষ ময়ূরের মাথার উপর ছড়ানো পাখার মতো ঝুঁটি। ঝুঁটি হল তারের মতো কতকগুলি সরু ডাঁটার উপর ছোটো নীল পালক। চকচকে উজ্জ্বল নীল গলা ও বুক, ঝাঁকড়া ব্রোঞ্জ-সবুজ লেজ, তার উপর বেগুনী-কালো, তার চারধারে তামাটে চাকতিতে ভর্তি, পিঠের শেষাংশ হাল্কা ব্রোঞ্জ-সবুজ, তার উপর সরু করে খোলা কাটা, ডানার বাইরের আচ্ছাদকে কালো ও লালচে-হলুদের দাগ, ডানার প্রাথমিক পালক ও তার আচ্ছাদক বাদামী। লেজের পালকের সংখ্যা 200-র উপর।

স্ত্রী-ময়ূর পুরুষের চেয়ে বেশ কিছুটা আকারে ছোটো। মাথায় ঐ রকমই ঝুঁটি কিন্তু লম্বা লেজ নেই। মাথা ও ঘাড় লালচে-পাটকিলে, বাকি উপরের পালক পাটকিলে, তার উপর ঐ রঙেরই ফিকে ছোপ,

গলা ধাতব-সবুজ (পুরুষের মতো নীল নয়), বুক লালচে-হলুদ পাটকিলে, তার উপর সবুজের ... পেট হলদেটে-সাদা। প্রাথমিক পালক পাটকিলে, পুরুষের মতো বাদামী ভাব নেই। উভয়ের ... বাদামী-পাটকিলে, উন্মুক্ত মুখের চামড়া সাদা, চঞ্চু গাঢ় শিঙে, উপরের চঞ্চু গাঢ় এবং ডগাও ... পা ও আঙুল ধূসরাভ-পাটকিলে থেকে গাঢ় শিঙে-পাটকিলে, নখর কালচে।

...— সাধারণত 1500 মি. উচ্চতার মধ্যে হলেও কচিৎ 2000 মি. উচ্চতার মধ্যে বহির্হিমালয় ... উপদ্বীপাত্মক ভারতের দক্ষিণাংশের সর্বত্র, পুবে সিন্ধুনদের পূর্বাংশ জম্মু ও দক্ষিণ কাশ্মীর থেকে ... নখিমপুর জেলা, সেখান থেকে দক্ষিণে নাগাল্যান্ড, মণিপুর, লুসাই পর্বতের মিজো, পশ্চিমে ... সেখান থেকে দক্ষিণে উপদ্বীপাত্মক ভারতের শেষ সীমানা পর্যন্ত এবং শ্রীলঙ্কায়। আন্দামানে ... রেয়ার অংশে ভিজে ও পর্ণমোচী জঙ্গলেও দেখা যায়।

...— সাধারণত পুরুষের উচ্চৈস্বরে কর্কশ ধাতব-শিঙার মতো— 'কেঁ-আও' বা 'কেইন কেইন ...' আওয়াজ 6 থেকে 8 বার শোনা যায়। সেই সময় গলা ও মাথাটা উপর-নিচ করে। কোনোরকম ... হলে বা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলে ধাতব 'ক-ক' বা 'কেও-কক' ডাক দেয়। এই ডাকটা স্ত্রী-পাখিদের ... বেশি শোনা যায়। সেই সময় গলার পালক বোতল-ধোওয়া বুরুশের মতো ফুলিয়ে দেয়। এটা ... যায় বেশি যখন বাচ্চা নিয়ে পথ চলছে।

খাদ্য— সর্বভুক। বীজ, শস্যকণা, মসূরাদি, চীনাবাদাম, শস্যের কচি ডগা, ফুলের কুঁড়ি, কুচজাতীয় ... ল্যানটানা, কুলজাতীয় ছোটো ফল, বুনো ডুমুর, বিছে-কেন্নো, টিকটিকি-গিরগিটি, ছোটো সাপ ... 20 সেমি পর্যন্ত, নানাবিধ কীটপতঙ্গ, মানুষের বসতির কাছে মানুষের মল।

স্বভাব— এরা সাধারণত ছোটো দলে ঘোরাফেরা করে। যেমন, একটি পুরুষের সঙ্গে 3 থেকে 5টি ...। প্রজননকালের পর দেখা যায় বয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রী-রা ঘোরাফেরা করে আলাদা ভাবে। স্ত্রী-পাখিদের ... থাকে অপরিণত শাবকেরা। জঙ্গলের বাইরে আসে খুব সন্তর্পণে। নতুন চষাজমির মধ্যে বিচরণ ... খুব ভোরে এবং সূর্যাস্তের আগে পর্যন্ত। পা দিয়ে মাটি আঁচড়ে খাদ্য খোঁজে। সূর্যোদয়ের ... খানেক পরে জলপানের জন্য তারা দল বেঁধে চলে জলের দিকে। সেইসময় তারা পা ফেলে অত্যন্ত সন্তর্পণে। শুকনো পাতার উপর দিয়ে হাঁটে অতি সাবধানে মাথাটি খাড়া করে। প্রতিটি ঝোপের ভিতর ... অতি মনোযোগ সহকারে। পুরুষ তার বিশাল ঝাঁকড়া লেজ মাটি থেকে কয়েক ইঞ্চি তুলে ... সরল রেখায় চলে। ঝোপঝাড়ের মধ্যে এইভাবে চলতে কিছুমাত্র অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। ... দ্বিতীয়বার জলপান সারে সন্ধ্যের মুখেই, রাতের বিশ্রামে যাবার আগে। ওড়ার চেয়ে পায়ের ... ভরসা রাখে বেশি। কারণ, পালাবার সুবিধে তাতেই। একের পিছনে আরেকজন দৌড়য়। ... বা কুকুরের তাড়ায় অথবা কানো ছোটো নদী বা পার্বত্য খাদ পার হবার সময় ওড়ে। সেই ... এদের পাখার ঝাপট শোনা যায়। এমনকি বয়স্ক পুরুষকেও দেখা যায় প্রায় সোজাসুজি উড়ে ... গাছের মাথা পার হতে। পুরোপুরি উঠে পড়লে এরা খুব দ্রুত উড়ে চলে, পাখার ঝাপট মেরে ... মাঝে মাঝে ভেসে সংকীর্ণ বাঁক নেয়, এমনভাবে যাতে গাছের গুঁড়ির বা অন্য কিছুর গায়ে নিজেদের আঘাত না লাগে।

উন্মুক্ত স্থানে বাচ্চা সমেত চলাফেরার সময় স্ত্রী-পাখি তার বাচ্চাদের কোনো বিপজ্জনক স্থান থেকে

এত দক্ষতার সঙ্গে সরিয়ে নেয়, মাথা বাঁচিয়ে গুঁড়ি মেরে চলে, চলার পথে ছোটোখাটো গর্ত বা এবড়োখেবড়ো জমি পড়লে তা এমনভাবে এড়ায় যে, অত বড়ো পাখির পক্ষে কি ভাবে তা সম্ভব হল দেখে আশ্চর্য হতে হয়।

ময়ূরা রাত্রে উঁচু গাছের উপর আশ্রয় নেয়। গাছ থেকে নামার আগে সারা বনস্থলী কাঁপিয়ে ডাক দেয়— 'কেঁ-আঁও' ধ্বনিতে। প্রতি সন্ধ্যে ও খুব ভোরে ডেকে ওঠে গাছ থেকে নামার আগে। রাতে গাছের উপর বসেও ডাকে। আরও ডাকে কোনো কারণে গাছের মোটা ডাল ভেঙে পড়লে বা বাজ পড়লে। এক জনের ডাক শুরু হলে কাছাকাছি অন্যরা যারা থাকে তারাও ডাক শুরু করে দেয়। পুরুষ ময়ূর খুব সহজেই বাঘের অস্তিত্ব টের পায়। হয়তো গুঁড়ি মেরে খুব সন্তর্পণে বাঘ চলেছে, কিন্তু ময়ূর ঠিক জানতে পারে এবং ডেকে উঠে জঙ্গলের অন্য প্রাণীদের সচেতন করে দেয়। ময়ূরের ডাকে বানর-হনুমানরাও সচেতন হয়ে ওঠে, তারাও হল্লা শুরু করে দেয়।

ময়ূর নাচের সময় তার ঝাঁকড়া লেজ তুলে ছড়িয়ে দেয়। পালকগুলি থাকে একটু ভিতর দিকে বাঁকানো। আধা-উন্মুক্ত বাদামী ডানা পাশে নামিয়ে দেয়, আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ খাড়া লেজের পালকগুলি যাকে পেখম বলে তা কাঁপাতে থাকে। তার থেকে ঝিরঝির শব্দ ওঠে। এইভাবে সে স্ত্রী-পাখির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে পা ফেলে এগোয়। থেকে থেকে পা বদল করেও নেয়। ঝিরঝির শব্দ চলতে থাকে। তারপর পাখনা তুলে ঘুরে স্ত্রী-পাখিকে তার পিছন দিক দেখায়। লেজের আচ্ছাদকের ধূসরাভ তলা এবং কালো বস্তিপ্রদেশের উপর ঝকঝকে সাদা পাখনার কাঠিগুলোকে দেখাতে থাকে। এই কামোদ্দীপক প্রকাশ স্ত্রী-পাখি প্রথমত গায্যের মধ্যেই আনে না, কিন্তু আবার সে কখনও বা জানান দেয় পুরুষের নিদর্শনের অক্ষম অনুকরণ করে।

প্রজননকাল— উত্তর ও মধ্যভারতে বর্ষার শুরুতে অর্থাৎ জুন থেকে, শেষ হয় সেপ্টেম্বরে। দক্ষিণ ভারতে প্রধানত এপ্রিল-মে মাসে, শ্রীলঙ্কায় প্রধানত জানুয়ারি থেকে মার্চ। বাসা বাঁধে মাটিতে আঁচড় কেটে অল্প খোঁদল করে। আস্তরণ দেয় ঘাস ও পাতা দিয়ে। এক সময়ে পোষা ছিল পরে বন্য হয়েছে এইসব আধা বন্যদের দেখা যায় পুরোনো দুর্গ বা ভাঙা অট্টালিকায়, কখনওবা গ্রামের বাড়ির ছাদে।

ডিম পাড়ে 4 থেকে 6টা, চওড়া ভোঁতা উপবৃত্তাকার ঘি-রঙা থেকে লালচে-হলুদ রঙের। ডিমের গড় মাপ 69·7 × 52·1 মিমি। পুরুষ-পাখি মোটামুটি বহুগামী। স্ত্রী-পাখি একাই ডিম ফোটায় 28 দিনে। আমাদের দেশে কার্তিকের বাহনরূপে পরিচিত। সংস্কৃত সাহিত্যে ও কাব্যে ময়ূরের খুবই উল্লেখ পাওয়া যায়।

ময়ূর তার লম্বা লেজের পালক প্রজনন ঋতুর পর নির্মোচন করে। গ্রামের লোকেরা সেই পালক সংগ্রহ করে ইউরোপ-আমেরিকায় চালান দিত। স্থানীয় অনেকেই এই পালক দিয়ে পাখা ও অন্যান্য জিনিস তৈরি করে থাকে। বর্তমানে ময়ূর, ময়ূরের পালক এবং তা দিয়ে তৈরি জিনিস বাইরে চালান দেওয়ার বিষয়ে যথেষ্ট কড়া নিয়মের সৃষ্টি হয়েছে। যদিও এত কড়াকড়ির কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, ময়ূরকে মানুষ এমনিই সংস্কারবশে হত্যা করে না। সুতরাং সংগৃহীত পালকের ব্যবসা মোটেই অসমীচীন নয়।

1963 সালে ময়ূরকে জাতীয় পাখিরূপে ভারত সরকার চিহ্নিত করেছেন।

শ্যেন বর্গ

শ্যেন বর্গে (অর্ডার ফালকনিফরমেস) দুটি বংশ— বাজ (অ্যাকসিপিট্রিদি) ও শ্যেন (ফালকনিদি)। বাজ বংশের মধ্যে বাজ, শকুন, চিল, ঈগল ইত্যাদি, আর শ্যেন বংশে শ্যেন, ধৃতি (হবি), তুরমতি (...লিন) পোকামারা (কেস্ট্রেল) প্রভৃতি।

বাজ বংশে 24টি গণ। যথাক্রমে বাজি (অ্যাকসিপিটার), ভাসক (নেফ্রন), পাণ্ডুর (জিপস), ...গৃধ্র (ঈজিপিয়াস), কর্ণগৃধ্র (টরগস), ভাস (গাইপীটাস), ভল্লুক (ইকটিনীটাস), পথ্যচূড় (...পিঙ্গীটাস), দীর্ঘশিখ (লোফোট্রিঅরকিস), কপোতারি হিরাঙ্গটাস), গরুড় (অ্যাকুইলা), খগ (...তিকেদা), মধুহা (পেরনিস), ভ্রামিক (সারকাস), তিলাধারি (স্পিলরনিস), সরটারি (বুটাস্টুর), ...কিকা (এলানাস), চক্রচারি (সার্কাঈটাস), কুরর (পানডিঅন), চিরস্মন (মিলভাস), মুষকাদ (...টিও), মীনাশ (ইকথাইওফাগা), উৎক্রোশ (হালিঈটাস), এবং লৌহপৃষ্ঠ (হেলিযাস্টুর)। আর শ্যেন বংশে 2টি ভাগ— ক্ষুদ্রশ্যেন (মাইক্রোহিয়েরাক্স) ও শ্যেন (ফালকো)।

বাজ বংশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চঞ্চু ছোটো, উপরের চঞ্চু তলার চঞ্চুর চেয়ে আকারে বড়ো, ...ডগা বঁড়শির মতো বাঁকানো। উপরে চঞ্চুর গোড়ায় মোমের মতো অনাবৃত ঝিল্লী, সাধারণত ...রঙের সেই ঝিল্লীর মধ্যে নাকের ছ্যাঁদা। পা শক্ত-সমর্থ এবং বাঁকানো, শক্তিশালী নখর। এই বংশের স্ত্রী-পাখিই আকারে বড়ো এবং শিকারেও পারঙ্গম পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি। শ্যেন বংশের (ফালকানিদি) পাখিদের ডানার পালক বড়ো এবং হাওয়াশীলদের (সোয়ালো) মতো ...ক্ষাগ্র, আর আছে চোখের পাশে গালের উপর কালো ছোপ।

বাজ বংশ

শিকরে *Accipiter badius*

সময়টা 1933 হবে। আমরা অর্থাৎ কার্তিক বসু, তার ভাই বাপী বসু ও আমি পাখি পোষা ...করি। সবই ডাকা বা শিস্ দেওয়া পাখি। হাতিবাগান আর রথের হাট থেকে কেনা। রোজই বিকেলে কার্তিক, বাপী আর আমার এই তিনজনের মধ্যে পাখি নিয়ে নানা কথাবার্তা জল্পনা-কল্পনা চলত। একদিন কার্তিক-বাপীর বড়ো ভাই হিতেন্দ্রমোহন অর্থাৎ হিতেনদা আমাদের পাখির আলোচনায় এসে বললেন, তোরা পাখি পুষছিস খুব ভালো কথা। সত্যিকারের পাখি পুষতে হলে

নবাব-বাদশাদের যে পাখি পোষার চল ছিল সেই পাখি পোষ। আমরা সবাই জানতে চাই, সে কী পাখি। উনি বললেন, বাজপাখি। এই বলে একটা ফার্সি বই বের করলেন তাঁর আলমারি থেকে এবং তার থেকে পড়তে লাগলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা করলেন বাজপাখির মহিমা। তাঁর কাছে জানলাম, ক্যাপ্টেন ডি সি ফিলেটের ইংরেজিতে অনুবাদ করা 'বাজনামা-ই-নাসিরি' বইয়ের কথা। সেই বই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে, তখন হয়েছে ন্যাশনাল লাইব্রেরী', সেখানে পাওয়া যাবে।



চি 90 শিকরে

ক্রিকেট খেলোয়াড় কার্তিক বসু ঐ লাইব্রেরিতে গিয়ে টাকা জমা দিয়ে 'বাজনামা-ই-নাসিরি' বইটা এনে কপি করে ফেরত দেন। বইটি বেশি বড়ো ছিলনা, শ' দেড়েক পাতার মতো বই। তারপর পাতিপুকুরের পাখিধরা বেদে সতীশ-চারুদের দিয়ে একটা শিকরে বাজ (ইন্ডিয়ান শিকরা) ধরার পর বই-এর লেখা মতো ত্রিশ দিনের শিক্ষা দেওয়া শুরু হয়। প্রথম দিন— ম্যানিং অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে পরিচয়। পাখিরা মানুষের হাতকে বড়ো ভয় পায়। পাখির দু'পায়ে সরু লাল ফিতে বেঁধে উইকেট কিপিং গ্লাভসের উপর ডান হাতে বসিয়ে সর্বক্ষণ তাকে নিয়ে ঘোরাফেরা। মাঝে মাঝে বাঁ হাতটা ওর মুখের সামনে এনে মাথার উপর দিয়ে একবার আমাদের শিকরে বাজটাকে হাতে নিয়ে চলেছি। দেখি প্রায় 15-20 মি. দূরে এক ছোটো জলার ধারে একটা কোঁচ বক (পণ্ড হেরন) বসে আছে। আমার আড়াল থেকে কার্তিকদা শিকরেটাকে তার শিকার বস্তুকে দেখাল। সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। এবার আর থ্রো বা ছোঁড়া নয়। পাখিটা হাত থেকে উড়ে চলে গেল একটু উপরে যাতে শিকার জলার দিকে না যেতে পারে। দেখা গেল সেই দিক থেকে বাজটা ঘুরে আসছে। বকটা প্রাণভয়ে জলা ছেড়ে উলটো দিকে এদিক-ওদিক এঁকেবেঁকে উড়তে লাগল। কিন্তু পাখিটা উপর থেকে নেমে এল বজ্রসম, পিছনের নখর দিয়ে মারল মাথায়। একটা শব্দের সঙ্গে কতকগুলো পালক এদিক-ওদিক উড়তে লাগল। বকটা মাটিতে পড়ছে, পাখিটাও সঙ্গে নামছে। মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাথা-গলা চেপে ধরে নখর বসিয়েছে। এইভাবে শিকারকে বলে 'দস্তান'।

সেই স্ত্রী-পাখি শ্যেন বর্গের (ফালকনিফরমেস) অন্তর্গত বাজ বংশের (অ্যাকসিপিট্রিদি)বাজি গণের (অ্যাকসিপিটার) শিকরে বাজ (অ্যাকসিপিটার বেডিয়াস), ইংরেজি— *ইন্ডিয়ান শিকরা*, হিন্দী— *শিকরা*। লম্বায়— 31-36 সেমি (12-14 ইঞ্চি,) পুরুষ— চিপক, চিপকা, লম্বায়— 31-36 সেমি (12 14 ইঞ্চি)।

অপরিণতদের চেহারা : উপরাংশ গাঢ় পাটকিলে, লেজে 5 থেকে 7টি কালো পটি ; বুকটা সাদা, তার উপর চওড়া করে লম্বালম্বি পাটকিলে ছিট ও ছোপ। পূর্ণবয়স্ক : উপরাংশ ছাই নীলচে-

বুকে। নিম্নাংশে সাদার উপর খুব ঘন করে মরচে-পাটকিলের আড়াআড়ি সরু টান, বিশেষত বুকের দিকে। গলায় ধূসর টান। স্ত্রী-পুরুষ প্রায় একই দেখতে, স্ত্রী-পাখি আকারে অল্প বড়ো, দেহে ধোঁয়াটে পাটকিলে আর ধূসরের পোঁচ। উভয়ের কনীনিকা সোনালি বা কমলা-হলুদ, চঞ্চু স্লেট-নীল, গোড়ায় ফিকে কালো, মুখ-গহ্বর হলদেটে, চঞ্চুর গোড়ায় অনাবৃত ঝিল্লী উজ্জ্বল হলুদ বা গাঢ় কমলা, পা ও আঙুল হলুদ, নখর কালো।

পরিব্যাপ্তি— পাকিস্তান, সিন্ধু থেকে নেপাল, সারা ভারত একমাত্র কেরালা বা আসাম ছাড়া, 1500 মি. উচ্চতায় হিমালয়ে। দেখা যায় খোলামেলা জঙ্গল, পাহাড় ও সমতলে গাঁ ও ক্ষেতের ধারে। আরও কয়েকটি শিকরে— সিংহলী শিকরে (অ্যা বে পলিওপসিস)। লম্বায় 31 থেকে 36 সেমি (12 14 ইঞ্চি)। দেখা যায় আসামে 900 মি. উচ্চতার মধ্যে, বর্মা, থাইদেশ, মালয় থেকে পূর্ব ইন্দোনেশীয় দেশ সমূহ এবং সেখান থেকে হাইনান ও ফরমোসা। কার-নিকোবর শিকরে (অ্যা বে বাটলেরি), লম্বায় 30 সেমি (12 ইঞ্চি)। দেখা যায় কার-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। কচ্ছল শিকরে (অ্যা বে অবসোলিটাস) ; লম্বায় 33-34 সেমি (13-14 ইঞ্চি)। লেজে একটি মাত্র টান। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কচ্ছল দ্বীপের বাসিন্দা।

খাদ্য— যে কোনো জীবন্ত প্রাণী যা এরা কবজা করতে পারে। যেমন— মেঠো ইঁদুর, নেংটি ইঁদুর, কাঠবিড়ালী, পাখির মধ্যে চড়াই, শালিখ, ছাতারে, বটের, ঘুঘু, ফিঙে, গিরগিটি-টিকটিকি, ব্যাং, পঙ্গপাল, গঙ্গাফড়িং, মেঠো ফড়িং ইত্যাদি পতঙ্গ, উড়ন্ত উঁই ইত্যাদি। কেউ কেউ আবার মুরগীর ছানা চুরি করতেও খুব ওস্তাদ।

ডাক— সাধারণত ডাকে জোরে 'টিটিউ টিটিউ', কখনও বা লম্বা টানের 'ইহিয়া ইহিয়া'। প্রজননকালে একটু জোরে ডাকে জোড়া স্বরে 'টি-টুই'। এই ডাকটা এই সময়ে বারে বারে ডাকে।

স্বভাব— গাছের উপর পাতার আড়াল থেকে অপ্রস্তুত শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবার এও দেখা যায় ঝোপের বাইরে একদল পাখির উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। সেই দলের মধ্যে একটা পাখিকে বেছে নিয়ে তাকে তাড়া করে, যতক্ষণ না তাকে কবজা করতে পারছে। এমনিতে ওড়া খুব দ্রুত, মাঝে মাঝে ডানায় ঝাপট আর ভেসে চলা। হঠাৎ কোনো গাছের ডালে উঠে বসে লক্ষ্য রাখে শিকার বস্তুকে। এইভাবে শিকারের পিছনে যখন ছোটে তখন কাঠবিড়ালী আর ছোটো পাখিদের মধ্যে সোরগোল পড়ে যায়। বিশেষত প্রজননকালে দেখা যায়, একজোড়া শূন্যে উঠে পরস্পরের মধ্যে নানা কসরতের খেলা শুরু করে দিয়েছে। তখনই দেখা যায়, ওড়ার এক কায়দা, গলা একটু বেঁকিয়ে পিঠের উপরে একটু তুলে খুব আস্তে ডানা নেড়ে উড়ে চলেছে। বাজপাখি দিয়ে শিকারের যুগে এদের ধরে শিক্ষা দেওয়া হতো বটের, তিতির, কাক, এমনকি ময়ূরের বাচ্চা শিকার করার জন্যে।

প্রজননকাল— মার্চ থেকে জুন। যদিও স্থানীয় আবহাওয়ায় কিছুটা এদিক-ওদিক হয়। তবে এপ্রিল-মে মাসেই বেশি দেখা যায়। বাসা বাঁধে অগোছালভাবে কাকের বাসার মতো কাঠি, ঘাস ও শিকড় দিয়ে। 30 সেমি চওড়া, 10 সেমি গভীর বাসা 7 থেকে 15 মিটার উচ্চতার মধ্যে ঝোপড়া আম, নিম, তেঁতুল বা অন্য কোনও বড়ো গাছে অথবা তালগাছের উপর। ডিম পাড়ে 3-4টি,

কদাচিৎ 6টি ফিকে নীলচে ধূসর, মাঝে মাঝে ফোঁটা ছিটানো সরু কালো টান ও ফিকে ধূসর বা ল্যাভেন্ডারের ছোপ। ডিমের গড় মাপ ৩৯.৪ × ৩১। মিমি। স্ত্রী পুরুষ দু'জনেই বাসা বাঁধায় এবং সন্তান প্রতিপালনে পরস্পরকে সাহায্য করে। পুরুষ পাখি ডিমে তা' দেয় কিনা তা এখনও জানা যায় নি। 18-21 দিনের মধ্যে ডিম ফোটে।

কার্তিক বসু এই বাজিগণের আরও দুটি পাখিতে আমায় দার্জিলিং জেলা থেকে। না আনালে এই পাখি দু'টিকে এত কাছ থেকে চোখেই দেখতে পেতাম না।

বাশা   Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus

বাজি গণের (অ্যাকসিপিটার) এই পাখিটির নাম— বাশা (অ্যাকসিপিটার নিসাস নিসোসিমিলিস)। ইংরেজি— *স্প্যারো-হক*, তেলেগু— *ওয়ারনাপা ডেগা*, মালয়ালাম— *প্রাপ্পিডিয়ান*, লেপচা— *টাক্তি*, সিকিম— উচুম। পুরুষ বাশিন, লম্বায় আমাদের শিকরের মতই 31-36 সেমি (12-14 ইঞ্চি)।

মাঝারি আকারের ছোটো ডানার বাজ। শিকরের মতই প্রায় দেখতে, তবে আকারে একটু বড়ো। উপরাংশ কিছুটা গাঢ় স্লেট- রঙের। নিম্নাংশে লালচে ভাব বেশি। মাথায় কালচে ভাবও বেশি। লেজে চার থেকে পাঁচটি কালো পটি। চোখের উপর একটা সাদা টান। গলায় কালো টান। কনীনিকা সোনালি-হলুদ বা কমলা-হলুদ, চঞ্চু স্লেট-ধূসর, ডগাটা কালো, চঞ্চুর প্রান্তে অনাবত ঝিল্লী (cere) লেবু-হলুদ ; পা ও আঙুল উজ্জ্বল হলুদ, নখর কালচে।

বাসস্থান— বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম হিমালয়, কাশ্মীর থেকে পুবে হিমালয় ধরে নেপাল, সিকিম, ভূটান, দার্জিলিং থেকে পূর্ব আসামে 1400 থেকে 3500 মি. উচ্চতার মধ্যে। শীতে পাহাড়ের পাদদেশে এমনকি সমতলেও নেমে আসে। দেখা যায় জঙ্গল এবং ঘন গাছপালার পার্বত্য ভূমিতে। আরও একটি বাশা ভারতে দেখা যায়, সেটি হল— **এশীয় বাসা** (অ্যা জি নিসোসিমিলিস)। শীতে দেখা যায় কাশ্মীর থেকে হিমালয় ধরে পূর্বাংশে। দক্ষিণে কেরালা, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, আন্দমান দ্বীপপুঞ্জে। শ্রীলঙ্কায় কিন্তু দেখা যায় না।

বেসরা   Besra Accipiter virgatu

এটিও বাজি গণের (অ্যাকসিপিটার) পাখি। নাম— বেসরা (অ্যাকসিপিটার ভিরগাটাস আফিনিস), ইংরেজি— *বেসরা স্প্যারো-হক*, হিন্দি— *খন্দ বেসরা*। পুরুষ-ধূতি। লম্বায় 31-36 সেমি (12-14 ইঞ্চি)। 29-36

মাঝারি আকারের ছোটো ডানার বাজ, শিকরেরই মতন, তবে বেশ পরিস্কারভাবে গলায় কালো টান। উপরাংশ গাঢ় চকোলেট-পাটকিলে, ক্রমে সেটা মাথায় ও ঘাড়ে স্লেট-কালো। নিম্নাংশে চিবুক ও গলা সাদা, তার উপর দিয়ে একটা চওড়া কালো টান এবং দুটো অস্পষ্ট কালো টান।। উপরের বুকের উপরাংশ ও তার দু'পাশ লালচে, আর বুক ও পেটের মাঝে ছোটো কালো টান। কনীনিকা

...লি-হলুদ ; চঞ্চু স্লেট-ধূসর। ডগায় কালো ছোঁয়াচ, চক্ষুর প্রান্তে অনাবৃত ঝিল্লী লেবু-হলুদ ; ... ও আঙুল উজ্জ্বল-হলুদ : নখর কালচে।

...স্থান— নেপাল, সেখান থেকে পুবে আসাম পাহাড়, ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর ও দক্ষিণাংশ, ...র 1000 থেকে 2000 মি. উচ্চতার মধ্যে। শীতে পাহাড়ের পাদদেশে বা তার কাছে-পিঠের ... দেখা যায় পশ্চিম চীন, ইউনান, উত্তর ব্রহ্মদেশে। শীতে দক্ষিণ চীন, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড ...হ্মচীনীয় অঞ্চলে। আরও কয়েকটি বেসরা দেখা যায়— **পশ্চিম হিমালয়ের বেসরা** (অ্যা ...কাশ্মীরিয়েনসিস), ইংরেজি— ওয়েস্ট *হিমালয়ান স্প্যারো-হক*। লম্বায় 31-36 সেমি (12-14 ...। বাসস্থান— কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, গাড়োয়ালে 3000 মি. উচ্চতার মধ্যে। শীতে নামে ... ও উত্তরপ্রদেশ এবং পুবে নেপাল এবং তার নিকটবর্তী স্থানে।

...ণী বেসরা (অ্যা ভি বেসরা)। ইংরেজি— *সাদার্ণ বেসরা স্প্যারো-হক*। লম্বায় 29-34 সেমি (11-13 ইঞ্চি)। *বাসস্থান*— শ্রীলঙ্কায় 1800 মি. উচ্চতার মধ্যে সর্বত্র, ভারতের পশ্চিম ঘাটে নীলগিরি ...পালনি পাহাড়ের ভিতর দিয়ে কেরালা, তার উত্তরে বোম্বাই-এর কাছে। মাঝে মাঝে পূর্ব ঘাটে ...ঞ্চলে দেখা যায় 600 থেকে 1200 মি. উচ্চতার মধ্যে। **পূর্বী বেসরা** (অ্যা ভি গুলরিস)। ইংরেজি— ...স্টার্ণ *স্প্যারো-হক*। লম্বায় 29-34 সেমি (11-13 ইঞ্চি)। *বাসস্থান*— আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে পোর্ট ব্লেয়ারের ...। বেশি দেখা যায় নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে।

খাদ্য— প্রধানত ছোটো পাখি। যেমন, বসন্তবউরি (বারবেটস্), বুলবুল (থ্রাসেস), চড়াই, বাসগাঙ্গরা ...), টুনটুনি-ফুটকি (ওয়ার্বলার্স)। এছাড়া ছোটোখাটো উড়ন্ত কাঠবিড়ালী, নেংটিইঁদুর, চামচিকে, টিকটিকি-গিরগিটি, পোকামাকড়। এদের স্ত্রীপাখি অর্থাৎ বেসরা দিয়ে তিতির, ঘুঘু, কাদাখোঁচা ইত্যাদি শিকার করানো হয়। পুরুষ-পাখি দিয়ে শিকার করানো হয় শালিক বংশীয় পাখি, চড়াই ইত্যাদি। ...রা বাজপাখি দিয়ে শিকার করান তাঁদের মতে এরা বাশাদের চেয়ে বেশি দ্রুত এবং নাছোড়বান্দা বেশি।

ডাক— বাসা বাঁধা ও রক্ষা করার জন্যে চিৎকার করে বেশি। ডাক লিপিবদ্ধ করা হয় নি।

স্বভাব— শিকরে বা বাশার মতই এদের আচার-ব্যবহার, তবে এরা একটু গভীর জঙ্গলের বাসিন্দা। শিকারের পেছনে খুব দ্রুত ওড়ে এঁকে-বেঁকে পথের বাধা এড়িয়ে।

প্রজননকাল— মার্চ থেকে জুন, তবে প্রধানত এপ্রিল-মে মাসেই বেশি। বাসা বাঁধে কাঠির টুকরো দিয়ে প্ল্যাটফর্ম আকারে 15 থেকে 25 মি. উচ্চতায় পাতায় ঘেরা দেবদারু বা জঙ্গলের অন্য কোনও পাতাভরা গাছে। প্রায়ই দেখা যায় এই গাছগুলো পাহাড়ের চূড়ার ধারে। প্রধানত বাছে পরিত্যক্ত দাঁড়কাকের বা ঐ জাতীয় কোনো জাতের পাখির বাসা। ডিম পাড়ে 3 থেকে 5টি খুব সুন্দর, প্রায় গোলাকার নানা রঙের হলেও প্রধানত নীলচে-সাদা তার উপর ছিট ও ছোপ থাকে নানা আকারের। মোটা দিকটার উপরে থাকে লালচে বা পাটকিলের ছোপ। ডিমের গড় মাপ 38.2 × 30.5 মিমি। ঘর-গেরস্তালীর কাজে স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই খাটে, কিন্তু কত দিনে ডিম ফোটে তা এখনও জানা যায় নি।

বাজ (Northern Goshawk) Accipiter gentilis

দার্জিলিং গেলেই সিকিমের পথে বেড়িয়ে আসাটা আমার চাই। এটা সেই 1979 সালের ঘটনা। প্রায় সিকিমের কাছে এসে পড়েছি। জিপটা ঢালুপথে নামছে। হঠাৎ দেখি একটা বেশ বড়োসড়ো পাখি কি একটা পাখিকে তাড়া করে আসছে। নিমেষে তাড়া খাওয়া পাখিটা নিচে এক ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। তাড়া করা পাখিটা দু'একটা চক্কর দিয়ে বড়ো একটা গাছের ডালে বসল। দেখি নিচে ঝোপের দিকে নজর রাখছে। পাখিটা ঝোপ থেকে বেরুলেই সে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাড়া খাওয়া পাখিটাকে বুঝতে পারলাম না। যে তাড়া করছিল তাকে চিনলাম, যখন গাছের ডালে বসল তখন দূরবীন দিয়ে দেখে। জিপটাকে ইতিমধ্যে থামিয়ে নেমে দূরবীন দিয়ে দেখছি। পাখিটাকে চিনতে ভুল হল না। তবে এইভাবে প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত অঙ্গনে দেখব তা কল্পনা করি নি।



চি 91. বাজ

প্রথম দেখেছিলাম রাজারাজড়াদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ত্রিশের দশকে অমৃতসরে দেওয়ালির দিন এই জাতের পাখিদের এক মেলা হতো। পাতিয়ালা, নাভা, কর্পূরথালা, বরোদা, বুন্দি এইসব জায়গার ছোটোবড়ো রাজা ও নবাবদের খেলার মাঠে তাঁবু পড়তো। পায়রা ছেড়ে দেবার পর রাজা বা তাঁদের শিক্ষিত শিকারী পাখিদের ছাড়তেন সেই পায়রাকে কবজা করার জন্যে। শিক্ষিত পাখিগুলি একে অপরের কাছ থেকে কিভাবে শিকারকে ছিনিয়ে নেয় এবং শেষ পর্যন্ত কে জয়ী হয়, তারই খেলা চলত সেইখানে। সেই অপূর্ব স্পোর্টস্ দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। নানা পাখির মধ্যে একটিকে সংগ্রহ করার খুবই আগ্রহ হয়েছিল আমার ও ক্রিকেটার কার্তিক বসুর। শিকারে শিক্ষিত পাখির যা দাম তা কেনা আমাদের সাধ্যের বাইরে ছিল। বাচ্চা অশিক্ষিত পাখি ওই মেলায় দু'একটি যা এসেছিল তারও দাম প্রায় একশ' টাকার কাছাকাছি। এই দাম হওয়াটাও তখনকার দিনে খুব বেশি নয়—কারণ এই পাখি হিমালয়ের যে উচ্চতা ও দূরূহতম অঞ্চলের পাখি, তা সংগ্রহ করে বাজারে আনা ছিল কঠিন শ্রমসাধ্য কাজ। ত্রিশের দশকে সেটাও আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া ঝুঁকি নিয়ে যদিই বা কিনি তাকে কলকাতার আবহাওয়ায় বাঁচাতে পারব কিনা সেটাও ছিল আমাদের চিন্তার বিষয়। তাই কোনদিনই এই পাখি পোষা বা শিক্ষা দিয়ে তৈরি করা হয়ে ওঠেনি।

এই মেলার বছর দুই পরে অমৃতসরেই আগে যাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল, সেই বরোদার

বাজশালায় এই পাখির শিকার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। বাজশালার রক্ষকের কাছে কিছুই জেনেছিলাম। একদিন একটি পাখির শিকার দেখলাম। দুপুরের দিকে বার হলাম নিয়ে। চোখে চামড়ার ঠুলি (হুড), পায়ের পুরো গুল্‌ফ বা গোড়ালি (টারশাস) পাতলা চেপটা ফিতে দিয়ে বাঁধা। শিকারজীবী অন্য কোনও পাখির পা। এইভাবে বাঁধা কখনও পরে বুঝেছিলাম পুরো গোড়ালিটা কেন এইভাবে চামড়ার ফিতেয় বাঁধা। বেশ খানিকটা একটা জংলা মতো জায়গায় আড়াল থেকে একটা বুনো খরগোস দেখে রক্ষক তাড়াতাড়ি চোখের ঠুলিটা খুলে তাকে হাত থেকে ছেড়ে দিল। তাকে দেখে খরগোসটা আত্মগোপন করল, কিন্তু চোখের পলকে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একশ' সওয়াশ' মিটার অসম্ভব উড়ে গেল মাটির সমান্তরালে কয়েকটা ডানার ঝাপট এবং ভাসার মাধ্যমে। তারপরে ডান-পিছনের নখর শিকারের চোখের ভিতর বসিয়ে দিয়ে থাবাটা বসাল। আর বাঁ-পা দিয়ে ঝোপের সরু ডাল আঁকড়ে ধরে ব্যালান্স রাখল, যাতে খরগোসটা আর যেতে না পারে। আমরা ছুটে গিয়ে খরগোসটাকে ধরলাম। পায়ে চামড়ার পটির অর্থ তখন বুঝলাম। যাতে ঝোপের পা ক্ষতবিক্ষত না হয় তার জন্যেই এই সাবধানতা। বাঁ-পায়ের কি অসম্ভব জোর তাও স্রেফ আটকে রেখে দিল ওই খরগোসটাকে যতক্ষণ না আমরা গিয়ে তাকে ধরেছি।

পাখিটি শ্যেন বর্গের অন্তর্গত বাজ বংশে (অ্যাকসিপিট্রিদি) বাজ গণের (অ্যাকসিপিটার) প্রজাতি। নাম— বাজ (স্ত্রী), পুং জুর্‌রা (অ্যাকসিপিটার জেন্টিলিস), ইংরেজি— *গোশক*।

লম্বায় 61 সেমি (24 ইঞ্চি), পুরুষ জুর্‌রা আকারে ছোটো 50 সেমি (20 ইঞ্চি)। শিকারজীবী স্ত্রী-জাতি সবসময়েই আকারে বড়ো হয়। তারা শিকারে বেশি পটু ও শক্তিশালী। দেখলে লম্বা লেজ ও বেঁটে গোল ডানা নিয়ে বড়ো জাতের শিকরে (অ্যাকসিপিটার বেডিয়াস) এদের দেহের উপরাংশ গাঢ় ধূসর, চাঁদি, ঘাড়, মাথার দু'পাশ ও গলায় একটু বেশি গাঢ় কপালের ধার ও ভ্রূর উপরটা সাদা। নিম্নাংশ সাদা, তার উপর কালো ভাঙা ভাঙা সরু লেজের টান চওড়া। তিন-চারটি কালো পটি। অল্পবয়স্কদের উপরাংশ হালকা পাটকিলে, পালকের একদম ধারে হলদেটে-সাদা, চাঁদি ঘাড় ও গলায় বড়ো করে পাটকিলের ছোপ। চিত্র-বিচিত্র পাটকিলের উপর 4-5টি কালচে পটি। নিচের অংশ লালচে-হলুদ, তার উপর ছোটবড়ো ফোঁটা, সরু লম্বা টানের দাগ নয়। সঙ্গের ছবিটা অল্প বয়স্কের। কনীনিকা বিভিন্ন বিভিন্ন রকম। সেটা লক্ষ্য করেছিলাম বরোদার বাজশালায়। খুব অল্পবয়স্কদের লেবু হলুদ, বড়ো হলে সোনালি-হলুদ, পূর্ণবয়স্কদের লাল। চঞ্চু গাঢ় স্লেট-শীসে, গোড়াটা ফিকে। নাকের ঝিল্লী হলদে, উপরাংশ একটু সবুজাভ। পা ও আঙুল হলুদ, নখর কালো।

বাসস্থান— 2400 মি. উচ্চতার মধ্যে দক্ষিণপশ্চিম হিমালয়, গাড়োয়াল থেকে পুবে। শীতে নিম্ন নামে উত্তর ভারত, কাশ্মীর থেকে সিকিম এবং আসামে। পাকিস্তানের সিন্ধু ও ভাওয়ালপুর এবং গুজরাটের সৌরাষ্ট্রে ক্বচিৎ দেখা যায়। দেখা যায় হিমালয়ে ওক, রূপোলি ফার, দেবদারু গাছের মাথার চূড়ায়। ভারতের বাইরে মধ্য-এশিয়ার বারনৌল ও ক্রাসনয়ার্স্কা থেকে ইয়াকুইলক

এবং আলভান নদী, দক্ষিণে তিয়েনশান, আলতাই পর্বত এবং আমুর নদীতে।

খাদ্য— পাখির মধ্যে জীবঞ্জীব (ফেজান্ট), তিতির, পায়রা এবং পশুর মধ্যে খরগোস প্রিয়। ভারতে ডাক শোনা যায় নি, অন্যত্র ছোটো চিৎকার, ও ডাক দেয় 'গিয়াক-গিয়াক-গিয়াক'।

বাজ স্বভাবে বাজ গণের (অ্যাকসিপিটার) শিকরে ও অন্যান্য পাখি এবং সাদাল বা শা-বাজদের (হক-ঈগল) মতো, শিকার বিপদ বোঝবার আগেই ঘন পাতায় ঘেরা ডাল থেকে মুহূর্ত মধ্যে শিকারের উপর ঝাপিয়ে পড়ে, যেন বিনামেঘে বজ্রপাত হল। তাই এর নাম 'বাজ'। দৈবক্রমে শিকার যদি নিজের প্রাণ বাঁচাতে পারে তবে বেশ কয়েক শ' মিটার ধাওয়া করে তাকে ধরে। তাও যখন ধরতে পারে না তখন আর তাড়া না করে ফিরে আসে। শিকারের পিছনে ধাওয়ার মুহূর্তে বাধা পেলে ডাল থেকে নেমে মাটির কাছ দিয়ে ঘন ঘন ডানার ঝাপট মেরে খুব দ্রুত খাড়া হয়ে উড়ে গিয়ে আর-একটা গাছের ডালে বসে। হিমালয়ের উচ্চভূমিতে যেখানে গাছের লাইন শেষ হয়েছে, সেখানে পাথরের উপর বসে শিকারের প্রতি দৃষ্টি রাখে কখন আড়াল থেকে তুষার তিতির ইত্যাদিরা বেরিয়ে আসবে আর তখনই সে ঝাঁপিয়ে পড়বে। একটু বেলায় বা বিকেলের আগে দেখা যায় খুব উঁচুতে ভেসে ভেসে চক্কর দিচ্ছে, লেজ কিছুটা পাখার মতো ছড়ান, ডানা পুরোপুরি বিস্তারিত এবং নিঃশব্দ সঞ্চরণ।

এক সময় ভারত ও পাকিস্তানে রাজা ও নবাবদের মধ্যে বাজপোষার খুব রেওয়াজ ছিল। সুগঠিত স্ত্রী-বাজপাখিকে শিক্ষা দিয়ে খরগোস, হুবারা (বাস্টার্ড), নানারকম হাঁস, বক এবং অন্যান্য বড়ো পাখি শিকার করান হতো।

প্রজননকাল— মনে হয় মার্চ-এপ্রিলে হিমালয়ের উচ্চাংশে গাড়োয়াল, বুশাহির ইত্যাদি অঞ্চলে। প্রজননকালীন আচার-ব্যবহার, সন্তান প্রতিপালন সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নি। একসঙ্গে 2টি ডিম সংগ্রহের খবর এখনও পর্যন্ত পাওয়া গেছে। চওড়া উপবৃত্তাকার ধূসরাভ-সাদা। একটি ডিমে ছিল ফিকে পাটকিলের ছিট ও ছোপ। খুব সম্ভবত সেটি স্বাভাবিক নয়, অন্য কোনও কারণে হয়ে থাকবে। প্রথম ডিমের মাপ 55·9 × 45·2, অপরটি 53·3 × 43·2 মিমি।

চিল

সেই কালের কথা, যখন হাওড়া থেকে বেলা এগারটা নাগাদ রেলগাড়িতে চাপলে বর্ধমান পৌঁছতে বিকেল হয়ে যেত। ট্রেন কিন্তু এক্সপ্রেস। প্যাসেঞ্জারের অভিজ্ঞতা নেই, তাই বলতে পারব না কখন পৌঁছত। মনে হয় সন্ধ্যে হতো। সেই যুগে স্কুলে গরমের ছুটি হলে, আমরা সদলবলে কামরা রিজার্ভ করে গিরিডি যেতাম। সেবার বিকেল তিনটে কি সাড়ে তিনটে নাগাদ বর্ধমান পৌঁছেছি। আধ ঘণ্টা দাঁড়াবে, ইঞ্জিনে জল ভরবে। ট্রেনে চাপলেই আমার দারুণ খিদে পায়। এই বয়সেও তার থেকে রেহাই পাই না। অনেকক্ষণ ধরেই খাই খাই করে গুরুজনদের বিরক্ত করেছি। বর্ধমান স্টেশনে

...রোদার বাজশালায় এই পাখির শিকার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। বাজশালার রক্ষকের কাছে কিছুই জেনেছিলাম। একদিন একটি পাখির শিকার দেখলাম। দুপুরের দিকে বার হলাম ...নিয়ে। চোখে চামড়ার ঠুলি (হুড), পায়ের পুরো গুল্ফ বা গোড়ালি (টারশাস) পাতলা ...টা ফিতে দিয়ে বাঁধা। শিকারজীবী অন্য কোনও পাখির পা। এইভাবে বাঁধা কখনও ...পরে বুঝেছিলাম পুরো গোড়ালিটা কেন এইভাবে চামড়ার ফিতেয় বাঁধা। বেশ খানিকটা ...একটা জংলা মতো জায়গায় আড়াল থেকে একটা বুনো খরগোশ দেখে রক্ষক তাড়াতাড়ি চোখের ঠুলিটা খুলে তাকে হাত থেকে ছেড়ে দিল। তাকে দেখে খরগোসটা আত্মগোপন চেষ্টা করল, কিন্তু চোখের পলকে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একশ' সওয়াশ' মিটার অসম্ভব উড়ে গেল মাটির সমান্তরালে কয়েকটা ডানার ঝাপট এবং ভাসার মাধ্যমে। তারপরে ডান-পিছনের নখর শিকারের চোখের ভিতর বসিয়ে দিয়ে থাবাটা বসাল। আর বাঁ-পা দিয়ে ঝোপের সরু ডাল আঁকড়ে ধরে ব্যালান্স রাখল, যাতে খরগোসটা আর যেতে না পারে। আমরা ছুটে গিয়ে খরগোসটাকে ধরলাম। পায়ে চামড়ার পটির অর্থ তখন বুঝলাম। যাতে ঝোপের ...পা ক্ষতবিক্ষত না হয় তার জন্যেই এই সাবধানতা। বাঁ-পায়ের কি অসম্ভব জোর তাও ...লাম। স্রেফ আটকে রেখে দিল ওই খরগোসটাকে যতক্ষণ না আমরা গিয়ে তাকে ধরেছি।

এই পাখিটি শ্যেন বর্গের অন্তর্গত বাজ বংশে (অ্যাকসিপিট্রিদি) বাজ গণের (অ্যাকসিপিটার) ...প্রজাতি। নাম— বাজ (স্ত্রী), পুং জুর্‌রা (অ্যাকসিপিটার জেণ্টিলিস), ইংরেজি— গোশক। বাজ লম্বায় 61 সেমি (24 ইঞ্চি), পুরুষ জুর্‌রা আকারে ছোটো 50 সেমি (20 ইঞ্চি)। শিকারজীবী পাখিদের স্ত্রী-জাতি সবসময়েই আকারে বড়ো হয়। তারা শিকারে বেশি পটু ও শক্তিশালী। দেখলে ...হয় লম্বা লেজ ও বেঁটে গোল ডানা নিয়ে বড়ো জাতের শিকরে (অ্যাকসিপিটার বেডিয়াস) ...। এদের দেহের উপরাংশ গাঢ় ধূসর, চাঁদি, ঘাড়, মাথার দু'পাশ ও গলায় একটু বেশি গাঢ় ...। কপালের ধার ও ভ্রূর উপরটা সাদা। নিম্নাংশ সাদা, তার উপর কালো ভাঙা ভাঙা সরু ... কিন্তু লেজের টান চওড়া। তিন-চারটি কালো পটি। অল্পবয়স্কদের উপরাংশ হালকা পাটকিলে, ...টি পালকের একদম ধারে হলদেটে-সাদা, চাঁদি ঘাড় ও গলায় বড়ো করে পাটকিলের ছোপ। ...জে চিত্র-বিচিত্র পাটকিলের উপর 4-5টি কালচে পটি। নিচের অংশ লালচে-হলুদ, তার উপর লালচে ছোটবড়ো ফোঁটা, সরু লম্বা টানের দাগ নয়। সঙ্গের ছবিটা অল্প বয়স্কের। কনীনিকা বিভিন্ন ...সে বিভিন্ন রকম। সেটা লক্ষ্য করেছিলাম বরোদার বাজশালায়। খুব অল্পবয়স্কদের লেবু হলুদ, ...একটু বড়ো হলে সোনালি-হলুদ, পূর্ণবয়স্কদের লাল। চঞ্চু গাঢ় স্লেট-শীসে, গোড়াটা ফিকে। নাকের আবৃত ঝিল্লী হলদে, উপরাংশ একটু সবুজাভ। পা ও আঙুল হলুদ, নখর কালো।

বাসস্থান— 2400 মি. উচ্চতার মধ্যে দক্ষিণপশ্চিম হিমালয়, গাঢ়োয়াল থেকে পুবে। শীতে নিম্ন হিমালয়ে নামে উত্তর ভারত, কাশ্মীর থেকে সিকিম এবং আসামে। পাকিস্তানের সিন্ধু ও ভাওয়ালপুর ...প এবং গুজরাটের সৌরাষ্ট্রে ক্বচিৎ দেখা যায়। দেখা যায় হিমালয়ে ওক, রূপোলি ফার, দেবদারু ...তি গাছের মাথার চূড়ায়। ভারতের বাইরে মধ্য-এশিয়ার বারনৌল ও ক্রাসনয়ার্স্কা থেকে ইয়াকুইলক



চি 92. চিল

গাড়ি ঢুকতেই আমার প্রিয় পুরী-আলুর-তরকারি নিয়ে প্ল্যাটফর্মের উলটো দিকের জানালার বাইরে হাত রেখে একটা পুরীতে আলুর তরকারি নিয়ে মুখে দিতে যাব, এমন সময় সব অন্ধকার হয়ে গেল। ডান হাত আর মুখে তোলা হল না। কে যেন নিমেষের মধ্যে পুরীটা ছিনিয়ে নিল। বাঁ-হাতের পুরীর ঠোঙাটা নিচে পাদানির পাশে মাটিতে পড়ে গেল। আমি হতভম্ব। সম্বিৎ ফিরতে দেখি একটা চেনা পাখি নখরে করে আমার পুরীটা নিয়ে উড়ে যাচ্ছে। জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে খাওয়ার নির্বুদ্ধিতার জন্য সকলের কাছে সেইসঙ্গে খাচ্ছি বকুনিও।

মাঝে শুনেছিলাম কলকাতার বুকে এই পাখি কমে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের এই পার্কসার্কাস পাড়ায় বিশেষ কমতি দেখি না। প্রতিদিন সকালে আমাদের চা খাবার পর চড়াই, পায়রা, কাক-শালিককে যখন বারান্দায় খেতে দিই, তখন দেখি অদূরে হয় নারকেল গাছের উপরে দুটো বসে আমার দেখছে, না হয় পাশে কর্পোরেশনের দোতলা প্রসূতি হাসপাতালের টিভি-অ্যান্টেনার উপর বসে লক্ষ্য রাখছে আমি কি করছি। বাজার থেকে ফিরে এসে দাঁড়ালেই দু'জনে সমস্বরে ডেকে ওঠে। আমি ওদের ডাক শুনে চিঁহিবাবা বলে ডাক দিলেই ওরা উড়তে থাকে। আমি মাছের নাড়ি-ভুড়ি বা মাংসের পর্দাটর্দা যা সাফসুফ করার পর থাকে তা নিয়ে এসে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিই, আর ওরা শূন্যমার্গে সেগুলি ধরে। ফস্কে গেলে গোঁৎ খেয়ে মাটিতে পড়ার আগে তুলে নেয়। তা না, পারলে সেগুলি মাটি থেকে কাকেরা তাদের মুখ-গহ্বরে দেয়। ওদের শূন্যমার্গে কসরত দূর থেকে দেখে আরও দশ-বারটা এসে জোটে।

আমাদের অতি পরিচিত এই পাখিরা শ্যেন বর্গের (ফালকনিফরমেস) অন্তর্গত বাজ বংশের (আকসিপিট্রিদি) এক *প্রজাতি*। নাম— চিল, গোদা চিল, ডোম চিল (মিলভাস মাইগ্রানস), ইংরেজি— *পারিয়া কাইট*।

চিল লম্বায় 61 সেমি (24 ইঞ্চি)। স্ত্রী-পাখির ডানা একটু বড়, তাছাড়া তফাত ধরা যায় না। উপরের পালক পাটকিলে, মাথার উপর এবং ঘাড়ের পিছন হালকা পাটকিলে, সূঁচলো ডানার দু-পাশ গাঢ়। চোখের ঠিক পিছনে কালো ছোপ। বাইরের ওড়ার পালক কালচে এবং প্রতিটি পালকে কমবেশি গাঢ় পটি ও ডগার দিকটা সাদাটে। লেজের উপরাংশ পাটকিলে, নিম্নাংশে অনেকগুলি সাদাটে-পাটকিলের গাঢ় পটি। নিচের অংশ উপরের অংশের চেয়ে অনেক হালকা। চিবুকের কাছটা সাদাটে, লেজের কাছে লালচে-হলদে। উড়লে লেজটা চেরা স্পষ্ট দেখা যায়। কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু কালো, নাকের উপর অনাবৃত ঝিল্লী হলদেটে। পা ও আঙুল ফিকে হলুদ, অল্পবয়স্কদের সবজেটে-হলুদ। নখর কালো।

বাসস্থান— পাকিস্তান, বাংলাদেশ, সমগ্র ভারতের সমতল ও পার্বত্য অঞ্চলে 2200 মি. উচ্চতার মধ্যে নেপাল, আন্দামান এবং শ্রীলঙ্কার নিম্নভূমির খরা অঞ্চল। দেখা যায় গ্রাম ও শহরের লোকালয়ের মধ্যে, এমনকি শহর-গ্রাম থেকে দূরে যেখানে বেদেরা তাঁবু ফেলেছে তার আশপাশে। ভারতের বাইরে বর্মা এবং মাঝেমধ্যে মালয়েশিয়া। যখন যে অঞ্চলে খুব বৃষ্টিপাত হয় তখন শুষ্ক অঞ্চলে সরে যায়।

খাদ্য— মোটামুটি সর্বভূক। প্রধানত মৃত জীবজন্তুর নাড়িভুঁড়ি, মরা ইঁদুর, টিকটিকি-গিরিগিটি, ব্যাঙ, হাঁস-মুরগির ছানা, উড়ন্ত পিঁপড়ে ও অন্যান্য পোকামাকড়। চিল সন্তান প্রতিপালনের সময় হাঁস-মুরগি পালকদের কাছে বিভীষিকা। এরা হাঁস-মুরগির ছানা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাবেই। ভুল করে গলফ খেলার বলও তুলে নিয়ে যেতে দেখেছি গড়ের মাঠে।

ডাক— তীক্ষ্ণসুরের রেশের সঙ্গে 'চি-ল্ হি-হি'। উড়তে উড়তে যেমন ডাকে, তেমনি কোন গাছে বা অন্য কোনও জায়গায় বসেও 4 থেকে 7 বার ডাকে। শত্রুর হাত থেকে বাসা রক্ষা করার সময় আরও রাগীস্বরে একটা যুদ্ধংদেহি ভাবের সঙ্গেও এই ডাকটা ডাকে।

স্বভাব— চিলকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে গ্রাম এবং শহরে দেখা যায়। মৃত জীবজন্তুর বর্জিতাংশ খেতে দক্ষ বলে মানুষের বড়ই উপকারী বন্ধু। সেই কারণে কসাইখানা, মাছের বাজার, আবর্জনার স্তূপ, জাহাজঘাটা এবং বাজারের ধারে দেখা যাবেই। চিল যেমন সাহসী তেমনই হিংস্র। এদের ওড়ার শৈলী দেখে মুগ্ধ হতে হয়। আকাশের বুকে ভাসা এবং পরস্পরে যখন খেলার ছলে নকল যুদ্ধ করে তা দেখবার মত। ছোঁ-মারার ভঙ্গিটিও খুব সুন্দর। খুব ভিড়-লোকজন, গাড়িঘোড়া, ট্রামবাস, ইলেকট্রিক-টেলিফোনের তার ইত্যাদির ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে যখন একটি মরা ইঁদুর বা অন্য কোনও মৃত আবর্জনা তুলে নেয়, তখন ওদের ওই সাবলীল গতিবিশিষ্ট সাহসী ভঙ্গীটি দেখে তারিফ না করে পারা যায় না। পছন্দসই গাছে অনেক সময় দলবদ্ধ হয়ে রাত্রিবাস করে।

প্রজননকাল— এক-এক জায়গায় এক-এক রকম। হিমালয়ে মার্চ থেকে মে, উপদ্বীপাত্মক ভারতে সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল, শ্রীলঙ্কায়, ডিসেম্বর থেকে মে। প্রজননকালে স্ত্রী-পাখি চিৎকার করতে থাকে, ঐ আহ্বানে শূন্য থেকে উড়ে এসে পুরুষ স্ত্রী-পাখির পিঠের উপর নামে। ঘন ঘন ডানা নেড়ে ভারসাম্য বজায় রেখে মিলিত হয়। দিনে 5-7 বার এই মিলনসাধন হয়। এইভাবে চলে বেশ কিছুদিন, প্রায় মাসখানেক। তারপর বাসা বাঁধে নিম, বট, অশ্বত্থ, তেঁতুল, শিশু, আম প্রভৃতি বড় গাছের দুই ডালের মাঝে। মানুষের বসতির কাছেই এদের বাসা, নারকেল বা তাল গাছেও বাসা বাঁধতে দেখা যায়। বাসা ছিরিছাঁদহীন প্ল্যাটফর্ম আকারের। উপকরণ শুকনো সরু গাছের ডাল, সরু তার, ছেঁড়া ন্যাকড়া, শন-পাট প্রভৃতি আঁশ এবং যত রকমের আবর্জনা।

ডিম পাড়ে 2-3টি, ক্বচিৎ 4টি চওড়া উপবৃত্তাকার। রঙ এবং দাগের কোন স্থিরতা নেই। কখনও দেখা যায় ধূসরাভ, কখনও সবুজাভ বা ফিকে গোলাপী, তার উপর কালচে-পাটকিলে, বেগুনী বা রক্তলালের ছিট ও ছোপ। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই বাসা বাঁধা থেকে সন্তান প্রতিপালন সবই করে, কিন্তু কতদিনে ডিম ফোটে তা এখনও নথিভুক্ত হয় নি। ডিমের গড় মাপ 52.7 × 42.7 মিমি।

শঙ্খচিল

এক সময় শহরকলকাতার আশপাশে খুবই দেখা যেত ; বালিগঞ্জ, গড়িয়া, যাদবপুর, দমদম, গ্রামগ্রাম, কাশীপুর, বরানগর সর্বত্র। কলকাতায় বাগবাজার বা আউট্রাম ঘাটে, গঙ্গার ধারে দেখেছি। এখন আর দেখা যায় না, অন্তত আমার চোখে পড়ে না। ওদের আসা-যাওয়া বা থাকার পরিবেশ ঠিক শহর-কলকাতা বা তার শহরতলিতে আর নেই। অবশ্য এখন দেখতে পাই দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণা আর সুন্দরবনে যত্রতত্র। তখনই বুঝতে পারি এরা এখনও অবলুপ্তির পথে যায় নি।

পাখিটি দেখতে বেশ। মাথা, ঘাড় এবং গলা থেকে পেটের মাঝখান পর্যন্ত সাদা। বাকি পালক লালচে-বাদামী, লেজ-ছোঁয়া লম্বা ডানা ও অল্প গোলাকার লেজের তলা হালকা এবং নিষ্প্রভ। ডানার বাইরের পালক কালো এবং লেজের ডগাটা সাদাটে। শরীরে প্রায় সর্বত্র উপর থেকে নিচে লম্বা লম্বা সরু কালো টান। চঞ্চু মোটামুটি বড়, চাপা এবং গোড়া থেকে একটু বাঁকান। জঙ্ঘার উপরাংশ পালকে ঢাকা। কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু শিঙে-নীল, উপরের চঞ্চুর ডগার দু-পাশ ফিকে, কখনও বা হলদেটে। নাকের উপর অনাবৃত ঝিল্লি হলদু, শিশু অবস্থায় নীলচে। পা ও আঙ্গুল ময়লাটে হলুদ বা ধূসরাভ কিংবা সবুজাভ-হলুদ ; নখর কালো।



চি 93. শঙ্খচিল

এই পাখি শ্যেন বর্গের (ফালকনিফরমেস) অন্তর্গত বাজ বংশের (অ্যাকসিপিট্রিদি) *এক প্রজাতি*। নাম— শঙ্খচিল, শঙ্কর চিল (হাসিয়াস্টুর ইন্ডাস), ইংরেজি— *ব্রাহমনি কাইট*। দক্ষিণ ভারতে কানাড়া ও তেলুগুভাষীরা বলেন-- 'গরুড়'। আসামে— '*রঙা চিলনী*' এবং এর জন্মকথা নিয়ে একটি করুণ উপকথাও আছে।

শঙ্খচিল আকারে চিলের চেয়ে ছোটো, লম্বায় 48 সেমি (19 ইঞ্চি) এবং চিলের মতো এদের লেজ চেরা নয়। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। অল্পবয়স্করা পাটকিলে, অনেকটা চিলের মতই কেবল লেজটা গোল। ডানার তলায় কখনও কখনও সাদা ছোপ দেখা যায়, তার জন্যে 'চুহামার' (বাজার্ড) বলে ভুল হয়।

বাসস্থান— বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ছাড়া পাকিস্তানের সর্বত্র, বাংলাদেশ, 1800 মি. উচ্চতার মধ্যে সমগ্র ভারত, নেপালে তরাই থেকে 1400 মি. উচ্চতার মধ্যে, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ এবং শ্রীলঙ্কার নিম্নভূমির শুষ্ক ও ভিজে অঞ্চল। দেখা যায় সমুদ্রের তীর এবং দেশের অভ্যন্তরে যেসব জায়গায় জল বেশি সেখানে। ভারতের বাইরে বর্মা থেকে পুবে দক্ষিণ চীন, টেনাসেরিম, উত্তর-থাইল্যাণ্ড এবং মধ্য-ভিয়েতনাম। অস্ট্রেলিয়ায় অন্য একটি *প্রজাতিকে* দেখা যায়।

খাদ্য— প্রধানত মরা মাছ। এছাড়া সংগ্রহ করে জলের উপরে উঠে আসা ও বন্যার পর জল সরে যাওয়ায় খুব অল্প জলে বা শুকনো জায়গায় আটকে থাকা মাছ, মনু মাছ (মাডস্কিপার), ব্যাঙ, মেঠো কাঁকড়া, টিকটিকি-গিরগিটি, ছোট সাপ, বন্দরে জাহাজ থেকে ফেলে দেওয়া আবর্জনা, উড়ন্ত উঁই, নানা প্রকার পোকামাকড়, পোলট্রির হাঁস-মুরগির ছানা এবং অসুস্থ ছোট পাখি। কখন-সখন মৃত পশুর ভোজন উৎসবে শকুনদের সঙ্গে জোটে।

স্বভাব— ডাকে কর্কশ অথচ তীক্ষ্ণ করুণ স্বরে আঁ-হা আঁ-হা। বাসার কাছে কাক বা অন্য কোন জ্বালাতন করা পাখি এলে তেড়ে যায় এই ডাক দিয়ে, কিন্তু আরও উগ্ররূপে তা প্রকাশ করে।

শঙ্খচিলকে এক কথায় বলা যায় জনপ্রিয় বাজ। শিকারের অন্বেষণে ঘুরে বেড়ায় জোয়ার-ভাঁটা খেলা খাঁড়ির কাছে, জেলে পাড়ায়, জাহাজ ঘাটার আশপাশে, জলস্রোত রোধ করবার জন্যে যে বাঁধ তার উপর, নদী, ঝিল, প্লাবিত ধানক্ষেত এবং বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে। আবার কখনও দেখা যায় এক জোড়াকে জল থেকে অনেক দূরে, মানুষের বসতির কাছে আড্ডা গেড়েছে চিলেদের মত মানুষদের ফেলে দেওয়া আবর্জনার জন্যে। বন্দরের কাছে দেখা যায় নিরীহ স্বভাবের জন্যে, এদের খাদ্য কেড়ে নিচ্ছে চিল এবং কাক। ছোঁ-মেরে নখরে তুলে নেয় জলের উপর উঠে আসা মাছ বা জাহাজ-নৌকা থেকে ফেলে দেওয়া খাদ্যবস্তু। অনেক সময় দেখা যায় শিকার ধরতে না পেরে জলে পড়ে গিয়ে ঢেউয়ের উপর ভাসছে। কিছুমাত্র অসুবিধে ভোগ করে না, বিনা আয়াসে জল ছেড়ে উঠেও পড়ে।

দেশের অভ্যন্তরে এরা মানুষের কাছে বিশেষ ঘেঁষে না। দেখা যায় ধানক্ষেতের উপর দিয়ে আসা-যাওয়া করছে, নজর রাখছে, ঝাঁপিয়ে পড়ছে ব্যাঙের উপর, নখরে করে তুলে নিচ্ছে। কিংবা ধানগাছের একটি শীষের উপর বসে আছে ঘাসফড়িং, ঠিক নজরে পড়েছে, মুহূর্তের মধ্যে ছোঁ-মেরে এক ঝটকায় তাকে তুলে নিল। অনেক সময় উড়তে উড়তে মাথা নিচু করে এগিয়ে দেয় পা এবং নখরে ধরা শিকার থেকে খাদ্য গ্রহণ করে।

কোন কোন বন্দরে দেখা যায় এরা পুরোপুরি মৃত জীবজন্তুর মাংসের বর্জিতাংশ খেয়েই জীবন ধারণ করে। পোতাশ্রয়ের চার পাশে শূন্যে চক্কর মারতে মারতে জাহাজ থেকে সদ্য ফেলা আবর্জনা ভাসমান অবস্থায় ছোঁ-মেরে নখরে তুলে নিয়ে গিয়ে বসে কোন জাহাজের উঁচু জায়গায়।

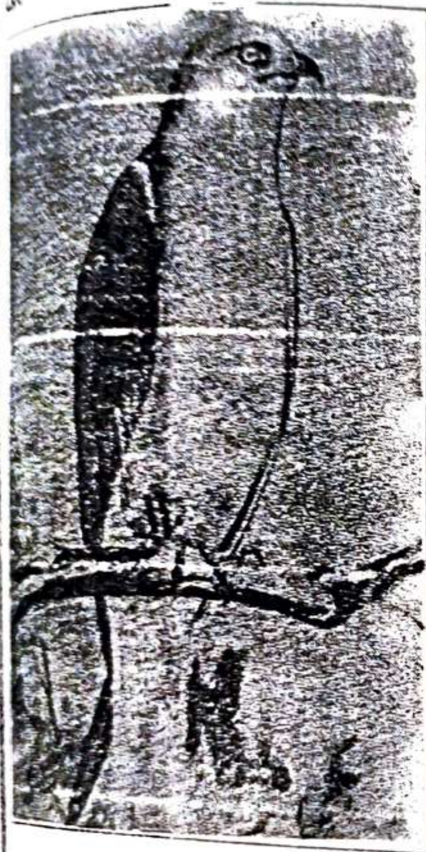
প্রজননকাল— ডিসেম্বর থেকে মার্চ-এপ্রিল। শ্রীলঙ্কায় মে পর্যন্ত গড়ায়। বাসা বাঁধে 6 থেকে 15 মি. উঁচুতে বড় বট, অশ্বত্থ, নিম, তেঁতুল, ঝাউ বা অন্য কোন উঁচু গাছে, অথবা নারকেল গাছের মাথায়। গাঁয়ের কাছে জলের ধারটা পছন্দ করে বেশি। ক্বচিৎ দেখা যায় পুরনো ভাঙ্গা অট্টালিকা বাছতে।

বাসা অগোছাল কোনরকমে সারা। চওড়ায় 30 থেকে 60 সেমি, 20 সেমি গভীর। লাইনিং দেয় নানা ধরনের আবর্জনা দিয়ে। যেমন পশম, ছেঁড়া ন্যাকড়া, চামড়ার টুকরো, দড়ি, পাট বা শনের ফেঁসো ইত্যাদি, আবার কখন সবুজ কাঁচা পাতা। ডিম পাড়ে সাধারণত 2টি, কখনও 3টি, ক্বচিৎ চারটি ধূসরাভ-সাদা, তার উপর খুব হালকা করে ফিকে লালচে-পাটকিলের ছোপ ও ফুটকি।

স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই বাসা বাঁধতে এবং সন্তান প্রতিপালনে পরস্পরকে সাহায্য করে। কিন্তু পুরুষ এখনও ডিমে তা' দিতে বসে কি না তা এখনও জানা যায় নি। ডিম ফোটে 26-27 দিনে। ডিমের গড় মাপ 50.7 × 40.2 মিমি।

কাপাসী (Black shouldered Kite)

1982-র 21 নভেম্বরে শ্যামনগর থেকে তপন ও বিশ্বরঞ্জনের সঙ্গে বর্তির বিলে গিয়ে ছিলাম। সেখানে বহুদিন বাদে সাদা-কালো এই পাখিটাকে দেখলাম। এর আগে অবশ্য গৌহাটি যাবার পথে ট্রেন রঙ্গিয়া ছাড়ার পর ধানকাটা খেতের উপর দেখেছি অনেকবার। প্রথম যেবার দেখি সেবার 1940 সালের মে মাসে। দারুণ গরমে দ্বারভাঙ্গা জেলায় বুড়ী-গণ্ডকের ধারে পুসায় গেছি। সকাল-সন্ধ্যে ছাড়া ঘরের বাইরে বেরনো যেত না এত গরম। গরমের চোটে দরজা-জানলা সব বন্ধ করে ঘরের মেঝেতে জল ঢেলে থাকতে হত।



চি 94. কাপাসী

একদিন খুব সকালে ঘুরতে বেরিয়েছি। সঙ্গে আমাদের কাজের লোক চালাকচতুর রমজান। আমরা পাকা রাস্তা দিয়েই চলেছি। পুসাতে আখ ও লঙ্কার চাষটাই বেশি। দেখতে পেলাম বাঁ-পাশে লঙ্কার খেতের উপর বাজপাখির মত দেখতে ধূসর ও সাদা একটা পাখি, অনেকটা মাঠ চিলের (সার্কাস মাক্রউরাংস, ইংরেজি— পেল হ্যারিয়ার) Pallid Harrier মত উড়ছে। ডানার কাঁধটা কালো, ডানার ডগাটাও কালো। লেজটা চৌকো হলেও একটু চেরা। পাখিটা উড়ছে মাটি থেকে বেশ উঁচুতে প্রায় 30 মিটারের মত, চক্কর দিচ্ছে, কখনও ভাসছে। অবার বাঁক নিয়ে হাওয়ার বিপরীতমুখী হয়ে মুহূর্তের জন্য পোকামারার (ফালকো টিন্নানক্যুলাস, ইংরেজি— কেস্ট্রেল) মত শূন্যে স্থির হয়ে মাটির দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে কি যেন খুঁজছে। নিচে যেন কি দেখতে পেয়েছে। ডানা দুটো পুরো খুলে উপর দিকে তুলে দিয়ে শুধু কালো ডগার ওড়ার পালক ধীরে ধীরে কাঁপাচ্ছে, নেমে আসছে ঠিক প্যারাসুটে যেমন লোক নামে ঠিক তেমনি করে। মাঝে মাঝে থামছে, স্থির হয়ে এক জায়গায় থাকছে, আবার উপরে উঠছে আর নেমে আসছে, সবটাই করছে লেজটাকে উপরনিচ করে নাড়িয়ে।

আস্তে আস্তে পা দুটোকে ঝুলিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ ডানা দুটো বন্ধ করে ঝপ করে লঙ্কার খেতের মধ্যে পড়ল আমাদের দৃষ্টির আড়ালে। মুহূর্তের মধ্যে শূন্যে উঠে ধীরে ধীরে পাখার ঝাপট মেরে,

মাঝে মাঝে ভেসে উড়ে চলে গেল দৃষ্টির বাইরে, যেমন উড়ে যায় গাংচিল ও নীলকণ্ঠরা। দেখলাম পায়ে আটকা আছে একটা মেঠো ইঁদুর (মুস, বুডুডা, ইংরেজি— *ফিল্ড মাউস*)।

পাখিটাকে এর আগে কখনও দেখি নি। মাঠ-চিল বা পোকামারা জাতীয় চিল বা বাজপাখি বলে বুঝতে পারছি। কারণ অন্যান্য বাজপাখির সঙ্গে এদেরও তখন পোষা হচ্ছে কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রীটে ক্রিকেটার কার্তিক বসুর বাড়ীতে। রমজানের কথায় বুঝলাম সে এ পাখি অনেক দেখেছে কিন্তু নাম জানে না। আমাদের আস্তানা থেকে মাইলটাক দূরে একটা গাছে এদের বাসাও আছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হল, কারণ রমজানকে দুপুরের রান্না করতে হবে। সঙ্গে বইপত্তর নেই যে পাখিটাকে সনাক্ত করতে পারব। মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর রমজান 'আসছি' বলে মাথায় গামছা বেঁধে ওই ভরদুপুরে বেরিয়ে গেল। গরমে হাঁসফাঁস করছি। শুয়ে-বসে সোয়াস্তি নেই। বেলা চারটে বেজে গেছে। রমজানের পাত্তা নেই। চায়ের জন্য অস্থির হচ্ছি, বিরক্ত হচ্ছি। এমন সময় রমজান এল, মুখে বিজয়ীর হাসি। হাতে সকালের দেখা একটা মরা পাখি। গুলতি দিয়ে মেরেছে।

ফিল্ড ডায়েরীতে লিখলাম, চাঁদি, ঘাড়, পিঠ, কোমর এবং লেজের উপরের আচ্ছাদক পালক ফিকে ছাই-ধূসর। বাকি মাথা, গলা, লেজের তলা সবটা ধবধবে সাদা। কালো চঞ্চু ছোট, গোড়াটা চওড়া, ডগার গোড়াটা একটু চাপা, উপরে চঞ্চু নাকের উপরের ফিকে হলুদ রঙের অনাবৃত ঝিল্লি (Cere) থেকে বেশ বাঁক নিয়ে নিচে নেমেছে। ঐ চঞ্চুতে শ্যেন বর্গের (ফালকনিফরমেস) দাঁতালি (ফেস্টুন) বেশ পরিস্ফুট। গোলাকার প্রায় লম্বাটে নাকের গর্তের উপর খোঁচা খোঁচা লম্বা গোঁফ। একটা কালো লাইন রক্ত-গোলাপ চোখের সামনে থেকে পিছন পর্যন্ত টানা। ডানা লম্বা ও সূঁচলো, সেটা লেজের ডগা ছাড়িয়ে গেছে। ডানার প্রথম সারির দ্বিতীয় পালক বড়, ডগা কালো। লেজ মোটামুটি লম্বাটে, অল্প চেরা। গুল্‌ফ্ বেঁটে ও শক্তিশালী। পালকহীন অংশ অর্থাৎ পা ও আঙুলে জালকাটা, রং গাঢ় হলুদ, নখর কালো। লম্বায় 33 সেমি (13 ইঞ্চি)। পাতিকাকের চেয়ে একটু ছোট। শবব্যবচ্ছেদের পর জানলাম, এটি পুরুষ-পাখি।

কলকাতায় এসে বইতে পেলাম, বাজ বংশের (অ্যাকসিপিট্রিদি) অন্তর্গত *এক প্রজাতি*, নাম— কাপাসী (এলানাস কায়েরুলিউস, ভোকিফেরাস)। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান— পাকিস্তান থেকে পুবে আসামের সমতল ও মণিপুর, হিমালয়ের পাদদেশ 1600 মি. উচ্চতার মধ্যে তরাই থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকায় 1200 মি. উচ্চতার ভিতর, শ্রীলঙ্কা এবং মালদ্বীপে। ভারতের বাইরে পুবে দক্ষিণ-ইউনান, উত্তর-টেনাসেরিম এবং ইন্দোচীনের অঞ্চল সমূহে। দেখা যায় পাতাঝরা গাছের জঙ্গল, উন্মুক্ত ঘাসজমিসহ জঙ্গল ও কাছেপিঠের খেতখামারে।

খাদ্য— ঘাসফড়িং, পঙ্গপাল, ঝিঁঝি পোকা ও অন্যান্য পোকামাকড়, মেঠো ইঁদুর, নেংটি ইঁদুর, সাপ, বাঙও পাকস্থলীতে পাওয়া গেছে।

এমনিতে ডাকে না। ক্বচিৎ খুব উচ্চগ্রামে সরু তীক্ষ্ণ একটা চেঁচানি শোনা যায় বা কখনও মানুষের শিসের মত মৃদু একটা মিষ্টি আওয়াজ।

স্বভাব— সাধারণত একাই বিচরণ করে, কখনও বা জোড়ায় কিন্তু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। একটা পছন্দসই

বা নেড়া ডাঙার উপর বসে থাকে দিনের পর দিন। এই বসার জায়গা থেকে চারিদিকে নজর রেখে, লেজটাকে থেকে থেকে খুব আস্তে উপর-নিচ, কখনও খোলা-বন্ধ, কখনও-বা ঝাঁকি মেরে ঝুঁ-নিচু করতে করতে ডানা দুটো ঝুলিয়ে দেয় এবং মাটিতে কোন শিকার দেখতে পেলে মুহূর্তের মধ্যে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

প্রজননকাল— একমাত্র এপ্রিল ও মে মাস ছাড়া বছরের যে কোন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন স্থানে এদের প্রজননকাল। কাকের মত ছিরিছাদহীন বাসা। উপকরণ হল সরু ডালের শুকনো টুকরো। শিকড় ও ঘাসের লাইনিং দেয়, লাইনিং ছাড়াও বাসা দেখা যায়। যে কোন ছোট গাছে 9 মি. মধ্যেই বাসা বানায়। এর চেয়ে বেশি উঁচুতে কদাচিৎ দেখা যায়। ডিম পাড়ে 3 থেকে 5, কখনও 6টি। তবে 3-4টিই বেশি পাড়ে।

ডিম দেখতে বেশ সুন্দর। রঙের বাহার থাকলেও কোন স্থিরতা নেই। জমিনের রং সাদা থেকে ফিকে হলুদ, ঈষৎ লালচে-হলুদ বা পাথুরে-হলুদ, তার উপর ছোপ ও ছিট থাকে লাল বা লালচে পাটকিলের। কখনও তার মধ্যে কালচে রক্ত-লালের ছোট ছোট ছোপ। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই ঘরগেরস্তালির সব কাজ করলেও, বাসা তৈরি করা ও ডিমে তা' দেওয়ার ব্যাপারে স্ত্রী-পাখির ভূমিকাটাই বেশি। বাচ্চাদের খাবার-দাবার' আনা এবং যাকে বলে মানুষ করা এসব পুরুষই করে থাকে।

চুহামারা (Common buzzard)

আমাদের বাজপাখি সংগ্রহটা বাড়িয়ে তুলেছিল চারু-সতীশরা। যেখানে যত এই জাতীয় পাখি আছে তাদের ধরতে পারলেই নিয়ে আসত আমাদের কাছে। এদের পরিচর্যা করতে হিমসিম খেয়ে যেতে হত। সত্যিকারের বাজ (হক) বা শ্যেন (ফকন) ছাড়া বাকিদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হতাম। কারণ, বাকিদের দিয়ে কোন পাখি শিকার করান সম্ভব নয়। তবু দিনকতক রেখে এদের হালচাল লক্ষ্য করতাম। তখন পক্ষিতত্ত্বের বিশাল সাম্রাজ্যে সবে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছি, কিছুই জানি না। এখনও অনেক কিছু জানিনা। এই জীবটির অপরিসীম বৈচিত্র্যের অনেক কিছুই আজও বুঝে উঠতে পারি না। শুধু জানার চেষ্টা করে চলেছি। জানি এ জীবনেও তা সম্ভব হবার নয়। অনেক পাখি হাতে পেয়েছি। প্রকৃতির আঙ্গিনায় তাদের দেখেছিও কিন্তু পুঙখানুপুঙখভাবে জানবার চেষ্টা করি নি, যতটা মন দেওয়া উচিত ছিল তা দিই নি। পরে জেনেছি তাদের সম্বন্ধে। তবে আজও ভারতীয় পক্ষিতত্ত্বে অনেক কিছু অজানা হয়ে রয়েছে। চারু কি সতীশ কে যে মাঝে মাঝে পাখিটাকে এনে হাজির করত আজ আর মনে নেই। পুরনো নোটবইতেও তার উল্লেখ নেই। শুধু চেহারার বর্ণনা আছে।

উপরাংশ গাঢ় পাটকিলে, তার উপর বেগুনির আভা, ডানা পটিসহ গাঢ় পাটকিলে। লেজ হালকা ধূসর বা লালচে-ধূসর, তার উপর সাত-আটটি সরু পাটকিলের পটি, একদম শেষে ডগারটা চওড়া। নিম্নাংশে পাটকিলে, বুকে সাদা সাদা পটি, গলা সাদা, পেট ও জঙ্ঘার আচ্ছাদকেও সাদা সাদা পটি, এই সাদা পটির ভিতর দু'চারটে লালচে-হলুদেরও পটি। কনীনিকা সোনালি-হলুদ (দু'একটি

পাখির সাদা এবং লালচে-হলুদও দেখেছি), চঞ্চু নীলচে-শিঙে, গোড়াটা ফিকে এবং হলদেটে, নাকের উপর অনাবৃত ঝিল্লী সবজেটে-হলুদ, পা ও আঙুল মোম-হলুদ, নখর কালো।

এই পাখি শ্যেন বর্গের (ফালকনিফরমেস) অন্তর্গত বাজ বংশের (অ্যাকসিপিট্রিডি) *এক প্রজাতি।* নাম—চুহামারা (ব্যুটিও ব্যুটিও), ইংরেজি— *কমন বাজার্ড।* বাজ (হক) বা শ্যেন (ফকন) বংশের পাখিদের নাম হিন্দি বা উর্দুতে প্রচলিত। একমাত্র 'শিকরে' নামটাই বাংলা। উত্তর ভারত ও পশ্চিম ভারতের কিছু অংশে এদের পুষে শিকার করানর রেওয়াজ ছিল বলেই ঐসব নাম সর্বত্র প্রচলিত। চারটি প্রজাতিকে ভারতে দেখা যায় তাদের সকলের নামই 'চুহামারা' যার অর্থ ইঁদুর-মারা।


চি 95 চুহামারা

চুহামারা গণের (ব্যুটিও) সঙ্গে ঈগল গণের (অ্যাকুইলা) পাখিদের কিছুটা মিল আছে। তফাত হল চুহামারাদের চঞ্চু ও পা দুর্বল। চুহামারাদের চঞ্চু মাঝামাঝি বা ছোট, উপরের চঞ্চু নাকের কাছ থেকে বাঁকা। লেজ লম্বা, শেষটা একটু গোল, গুলফ্ লম্বা সামনের খানিকটা পালকে ঢাকা, পিছনে পালক নেই। আঙুল ছোট, ভিতরের আঙুল বাইরের আঙুলের চেয়ে অনেক ছোট। এই গণের পাখিদের দেখা যায় ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও এশিয়ায়। কিন্তু দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় দেখা যায় না।

চুহামারার (কমন বাজার্ড) স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে, শুধু আকারে ছোটবড়। পুরুষ 51 সেমি (20 ইঞ্চি), স্ত্রী 56 সেমি (22 ইঞ্চি)। অল্পবয়স্কদের দেখায় অল্পবয়স্ক শঙ্খচিলের (ব্রাহমনি কাইট) মত। প্রকৃতির প্রাঙ্গণে মুক্ত স্বাধীন অবস্থায় চার প্রজাতির পাখিকে চোখে দূরবীন লাগিয়ে দেখেও তফাত করা শক্ত। এই কারণে কোন্ প্রজাতিকে ভারতের কোন্ অঞ্চলে পাওয়া যায় তা স্থির করা যায় নি। ভারতে বাসা বাঁধার প্রজননকালীন বা পরিযায়ী হয়ে আসা চামড়া না পেলে সঠিক স্থির করা সম্ভব নয়। সেই চামড়া এখন পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায় নি।

বাসস্থান— পূর্ব তুর্কিস্তান এবং আপার ইয়েনেসির উত্তর থেকে ডওরিয়া এবং বৈকাল হ্রদ, পুবে উসুরিল্যাণ্ড, দক্ষিণে হিমালয়, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া এবং জাপান। শীতে পরিযায়ী হয় ভারত, বর্মা এবং দক্ষিণ চীন। ভারতে দেখা যায় উত্তর ভারত থেকে নেপাল, সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, পশ্চিম দাক্ষিণাত্য, কেরালা এবং শ্রীলঙ্কা। ভারতে আর কোথাও দেখা যায় কিনা তা সঠিক নির্ণয় হয় নি। নমুনা ছাড়া লোকমুখের কথা বিশ্বাস করা যায় না।

খাদ্য— ইঁদুর ও কাঠবিড়ালী জাতীয় ছোট স্তন্যপায়ী, ব্যাঙ, টিকটিকি-গিরগিটি, অসুস্থ ও আহত পাখি, পঙ্গপাল ও অন্যান্য বড় পোকামাকড় এবং কিছুটা মৃত মাংস।

ডাক— সঠিক নথিভুক্ত হয় নি। আমি যা শুনেছি তা তীক্ষ্ণ উচ্চগ্রামে খানিকটা বিড়াল-ছানার মত 'মিউ মিউ'।

স্বভাব— শীতকালে পরিযায়ী হয়ে এলে দেখা যায় হয় একা, না হয় জোড়ায় এসে বসেছে গাছের মাথায়, কোন ঢিবি বা পাথরের উপর। ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাছাকাছি 6-7টিও দেখা যায়। জঙ্গলে আগুন লাগলে বা জঙ্গলের ঘাসে আগুন দিলে পলাতক গিরগিটি, ইঁদুর এবং পোকামাকড়, ফিঙে বা অন্যান্য শিকারজীবি পাখিদের সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরে। এমনকি আগুনে আধপোড়া অবস্থা থেকেও ছোঁ-মেরে তুলে নেয়। শূন্যে পাখা মেলে যখন ওড়ে, চক্কর দেয়, তখন তলা থেকে পাখার বিস্তার, ওড়ার পালকে ফাঁক, পাখার ভিতর দিকের সরু সরু টানা দাগ ও লেজের প্রান্তে মোটা পটি, এইসব দেখে চেনা যায় চুহামারাকে।

প্রজননকাল— ভারতের বাইরে মার্চ থেকে মে। প্রজননকালীন আচার-ব্যবহার, কটি ডিম পাড়ে, ডিমের রঙ, আকার, কিছুই এখনও পর্যন্ত জানা যায় নি।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে বাকি যে 3 প্রজাতির চুহামারা দেখা যায়, তারা হল— 1. লং-লেগেড বাজার্ড (ব্যুটিও রুফিনাস), লম্বায় 61 সেমি (24 ইঞ্চি), বাসা বাঁধে পাকিস্তানের পেশোয়ার ও কোহাট জেলা, বেলুচিস্তানে জিয়ারাট ও চামন জেলায়। ভারতে বাসা বাঁধে কাশ্মীর ও গাড়োয়াল এবং সন্দেহ করা হয় লাডাখেও। 2. আপল্যাণ্ড বাজার্ড (ব্যুটিও হেমিনাসিয়াস), আকারে সবচেয়ে বড় 71 সেমি (28 ইঞ্চি)। এরা পরিযায়ী হয়ে আসে বৈকাল হ্রদ অঞ্চল থেকে। দেখা যায় কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, নেপাল, সিকিম। 3. ডেজার্ট বাজার্ড (ব্যুটিও ভাল পিনাস), লম্বায় 51-56 সেমি (20-22 ইঞ্চি)। শোনা যায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও কাশ্মীরে বাসা বাঁধে। হিমালয়ের দক্ষিণে কোথাও দেখা গেছে বলে জানা যায় নি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও কাশ্মীরের বাসা থেকে বাচ্চার নমুনা সংগ্রহ হলেই তখন নিশ্চিত হওয়া যাবে।

পরপন বাজ [Bonelli's Eagle]

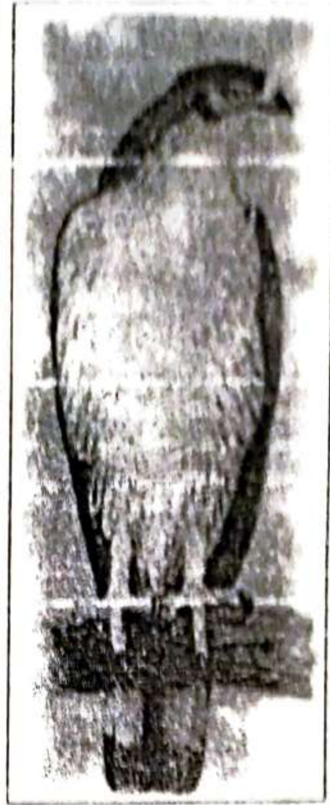
চারু শেখ সেই গোঁফ, সূঁচলো চিবুক, হাড় জিরজিরে চেহারা আর বোল-চাল। হয়-কে নয়, নয়-কে হয় করার সম্রাট।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় 52 নং আমহার্স্ট স্ট্রীটের পর্টিকোর তলায় সিঁড়ির ধাপে বসে তুমুল আড্ডা চলছে, এমন সময় চারু কালো কাপড়ে ঢাকা একটা খাঁচা নিয়ে হাজির। আমরা জিজ্ঞেস করি, কি আনলে ? অনেক বোল-চালের পর চারু খাঁচার উপরের কাপড় সরিয়ে দেখাল পাখিটাকে। ঈগল জাতীয় পাখি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দেহের উপরাংশ পুরো বাদামী-পাটকিলে, মাথা ও ঘাড়ের পিছন কিছুটা সাদা, ডানার পালক কিছু অস্পষ্ট কালচে, লম্বাটে লেজ স্লেট-ধূসরাভ। লেজে সাতটি সরু পটি, একদম ডগারটা চওড়া। নিম্নাংশ পুরো সাদা, তার উপর কিছু সরু লম্বাটে গাঢ় পাটকিলের আঁচড়, আঁচড়ের বেশিটা বুকের পাশে আর তলপেটে। জঙ্ঘায় পালক। কনীনিকা হলদেটে-পাটকিলে, চঞ্চুর গোড়ায় নীলচে-ধূসর,

বাকিটা শিঙে-কালো, নাকের উপর অনাবৃত ঝিল্লী গন্ধক-হলুদ। পা ময়লাটে গন্ধক-হলুদ, নখর শিঙে-পাটকিলে।

চারু গোঁফটা চুমড়ে তার চব্বিশ ইঞ্চি মার্কা বুক যতদূর সম্ভব চিতিয়ে বলল, বলুন কি পাখি? জাতটা বুঝতে পারি কিন্তু সঠিক নাম বলব কি করে? আগে কখন দেখিই নি। হিতেনদার বড় ছেলে বুড়ুকে বললাম, যা তোর বাবাকে ডেকে নিয়ে আয়। ইতোমধ্যে চারু কিভাবে পাখিটাকে ধরেছে তার বর্ণনা সবিস্তারে দিতে লাগল।



চি ৭৬ পরপন বাজ

বরাট বাড়ির রঞ্জেবাবুকে ত আপনারা চেনেন। ওই পাতিপুকুর রেল স্টেশনের পরে নন্দীগ্রামে যাঁদের বাড়ি, তাঁদের ত অনেক পায়রা। সকালে-বিকেলে পায়রা ওড়ান হয়। ওড়ায় শেষে বোমে যা ছাতে যখন নামে, তখন দেখা যায় রোজ গুনতিতে একটা-দুটো করে কম। ওঁরা ভাবতেন লগ্গর অথবা বউরি বাজে (পেরিগ্রীন ফকন) মারছে বুঝি! গোটা ত্রিশেক কমে যাবার পর তিনি আমায় খবর পাঠান। দু'দিন ধরে নজর রাখার পর দেখি গতকাল সকালে এই মাদাটা পায়রারা যেখানে উড়ছে, তারও অনেক উপরে উড়ছে। ওড়াটা ঠিক বাজ, বউরি বা লগ্গরের মত নয়, একটু তফাত আছে। উপর থেকে ঝাঁপ দিল পায়রাদের উপর, কিন্তু পায়রাদের উপর পড়ল না, পাশ দিয়ে নেমে এসে গোঁৎ খেয়ে উপরে উঠে ঝাঁকের ভিতর গেল। পায়রারা সব ছত্রভঙ্গ। কোথায় ছিল গাছের উপর বসে নরটা, সেটা এই ফাঁকে উঠে এল, এসেই একটা চোট দিয়ে দু'পায়ে একটাকে আঁকড়ে নিয়ে চলে গেল। মাদাটাও আবার উপরে উঠেছে। পায়রারা সব এদিক-ওদিক পালাচ্ছে, সেই ফাঁকে উপর থেকে ছোঁ মেরে একটাকে নিয়ে চলে গেল যেদিকে নরটা গেছে। আমি আমার ছেলে-ভাইপো সবাই মিলে ছুটে গিয়ে যে গাছে দুটো খেতে বসেছে সেই গাছ পাহারা দিই। সন্ধ্যে বেলায় সেগাছ ছেড়ে যেগাছে রাত কাটায় সেটাকে দেখে রাখি। গতকাল রাতে সাতনলা মেরে একে ধরেছি। নরটা অন্ধকারে উড়ে পালাল, ধরতে পারলাম না।

হিতেনদা বইপত্তর নিয়ে নেমে এসেছেন। পাখিটাকে দেখে বই ঘেঁটে বললেন, বাংলা নাম নেই। হিন্দি—*মোরাঙ্গি*। ইংরেজী— *শ্লেন্ডার হক-ঈগল, বনেল্লিস' হক-ঈগল*। জার্ডন একে বলেছেন, ক্রেস্টলেস হক-ঈগল। চারু বলে উঠল, বাংলা নাম আছে। আমরা বলি— পরপন বাজ। আমি বলি, পরপন পায়রার মত দেখতে বলে বুঝি? কোন্‌দিন বলবে লঙ্কা বাজ, সিরাজু বাজ। চারু বলে ওঠে, আপনি সব কথায় খুঁত ধরেন, বিশ্বাস না হয় অন্য পাখিওলাদের জিজ্ঞেস করবেন।

পরপন বাজ (হিয়েরাঈটাস ফাসকিয়াটাস), শ্যেন বর্গের (ফালকনিফরমেস) অন্তর্গত বাজ বংশের (অ্যাকসিপিট্রিদি) *এক প্রজাতি*। স্ত্রী-পুরুষ দেখতে এক। স্ত্রী-পাখি লম্বায় 72 সেমি (29 ইঞ্চি), পুরুষ 68 সেমি (27 ইঞ্চি)।

বহু বছর বাদে গত 27-5-82 তারিখে নারকেলডাঙ্গা— সি আই টি রোডে শ্রী মৃন্ময় ঘোষ যিনি পাখি ও কুকুর দুইই পোষেন, তাঁর ওখানে এক অল্পবয়সীকে দেখেছিলাম। পাতি পুকুরের এখনকার পাখিওয়ালারা তাঁকে ধরে দিয়েছিল। উপরটা হালকা পাটকিলে, তলাটা লালচে-হলদেটে, তার উপর কালচে আঁচড়। লেজের পটি সব সবু ও কিছু ছোপছোপ, শেষের চওড়া পটিটা তখনও হয় নি।

বাসস্থান— পশ্চিম পাকিস্তানে বেলুচিস্তান, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, ভারতে কাশ্মীর ও পাঞ্জাব থেকে পশ্চিমবঙ্গ, নেপাল, আসাম, বাংলাদেশ 2400 মি. উচ্চতার মধ্যে, দক্ষিণে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে কন্যাকুমারিকা। বাসা বাঁধে পাহাড় ও সমতলের গাছপালা সমৃদ্ধ জায়গায়। শ্রীলঙ্কা সহ সারা ভারত জুড়ে আছে কিন্তু দেখা যায় কম। ভারতের বাইরে দক্ষিণ ইওরোপ থেকে দক্ষিণে উত্তর আফ্রিকা, পুবে দক্ষিণ চীন।

খাদ্য— ছোটবড় পাখি যেমন শালিক, পাতিকাক, হরিয়াল, পায়রা, কুকো, তিতির, বুনো মুরগি, টিটিভ, কোঁচ বক, জাংহিল, হুকনা, ডাহুক, শীখ, চিল ও অন্যান্য শিকারজীবি পাখি এবং ছোট স্তন্যপায়ীর মধ্যে খরগোস। পাতিকাকও ওদের খুব প্রিয়। গৃহপালিত হাঁস-মুরগি এবং পোষা পায়রা মারে যম। গিরগিটিও খায়। মৃত পশু খায় কিনা জানা যায় নি, তবে খেলেও কচিৎ।

ডাক— মাঝে-সাজে তীক্ষ্ণস্বরে 'কিরে কিরে কিকিকি' আওয়াজ শোনা যায়।

স্বভাব— পরপন বাজ প্রায় সব শিকারজীবি পাখিদের মত ডানা ছড়িয়ে শূন্যে ভাসে ও চক্কর দেয়। অত্যন্ত সাহসী ও কর্মঠ শিকারী। তার দেহের ওজনের (2·5 কেজি) চেয়েও বড় স্তন্যপায়ীকে প্রায়ই মারতে দেখা যায়। গাছের উপর থেকে যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে, তেমনি উড়ে পিছনে ধাওয়া করেও আয়ত্তে আনে। শিকারকে দুই পায়ের নখরে বেশ জোরে চেপে ধরে। সেটা এত জোরে যে নখর দেহের মধ্যে গভীরভাবে ঢুকে যায়। জোড়ায় শিকার করতে বেশি দেখা যায়, যেমন দেখেছিল চারু। দেখা যায় সন্ধ্যেবেলায় কাকেরা যখন রাত্রিবাসের জন্যে দল বেঁধে বাসায় ফেরে, তখন জোড়ায় তাড়া করে একটাকে দলছুট করে ফেলে। একজন উপর-নিচ এঁকে-বেঁকে ধাওয়া করে চলেছে, অন্যজন হঠাৎ পাশ থেকে উদয় হল। একেবারে ফুটবলের অফসাইডের মত। কাকের আর কিছুই করার থাকে না। দু'জনে ভাগাভাগি করে ঐ শিকার করা কাককে খায়। শিকার-শেখান বাজও শ্যেন বংশের পাখির পালকরা মাঝে মাঝে পোষ্যদের কাকের মাংস খাওয়ান, কারণ তাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

পরপন বাজ মুক্ত স্বাধীন অবস্থায় দর্শনীয়ভাবে শিকার করে, কিন্তু বন্দী অবস্থায় সেই শিকার ধরান অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। সেইজন্যে এই পাখি পোষার রেওয়াজ নেই। আমরাও চেষ্টা করে ছাড়ি নি। চারুর কাছ থেকে পাওয়া পাখিটাকে কার্তিকদা প্রিন্স নাসিরির নির্দেশ অনুযায়ী খুব ধৈর্য ও ধৈর্য্যের সঙ্গে 60 দিনের শিক্ষা দিয়ে তৈরি করলেন। অনুশীলনে কোন গলদ পেলাম না। তারপর একদিন সদলবলে বার হলাম ওকে নিয়ে বাগুইহাটি-দমদমের দিকে। এক সদ্য ধানকাটা ক্ষেতের ধারে এসে দেখি কয়েকটা বুনো গোলাপায়রা চরছে। কার্তিকদা হাত থেকে অর্থাৎ দস্তানা থেকে সদ্য শিক্ষিতকে ছাড়লেন। পায়রারা সাক্ষাৎ যমকে দেখে প্রাণভয়ে এদিক-ওদিক ছিটকে

উড়ল, তার মধ্যে একটাকে বেছে নিয়ে পাখিটা তাড়া করল। উপর-নিচ এপাশ-ওপাশ পায়রাটা অনেক চেষ্টা করল কিন্তু এড়াতে পারল না। উত্তেজিত হয়ে অপেক্ষা করছি, দু'পায়ে নখরে জোরে চেপে ধরে মাটিতে ফেলবে, আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে, আমরা ছুটে যাব, কিন্তু 60 দিনের শিক্ষা পাওয়া বাজটা তা করল না, দুই থাবায় শিকার আঁকড়ে ধরে দেখতে দেখতে আমাদের চোখের বাইরে চলে গেল। আমার মুখ দিয়ে সজোরে আক্ষেপোক্তি বার হল, নেমকহারাম। কার্তিকদার মুখের অবস্থাটা পয়লা বলে বোলড্ হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরার মতো। এতদিনের পরিশ্রম সব ব্যর্থ।

প্রজননকাল— প্রধানত ডিসেম্বর-জানুয়ারি, কোথাওবা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গড়ায়। হয় উঁচু গাছে না হয় পাহাড়ের উপর দিকের খাঁজে, খুব বড় করে সরু শুকনো গাছের ডাল দিয়ে বাসা বানায়। মাঝখানের খোঁদলে টাটকা কাঁচাপাতার লাইনিং দেয়। বছরের পর বছর একই বাসা ব্যবহার করে বলে বাসা ক্রমেই পুরু হতে থাকে। সাধারণত 2টি সাদা চওড়া উপবৃত্তাকার ডিম পাড়ে। প্রায় কোন দাগ না থাকার মধ্যে, তবে খুব অস্পষ্ট পাটকিলে বা লালচে-পাটকিলের ছোপ থাকে। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই বাসার সব উপকরণ আনে। ডিমে দু'জনেই তা' দেয়, তবে স্ত্রী-পাখিই বেশিক্ষণ বসে। কতদিনে ডিম ফোটে তা এখনও জানা যায় নি। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই সন্তানদের খাওয়ায়। পুরুষ শিকার আনে, আর স্ত্রী ছোট ছোট টুকরো করে সন্তানদের মুখে দেয়। ভারতীয় ডিমের গড় মাপ 69·1 × 53·4 মিমি।

ওকাব (Tawny eagle)

1953 সালের মার্চের শুরুতে মোটরে শান্তিনিকেতন যাচ্ছি। ইলামবাজার ছাড়িয়ে খানিকটা গিয়েছি, গাড়িটা একটু বেগড়বাঁই করতে শুরু করল। প্লাগেও তেল ঢুকছে। অগত্যা গাড়ি থামিয়ে বনেট খুলে ইঞ্জিনের রোগ সারাতে দু'জন লেগে গেল। আমি এই অবসরে ঠ্যাং দুটোর জড়তা কাটাবার জন্যে গাড়ি থেকে নেমে এদিক-ওদিক পায়চারী করছি আর তাকাচ্ছি।

একপাশে পর পর অনেকগুলো খেত। জো-বাঁধার জন্যে লাঙল দেওয়া হয়েছে। খেতগুলোর মাঝখানে একটি মাত্র বড় পিপুল গাছ, তার নেড়ামাথা খাড়া করে আছে। শালিক, চড়াই, কাক আর ফিঙে ছাড়া আর কোন পাখি দেখছি না। হঠাৎ নজরে পড়ল নেড়ামাথা পিপুল গাছটার এক ধাপ নিচে পাতাওয়ালা একটা ডালে বসে আছে বড়সড় একটা পাখি। গলায় ঝুলন দূরবীণটা দিয়ে পাখিটাকে দেখতে থাকি।

দেহের রং ময়লা হলদেটে-পাটকিলে অর্থাৎ তামাটে, প্রায় লেজের ডগা-ছোঁওয়া লম্বা ডানা কালচে-পাটকিলে, গোড়ায় সাদাটে ছোপ ও টান, লেজ গাঢ় ধূসর-পাটকিলে, তার উপর খুব হালকা করে সরু পটি। শকুনের মত লেজ গোলাকার কিন্তু বেশ লম্বাটে। পা ঘন পালকে ঢাকা, শুধু আঙুল বেরিয়ে আছে। কনীনিকা হলদেটে-পাটকিলে, চঞ্চু শিঙে-কালো, গোড়াটা সীসে, নাকের উপর অনাবৃত ঝিল্লী লেবু-হলুদ, আঙুল হলুদ, নখর কালো।



চি 97. ওকাব

পাখিটা কর্কশ চিৎকারে 'কেকেকে' করে শূন্যে উড়ল। পাখা মেলে দিল। তখন ওকে আরও ভাল করে দেখলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম 'জুমিজ' (স্টেপ ঈগল) বুঝিবা! তারা দক্ষিণ ওড়িশার বেশি ভিতরে ঢোকে না। পশ্চিমবঙ্গে আসা বা থাকার কোন রেকর্ড নেই। মর্জি হলে তারা নিশ্চয়ই আসবে। বর্তমানে অনেক পাখিকে তার নথিভুক্ত সীমারেখা পার হয়ে ঢুকতে দেখেছি। তবে জুমিজ আকারে অন্তত পাঁচ-ছ ইঞ্চি বড়ো।

Steppe Eagle

পাখিটা শ্যেন বর্গের (ফালকনিফরমেস) অন্তর্গত বাজ বংশের (অ্যাকসিপিট্রিদি) *এক প্রজাতি*। নাম— ওকাব, তামাটে ঈগল (অ্যাকুইলা রাপাকস্), ইংরেজি— *টনি ঈগল*। স্ত্রী-পাখি লম্বায় 71 সেমি (28 ইঞ্চি), পুরুষ 63 সেমি (25 ইঞ্চি)।

বাসস্থান— পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে সমগ্র ভারতের শুষ্ক অঞ্চল। দেখা যায় আধা মুরুভূমি, ঝরেপড়া পাতার শুকনো সমতল ও মালভূমিতে। ভারতের বাইরে উত্তর-মধ্য বর্মার শুষ্ক অঞ্চল। ভারতে কেরালা ও আসাম, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কায় কখনও দেখা যায় না। অপেক্ষাকৃত খরা অঞ্চল বলে বাঁকুড়া, বীরভূমে আমার মতো হয়ত কেউ কেউ দেখে থাকবেন।

খাদ্য— ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি এবং সরীসৃপ, যা বেশির ভাগই চিল এবং অন্যান্য বাজপাখিদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া। যখন চিল বা অন্যান্য বাজদের তাড়া করে তখন একটা যুদ্ধং দেহি ভাবের সজোরে ডাক দেয় 'ক্রা ক্রা'। আবার শূন্যমার্গে কসরতের সময় ডাকে 'কেকেকে'। বাসায় বাচ্চারা তাদের মা-বাপদের দূরে দেখলেই সমস্বরে চিৎকার শুরু করে, যেন দু'মাসের মাতৃহারা মুরগির ছানা। সাধারণ ওকাবকে দেখা যায়, আমি যেমন দেখেছিলাম, চষাক্ষেতের মাঝে উঁচু গাছের উপর, অথবা কর্ষিত কিন্তু অনাবাদী জমির ধারে কিংবা ছোট ঝোপঝাড়ের জঙ্গলের মাঝে বড়ো গাছে। প্রায়ই দেখা যায় গাঁ বা শহরের বাইরে মৃত পশুর মাংস নিয়ে জঞ্জালের স্তূপের ধারে শকুন, চিল আর কাকের সঙ্গে ঝগড়া বা লড়াই করে তা ছিনিয়ে নিচ্ছে। কাককে হয়রান করেই ছিনিয়ে নেয় বেশি। মাংস গলিত পচা হলেও আপত্তি নেই।

প্রায় সমস্ত ঈগলের মতই আকাশের বুকে নানারকম কসরত দেখায় এবং সেটা বেশি দেখা যায় প্রজননকালেই। কখনও নাক বরাবর দুই ডানা বন্ধ করে সোজা নিচে মুখ করে ডাইভ দেয়। খানিকটা এমনিভাবে গোঁৎ খেয়ে নেমে এসেই একটা ডিগবাজি খেয়ে মুখটা সোজা করে উপরে উঠে যায়। প্রায় মিনিট দশেক ধরে এই কসরত চলে। অনেক সময় সঙ্গী না থাকলেও করে থাকে। আশেপাশে সঙ্গী বা সঙ্গিনী থাকলে এসে এই খেলায় যোগ দেয়। বেশির ভাগ সময় দেখা যায় খাদ্য সংগ্রহ করে দস্যুবৃত্তি করে। ওদের চেয়ে আকারে ছোট বাজপাখিদের ন্যায্য শিকার স্রেফ

ঝ্যালাপেঙ্খ্যা (Indian Spotted Eagle)

পিছনে লেগে নানাভাবে উত্যক্ত করে কেড়ে নেয়। বাজেরা এদের মত এত দ্রুত উড়তে পারে না। এইজন্যে যাঁরা বাজ দিয়ে এক সময় শিকার করতেন তাঁরা এদের দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। তাঁদের কাছে শুনেছি, বহু শিক্ষিত ভাল বাজ বা বহেরি এদের তাড়া খেয়ে এত দূরে পালিয়ে চলে গিয়েছে যে, তার আর কোন পাত্তাই পাওয়া যায় নি। মাঝে মাঝে দেখা যায় মুরগি-পালকদের খামার থেকে মুরগিছানাদের অবলীলাক্রমে তুলে নিয়ে চম্পট দিতে। মুরগি-পালকরা ওকাব দেখলে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। অন্যান্য শ্যেন বংশের পাখিদের সঙ্গে একই গাছে দু-চার জোড়া একসঙ্গে বাসা বাঁধে।

প্রজননকাল— নভেম্বর থেকে মার্চ-এপ্রিল। প্রায়ই দেখা যায় গাঁয়ের ধারে পিপুল, শিশু, বাবুল, সাঁই বা শমী জাতীয় গাছের হয় মগডালে, না হয় তার কাছাকাছি ডালে বড় প্ল্যাটফর্ম আকারে কাঠি ও গাছের সরু শুকনো ডাল দিয়ে বাসা বাঁধে। লাইনিং দেয় ঘাস ও পাতা দিয়ে। ডিম পাড়ে 2 বা 3টি সাদা বা ধূসরাভ-সাদা, তার উপর কয়েকটি লালচে-পাটকিলের ছিট ও ছোপ থাকে। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই বাসা ও সন্তান প্রতিপালনে পরস্পরকে সাহায্য করে। স্ত্রী-পাখি একাই ডিমে তা' দেয়। কতদিনে ডিম ফোটে তা এখনও জানা যায় নি। ডিমের গড় মাপ 66·0 × 52·8 মিমি।

মাঠচিল (Pallid Harrier)

কলকাতার ক্রিকেট সিজন শেষ হয়েছে। মার্চ মাসের গোড়া। কার্তিক বসু, তাঁর ভাই বাপী আর আমি বেরিয়েছি শালিক, গো-শালিক, কোঁচবক ইত্যাদি পাখির মাংস সংগ্রহ করতে, কারণ ক্রিকেট মরসুমে আমাদের পোষ্য শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বাজপাখি গোষ্ঠীরা বাজারের কেনা মাংস খেয়েই তিন-সাড়ে তিন মাস কাটিয়েছে। সকলের শরীরও ভাল যাচ্ছে না। টাটকা হালকা মাংসের প্রয়োজন। সঙ্গে আছে পাখিধরা বেদে সতীশ, তার সাতনলা চৌঘুড়ি নিয়ে, আর আছে কার্তিকদার পয়েন্ট টু-টু বি এস এ এয়ার-রাইফেল, যেটি উপহার পেয়েছিলেন অন্যতম উপহার হিসেবে ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজকুমারের কাছ থেকে, তাঁর আমন্ত্রণে দলে খেলেছিলেন বলে।

বাগুইআটি-দমদমের মাঝামাঝি জায়গায় দু'দিকের উঁচু বাঁধের পাড়ে, গাছপালা, কুঁড়েঘর অর্থাৎ মানুষজনের বসতি বা গ্রাম, দুই পাড়ের মাঝখানে পরপর আল দেওয়া সব ক্ষেতের জমি। লাঙল দিয়ে মাটি উল্টে জো-বাঁধা হয়েছে। আমাদের সংগ্রহ হয়েছে একটি-দুটি করে শালিক, গো-শালিক আর তিলে ঘুঘু। চলেছি বাঁধের তলা আল দিয়ে ঘেঁষে। এমন সময় নজরে পড়ল কাছেই ক্ষেতের উপর একটা মাটির ডেলার উপরে বসে আছে একটা পাখি। যে পাখিকে আগে কখনও দেখি নি। আমরা দাঁড়িয়ে পড়ে পাখিটাকে দেখছি, আমার নোটবইতে লিখছি। পাখিটার দেহের উপরাংশ ফিকে ছাই-ধূসর, নিম্নাংশ পুরোপুরি সাদা লম্বা সূঁচলো ডানার ডগায় কালো ছোপ। পাখিটা উড়ল, খুব নিচু দিয়েই চলল, ডানা দুটো উপরে তুলে ইংরেজী V-করে উড়ছে। লেজ লম্বাটে, তাতে ধূসরের কয়েকটা পটি। বাজ-জাতের পাখি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে চিলের চেয়ে বেশ খানিকটা ছোট।

আমরা সবাই উঁবু হয়ে বসে পাখিটাকে দেখছি, নোট নিচ্ছি। হঠাৎ মুখ তুলে দেখি সতীশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের রকমসকম দেখে হাসছে। চোখাচোখি হতেই সতীশ বলল, ও ত মাঠচিল। এটা ... সাদীটা একটু অন্যরকম দেখতে। ভাবটা এমনকি আর পাখি যা দেখে আমরা বিস্মিত হচ্ছি। কোনো সাধারণ পাখি। ওর ভঙ্গি দেখে আমি চটে গেলাম। বললাম— তুমি গুল মের না সতীশ। মাঠচিল বলছ কেন? ক্ষেতে দেখেছ ক্ষেতচিল বল, বেড়ার উপর দেখলে বলবে বেড়াচিল। বাপীদা অত্যন্ত রসিক ছিলেন। তিনি সায়গলী ঢঙে 'তুমি ভুল করো না পথিক' গানকে প্যারডি করে গেয়ে উঠলেন, তুমি গুল মের না সতীশ। সতীশ ক্ষুব্ধ, সে একটু রেগেই বলল, বেশ বড়বাবুকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে। বড়বাবু হচ্ছেন কার্তিক-বাপীদের সবচেয়ে বড় দাদা হিতেন্দ্রমোহন— হিতেনদা।



চি 98. মাঠচিল

সন্ধ্যেবেলায় 52 নং আমহার্স্ট স্ট্রীটে ফিরেই হিতেনদার দরবারে। হিতেনদা জার্ডন ও স্টুয়ার্ট-বেকার ঘেঁটে বললেন, জার্ডন নামটা উল্টোপাল্টা করেছে, বেকারে ঠিক আছে, মাঠচিল-ই। রায় শুনে সতীশের এক চোখ নষ্ট পানবসন্তের দাগে ভরা মুখে ফুটে উঠেছে বিজয়ীর হাসি।

পাখিটা নর-ই এবং শ্যেন বর্গের (ফালকনিফরমেস) অন্তর্গত বাজ বংশের (অ্যাকসিপিট্রিদি) এক প্রজাতি। নাম— মাঠচিল (সার্কস মাকরোউরাস), ইংরেজি— পেল হ্যারিয়ার, পালিড হ্যারিয়ার, হিন্দি— গিরগিটমার, তেলেগু—পেল্লি গেড্ডা, তামিল—পূণাই পারুন্ডু, তামিল-তেলেগু নামের অর্থ 'বেড়াল চিল'। কদিন বাদেই সতীশ স্ত্রী-পাখিটাকে ধরে নিয়ে এল। আমাদের বাজপক্ষিশালায় সংখ্যায় একটি বাড়ল।

পুরুষ মাঠচিল লম্বায় 46 সেমি (18 ইঞ্চি), স্ত্রী 51 সেমি (20 ইঞ্চি)। স্ত্রী-পাখি দেখতে বাদাম-পাটকিলে, পেঁচার মতো গলা ঘিরে ফিকে হলদেটে-লালচে সরু লাইন, বস্তিপ্রদেশে সাদা ছোপ। নিম্নাংশ গাঢ় গৈরিক, তার উপর লেজের তলার আচ্ছাদক পর্যন্ত পাটকিলে আঁকাবাঁকা ডোরাকাটা, লেজের উপরের আচ্ছাদকে সাদাটে-পাটকিলের পটি। লেজের মাঝের পালক ধূসরাভ, বাকি দু'দিকের পালক ফিকে হলদেটে-লালচে কিন্তু প্রত্যেকটি পালকে গাঢ় পাটকিলের পটি। উভয়ের কনীনিকা সবজেটে-হলুদ, অল্পবয়স্কদের পাটকিলে। চঞ্চু শিঙে-কালো, তলার চঞ্চুর গোড়াটা সীসে, নাকের উপর অনাবৃত ঝিল্লী লেবু-হলুদ, পা ও আঙুল ফিকে ময়লাটে হলুদ, নখর কালো।

বাসস্থান— বাল্টিক সাগর অঞ্চলীয় প্রদেশসমূহ থেকে পুবে তারবাগাতাই ও তিয়েনশান পর্যন্ত, দক্ষিণে রুমানিয়া, দক্ষিণ রাশিয়া এবং ফারঘানা। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর থেকেই পরিযায়ী হয়ে আসতে

শুরু করে সমগ্র ভারত, আন্দামান, লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ, পাকিস্তান, নেপাল, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কায় সমতল থেকে 3000 মি. উচ্চতার মধ্যে। আফ্রিকা ও বর্মাতেও যায়। ঝাঁক বেঁধে আসে না, আসে ফাঁক ফাঁক হয়ে একের পর এক সন্ধ্যেতে এবং তারপরেও রাতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে জমায়েত হয় কোন পাহাড়ের ধারে মেঠোজমি, ক্ষেতের ধারে, পাথুরে আধামরুভূমি স্থান বা বাছহীন ছোট ঝোপঝাড়ে। পরিযায়ীর সময় বেশ উঁচু দিয়ে আসে, সাধারণত অন্য সময় অত উঁচুতে কখনও ওড়ে না।

খাদ্য— ব্যাঙ, গিরগিটি-টিকটিকি, মেঠো ইঁদুর, মাটিতে বাসা বাঁধে যেসব পাখি, তাদের ছানা ও অসুস্থ পাখি, ঘাসফড়িং ইত্যাদি। দু-একটি পাকস্থলীতে ছোট বটের (বাস্টার্ড-কোয়েল) ও ভাটতিতিরের (স্যান্ড-গ্রাউজ) মাংসের অবিশিষ্টাংশ পাওয়া গেছে। ভারতে মাছ খায় কিনা জানা যায় না, কিন্তু 1940 সালে পক্ষিবিশারদ ডবলু পি লোয়ে দেখেছেন পরিযায়ীর শেষে আফ্রিকা থেকে ইউরোপে ফেরার সময়, লোহিত সাগরের উপরে নখরে উড়ুক্কু মাছ ছোঁ-মেরে নিতে এবং খেতেও।

ডাক— ভারতে ডাক শোনা যায় নি।

স্বভাব— একদম সঙ্ঘচারী নয়। একাই বিচরণ করে। দেখা যায় সারাদিন গাঁয়ের ধারে ক্ষেত বা মাঠের উপর এক-দু মিটার উঁচুতে ক্লান্তিবিহীনভাবে ডানা মেলে নিঃশব্দে উড়ছে। কখনও নেমে মাটির ঢিবির উপর বসছে, আবার উড়ছে বড় ঘাসের বন বা ঝোপের উপর। হঠাৎ পা দুটো ঝুলিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারের উপর। শিকার বুঝতেই পারে না যে তার শিয়রে শমন। বেড়ালের মত নিঃশব্দে আঘাত হানে বলেই তেলুগু-তামিল নামের সার্থকতা। শিকারে সফল হলে সেখানে বসেই খেয়ে আবার ওড়ে। কখনও ঝোপ বা গাছের উপর বসে না। রাত্রে জমায়েত হয় উন্মুক্ত প্রান্তর, চষা বা অনাবাদী জমির ঢিবির উপর। সকলেই পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখে। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে ঘুমোয় না। প্রত্যেকেই এক বা দু-মিটার তফাতে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে রাত কাটায়।

প্রজননকাল— মনে হয় মে-জুনে নিজেদের দেশে। আপনা থেকে মাটিতে গড়ে ওঠা কোন গর্তে, খোলা মাঠ ও জলাভূমির ধারে, পাতা ও ঘাস বিছিয়ে 4-5টি ডিম পাড়ে সাদা, তার উপর সাধারণত লালচে-পাটকিলের ছিট ও ছোপ থাকে।

পাহেটাই (Pied Harrier)

এই পাখিকে উন্মুক্ত পরিবেশে বেলগাছিয়া-পাতিপুকুরের কাছে দেখার বছরখানেক আগে দেখেছিলাম 52নং আমহার্স্ট স্ট্রীটে প্রয়াত কার্তিক বসুর ওখানে। দুটি পাখি ছিল, চারু-সতীশদের ধরা। আমি বিকেলে যেতেই কার্তিকদা বলল, বলতো কি পাখি? বলি, তোমার কাছে যখন এসেছে তখন নিশ্চই বাজ বংশীয় কোন পাখি, তবে আগে কখনও দেখি নি। কেন জানি মনে হচ্ছে মাঠচিলেরই (পেইল হ্যারিয়ার) কোন জ্ঞাতি হবে। আর সাদা-কালো রং দেখে আবলকি (পায়েড) বলেই মনে হচ্ছে। কার্তিকদা হেসে বলেছিল, আন্দাজটা তোর ঠিকই। যা ওপরে গিয়ে দাদার (হিতেন্দ্রমোহন বসু) স্টুয়ার্ট বেকার-এর বই থেকে বের কর এর নাম-ধাম। বলি, স্টুয়ার্ট-বেকার-এর চাইতে জার্ডন-


চি 99. পাহেটাই

এর বই থেকে চট করে বের করতে পারব। ওর বইটাতেই আমার সুবিধে লাগে। কিন্তু দোতলায় গিয়ে বই হাঁটকে সনাক্ত করার চেয়ে আমায় এখন নামটাই বলে দাওনা কেন, পরে বই দেখে নেব। জবাব পাই, পাখি চিনতে হলে, জানতে হলে এটুকুন কষ্ট করতেই হবে। অগত্যা উপরে উঠে বই ঘাঁটতেই হল। প্রথমেই জার্ডন দেখে বার করলাম এর নাম। পরে স্টুয়ার্ট-বেকার দেখে সবটা জেনে নিচে নেমে কার্তিকদার কাছে এসে হেসে ফেললাম। কার্তিকদাও হাসতে লাগল। বাজ বংশের পাখি হলে কি হবে ওরা কোন পাখি শিকারে অক্ষম। দুর্বল, ওড়াতে দ্রুতও নয়।

ছিপছিপে সুন্দর কালো-সাদা পাখি। মাথা, ঘাড়, গলা ও বুক কালো, বাকি তলাটা এবং বস্তিপ্রদেশ সাদা, লেজ ধূসর। ডানা রূপোলি-ধূসর। ওড়ার পালকে চওড়া করে কালো ছোপ, মধ্যবর্তী ডানার পালকের আচ্ছাদকে কালো পটি। এই পাখি দুটোই পুরুষ। পাখি জার্ডনের বইতে লেখা আছে স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। কিন্তু তা ঠিক নয়।

স্ত্রী-পাখি দেখেছিলাম অনেক পরে। চেনা খুবই শক্ত, মাঠচিল বলেই ভুল হয়। একমাত্র ডানার প্রান্তদেশ মাঠচিলেদের চেয়ে একটু ভোঁতা এবং ওড়ার সময় ডানা নাড়ে খুব ধীরে। স্ত্রী-পাখির উপরাংশ গাঢ় পাটকিলে, নিম্নাংশ ফিকে মেটে লালচে-হলুদ, ঘাড় কিছুটা সাদাটে। দু'জনেরই কনীনিকা উজ্জ্বল লেবু-হলুদ, উপর ও নীচের চঞ্চুর অর্ধেকটা কালচে-পাটকিলে, নীচের চঞ্চুর বাকি অংশ সবজেটে-হলদের ছোঁয়াচ নিয়ে সীসে-রঙা। নাকের উপর উন্মুক্ত ঝিল্লি সবজেটে-হলুদ। পা ও আঙুল কমলা-হলুদ (স্ত্রী-পাখির একটু নিষ্প্রভ), নখর কালো।

এই পাখি শ্যেন বর্গের (ফালকনিফরমেস) অন্তর্গত বাজ বংশের (অ্যাকসিপিট্রিদি) এক প্রজাতি। নাম—পাহেটাই (সার্কাস মেলানো লিউকস), ইংরেজী—*প্যায়েড হ্যারিয়ার*, নেপালি—*আবালক পেটাহা*। পুরুষ লম্বায় 46 সেমি (18 ইঞ্চি), স্ত্রী 49 সেমি (19 ইঞ্চি)।

বাসস্থান— প্রধানত শীতে পরিযায়ী হয়ে আসে পূর্ব ভারতে। বেশি দেখা যায় মণিপুর, আসাম (মাঝে-মধ্যে বাসাও বাঁধে), বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা থেকে পূর্ব উপকূল ধরে কন্যাকুমারিকা এবং কিছু শ্রীলঙ্কায়। এছাড়া কখনও-সখনও দেখা যায় কেরালা, পশ্চিম মাদ্রাজের নীলগিরি ও পালনি পর্বতসমূহে, মহীশূরের লোণ্ডা জেলা, মধ্যপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল বালাঘাট, ভাণ্ডারা ও বস্তারে। ক্বচিৎ হাজির হয় অন্ধ্রপ্রদেশের ওয়ারাঙ্গাল জেলা ও মহারাষ্ট্রের বোম্বাই অঞ্চলে। বিচরণ করে পাহাড়ী জায়গায় 2100 মি. উচ্চতার মধ্যে এবং সমতলে মেঠো জমি, 'ধানখেত এবং ঝিলের ধারে বড় বড় ঘাসের জঙ্গলে। বাসা বাঁধে বৈকাল হ্রদ থেকে পুবে উসুরিল্যাণ্ড, দক্ষিণে মঙ্গোলিয়া, উত্তর চীন এবং আমুর অঞ্চলে। শীতে পরিযায়ী হয় পূর্ব ভারত থেকে ভারতের বাইরে বর্মা, দক্ষিণ চীন, ইন্দোচীনীয় অঞ্চল, বোর্ণিও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে।



চি 99. পাহেটোহ

এর বই থেকে চট করে বের করতে পারব। ওর বইটাতেই আমার সুবিধে লাগে। কিন্তু দোতলায় গিয়ে বই ইাঁটকে সনাক্ত করার চেয়ে আমায় এখন নামটাই বলে দাওনা কেন, পরে বই দেখে নেব। জবাব পাই, পাখি চিনতে হলে, জানতে হলে এটুকুন কষ্ট করতেই হবে। অগত্যা উপরে উঠে বই ঘাঁটিতেই হল। প্রথমেই জার্ডন দেখে বার করলাম এর নাম। পরে স্টুয়ার্ট-বেকার দেখে সবটা জেনে নিচে নেমে কার্তিকদার কাছে এসে হেসে ফেললাম। কার্তিকদাও হাসতে লাগল। বাজ বংশের পাখি হলে কি হবে ওরা কোন পাখি শিকারে অক্ষম। দুর্বল, ওড়াতে দ্রুতও নয়।

ছিপছিপে সুন্দর কালো-সাদা পাখি। মাথা, ঘাড়, গলা ও বুক কালো, বাকি তলাটা এবং বস্তিপ্রদেশ সাদা, লেজ ধূসর। ডানা রূপোলি-ধূসর। ওড়ার পালকে চওড়া করে কালো ছোপ. মধ্যবর্তী ডানার পালকের আচ্ছাদকে কালো পটি। এই পাখি দুটোই পুরুষ। পাখি জার্ডনের বইতে লেখা আছে স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। কিন্তু তা ঠিক নয়।

স্ত্রী-পাখি দেখেছিলাম অনেক পরে। চেনা খুবই শক্ত, মাঠচিল বলেই ভুল হয়। একমাত্র ডানার প্রান্তদেশ মাঠচিলেদের চেয়ে একটু ভোঁতা এবং ওড়ার সময় ডানা নাড়ে খুব ধীরে। স্ত্রী-পাখির উপরাংশ গাঢ় পাটকিলে, নিম্নাংশ ফিকে মেটে লালচে-হলুদ, ঘাড় কিছুটা সাদাটে। দু'জনেরই কনীনিকা উজ্জ্বল লেবু-হলুদ, উপর ও নীচের চঞ্চুর অর্ধেকটা কালচে-পাটকিলে, নীচের চঞ্চুর বাকি অংশ সবজেটে-হলদের ছোঁয়াচ নিয়ে সীসে-রঙা। নাকের উপর উন্মুক্ত ঝিল্লি সবজেটে-হলুদ। পা ও আঙ্গুল কমলা-হলুদ (স্ত্রী-পাখির একটু নিষ্প্রভ), নখর কালো।

এই পাখি শ্যেন বর্গের (ফালকনিফরমেস) অন্তর্গত বাজ বংশের (অ্যাকসিপিট্রিদি) এক প্রজাতি। নাম—পাহেটোই (সার্কাস মেলানো লিউকস), ইংরেজী—প্যায়েড হ্যারিয়ার, নেপালি—আবালক পেটাহা। পুরুষ লম্বায় 46 সেমি (18 ইঞ্চি), স্ত্রী 49 সেমি (19 ইঞ্চি)।

বাসস্থান— প্রধানত শীতে পরিযায়ী হয়ে আসে পূর্ব ভারতে। বেশি দেখা যায় মণিপুর, আসাম (মাঝে-মধ্যে বাসাও বাঁধে), বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা থেকে পূর্ব উপকূল ধরে কন্যাকুমারিকা এবং কিছু শ্রীলঙ্কায়। এছাড়া কখনও-সখনও দেখা যায় কেরালা, পশ্চিম মাদ্রাজের নীলগিরি ও পালনি পর্বতসমূহে, মহীশূরের লোন্ডা জেলা, মধ্যপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল বালাঘাট, ভাণ্ডারা ও বস্তারে। ক্বচিৎ হাজির হয় অন্ধ্রপ্রদেশের ওয়ারাঙ্গাল জেলা ও মহারাষ্ট্রের বোম্বাই অঞ্চলে। বিচরণ করে পাহাড়ী জায়গায় 2100 মি. উচ্চতার মধ্যে এবং সমতলে মেঠো জমি, 'ধানখেত এবং ঝিলের ধারে বড় বড় ঘাসের জঙ্গলে। বাসা বাঁধে বৈকাল হ্রদ থেকে পুবে উসুরিল্যান্ড, দক্ষিণে মঙ্গোলিয়া, উত্তর চীন এবং আমুর অঞ্চলে। শীতে পরিযায়ী হয় পূর্ব ভারত থেকে ভারতের বাইরে বর্মা, দক্ষিণ চীন, ইন্দোচীনীয় অঞ্চল, বোর্নিও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে।

ডাক— সাধারণত চুপচাপ। তবে বাসার কাছে অপছন্দের কেউ এলে হাঁড়িচাচা (ট্রি পাই) মার্কা পরপর ছ'বার একটা আওয়াজ করে।

খাদ্য— ব্যাঙ, টিকটিকি-গিরগিটি, নেংটি ইঁদুর, ঘাস-ফড়িং ইত্যাদি। মাঝে মাঝে অসুস্থ দুর্বল কোন পাখি এবং মাটিতে যেসব পাখি বাসা বাঁধে তাদের ছানাদের খেয়ে থাকে।

প্রজননকাল— প্রজনন ঘটে সবই ভারতের বাইরে। একমাত্র আসামের ডিব্রুগড় জেলায় ও কাছাড়ে 600 থেকে 900 মি-র মধ্যে, বাসা বাঁধে এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মধ্যে। ঘেসো জমিতে দুমড়ে যাওয়া বড় ঘাসের উপর কয়েক সেমি উঁচুতে ঘাসের চাপড়া সাজিয়ে বাসা বানায়। সাইবেরিয়ায় 4 থেকে 6টা সাদা ডিম পাড়ে, কখনও তার উপর লালচে ছোপ থাকে। ভারতীয় ডিমের খবর এখনও বিশেষ কিছু জানা যায় নি। ডিমের গড় মাপ (সাইবেরিয়ায়) 43·6 × 34·5 মিমি।

পানচিল (Eurasian March Harrier)

বাল্মীকি অবস্থায় কখনও পৌঁছব না, এটা জলভাতের মত সত্যি, কিন্তু রত্নাকররূপে 13 থেকে 50 বছর বয়েস পর্যন্ত যে ভূমিকা পালন করতাম, তার ফলে সেই যুগে পুজোর পরেই বন্দুকের ঘোড়াটানার আঙুলটা চুলকোত। নলখাগড়া, শর, উলু, জল-বাতাস আলোয় মেশা পরিবেশ নেশার মত আমায় টানত। কোথাও যাবার আমন্ত্রণ বা সুযোগ না পেলে বারে বারে যেতাম কলকাতার উপকণ্ঠে বাদা বা লবণ হ্রদে।

সেখানে বিগরি বা তুলসীবিগরি (কমন টিল), আর বালি হাঁস (কটন টিল) বন্দুকের গুলিতে গোটা কতক পড়লে পর কাছে-পিঠে কোড়াল বা মচ্ছল (প্যালাসেস ফিশিং-ঈগল) থাকলেও ঐ রাজকীয় পাখিটি তার নজরানা আদায় করে নেবেই, হাজার হুসহাস বা বন্দুক উঁচিয়ে যতই ভয় দেখানর চেষ্টা করা যাক না কেন।



চি 100. পানচিল

সন-তারিখ আজ আর ঠিক মনে নেই, 1939 -40 সালই হবে, খুব ভোরে বোধহয় প্রথম ট্রেনেই শিয়ালদা থেকে গড়িয়ায় গিয়ে নেমেছি। ভেড়ির পাশ দিয়ে চলেছি, মাইল তিনেক গেলেই নতুন দেয়াড়া বলে একটা গ্রাম পাব। এইসব ভেড়ি আর নেই। শেষ 1976 সালের ডিসেম্বরে গিয়ে দেখি জলের চিহ্ন আর না থাকার মধ্যে। সব মাঠ হয়ে গেছে। ভেড়ির আল দিয়ে চলেছি। একদিকে যেখানে জল প্রায় নেই, সেখানে উলু, শর ও নলে ভর্তি। স্টেশন থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে খানিকটা যেতেই সঙ্গে বন্দুক দেখে কয়েকটি ছেলে পুরোপুরি প্রকৃতির সাজে কয়েকটির আবার জাঙ্গিয়া জাতের জিনিস পরনে জুটে গেল, এদের তাড়ালেও যেত না।

চলেছি কিন্তু খুবই সতর্ক হয়ে। শর-বনটা হাত পাঁচ-ছয় চওড়া, তারপরেই জলরাশি। হঠাৎ শর-বনের পাশ থেকে এক ঝাঁক বালি হাঁস উড়তেই আমি গুলি করেছি। বেশ কয়েকটা পড়েছে বলে মনে হল। ছেলেগুলো হৈ হৈ করে জলে নেমে পড়েছে, শর সরিয়ে হাঁসগুলো একে একে সরতে যাবে সেইসময় আমায় হতচকিত করে একটা পাখি, খুব বড়সড় নয়, চিলের চেয়ে একটু ছোটই হবে, পিছনে উলুঘাসের জমির দিক থেকে উড়ে এসে প্রায় আমার গা ঘেঁষে গিয়ে একটাকে জল থেকে তুলে নিল। ছেলেরা জল ছুড়ছে, চিৎকার করছে, 'পানচিলে নেল, পানচিলে নেল'। পাখিটা কোন ভ্রূক্ষেপ না করে প্রায় আমার পাশ দিয়ে ফিরে গেল উলুর ঝোপে বালিহাঁসটাকে থাবায় আঁকড়ে। সমস্ত ঘটনা ঘটতে আধ মিনিটও সময় যায় নি। কোড়ালের মত এই পাখিটাও নজরানা নিল। কোড়ালের পক্ষে বালিহাঁস তুলে নিয়ে যাওয়া সহজসাধ্য, কিন্তু তুলনায় আকারে কত ছোট, তা-সত্ত্বেও অবলীলাক্রমে তুলে নিয়ে গেল দেখে অবাকও হলাম।

ঐ সময়টুকুর মধ্যে পাখিটাকে যা দেখলাম, তা হল— দেহ গাঢ় চকোলেট-পাটকিলে, চিলের মতই তবে রোগাটে, লেজ গোল চিলের মত চেরা নয়। মাথাকে ঘিরে সরু হলদেটে-লালচে গোল আংটি বা চাকতি, ডানার কাঁধের কাছেও হলদেটে-লালচে বা জরদের পটিটা এসেছে, ডানার প্রান্তদেশ ছুঁচলো নয়, একটু ফাঁক ফাঁক, গাঢ় পাটকিলের পটিও আছে। ওড়ার পালক কালো।

বাড়ি এসে বই খুলে ওর পরিচয় জানলাম। যে পাখিটাকে দেখেছিলাম আমার শিকারের উপর ডাকাতি করতে, সেটা ছিল স্ত্রী-পাখি। চারু-সতীশদের বলতে বলল, ওতো 'ঢিকা বউরি'। ক'দিন বাদেই একটাকে ধরে নিয়ে হাজির।

পাখিটা শ্যেন বর্গের (ফালকনিফরমেস) অন্তর্গত বাজ বংশের (অ্যাকসিপিট্রিদি), এক প্রজাতি। নাম—পানচিল, ঢিকা বউরি (সার্কাস ইরুগিনোসাস), ইংরেজি— মার্শ হ্যারিয়ার। স্ত্রী-পাখি লম্বায় 59 সেমি (23 ইঞ্চি), পুরুষ 54 সেমি (21 ইঞ্চি)। পুরুষের দেহ গাঢ় পাটকিলে, মাথা, ঘাড়, বুক দিকে হলদেটে-লালচে, নিচের অংশটা গাঢ় হলদেটে-লালচে। লেজ রূপোলি-ধূসর, রূপোলি-ধূসর ডানার একদম ডগাটা কালো। উভয়ের কনীনিকা বাদামী-পাটকিলে, চঞ্চু শিঙে-কালো, গোড়ায় চিবুকের কাছে সবজেটে-হলুদ বা সীসে, নাকের উপর অনাবৃত ঝিল্লী হলুদ, পা ও আঙুল হলুদ থেকে কমলা-হলুদ, নখর শিঙে-কালো।

বাসস্থান— দক্ষিণ সুইডেন, এবং ডেনমার্ক থেকে পুবে ইয়েনেসি, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরীয় কূল, তুর্কিস্তান এবং মঙ্গোলিয়া। শীতে পরিয়াযী হয় আফ্রিকা, ভারত, মালয় উপদ্বীপ, দক্ষিণ চীন, জাপান ও ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে। 2000 মি. উচ্চতার মধ্যে সমগ্র ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, বাংলাদেশ, আন্দামান, শ্রীলঙ্কায় পরিযায়ী হয় সেপ্টেম্বর থেকে। নিজের বাসভূমিতে ফিরে যায় এপ্রিল-মে মাসে। অনেক পক্ষিবিজ্ঞানী মনে করেন কাশ্মীর ও উত্তর ভারতের নানা স্থানে এরা বাসা বেঁধে স্থায়ী বসবাস করে। দেখা যায় ঝিল, বাদা, খাল, জলে ভেসে যাওয়া ধানখেত ইত্যাদির ধারে।

খাদ্য— ব্যাঙ, মাছ, মেঠো ইঁদুর, ছুঁচো, দুর্বল ও আহত পাখি, বড় জলজ-কীটপতঙ্গ এবং সময়ে সময়ে মৃত প্রাণীর মাংস।

ডাক— ভারতে শোনা যায় নি।

স্বভাব— জলের ধার ছাড়া অন্যত্র এদের দেখা যায় না বললেই হয়। ক্বচিৎ ঘাসের মাঠে বা শুকনো শস্য খেত থেকে শিকার ধরছে নজরে পড়ে। দেখা যায় শর বা নল-খাগড়া বনের কয়েক মিটার উঁচু দিয়ে পাখা ছড়িয়ে স্পন্দনহীনভাবে ভেসে চলেছে, সঙ্গে থেকে থেকে অলসভঙ্গিতে পাখার ঝাপট, হঠাৎ গোঁৎ খেয়ে ঢুকে গেল শর-বনের ভিতর কোন শিকার ধরতে। বহু সময় দেখা যায় মাটিতে বসে আছে, বিশেষত খাল, বিলের ধারে কোন ঢিবির উপরে। ওখান থেকে উড়ল শূন্যে একটু জোরে ডানার ঝাপট মেরে, ডানা দুটো শূন্যে তুলে দিল উপরে ইংরেজী V -করে, চলল বাতাস কেটে সোঁ সোঁ করে কোথায় যেন শিকার দেখেছে। আমার শিকার করা বালিহাঁস যেমন নিয়েছিল, তেমনি আরো অনেক শিকারীকে ওদের দস্যুবৃত্তির ফল ভোগ করতে হয়েছে। বিনা ভ্রূক্ষেপে কাউকে ভয় না করে তুলে নিয়েছে বন্দুকে আহত বা নিহত পাখি যা কখনও কখনও ওর দেহের তুলনায় বড় এবং ভারীও।

প্রজননকাল— ভারতের বাইরে এপ্রিল থেকে জুন। কোন বাদার ধারে মাটির উপর নলখাগড়া বা শরের পাতা দিয়ে বাসা বানায়। লাইনিং দেয় ঘাসের, ছিট ছোপহীন সাদা-রঙের ডিম পাড়ে 4-6টি।

সাপমারিল

20-10-82-র বিকেল নাগাদ ন্যাজাট হয়ে সন্দেশখালি পৌঁছেছি। অতিথি হয়েছি ওখানকার গ্রাম-পঞ্চায়েতের সভাপতির। পরদিন 21-10-82 সকাল ছটায় 'জয় মা বীণাপাণি' ভটভটিতে চেপে গিয়েছি বাগনা। জঙ্গলে ঢুকব বলে সেখানকার রেঞ্জ অফিস থেকে একজন বন্দুকধারী ফরেস্ট গার্ডকে নিয়ে চলেছি ঝিলা নদীর উপর দিয়ে। পাশে আড়বেশি ব্লক নং 2 -এর জঙ্গল। নানারকম পাখি দেখছি, বাঁদরও দেখছি। নোট করছি। সকাল 9-15 মিনিটে বুড়ির ডাবরি খালে ঢুকলাম। ডানদিকে আড়বেশি ব্লক নং 5। সাধারণ শকুন (হোয়াইট-ব্যাকড্ ভালচার) ও লম্বাচঞ্চু শকুন (লংবিলড্ ভালচার) দু'জাতই বাসা বেঁধেছে এক-একটা কেওড়া গাছে। হঠাৎ দেখি সামনেই চিলের চেয়ে বড় একটা পাখি উড়ে আসছে আমাদের ভটভটির দিকে। এক কালো সাপের মাথা ও ঘাড় নখরে আটকে ধরে আছে। সাপটা ছাড়াবার জন্যে প্রাণপণে লেজ আছড়াচ্ছে। কিন্তু সুবিধে করতে পারছে না। মাথার উপর দিয়ে যখন পার হয়ে আড়বেশি ব্লক 5-এর দিকে গেল তখন পাখিটাকে ভাল করে দেখলাম। পাখিটা বেশ গাঁট্টাগোট্টা দেহের উপরাংশ গাঢ় পাটকিলে, নিম্নাংশ সাদা হলেও গলায়, বুকে সাদার উপর পাটকিলের সরু ও চওড়া ছোপ ও টান বেশ কয়েকটা। লেজে 3কি 4টি পটি, একদম শেষের পটিটা আর বাকিগুলোর চেয়ে বেশি চওড়া। মাথাটা একটু গোলাকার এবং ধূসরাভ। পাখিটা ঈগল। ভটভটির সারেঙ কালীপদকে বোটটা থামাতে বলেছি। চোখে দূরবীন। সাপটা দেখলাম কেউটে। ঈগলটা এসে বসল আরেকটা কেওড়া গাছের উপরের ডালে। বাঁকান তীক্ষ্ণ চঞ্চু দিয়ে সাপের ঘাড়ের কাছ থেকে মাংস ছিঁড়ে মুখে দিচ্ছে। কেউটেটা হাত দেড়েক-দুই হবে। লেজ দিয়ে ওর দেহটাকে বাঁধার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। ধড় থেকে মাথাটা কেটে মাটিতে ফেলে দিয়েছে।



চি 101. সাপমারিল

কেউটের লেজ ঝাপটানি বন্ধ। দেখলাম পাখিটার পায়ের গুলফে কোন পালক নেই। ডানার ডগা লেজ ছুঁয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সাপখেকো ঈগলের দুটি জাতের অস্তিত্ব আছে। সারেঙ কালীপদকে জটজটি চালাতে বললাম। ঘুড়ির ডাবরি টাওয়ারে পৌঁছলাম 11.55য়। সেখানে বাঘের পায়ের কাঁচা ছাপ সর্বত্র।

পাখিটা শ্যেন বর্গের (ফালকনিফরমেস) অন্তর্গত বাজ বংশের (অ্যাকসিপিট্রিডি) এক প্রজাতি। নাম-সাপমারিল (সার্কাইটাস গালিকাস), ইংরেজি— শর্ট টোড ঈগল। এই গণের পাখিদের জঙ্ঘাস্থি পর্যন্ত পালক, গুলফ, লম্বা এবং পালকহীন। গুলফের উপর ষড়ভুজ আকারের ছোট ছোট ভাঙ্গাচোরা আঁশে ভর্তি। আঙ্গুল ছোট, ভিতর ও বাইরের আঙ্গুল লম্বায় প্রায় সমান। নখর ছোট এবং খুব বেশি বাঁকান নয়।

পুরুষ সাপমারিল লম্বায় 63 সেমি (25 ইঞ্চি), স্ত্রী আকারে বড় 68 সেমি (27 ইঞ্চি,) স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। উভয়ের কনীনিকা হলুদ বা উজ্জ্বল কমলা-হলুদ, চঞ্চু ফিকে ধূসরাভ, নীল ডগাটা গাঢ়, নাকের উপর অনাবৃত ঝিল্লী সাদাটে বা ফিকে সীসে-ধূসর। পা ও আঙ্গুল ময়লা হলদেটে-সাদা বা ধূসর-পাটকিলে, নখর কালো।

বাসস্থান— আসাম ছাড়া সমগ্র ভারত, পাকিস্তান 2300 মি. উচ্চতার মধ্যে। শ্রীলঙ্কায় দেখা যায় না এবং বাংলাদেশে দেখা যায় বলে নথিভুক্ত হয় নি। ভারতের বাইরে মধ্য ইউরোপ থেকে পূবে তুর্কিস্তান এবং মঙ্গোলিয়া, দক্ষিণে উত্তর আফ্রিকা, পারস্য এবং উত্তর চীন। কিছু মধ্য ইউরোপ থেকে পরিযায়ী হয় উত্তরপূর্ব আফ্রিকায়।

খাদ্য— প্রধানত বিষাক্ত সাপ সমেত সবরকম সাপ। 150-180 সেমি লম্বা দাঁড়াশ সাপকে শিকার করতে দেখা গেছে। এছাড়া অন্যান্য সরীসৃপ, যেমন টিকটিকি-গিরগিটি, গোসাপ ইত্যাদি, ব্যাঙ, মেঠো ইঁদুর, অসুস্থ বা আহত পাখি, বড় জাতের পোকামাকড়।

ডাক— তীক্ষ্ণস্বরে জোরে খানিকটা চিলের মতন উড়তে উড়তে ডাকে 'পাই-ইওউ পাই-ইওউ'। প্রজননকালে খুব বেশি শোনা যায়।

স্বভাব— সাধারণত দেখা যায় নীল আকাশের বুকে সঙ্গ উদাসী হয়ে একাই শূন্যে চক্কর মারছে। কখনওবা দুই ডানা ছড়িয়ে দিয়ে কোন ঝাপটা না মেরে মাটি থেকে 15 থেকে 20 মিটারের মধ্যে উঁচুতে ভেসে চলেছে, কিন্তু নজর ঠিক রাখছে নিচে ঝোপঝাড় বা মাঠের উপর কোথাও কোন শিকার আছে কিনা। জমিতে কোন শিকার-বস্তু দেখতে পেলে বা আছে এই সন্দেহ হলে, নিচে

নেমে এসে ঘনঘন পাখা নেড়ে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে খোঁজে। বেশ কিছু উঁচুতে বাতাসের বেগের বিরুদ্ধে কয়েক মিনিট স্থির হয়ে ভাসে, ডানা ও লেজ একটু এঁকিয়ে-বেঁকিয়ে। হঠাৎ ঐ অবস্থায় ডানা বন্ধ করে মুখ নিচু করে সোজা ডাইভ মারে খুব উচ্চগতিতে. মাটির খুব কাছে এসে ডানা ছড়িয়ে দিয়ে গতিবেগ সংযত করে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারের উপর। 400 মিটার মতন উপর থেকেও এইভাবে নেমে আসে। গাছের মাথা বা খাড়া পোতা বাঁশের খুঁটির উপর বসেও আহার্যবস্তু খোঁজে। কখনও দেখা যায় চুহামারদের (বাজার্ড) মতো মাটিতে হাঁটতে হাঁটতে ধরে তার শিকার, ঘাসফড়িং বা তার শূককীট না হয় উঁই। প্রজননকালে জোড়ায় আকাশে ওড়ে এবং ডাকতে থাকে। সেইসঙ্গে ওড়ার নানা কসরত দেখায়। দক্ষিণ ভারতের আদিবাসীদের বিশ্বাস ওদের পাখার তলায় ভগবান বিষ্ণুর চক্র আঁকা আছে, সেইজন্য সাপেরা কিছুই করতে পারে না।

প্রজননকাল— ডিসেম্বর থেকে মার্চ। এত বড় আকারের দেহের তুলনায় বাসা বেশ ছোটই বানায়, কাঠি ও শুকনো গাছের সরু ডাল দিয়ে। মাঝখানটা বসা, কখনও কখনও ঘাসের অল্প লাইনিং দেয়। বাসাটা বানায় মাঝারি উচ্চতার নিম, বাবুল, সাঁই বা শমী, শিশু বা অন্যান্য গাছে একটু খোলামেলা জায়গায়। ক্বচিৎ পাহাড়ের খাঁজের ধারে বা নদীর খাড়া পাড়ে বাসা বাঁধতে দেখা যায়। ভারতে একটি, উইরোপে 2টি ছোপছাপ হীন সাদা ডিম পাড়ে। ভারতে স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই পরস্পরের সাহায্যে বাসা বানায় কিনা তা এখনও জানা যায় নি, তবে স্ত্রী-পাখিকে একাই ডিমে তা' দিতে দেখা গেছে, তবে সন্তান প্রতিপালন করতে দু'জনকেই দেখা গেছে। ভারতে কতদিনে ডিম ফোটে তা জানা যায় নি। কিন্তু উইরোপে জানা গেছে 47 দিনে ফোটে। বাচ্চারা বাসা ছাড়ে 70-75 দিনে। ভারতীয় ডিমের গড় মাপ 73˙5 × 58˙4 মিমি।

তিলাজ বাজ

এই পাখিটিকে প্রথম দেখি চিড়িয়াখানায়। দেখে ভালই লেগেছিল। যেসব পাখির ঝুঁটি থাকে তাদের থাকে মাথা বা চাঁদির উপর, এদের দেখলাম গোল কালো-সাদা ঝুঁটি ঘাড়ের উপর, বাবরি চুল যেমন হয় তেমনি একটু ওঠা। সেটা স্পষ্ট হয় যখন ঝুঁটিটা তুলে খাড়া করে। ছেলেবেলায় আলিপুরের চিড়িয়াখানায় একটু উত্যক্ত করে ঝুঁটি তোলাটা দেখতাম। পরে মুক্ত স্বাধীন অবস্থায় দেখেছি শহর কলকাতার আশপাশে। এই পাখিটাকেও চারু-সতীশরা ধরে আমাদের সংগ্রহে দিয়েছিল, তখন খুব ভাল ভাবে নজর করে দেখি।

মাথা কালো, প্রতিটি পালকের শেষে একটু সাদার ছোঁয়া। মাথার ঝুঁটি বাবরি চুলের মত ঘাড়ে। দেহের উপরাংশ পাটকিলে, ঘাড় ও ডানার ছোট আচ্ছাদকে ছোট ছোট সাদা ফুটকি, ডানার পালকে চওড়া করে কালচে-ধূসরের পটি। লেজ পাটকিলে, ঘোলাটে সাদার উপর চিত্রবিচিত্র এবং দুটি চওড়া কালচে পটির সবচেয়ে নিচে সরু সাদা পটি। নিম্নাংশে চিবুক থেকে বুক ছিটহীন পাটকিলে, সেখান থেকে লেজের তলার আচ্ছাদক পর্যন্ত ফিকে পাটকিলে, তার উপর খুব ফিকে সাদাটে লম্বা লম্বা টান,আর সাদা ফোঁটা। ডানা চওড়া গোলাকার, তলায় চওড়া সাদা পটিকে ঘিরে সরু



চি 102. তিলাজ বাজ

কালো পটি। ডানা লেজ পর্যন্ত পৌঁছয় না, 8 সেমির (3 ইঞ্চি) মতন ছোট।

পাখিটা শ্যেন বর্গের (ফালকনিফরমেস) অন্তর্গত বাজ বংশের (অ্যাকসিপিট্রিদি), *এক প্রজাতি।* নাম— তিলাজ বাজ, সব চূড়, সাপমার চিল (স্পিলরনিস চীলা) ইংরেজি— *ক্রেস্টেড সার্পেন্ট ঈগল,* হিন্দি— *ডোগরা চিল, ফার্জ বাজ।*

পুরুষ তিলাজ বাজ 63 সেমি (25 ইঞ্চি), স্ত্রী 74 সেমি (29 ইঞ্চি)। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। কনীনিকা সোনালী-হলুদ, চঞ্চু সীসে-নীল, উপরের চঞ্চুতে একটু কালচে ভাব, নাকের উপর অনাবৃত ঝিল্লী এবং চোখের চারপাশের চামড়া হলুদ, প্রজননকালে এই হলুদের ভাব বেশ গাঢ় হয়। গুলফে পালক নেই, টেরাবাঁকা ছোটবড় ষড়ভুজ আঁশ। পা ও আঙুল ময়লাটে-হলুদ, নখর কালো।

বাসস্থান— পাকিস্তান উত্তর পশ্চিম সীমান্ত, উত্তর ভারত, কাশ্মীর থেকে পুবে নেপাল, আসাম, গাঙ্গেয় উপত্যকা, পশ্চিমবঙ্গ, 2000মি. উচ্চতার মধ্যে। উপদ্বীপাত্মক ভারতে যে *উপজাতি* মারাঠি 'মুরাইয়ালা' (স্পি চী মেলানটিস), ইংরেজি— *লেসার ক্রেস্টেড সার্পেন্ট ঈগল,* আকারে একটু ছোট এবং সেটা না মাপলে বোঝা যায় না। *বাসস্থান*— গাঙ্গেয় উপত্যকার দক্ষিণে 25 উঃ অক্ষাংশ গুজরাট থেকে পুবে পশ্চিমবঙ্গ। শ্রীলঙ্কার উপজাতি 'রাজালিয়া' (স্পি চী স্পিলোগাস্টার) আকারে ছোট, পুরুষ 59 সেমি (23 ইঞ্চি), স্ত্রী 63 সেমি (25 ইঞ্চি)। বর্মার *উপজাতিকে* (স্পি চী বার্মানিকাস) অসমিয়ারা বলেন 'ছিন', লম্বায় 68 সেমি (27 ইঞ্চি)। এছাড়া আন্দামান, নিকোবর ও গ্রেট নিকোবরে একটি করে *উপজাতি,* তার মধ্যে গ্রেট নিকোবরের *উপজাতি* (স্পি চী ক্লোসি) আকারে সবচেয়ে ছোট, 46 সেমি (18 ইঞ্চি)। এদের সবাইকে দেখা যায় সেই সব অঞ্চলে যেখানে আছে ঘন গাছপালা ও প্রচুর জল।

খাদ্য— প্রধানত সাপ, ব্যাঙ, টিকটিকি-গিরগিটি, মেঠো ও নেংটি ইঁদুর, কাঁকড়া, মাঝে-মধ্যে জল সরে গেলে কাদার মধ্যে নেমে বান মাছ, অসুস্থ ও আহত পাখি। মাঝে মাঝে গৃহপালিত মুরগির ছানা তুলে নিয়ে যায়। কিছু শিকারী বদনাম দিয়েছে যে এরা বন্দুকে মারা পাখি তুলে নেয় কিন্তু সেটা দৈবাতই ঘটতে পারে। কখনও কোন তিতির বা জীবঞ্জীব (ফেঝাণ্ট) তুলে নিতে দেখা যায় নি।

ডাক— খুব উচ্চকণ্ঠে শিসের মত তীক্ষ্ণস্বরের লম্বা টানে ডাকে 'কিই-কিই-কিই--- কেক-কেক-কেক-কিইই।' সাধারণত উড়তে উড়তে ডাকলেও মাঝে মাঝে গাছের ডালে বসেও ডাকে। যেটাকে আমরা পুষেছিলাম, সেটার কাছে আমরা যখন যেতাম তখন সেটা নিচু গলায় 'হুই-হুই' করে কখনওবা 'পৃ-পৃ-পৃ' ডাকত।

স্বভাব— সাধারণত একাই থাকে, জোড়েও দেখা যায়। জঙ্গলপূর্ণ গিরিখাত, গাছে ঢাকা স্রোতস্বতীর ধার, জঙ্গলের শেষে উপত্যকা এবং খেতখামারের ধারে, খুব উঁচু গাছে কিছুটা পাতার আড়ালে দুজনে টান টান হয়ে সোজা বসে। সেখান থেকে চারিদিকে কোথায় শিকার বস্তু আছে তাই খোঁজে। কোনরকম বিপদের আভাস বা সন্দেহজনক কিছু মনে হলে ঘাড়ের ঝুঁটি খাড়া করে তোলে। মনে হয় যেন সাদা-কালো পালকের সুন্দর গলাবন্ধ বা মাফলার পরেছে। বেশি দেখা যায় বড় বড় গাছের মাথার উপর দিয়ে, কখনওবা খুব উঁচুতে চক্কর মারছে, মাটি থেকে দেখলে মনে হয় বিন্দুসম বা—ভেসে চলছে আর তীক্ষ্ণস্বরে ডাক-পেড়ে জানাচ্ছে আমি আছি। প্রজননকালে চেল্লাচিল্লিটি বেশিই করে, সেই সঙ্গে দেখায় ওড়ার যতরকম কসরত হতে পারে সব। কখনও দেখা যায় তিনটি পাখি শূন্যে কসরতের খেলায় মত্ত হয়েছে। দুটি পুরুষ, একটি স্ত্রী। সেই চিরন্তন ত্রিভুজ।

প্রজননকাল— সমতলে ফেব্রুয়ারি-মার্চ, পাহাড়ে মার্চ থেকে মে। জঙ্গলের ধারে স্রোতস্বতীর পাশে, খুব উঁচু গাছে মগডালের কাছে, খুব বড় কাঠি ও শুকনো সরু ডাল দিয়ে বাসা বানায়। তাতে কখনও কখনও কাঁচা পাতার লাইনিং দেয়। ডিম পাড়ে 1টি। দেখতে সুন্দর, নানা রঙ ও ছিট-ছোপের হয়। বেশি দেখা যায় ঘি-রঙের উপর বেশ গাঢ় লালচে-পাটকিলের ছোপ ছোপ। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই বাসা বানায়। স্ত্রী-পাখি একাই ডিমে তা' দেয়। কিন্তু কত দিনে ডিম ফোটে তা এখনও জানা যায় নি। ডিমের গড় মাপ 71·8 × 56·2 মিমি।

কোড়াল

1390-র চৈত্র সংক্রান্তির দিন বাবুঘাট থেকে 10-45-এর বাসে চেপে চলেছি সোনাখালি। যাব গোসাবায়। সাড়ে বারটা নাগাদ মিনাখাঁ ছাড়িয়েই একটা ভেড়িতে দেখি জলের উপর একটা নেড়া গাছের খুঁটির মাথায় বসে আছে এক রাজকীয় পাখি। মাঝারি আকারের একটা মাছকে নখরে চেপে ধরে চঞ্চু দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে তার লাঞ্চ সারছে। কুমার চ্যাটার্জি আর আমি বাসে বসে দেখতে দেখতে পার হয়ে চলে এলাম। বহু বছর বাদে পাখিটাকে দেখলাম। অবলুপ্তির পথে চলে যাচ্ছে বলেই মনে হয়।

পাখিটার সঙ্গে পরিচয় কৈশোর থেকে। তখন বাদা বা লবণ হ্রদ ছিল আমার মুখ্য বিচরণভূমি। সেই বিশাল জল-রাজ্যে কতদিক দিয়েই না প্রবেশ করেছি। পছন্দ ছিল মানিকতলা বেঙ্গল কেমিক্যালের খাল পার হয়ে যাওয়া। এছাড়াও যেতাম বেলেঘাটার ভিতর দিয়ে বা দমদম-কেষ্টপুরের খাল পার হয়ে, অথবা গড়িয়া, সোনারপুর বা কালিকাপুরের দিক দিয়ে। সর্বত্রই দেখেছি এই রাজকীয় পাখিটিকে। এর সঙ্গে যুদ্ধও কম করতে হয় নি। মৃত ভাসমান শরাল বা বালি হাঁস সংগ্রহ করতে বাদার জল ঠেলে চলেছি, ওরাও উড়ে এসেছে, একটা-দুটো ছোঁ-মেরে নেবেই যতই হুসহাস করে ভয় দেখাই না কেন। দু'জনেরই এই হাঁস-সংগ্রহের মধ্যেদিয়ে একটা হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল। সে ছিনিয়ে নেবে আর আমি নিতে দেব না। এই খেলায় বেশ মজাই লাগত। তাছাড়া এই বংশের পাখিদের পুষে এবং শিকার খেলায় শিক্ষা দেবার মাধ্যমে খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করার সৌভাগ্য হয়েছিল



৭ ।০২ কোড়াল

প্রয়াত ক্রিকেটার কার্তিক বসুর সঙ্গী হিসেবে থেকে। ঠিক এই পাখিটিকে হাতে না নিয়ে দেখলেও এই বংশের প্রতিটি পাখির প্রতি আমাদের একটা শ্রদ্ধা গড়ে উঠেছিল, স্রেফ তাদের রাজকীয়ভাবের জন্যে।

একবার এক সকালে এক ভেড়ির খোলে পৌঁছে দেখি একদল এই পাখিটিকে গুলি করে মেরেছেন। আমি তাঁদের মৃদু ভর্ৎসনা করাতে তাঁরা বললেন, কি করব ? যতবারই আসি ততবারই এরা একটা-দুটো ছিনিয়ে নেবেই। বিরক্ত হয়ে একটাকে মেরেছি। বলি, আপনারা যা করতে এসেছেন এরাও তাই করতে এসেছে। মাছ শিকার এদের প্রধান হলেও পাখিও এদের অন্যতম খাদ্য। গোটা ছ'য়েক তো মেরেছেন দেখছি। এক-আধটা যদি নেয়ই তাতে আপনাদের কম পড়ার কথা নয়।

এঁরা সবাই হ্যাট-বুট পরা, সঙ্গে তিন-চারটে নানাজাতের বন্দুক। পয়সার লোভে স্থানীয় ছোকরারা জলে নেমে হাঁস নিয়ে এসেছে। ছেলে ছোকরাদের এই পাখি ভয় করবে কেন ? বরং বিশাল পক্ষবিস্তারে ছোঁ-মারা দেখে ছেলেরাই আতঙ্কিত হবে।

জলে নেমে পাখিটাকে নিয়ে এলাম। দেখি টু-টু রাইফেলের গুলিতে বুক এফোঁড়-ওফোঁড়। চোখ দুটি বন্ধ। মৃত্যুর মধ্যেও একটা শান্ত রাজকীয় ভাব ফুটে উঠেছে। কারুর কোন কাজে লাগবে না, শেয়াল-কুকুর-ইঁদুর ইত্যাদির ভোগ্য হবে। সেই শিকারীরা খুবই ভদ্র ছিলেন। আমার আক্ষেপ ও আচরণে তাঁরা নীরবে ধীরে ধীরে সেই স্থান ত্যাগ করলেন। এই পাখি শ্যেন বর্গের (ফালকনিফরমেস) অন্তর্গত বাজ বংশের (অ্যাকসিপিট্রিদি) *এক প্রজাতি।* নাম— কোড়াল, মচ্ছল (হালিয়াঈটাস লিউকরাইফাস), ইংরেজি— *প্যালাসেস ফিশিং ঈগল, রিংটেইলড্ ফিশিং ঈগল,* হিন্দি— *মাছমাঙ্গা, ঢেনক।*

কোড়াল লম্বায় 76-84 সেমি (30-33 ইঞ্চি)। মাথা ও ঘাড় ফিকে সোনালি-পাটকিলে, বাকি দেহের পালক গাঢ় পাটকিলে। লেজের প্রায় মাঝামাঝি চওড়া সাদা পটি। যখন উড়ে চলে তখন দেহের সঙ্গে ডানা এক সমতলে থাকে, কেবল প্রাথমিক পালকগুলি একটু নিচের দিকে বেঁকে থাকে। কনীনিকা ধূসরাভ-হলুদ, চঞ্চু গাঢ় স্লেট-কালো, নাকের উপর অনাবৃত ঝিল্লি সীসে, পা ও আঙুল হলদেটে-সাদা, নখর কালো। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে, কেবল স্ত্রী-পাখি আকারে একটু বড়ো।

বাসস্থান-- পাকিস্তান ও উত্তর ভারতের হিমালয়ে 1800 মি. উচ্চতার মধ্যে কাশ্মীর থেকে হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, নেপাল, গাঙ্গেয় উপত্যকার ভিতর দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বাংলাদেশ, দক্ষিণে,

সুরাট থেকে গোপালপুর, ওড়িশার চিলকা। দেখা যায় বড় নদ-নদীর আশ-পাশ, জোয়ার-ভাটা খেলা খাঁড়ি, হ্রদ এবং ঝিলে। ভারতের বাইরে বাস করে দক্ষিণ রাশিয়া থেকে মধ্য এশিয়া হয়ে ট্রান্স বৈকালিয়া এবং দক্ষিণে পারস্য উপসাগর ও উত্তর বার্মায়। কিছুটা পারযায়ী হয় কিনা জানা যায় না, তবে গ্রীষ্মে গাছপালাহীন পশ্চিম তিব্বতের কৈলাস মানস-সরোবরের কাছে-পিঠে, যাদের দেখা যায়, তারাই হয়ত প্রজননের জন্য কাশ্মীর অঞ্চলে নেমে আসে। যখন কলকাতায় বাসা ছিল তখন অক্টোবর থেকে এপ্রিলের মধ্যে প্রচুর দেখা যেত, ওটাই ওদের প্রজননকাল এবং গরম পড়লে অর্থাৎ মে থেকে সেপ্টেম্বরে দেখা যেত না।

খাদ্য— প্রধানত মাছ, জলার পাখি বিশেষত কারণ্ডব ও কামপাখি। এছাড়াও বন্দুকের গুলিতে আহত যে কোনও হাঁস শিকারীর সামনে থেকে বিনা ভ্রূক্ষেপে তুলে নেয়। খাদ্য-তালিকায় পড়ে সাপ, ব্যাঙ, কাদায় কচ্ছপ। প্রয়োজনে মরা প্রাণীও খায়। নথিভুক্ত আছে মরা বেড়ালকে তুলে নিয়ে যাওয়ার কথা। লাডাখ অঞ্চলে বাদি বা কড় হাঁসের (বারহেডেড্ গুজ) বাচ্চারা এদের হাতে খুব মারা পড়ে।

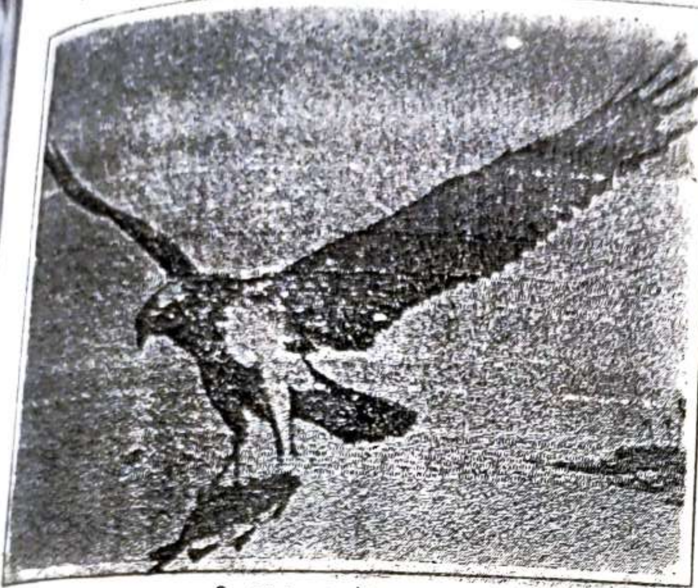
ডাক— ডাকে অনেকটা পিকিনিজ কুকুরের মত। এছাড়া মৃদুস্বরে মুরগী তার ছানাদের যেমন ডাকে সেইভাবেও ডাকে। আকাশের বুকে চক্কর দিতে দিতে মুখে আওয়াজ করে। এই আওয়াজটা প্রজননকালেই বেশি করে, যখন জোড়ায় জোড়ায় আকাশের বুকে ওড়ার কসরত দেখায়।

কোড়ালকে সাধারণত দেখা যায় কোনও ঢিবি, মাছের ভেড়ির পোতা বাঁশ বা নেড়া গাছ, ঝিলের ধারে উঁচু গাছ বা নদীর ধারে বালিয়াড়ির মাথায় বসে থাকতে। মাছ ধরে জলের উপর থেকেই, মাছমৌরল বা উৎক্রোশের মত জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরে না। বড় মাছ নখরে তুলতে না পারলে জলের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে ডাঙ্গায় তুলে মেরে খায়। এছাড়া মাছমৌরল, শঙ্খচিল, পান চিল (মার্শ হ্যারিয়ার) প্রভৃতির শিকার তাড়া দিয়ে ছিনিয়ে নিতে খুবই পটু। জলার ধারে যে সব পাখিদের বাসা তার উপর উড়ে উড়ে দেখে কোথায় একটু মোটাসোটা বাচ্চা। ফাঁক পেলেই সেখান থেকে তুলে নেয়। কোড়ালকে দেখলে সেইসব বাসার মালিকরা সমস্বরে চেঁচিয়ে অন্যদের জানান দেয় শত্রুর আগমনের। আর প্রতিটি বাসায় ধাড়ি ও বাচ্চারা ধারাল চঞ্চু এগিয়ে বসে থাকে খোঁচা মারার জন্যে। এইভাবে আক্রমণ ও শিকার সাধারণত স্ত্রী-পুরুষ জোড়ায় করে থাকে। অল্প জলে একটু বড়সড় শিকার ধরলে তাকে চেপে ধরে জলের মধ্যে চুবিয়ে দমবন্ধ করে মেরে নখরে করে তুলে নিয়ে যায়।

প্রজননকাল— অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি। বাসা বানায় 15 থেকে 35 মি. উঁচুতে শিমূল, পিপুল, হিমালয় অঞ্চলে চিনার প্রভৃতি গাছের উপর বেশ বড় করে শুকনো সরু ডাল দিয়ে। লাইনিং দেয় সবুজ পাতার। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনই বাসা বানান থেকে সন্তান প্রতিপালনে পরস্পরকে সাহায্য করে, কিন্তু ডিম কতদিনে ফোটে তা এখনও জানা যায় নি। আমি শেষ এদের বাসা দেখেছি গুড়িয়ার কাছে, নতুন দিয়াড়াতে হাই-টেনশন বিদ্যুতের থামের ব্র্যাকেটের উপর (1964, 21-3-76 এবং 19-12-76)। ডিম পাড়ে 2 থেকে 4টি, সাধারণত 3টি ছিটছোপহীন সাদা। ডিমের গড় মাপ 69·7 × 55·1 মিমি।

মাছমৌরল

1982 সকালে দৈনিক আজকালে কলকাতার চিত্তরঞ্জন রায় এবং দার্জিলিঙের অশোককুমার সরকার মহাশয়দের লেখা চিঠি দুটি পড়ে খুবই ভাল লেগেছিল। আমাদের দেশে কিছু পাখির নাম এক-এক জায়গার অধিবাসীরা এক-এক রকম করে থাকে।



চি 104. মাছমৌরল

তাঁদের দেখা পাখিটির আসল নাম— মাছমৌরল, কুড়ারি, উৎক্রোশ (পানডিয়ন হালিয়াইটাস), ইংরেজি— *অসপ্রে*, হিন্দি— *মছলিমার*। লম্বায় 56-59 সেমি (22-24 ইঞ্চি)।

এটি পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, বিহার, ওড়িশা ইত্যাদি হিমালয়ের নিম্নাংশ প্রদেশের পাখি নয়। ভারতের বাইরে থেকে সেপ্টেম্বর মাসে আসতে শুরু করে। থাকে মার্চ কি তারও কিছু পর পর্যন্ত। দেখা যায় সমগ্র ভারতেই। কিছু পাখি স্থায়ী ভাবে বাসা বেঁধেছে লাডাখ, কাশ্মীর, গাড়োয়াল ও কুমায়ুনে 2000 থেকে 3300 মিঃ উচ্চতার মধ্যে এবং আসামের কাছাড় প্রদেশে।

প্রয়াত পক্ষিপ্রেমিক প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত মহাশয় ও আমি একবারই বাসা বাঁধতে দেখেছি শিবপুরের বোটানিকসে গঙ্গার ধারে একটা নেড়া গাছে। কিন্তু তার প্রজননকালীন চেহারা, দেখিনি, দেখেছি পরিযায়ী হয়ে আসার রং কালচে-ধূসর। প্রজননকালীন চেহারা পেয়েছিল কিনা এবং ডিম পেড়ে বাচ্চা তুলেছিল কিনা জানি না। ইচ্ছে থাকলেও আর সুযোগ হয় নি।

নদী, জলা, বিল, খাঁড়ি ইত্যাদির ধারে বা ভিতরে উঁচু নেড়া গাছে বা জলের মধ্যে পোঁতা বাঁশের উপর, অথবা পাথরের ঢিবির উপর বসে জলে ঝাঁপিয়ে শিকার ধরলেও সেটা তখনকার মত আবাস হতে পারে বটে কিন্তু পাকাপাকি ভাবে নয়। আমরা যেমন চেঞ্জে গিয়ে কিছুদিনের জন্যে বাসা ভাড়া করে থাকি সেই রকম আর কি। যেখানে ওরা বসে সেই জায়গাটা ওদের পুরীষ ত্যাগে চুনের মত সাদা ছোপে ভরে যায়।

বাসস্থান— উইরোপের স্কটল্যান্ড ও ল্যাপল্যান্ড থেকে পুবে কামচাটকা ও জাপান, দক্ষিণে স্পেন, উত্তর আফ্রিকা, ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপসমূহ, গ্রীস, লোহিত সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল, দক্ষিণ আরব এবং দক্ষিণ চীনে। শীতে পরিযায়ী হয় দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, বর্মা, থাইদেশ, মালয়েশিয়া, ফিলিপিন ও সুন্দা দ্বীপপুঞ্জে।

বাসা বাঁধে বেশ বড় করে কাঠি ও শুকনো সবু গাছের ডাল দিয়ে, যার ব্যাস 138 সেমি এবং প্রায় ততটাই গভীর। বাসাটা হয় জলের ধারে বা মাঝে, প্রায় নেড়া গাছে 12-14 মি. উঁচুতে। ডিম পাড়ে হলদেটে-সাদা রঙের 2-3টি, কখনও বা 4টি।

স্বভাব— বেশির ভাগ সময় দেখা যায় একা বসে আছে জলের ধারের বা ভিতরের মরা গাছে, অথবা জলের ভিতর থেকে উঠে থাকা উঁচু পাথরের উপর। সেখান থেকে উড়ে জলের উপর 20 থেকে 30 মি. উচ্চতায় চক্রাকারে আস্তে আস্তে পাখা ঝাপটিয়ে চলে, যেমন ভাবে ওড়ে চিল। মাঝে মাঝে পাখা ঝাপটান বন্ধ করে চিলের মত ভাসে। ওইভাবে নেমে এসে শিকার খুঁজে উড়ে উপরে উঠে চলে যায়। মাঝে মাঝে দ্রুত ডানা নাড়িয়ে গলা বাড়িয়ে জলের উপর স্থির হয়ে ভেসে থেকে, নিচে জলের উপর কোন মাছ ভেসে উঠছে বা নড়ছে কিনা তা দেখে। ঠিক যেমন ভাবে দেখে সাদা-কালো ফটকা বা কড়ি কাটা মাছরাঙা (পায়েড কিংফিশার)। এই সময় তার পা দুটো ঝুলন্ত থাকে। সুবিধে বুঝে অর্থাৎ শিকার দেখতে পেলে ডানা মুড়ে মাথা নিচু করে ডাইভ দিয়ে ঝপাৎ করে জলের উপর পড়ে। নখরওয়ালা থাবা যার নিচটা ছোট কাঁটায় ভরা. তাতে আঁকড়ে ধরার সুবিধে হয়, সেই থাবায় আঁকড়ে ধরা পিচ্ছিল চকচকে শিকারটি নিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে শরীরের জল ঝেড়ে উড়ে গিয়ে বসে নিজের বসার জায়গাটিতে। তারপর পা দিয়ে আঁকড়ে ধরে তীক্ষ্ণ বাঁকানো চঞ্চু দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।

খাদ্য— মাছই একমাত্র খাদ্য।

ডাকে— 'কাই কাই কাই' কিংবা ছোট শিসের মত শব্দ করে। পরিযায়ী হয়ে এসে ডাকে খুবই কম। যাঁরা শুনেছেন তাঁদের ভাগ্যবান বলব।

অশোকবাবু দেখেছিলেন, বড় মাছ ধরে কায়দা করতে না পারায় মাছ তাকে জলের তলায় নিয়ে মেরে ফেলেছে, তেমন দুর্ঘটনা তাদের জীবনে কখন-সখন ঘটে থাকে। আমি দেখেছি এক বড় কাতলাকে ধরে ডানা ঝাপটিয়ে টাগ-অফ-ওয়ার করতে করতে টেনে পাড়ে নিয়ে এসে মারতে।

নিজের বাসভূমিতে গায়ের রং— উপরাংশে গাঢ় পাটকিলের উপর সাদা ছিট, মাথায় নিম্নাংশে খুব ছোট ঝুঁটি। নিম্নাংশে ধবধবে সাদা, শুধু গলার নিচে বুকের উপরাংশে নেকলেসের মত পাটকিলে টানা টানা পটি। কালো একটা পটি চোখের পিছন দিয়ে নামে। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। স্ত্রী-পাখি আকারে বড়ো।

শকুন

আমার চারতলার বারান্দার পুবের অংশ থেকে 70-80 হাত দূরে তিনটি নারকেল গাছ। আমি বিছানায় শুয়ে প্রায়ই তাদের দিকে তাকিয়ে থাকি। মাঝের বড় গাছটার মাথার পাঁচটা ডাল সোজা উঠে গেছে। তার তলার ডালগুলি অন্যদের মত উপরের দিকে মুখ তুলতে পারে নি, বেঁকে ঝুলে আছে। কারণ সেই ডালগুলিতে বিরাট ভারদেহী কুৎসিত দর্শন গোটা পাঁচ-ছয় পাখি বসে বিশ্রাম করার ফলে, অন্যদের তুলনায় তাদের আর সতেজভাব নেই। মাথা নিচু করেই আছে। গত কদিন



চি 105. শকুন

পরেই পাখিগুলিকে আর দেখতে পাচ্ছি না। কোথায় গেল ? পশ্চিমবঙ্গের কোন অংশে ?

পশ্চিমবঙ্গ আজ খরায় কবলিত। বিষাক্ত বায়ুকে ঐ পাখির পাল্লা আর বড়ো বাঁকানো চঞ্চুই দূষণমুক্ত করে এসেছে। দুর্যোধনের মামার নামে এই কলিযুগে যাদের দেখি, ঘৃণা করি, অশুচি বলি এবং কুসংস্কারে অমঙ্গলের আশঙ্কা করি, সত্যিই কি তারা তাই ? যদিও দেখতে খুব খারাপ। উপরের পালক গাঢ় পাটকিলে-কালো, মাথা, গলা নেড়া, কালচে চামড়ার উপর ছোট সরু সরু লোমের মত পাটকিলে পালক। গলার শেষে ঘাড়ে সাদা সরু পালক ফোলা ফোলা। লেজের উপরে বস্তিপ্রদেশ জুড়ে অনেকখানি অংশ সাদা। বুক, পেট পাটকিলে কালোর উপর খুব সরু লম্বালম্বি সাদার টান। ডানার তলা, উপরের বুকের দু'ধার এবং উরুর পালক সাদা। কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু গাঢ় সীসে, উপর দিকটা সাদাটে, চঞ্চুর প্রান্তে মোমের মত অনাবৃত ঝিল্লী চকচকে শিঙে-কালো। পা ও আঙুল সবজেটে-সীসে, প্রায় কালোই। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

এরা শকুন, **শকুনি** (জাইপস্ বেঙ্গলেনসিস), ইংরেজি— *হোয়াইট ব্যাকড্ ভ্যালচার*, হিন্দি— *গিধ*। লম্বায় 90 সেমি।

বাসস্থান— পাকিস্তানের বেলুচিস্তান থেকে পুবে হিমালয়ের দেড় থেকে আড়াই হাজার মিটার উচ্চতা ধরে নেপাল, আসাম, মণিপুর পর্যন্ত, দক্ষিণে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা অর্থাৎ উপদ্বীপাত্মক ভারতে সর্বত্র। শ্রীলঙ্কায় নেই। ভারতের বাইরে বর্মা থেকে ইউনান, দক্ষিণে শ্যামদেশ, দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও মালয়েশিয়া।

খাদ্য— মৃত ও গলিত মাংস।

স্বভাব— শকুনকে সাধারণত ছোট দলেই দেখা যায়। অনেকসময় সেই দলে অন্য শকুনও জোটে। যেমন পশ্চিমবঙ্গে দেখেছি গো-ভাগাড়ে, নিত্য দেখা শকুনের সঙ্গে পালকহীন মাথা ও লম্বা গলা, লম্বা চঞ্চু, আকারে বড় (92 সেমি), হালকা থেকে গাঢ় পাটকিলে উপরটা, তলা প্রায় বালির মত হালকা পাটকিলের **'লম্বা চঞ্চু শকুন'** (লংবিলড্ ভালচার, জাইপস্ ইন্ডিকাস) এবং গাঢ় হলদেটে লাল গলা ও মাথা কালো, লম্বায় 84 সেমির **'রাজশকুন'** (কিং ভালচার, টরগন কালভাস)। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিহার, দক্ষিণ ও মধ্যভারতে দেখেছি এদের সঙ্গে ছোট আকারের (61 সেমি) গিন্নি বা **'শ্বেতশকুন-কে'** (স্ক্যাভেনজার ভালচার, নিওফ্রন পের্কনোপটেরাস)।

কাছ থেকে শকুন দেখতে অতি কুৎসিত হলেও আকাশে যখন দুই ডানা না নেড়ে মেলে দিয়ে

ভাসমান, তখন সেই ওড়ার মধ্যে ফুটে ওঠে একটা স্বাভাবিক মাধুর্য ও প্লবতার মধ্যে প্রাণবন্ত ভাব। গাঁয়ের ধারে দেখা যায় খাদ্যান্বেষণে, কখনওবা খেয়ালের বশেই বহু উঁচুতে উঠে উড়ে চলেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, মাইলের পর মাইল।

দৃষ্টিশক্তি খুবই তীক্ষ্ণ। তবে সাধারণ লোকের যা বিশ্বাস— শূন্যে ভাসমান বিন্দুসম শকুন নিচে মৃত জন্তু দেখতে পায়, তা কিন্তু মনে হয় না। একবার চব্বিশ পরগণার বারাসতের কাছে ছোট জাগুলিয়ায় দেখেছিলাম, বৈশাখের ভরদুপুরে খাঁ খাঁ রোদে এবড়ো-খেবড়ো শুকনো ধানজমির মধ্যে দিয়ে আসছিল একটা মড়াখেকো চেহারার গরু। হঠাৎ সেটা পড়ে মরে গেল।

দূরে একটা উঁচু তালগাছের মাথায় বসেছিল দুটো শকুন। তারা উড়ে আসতে লাগল। তারও উপরে উড়ছিল আরও কয়েকটা। এদেরও উপরে উড়েছিল বিন্দুসম কয়েকটা। বিন্দুসমরা তার নিচের স্তরের শকুনদের নামতে দেখে হুহু করে নেমে আসতে লাগল। এক স্তরের শকুন অন্য স্তরের আচরণ লক্ষ্য করেই নেমে এসেছে বলে মনে হয়েছে। কিছু কাক ও চিল এসে জুটল। সবশুদ্ধ দল হল 50-55-র, তার মধ্যে শকুন হল 30-35, বাকি কাক-চিল। খাচ্ছে, ঝগড়া করছে, আওয়াজ করছে কিক কিক্ কখনও ধাতব, কখনও হাসির মত কাকাকাকা। একঘণ্টাও হয় নি, দেখলাম গরুটার শুধু সাদা হাড়ের কঙ্কাল পড়ে আছে। শকুনরা এত খেয়েছে যে উড়তে পারছে না, কোনরকমে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে সরে যাচ্ছে।

প্রজননকাল— অক্টোবর থেকে মার্চ। গাঁয়ের ধারে বা ভিতরে, রাস্তা অথবা খালের ধারে উঁচু বট, পিপুল, আম, শিশু ইত্যাদি গাছে বাসা বাঁধে 10-18 মি. উচুতে কাঠি এবং পাতাসহ গাছের সরু ডাল দিয়ে। মাঝখানে খোঁদলে সবুজ পাতা বিছায়। ডিম পাড়ে সাধারণত একটি, ক্বচিৎ দুটি মোটা খোলার অমসৃণ সাদা ডিম। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে প্রায় 45 দিন লাগে।

গিন্নি শকুন

1965 সালে একবার পণ্ডিচেরী গিয়েছিলাম কয়েকজনের সঙ্গে। পথে মাদ্রাজে নেমে প্রায় 55 কিমি. দূরে গিয়েছিলাম থিরুকালিকুণ্ড্রম বলে একটা জায়গায়, পাহাড়ের উপরে মন্দিরে। একেই পক্ষিতীর্থ বলে। প্রতিদিন নাকি বেলা এগারোটা থেকে বারটার মধ্যে দুটি পাখি কাশী থেকে প্রসাদ খেতে আসে এবং খেয়ে ফিরে চলে যায় সেই কাশীতে।

দেখলাম পাহাড়ের উপর এক নির্দিষ্টস্থানে মন্দিরের কোন পুরোহিত থালায় করে এনেছেন কয়েকটা সাদা গোল ডেলা। অনেক কাকুতি-মিনতির পর একটা হাতে নিয়ে দেখলাম ভাত, ময়দা, ঘি আর চিনি দিয়ে তৈরি প্রতিটি ছোট ডেলা। শুনলাম যে পাখি দুটি আসবে তারা নাকি অমর। বহু যুগ ধরেই এরা আসছে। নানা কিংবদন্তি আর গল্পগাথা শুনছি আর ভাবছি, অমরত্ব লাভ করা কোন জাতের পাখি যে এই অদ্ভুত ভোজ্যবস্তু খেতে আসবে! বেলা 'সওয়া এগারটার সময় দেখা গেল উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে ঈগলের চেয়ে ছোট প্রায় চিলের মতই দুটি পাখি উড়ে আসছে। হু হু করে এসে তারা নামল থালা থেকে হাত-পাঁচেক দূরে। ও হরি! এ যে আমার অত্যন্ত চেনা


চি 106. গিন্নি শকুন

পাখি। গিরিডিতে হাটের পাশে ডাঁইকরা জঞ্জালের উপরে-পাশে কত দেখেছি। এ ত গিন্নি শকুন, গৃধিনী, শ্বেত-শকুন (নিওফ্রন পেবক্নো পটেরাস), ইংরেজি— *স্ক্যাভেঞ্জার ভালচার।*

আশ্চর্য হলাম ঐ অদ্ভুত খাদ্য তাদের বেমালুম খেতে দেখে। ওটা ওদের খাদ্যই নয়। খাদ্য পচা-গলা মাংস, নাড়ীভুঁড়ি, আবর্জনা, অত্যাধিক পরিমাণে মল, ব্যাঙ, বড়ো ঘেসোজমির ঝিঁ ঝিঁ পোকা ও উড়ন্ত পিঁপড়ে। সত্যিই কি এরা প্রতিদিন কাশী থেকে উড়ে আসে? প্রায় 1300 কিমি. পথ যে, আবার ফিরেও যায় অতদূর! অথচ মাদ্রাজের অতি সাধারণ পাখি। কিন্তু কেন শুধু দুটি পাখিই রোজ আসে। খাদ্যান্বেষণে আরও ত সংখ্যায় আসতে পারত। সেটাই ছিল স্বাভাবিক। এই উৎসর্গীকৃত ভোগ খেতে নিদেন পক্ষে তিনটিও ত আসতে পারত। গিন্নি শকুনরা ত অমর নয়। তবে কি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এদের বদল করা হচ্ছে এবং সেটা কোন্ উপায়ে? খাদ্যে কি আফিম মেশান থাকে? ওদের দেখে এইসবই মনে হয়েছিল। আজও কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাই নি। পরে জেনেছিলাম, বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এই বিষয়ে অনুসন্ধান চালাবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু মন্দিরের পুরোহিতরা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিরা করতে দেন নি।

পূর্ণ বয়স্ক গিন্নি শকুন বা গৃধিনীর ডানার ওড়ার পালক কালো, বাকি দেহ ময়লাটে-সাদা। মাথা, মুখ ও ঘাড়ের সামনের অংশ হলুদ চামড়ার। কীলকাকার লেজ, ডগার সব পালক কালো। চঞ্চু হলদে, কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে কখনও বা হলুদ, পা ও আঙুল ধূসরাভ-হলুদ, নখর ফিকে কালো। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান— উত্তর-পশ্চিম ভারত, বাংলাদেশ ও আসাম ছাড়া হিমালয়ের দু-হাজার কিমি. উচ্চতা ধরে নেপাল, দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা, পুবে বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশে।

গিন্নি শকুনকে মানুষের বসবাসের কাছে তা শহর, গ্রাম যাই হক না কেন, এমনকি বেদেদের বা তীর্থযাত্রীদের ঝোপড়ি বা তাঁবুর ধারে দেখা যাবে, আবর্জনা মল বা জীবজন্তুর মাংসের ফেলে দেওয়া পচাগলা অংশ মহানন্দে খেতে। বসে থাকবে মাটির ঢিপি, ভাঙা পোড়ো বাড়ি ইত্যাদির উপর। খাবার সন্ধানে মাটিতে চলাফেরা করে হাঁসের মত গলাটা বাড়িয়ে হেলেদুলে। ওড়ে স্বাভাবিক একটা মাধুর্যে স্বচ্ছন্দ-গতিতে। ডানা দুটি দেহের সঙ্গে এক সমতলে ছড়িয়ে দিয়ে বহু সময় ধরে ধীরে ধীরে ভেসে চলে। ক্বচিৎ খুব উঁচুতে উঠে ওড়ে।

এরা একদম সঙ্ঘচারী নয়। একসঙ্গে দেখা যায় দুটি বা তিনটিকে, তবে যেখানে ওদের খাদ্য প্রচুর সেখানে সংখ্যায় অনেকগুলিকে দেখা যায়। প্রায়ই দেখা যায় সেইরকম জায়গায়, যেখানে

চিল, কাক ও অন্যান্য শকুনদের সঙ্গে এরাও ভাগীদার। যেটা ঘটে কোন বড় মৃত জন্তুকে ঘিরে বা মিউনিসিপ্যালিটির আবর্জনার স্তূপের উপর। অন্যান্য শকুনদের মত এরা কিন্তু কখনই গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বার করে না, একদম চুপচাপ।

প্রজননকাল— ফেব্রুয়ারি থেকে মে হলেও মার্চ-এপ্রিলই প্রধান সময়। বাসা বাঁধে পুরানো পোড়ো বাড়ির কার্নিসে, পরিত্যক্ত ও ভাঙ্গা মসজিদ, কবরস্থান, কেল্লা, কখনও বা বট, পিপুল ইত্যাদি গাছে 4 থেকে 6 মিটার উঁচুতে। বাসা অত্যন্ত নোংরা এলোমেলো। উপকরণ, শুকনো গাছের সরু ডাল, ভেতরে লাইনিং দেয় ছেঁড়া ময়লা নেকড়া, চুলের জটা, জন্তুর চামড়া ইত্যাদি আবর্জনা, কখনও বা স্তন্যপায়ী জন্তুর মল বা বিষ্ঠা দিয়ে। মাঝে মাঝে ঈগলের পরিত্যক্ত বাসাতেও বাসা বেঁধে থাকে। ডিম পাড়ে 2টি। বিশ্রী কদাকার স্বভাব হলে কি হবে ডিম দেখতে বড় সুন্দর। রং সাদা থেকে ফিকে ইট-লাল, তার উপর লালচে-পাটকিলে বা কালোর ছোপ। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই ঘরগেরস্তালির সব কাজ করে। আনুমানিক 42 দিনে ডিম ফোটে।

রাজ শকুন

পার্ক সার্কাসে শিশু হাসপাতালের পিছনে খানিকটা পড়ো জমি, তারপরেই 4নং পুল ওঠার পাকা রাস্তা। একদিন সকালে দেখি ওই পড়ো জমিটাতে একটা মরা গরু পড়ে আছে। তাকে ঘিরে বেশ কয়েকটা শকুন তার মাংস খুবলে নিয়ে খাচ্ছে। তাদের মধ্যে আর একটি অন্য পাখি এসে চুপচাপ জুটেছে। সে-ও খুব সন্তর্পণে গুটি গুটি এসে গরুটার গা থেকে মাংস তুলে নিয়ে খাচ্ছে। এই শকুনটা আমাদের সাধারণ শকুনের মতো দেখতে নয়, সম্পূর্ণ আলাদা। দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি। বেশ বড়ো কালো দেহ, পালকহীন গাঢ় হলদেটে- লাল উন্মুক্ত ঘাড় ও মাথা, পা ও উরুও তাই। গলার তলায় ও উপরের উরুতে সাদা ছোপ। আর-একটা ওই কালো পাখি উড়ে আসছে। লাল মাথা, বুক ও উরুতে সাদা ছোপ নিয়ে। দেখি ছড়ানো ডানার তলায় সরু একটা সাদা পটি। ডানা সরু, যদিও ওড়ার কয়েকটা পালক ছড়ানো ও উপরে একটু তোলা। বেশ বড়ো V-এর আকার। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। কনীনিকা হয় হলদে, না হয় হলদেটে-পাটকিলে বা টকটকে লাল। চঞ্চু গাঢ় পাটকিলে, তলার চঞ্চুর গোড়াটা হলদেটে। চঞ্চুর প্রান্তে অনাবৃত ঝিল্লী, মাথা ও গলার মাংসল উপাঙ্গ চামড়া গাঢ় হলদেটে-লাল, পা মাংসল থেকে ফিকে লাল।

এই পাখি কর্ণগৃধ্র গণের টারগাস— *এক প্রজাতি*। নাম— রাজ শকুন, কালো শকুন (টারগোস কাল ভাস)। হিন্দি— *রাজগিধ*, ইংরেজি— *কিং ভালচার, ব্ল্যাক ভালচার।* লম্বায় 84 সেমি. (33 ইঞ্চি)।

বাসস্থান— সারা ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল হিমালয়ে 2000 মি. উচ্চতার মধ্যে। শ্রীলঙ্কায় দেখা যায় না। এমনকি কোথাও খুব বড়ো দলেও দেখা যায় না। সবখানেই ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায়। খোলামেলা গাঁয়ের ধারে লোকবসতির কাছে-পিঠে দেখা যায়। ভারতের বাইরে বর্মা, থাইদেশ, মালয় উপদ্বীপ, দক্ষিণ ভিয়েতনামে।

খাদ্য— পুরোপুরি মৃত মাংসভোজী। খাদ্য সংগ্রহ করতে অন্যান্য শকুনদের সঙ্গেই দেখা যায়। মৃতদেহ সাফ বেশ দ্রুতগতিতেই সারে, যার ফলে গ্রাম বসতির ভিতর কোনো রোগ ছড়াতে পারে না।

স্বভাব— অন্যান্য শকুনদের মতো এরা বড়ো দলে ঘোরাফেরা করে না। এমনকি মৃতদেহ ভোজের সময়ও অন্যান্য শকুনদের সঙ্গে একটি বা দুটিকে ছাড়া দেখা যায় না। খুব কম সময়েই 20-30 এর জমায়েত দেখা যায়। রাজ নামটা এসেছে এদের সাহস, অন্যান্য শকুনদের মধ্যে এদের ঝগড়াটে স্বভাবের জন্যে এবং শবদেহতে একাধিপত্য বিস্তার করে পছন্দসই খাদ্য সংগ্রহ করার জন্যে। কিন্তু আসলে দেখা যায় রাস্তার ধারে মৃত জন্তুর উপর এঁদের আধিপত্য প্রায় না থাকার মধ্যে। আস্তে আস্তে কোনো মতে এসে এক-আধ টুকরো ভয়ে ভয়ে ছিঁড়ে নিয়ে খাওয়া। অন্যান্যরা চাপাচাপি করলে তক্ষুণি সরে যায়। দেহে বেশ ক্ষমতা ধরে। দেখা যায় খুব ভরপেট খেলেও স্রেফ ডানার জোরে মাটি ছেড়ে উপরে উঠে পড়ে।

একটা ভাঙা গলায় কর্কশ আওয়াজ করে। এটা শোনা যায় মৃত মাংস নিয়ে টানা-হেঁচড়ার সময়। প্রজননের সময়ও এই আওয়াজ শোনা যায়।

প্রজননকাল— ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল। সমতলে আগের দিকে, হিমালয় অঞ্চলে বেশি দেখা যায় ফেব্রুয়ারি-মার্চেই। বাসা বানায় কাঠি-কঞ্চি দিয়ে বেশ বড়ো প্ল্যাটফর্ম আকারে, অগোছালোভাবে লাইনিং দেয় খড় ও পাতার। এই বাসা অনেক ঈগলদের চেয়ে বেশ ছোটো এবং স্থূলও কম। পিপুল বা আমগাছে 9 থেকে 12 মিটার উপরে বাসা বানায়। এই বাসা অনেক সময় দেখা যায় গাঁয়ের বেশ ধারে। আধা-মরুভূমি. অঞ্চলে বাসা দেখা যায় ছোটো সাঁই বা শমী গাছে 2-3 মিটার উঁচুতে। একই গাছে একই জায়গায় বছরের পর বছর বাসা বাঁধে। ডিম পাড়ে একটি গোলাকার সাদা। তা' দিতে দিতে কিছুটা রং মলিন হয়। ডিমের গড় মাপ 89˙9 × 66˙0 মিমি.। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই বাসা বাঁধা, তা' দেওয়া, সন্তান প্রতিপালনে পরস্পরকে সাহায্য করে। প্রায় 45 দিনে ডিম ফুটে বাচ্চা বার হয়।

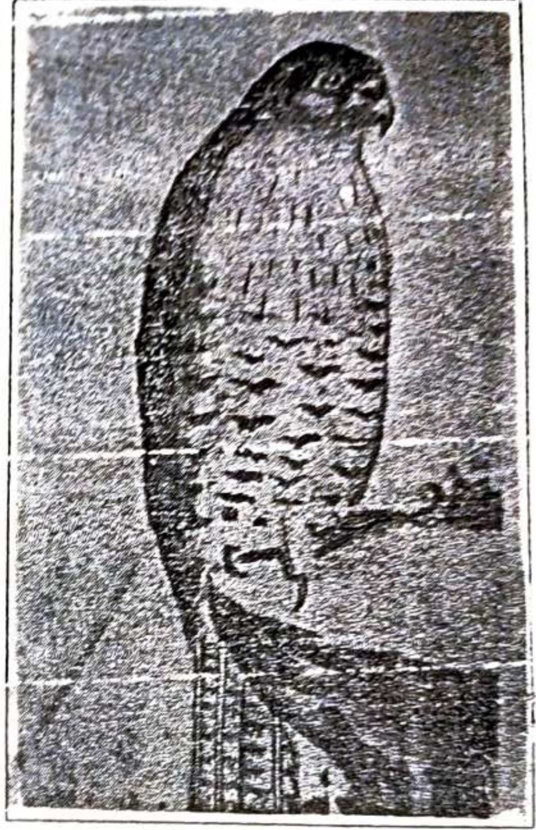
শ্যেন বংশ

তুরুমতি (Red headed falcon)

এটিকেও চারু শেখ এনে দিয়েছিল কার্তিক বসুকে। ধরে ছিল আমগাছের উপর ওর বাসা থেকে। পুরোনো পরিত্যক্ত এক কাকের বাসায় এসে রাত্রিবাস করছিল। জিজ্ঞেস করি, পাড়ার সময় ডিমটিম পেলে নাকি ? জবাব পাই, না বাবু। এরা ডিম পাড়ে সেই শীতকালে। এখন তো গরম বোশেখ-জষ্ঠি। এখন পাড়ে অন্য পাখিরা। চারুর কাছে আরও খবর পেলাম, মাঝে মাঝে ঘন পাতার তালগাছেও বাসা বাঁধে এবং জোড়ায় শিকার করে। বললাম, নরটাকেও জোগাড় কর। দেখি এদের জোড়ায় শিকার কেমন। চারুর ততদিনে আমাদের উপর আস্থা এসেছে, যে আমরাও বুনো জংলি

পাখিকে পোষ মানিয়ে শিকার ধরা শেখাতে পারি।

আমাদের সঙ্গে বার-কয়েক চারু-সতীশ-এরা শিকার ধরা দেখতেও গেছে। পাখি দেখে কার্তিকদার বড়দা হিতেনদা বললেন, সামন্তযুগীয় ইওরোপে লর্ড, ব্যারণ, ডিউক এইসব বাড়ির মেয়েরা এই পাখিদের দিয়ে শিকার করাতেন। এক পুরোনো বাঁধান ইংরেজি শিকারের ম্যাগাজিন দিয়ে বললেন, এর মধ্যে এই পাখির উপর লেখা আছে। তাতে অনেক ছবি এবং লেখায় পড়লাম এটা 'লেডিজ বার্ড'। এটা সেই সময়কার বড়লোক মেয়েদের একটা স্পোর্ট ছিল। ছবিতে মেয়েদের হাতে এই পাখি। সঙ্গে ভৃত্য আছে। মনে হয় তাদের হাতেই থাকত, শিকারের আগের মুহূর্তে এইসব মহিলারা নিজেদের হাতে নিতেন।



চি 107. তুরুমতি

যে সময়ের কথা বলছি তার দিন সাতেকও পার হয়নি, চারু নর পাখিটাকেও ধরে এনে দিয়েছিল। কার্তিকদা অক্লান্ত অধ্যবসায় ও ধৈর্যর মধ্যে দিয়ে জোড়াটাকেও উপযুক্ত করে তুলেছিলেন। কি ক্রিকেট, কি বাজপাখি দুয়েতেই নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ দক্ষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো ফাঁক রাখতেন না। মাঝে মাঝে বিরক্তি প্রকাশক করে বলেছি— এইটুকুনের জন্যে কি এসে যাবে! বলতেন, তুই জানিস না, গলদ রয়ে গেলে পরে সেটাই বড়ো ফাঁক হয়ে যাবে, আর কোনওরকমে সারানো যাবে না।

চারুর দেওয়া পাখি দুটো ছিল শ্যেন বর্গের অন্তর্গত শ্যেন বংশের (ফালকনিদি) এক *প্রজাতি*। নাম— তুরুমতি (স্ত্রী), চেতওয়া (পুরুষ) (ফালকো চিকারা), ইংরেজি— *রেড হেডেড মার্লিন*। তেলেগু— *জেল্লাগান্টা, জেল্লাগড্ডা*। লম্বায় 31-36 সেমি. (12-14 ইঞ্চি)।

চাঁদি, ঘাড়, মাথার দু'পাশ এবং গালপাট্টা লালচে-বাদামী, বাকি উপরাংশ ছাই বা নীলচে-ধূসর, ডানার পালক কালচে। লেজ ধূসর, তার উপর সরু সরু কালো পটি এবং একদম শেষের পটিটা চওড়া কালো। এরপর একদম ডগাটা সাদা। নিম্নাংশ সাদা, বুকে এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্ত আঁকাবাঁকা ডোরা, বুকের দু'পাশ ও তলপেটে লম্বা টুকরো টুকরো টান। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে, তবে স্ত্রী আকারে সামান্য বড়ো। কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু গাঢ় শীসে, ডগাটা কালো, গোড়াটা সবজেটে-হলুদ। নাকের উপর অনাবৃত ঝিল্লী হলুদ, পা ও আঙুল হলুদ, নখর কালো।

অপ্রাপ্তবয়স্কদের বুকে লম্বা লম্বা টান অনেক বেশি, প্রায় পুরোটাই। মাথায় লালচে-বাদামীতে লালচের ভাব বেশি, তার উপর কালো টান, গলা ও বুকে কালো টানটাও বেশি বেশি।

বাসস্থান— পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, সিন্ধুপ্রদেশ থেকে পুবে রাজস্থান, গাঙ্গেয় উপত্যকা থেকে

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বাংলাদেশ, দক্ষিণে উপদ্বীপাত্মক ভারতে কেরালা, মাদ্রাজ পর্যন্ত। শ্রীলঙ্কায় নেই। কোনো কোনো সময়ে শীতকালে দেখা যায় যে, কিছুটা স্থানান্তরে যাতায়াত করছে। দেখা যায় ঝরে পড়া পাতার গাছের সমতল ভূমি, মালভূমি, এবং খুব নিচু পাহাড়ের পাদদেশে, যেখানে ছড়ানো-ছিটনো গাছপালা, খামার ও গ্রাম। জঙ্গল একদম এড়িয়ে চলে।

খাদ্য— প্রধানত ছোটো ছোটো পাখি, যেমন চড়াই, খঞ্জন, তুলিকা, গেরী, জিরিয়া (রিং প্লোভার), টুট-রাশি (জাঙ্গল রেণ-ওয়ার্বলার) ইত্যাদি, এছাড়া নেংটি ইঁদুর ও চামচিকা। আমরা শালিক, গোশালিক, গাং শালিক, বটের ও তিলেঘুঘু ধরিয়েছি। ডাকে তীক্ষ্ণস্বরে ঝগড়াটে গলায়, যখন কেউ ওদের, বাসার কাছে আসে যেমন কাক, চিল। আরেকটা সমানে ডাকে— 'টিরি-রি রি রি টিরি রি রি করে। পোষা অবস্থায় মালিকের সাড়া বা দেখা পেলে কি রকম একটা আদর খাবার ন্যাকামির 'কুঁই-কুঁই' আওয়াজ করতে থাকে। এই জন্যেই বোধহয় সামন্তযুগীয় মহিলাদের খুব প্রিয় ছিল।

প্রকৃতির মাঝেও তুরুমতি ও চেতওয়া জোড়ায় শিকার করে এবং শিকার করা জিনিস জোড়ায় ভাগাভাগি করে খায়। শিক্ষা দেওয়ার পর থ্রো-পদ্ধতিতে তুরুমতিকে শালিকের দিকে ছেড়েছি, সে অতিদ্রুত শালিককে অনুসরণ করে চলেছে মাটি ঘেঁষে, আর চেতওয়া তাই দেখে হাত থেকে উড়ে উপর দিয়ে চলেছে। এই পিছনে ধাওয়াটা ঘন ঘন ডানা নেড়ে সোজা তীরের বেগে। শিকার ঝোপের মধ্যে আত্মগোপন করেছে। দু'জনের কেউই শিকারকে ছাড়বে না। চেতওয়া ঝোপের উপর চক্কর দিচ্ছে। নিচে তুরুমতি তখন ঝোপের মধ্যে ঢুকে ছোটবড়ো যে পাখিকে পাবে তাড়া করে বার করবেই। নিজের লক্ষ্য বস্তুকে পেলে তো কথাই নেই। এই ভাবে একবার বটেরও মেরেছে এবং যে শালিকের উপর ছেড়েছি তাকেও মেরেছে। জোড়ার শিকারে এই একটা সুবিধে।

আবার এও নজরে পড়েছে, একদল সাহেব শিকারী একবার বটের, বগেরি ইত্যাদি ছোটো পাখিদের মারতে ঝোপের মধ্যে স্রেফ গুলি চালিয়ে চলেছে। যে কটা পাখি নজরে পড়ছে সেগুলো তুলে তাদের সাইড ব্যাগে ভরছে। কোথায় গাছের মধ্যে বসেছিল এক তুরুমতি। কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে ঝাঁ করে এসে একটা বটের যেটা ওদের চোখ এড়িয়েছিল সেটাকে তুলে নিয়ে চলে গেল। গুলি ছুঁড়েছিল বটে শিকারীরা কিন্তু কেউই ওর গায়ে লাগাতে পারে নি। তুরুমতিটাকে সাবাশ জানিয়েছিলাম।

প্রজননকাল— সাধারণত জানুয়ারি থেকে মার্চ, কিন্তু দেখা গেছে মে পর্যন্ত গড়াতে। গাঁয়ের ধারে আম, বট, পিপুল গাছে 5 থেকে 10 মিটার উঁচুতে ঘন পাতার মধ্যে কাপ বা প্ল্যাটফর্ম বানায় কাঠি আর ছোটো সরু শুকনো গাছের ডাল দিয়ে। লাইনিং দেয় ঘাসের গোড়া দিয়ে। মাঝে মাঝে পরিত্যক্ত কাক ও চিলের বাসা একটু সারিয়ে-সুরিয়ে নিয়ে বাসা বানায়। ডিম পাড়ে 3-4টি, লম্বাটে আকারের ফিকে লালচে-সাদা, তার উপর খুব ঘন করে লালচে-পাটকিলের ছিট থাকে। বাসা বানান, বাসা সারান, ডিমে তা' দেওয়া, সন্তান প্রতিপালন সবই স্ত্রী-পুরুষ দুজনে মিলেমিশে করে। অবশ্য তা' দেওয়ার ব্যাপারে তুরুমতির ভূমিকাটাই মুখ্য। ডিম কতদিনে ফোটে তা এখনও জানা যায় নি। ডিমের

বহেরি (Peregrine)

10ই ডিসেম্বর 1944। ঠান্ডা আমেজসহ এক রবিবারের ঝলমলে শীতের সকাল। বাদা বা লবণ হ্রদে এসেছি। সেবারের মত এত পরিযায়ী পাখি খুব কমই দেখেছি। তার মধ্যে হাঁসই কত রকমের। ছোট লালশির (আনাস পেনেলোপ), ইংরেজি— উইজন এসেছিল সাইবেরিয়া ও তার কাছাকাছি জায়গা থেকে প্রচুর।

ফেরার সময় হওয়াতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে আস্তে আস্তে ফিরছি। ফিল্ড ডায়েরিতে নোট করছি, যাদের গত দু'বছর দেখিনি। কিছু আবার আঙুলে গোনার মত দেখেছি। পশ্চিম ও পূর্ব রণাঙ্গনের অবস্থা খুব জটিল।

একটা খোলের মুখে এসে পড়লাম। খানিকটা জল শুকিয়েছে, সেখানে কাদার উপর জলের ধারের বালুবাটান (স্পটেড ম্যাগপাইপার), গোত্রা (গ্রীনশ্যাঙ্ক), জৌরালি (ব্ল্যাকটেইলড গডউইট), কাদা খোঁচারা (ফ্যানটেইল স্নাইপ) খাদ্য সংগ্রহে ব্যস্ত। শর ও জলজ লম্বা ঘাসের আশেপাশে কারগব বা ডোমকুর (কুট), শরাল (হুইস্টলিং টিল) ও ছোট লালশিররা চরছে। হঠাৎ কাদার উপর পাখিরা সচকিত হয়ে উঠল। কারণটা বোঝার জন্যে উপরে তাকাতেই দেখলাম একটা পাখি গোলা পায়রার (রক পিজিয়ন) মত উড়ছে। কখনও ডানা বেঁকিয়ে বাঁক খাচ্ছে, আবার ডানার ঝাপট, আবার সোজা ভেসে চলেছে অর্ধবৃত্তাকারে পাক খেয়ে। পাখিটা আমার খুবই চেনা। ক্রিকেট খেলোয়াড় কার্তিক বসু এই পাখিকে শিখিয়ে-পড়িয়ে পায়রা, ঘুঘু, বক ইত্যাদি অনেক ধরেছেন। তাঁর সঙ্গী হয়ে এই পাখির শিকার ধরা খুব ভাল করে লক্ষ্য করেছি। মনে হত, হিমালয়ের স্বর্ণ ঈগল যদি আকাশের মহারাজা হয় তবে এ নিশ্চয়ই আকাশের যুবরাজ। এর রাজকীয় ভঙ্গিমা আমায় খুবই আকৃষ্ট করত।


চি 104. বহেরি

আমি উপর দিকে তাকিয়ে। পাখিটা বাঁক খাওয়াতে ওর রূপালি গলাও বুকের খানিকটা দেখতে পেলাম। এবার সে ছোঁ মারবে। কিন্তু ওর মধ্যে কোন তাড়া নেই। শুধু চক্কর দিচ্ছে, যেমন উড়োজাহাজ নামার আগে দেয়। কার উপর আঘাত হানবে বোধ হয় তারই পাঁয়তাড়া কষছে। তারপরেই কাঁধের পিছনে ডানাটা ঠেলে দিয়ে 45° কোণায় নেমে এল ঝড়ের গতিতে, আমার থেকে দশ-বার হাত দূর দিয়ে। বাতাস কাটার সাঁ-সাঁ আওয়াজ। পিছনের দুই নখর ঝুলিয়ে দিয়েছে। তড়িৎগতিতে চলেছে জৌরালি বালুবাটানদের ঝাঁকের মধ্যে। বাঁদিক-ডানদিক করছে। কাউকেই আঘাত করতে পারছে না। স্রেফ ফসকাচ্ছে।

মাটি থেকে হাতখানেক উপর দিয়ে উড়ে চলেছে। ডানদিকে বাঁক নিয়ে ঐ 45° কোণায় উপরে উঠে গেল। মুহূর্তের জন্যে মনে হয়েছিল ওর ব্যর্থতা। নিখুঁত সময়জ্ঞানের অপারগতা, যা এর আগে কখনও দেখিনি। পরমুহূর্তে বুঝলাম আমার ভুল। প্রথম থেকেই ওর নজর কাদার উপর পাখিদের দিকে ছিল না। স্রেফ ভান করে চলছিল।

ছোট লালশিররা জল ছেড়ে উড়ে পালাচ্ছে। বজ্রপাতের মত উপর থেকে সোজা নেমে এসে একটা ছোট লালশিরকে আঘাত করল পিছনের দুই নখর দিয়ে। একটা সশব্দে ফট আওয়াজ, বেশ কিছু ছোট-পালক ঝরে পড়ল জলের উপর।

ভাসতে ভাসতে দুই থাবায় আঁকড়ে ছোট লালশিরকে নিয়ে চলে গেল দূরে গাছের দিকে, তার প্রাতরাশের জন্য। এই শিকারজীবী পাখিটি শ্যেন বংশের (ফালকোনিদি) অন্তর্গত এক *প্রজাতি*, নাম— বহেরি, বাজ বউরি (ফালকো পেরেগ্রিনাস), পুং— বহেরি বাচা, ইংরেজি— *পেরিগ্রিন ফকন*। এই বংশে স্ত্রী-পাখিরাই আকারে বড় হয় এবং শিকারে পুরুষের থেকে পারঙ্গম বেশি। দেখতে এক হলেও পুরুষ আকারে ছোট, ইংরেজিতে— *টিয়েরসেল*' (tiercel) বলে।

বহেরি লম্বায় 40-48 সেমি.। দাঁড়কাকের চেয়ে বিশেষ বড় নয়। মাথা স্লেট-কালো, গালে গালপাট্টার মত, চোখের তলায় সাদার উপর কালো ছোপ। উপরাংশ ধূসরের উপর কালো টান। চওড়া কাঁধ, ডানা চওড়া থেকে সরু, ওড়ার পালক তৃতীয় পালকের চেয়ে লম্বায় বড়। বলিষ্ঠ কিন্তু ছিপছিপে বুলেটের মত দেহ। নিম্নাংশে চিবুক, গলা সাদা, তারপর লালচে-হলুদ মেশান সাদা, বুকের তলা থেকে তলপেটের নিচ পর্যন্ত খুব সরু সরু কালচে টান। ডানার তলাতেও কালো কালো টানে ভরা। লেজ ছোট, ছড়ান নয়। কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু নীলচে-স্লেট, তলার চঞ্চুর গোড়া হলদেটে, উপরের চঞ্চুর গোড়ায় মোমের মত অনাবৃত ঝিল্লী (cere) হলুদ। পা ও আঙুল মলিন সবজেটে-হলুদ, নখর কালো।

বাসস্থান— উত্তর এশিয়ার সাইবেরিয়া থেকে পুবে আনাডাইর এবং কামচাটকা। পরিযায়ী হয়ে আসে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর থেকে মার্চ-এপ্রিলে, বেলুচিস্তান থেকে পুবে আসাম, মণিপুর ও গিলগিট এবং কাশ্মীর থেকে। হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা, লাক্ষা ও মালডিভ দ্বীপপুঞ্জ এবং শ্রীলঙ্কার শুষ্ক অঞ্চল। জাপান, সুন্দা দ্বীপপুঞ্জ, মলাক্কা, নিউগিনি এবং মাঝে মাঝে উত্তর আফ্রিকাতেও পরিযায়ী হয়।

একাই শিকার করে, ক্বচিৎ দেখা যায় পুরুষের সঙ্গে জোড়ায়। সকাল এবং বিকেলের দিকেই শিকার করে। গোধূলির অনেক আগেই শিকার শেষ করে। দুপুর বেলাটা সাধারণত কাটায় কোন বড় গাছের ডালের ছায়ায়, যেখান থেকে তার ব্যক্তিগত খাদ্য-ভূমিকে নজর রাখতে পারে। কখনও বিশ্রাম নিতে দেখা যায় বালিভরা নদীর ধারে, গাছের উপর বা গাছ কাটার পর গুঁড়ির উপর বসতে। শিকার করে জলচারী পাখিই বেশি। আঘাত করে শূন্যে। উপর থেকে নেমে আসে প্রায় সোজাসুজি অসম্ভব গতিতে, ডানা শরীরের দু'পাশে চেপে সাঁ-সাঁ শব্দে এসে পিছনের নখর দিয়ে শিকারকে ফালাফালা করে দেয়। শিকার মাটিতে এসে পড়ে। বার কয়েক চক্কর দিয়ে পড়ে থাকা শিকারকে তুলে নিয়ে যায় তার বাছাই করা ডালে, সেখানে বসে প্রথমে পালককে তুলে ফেলে,

তারপর মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। অনেক সময় শিকারকে মাটিতে পড়ার সময় দেয় না, শূন্যেই বিদ্যুৎ গতিতে আঘাত করে তাকে থাবায় ধরে নিয়ে চলে যায়, যেমন দেখেছিলাম লবণ হ্রদে।

খাদ্য— জলচারী পাখি অর্থাৎ হাঁস, কারণ্ডব, জলমুরগী, টিট্টিভ, গুলিন্দা, জৌরালি, পায়রা, ঘুঘু, তিতির ইত্যাদি এবং ভোরে ওড়া বাদুড়।

পাঠান-মুঘল যুগ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বহেরিকে শিক্ষা দিয়ে শিকার, এই খেলা রাজা-বাদশা সকলে, এমনকি প্রত্যেক সামন্ত রাজ্যের সম্ভ্রান্তরাও খেলেছেন। সেই ঐতিহ্য এখনও কোথাও কোথাও আছে। শিকার করা হতো নানা জাতের বক, দীর্ঘজঙ্ঘ (Storks), সারস জাতীয় (Cranes), কালিজ জীবঞ্জীব (Pheasant) এবং নুকনা বা তুকদার (গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড)। এরা সবাই বহেরির চেয়ে আকারে বড়ো এবং ওজনেও বেশি। শিকার শিক্ষা দেবার নানা পদ্ধতি আছে, তারমধ্যে পারস্য দেশীয় পুস্তক 'বাজনামা-ই-নাসিরি' শ্রেষ্ঠ। ক্রিকেট খেলোয়াড় কার্তিক বসু তাঁর বহেরিকে সেই বইয়ের পদ্ধতি অনুসারেই শিক্ষা দিয়েছিলেন।

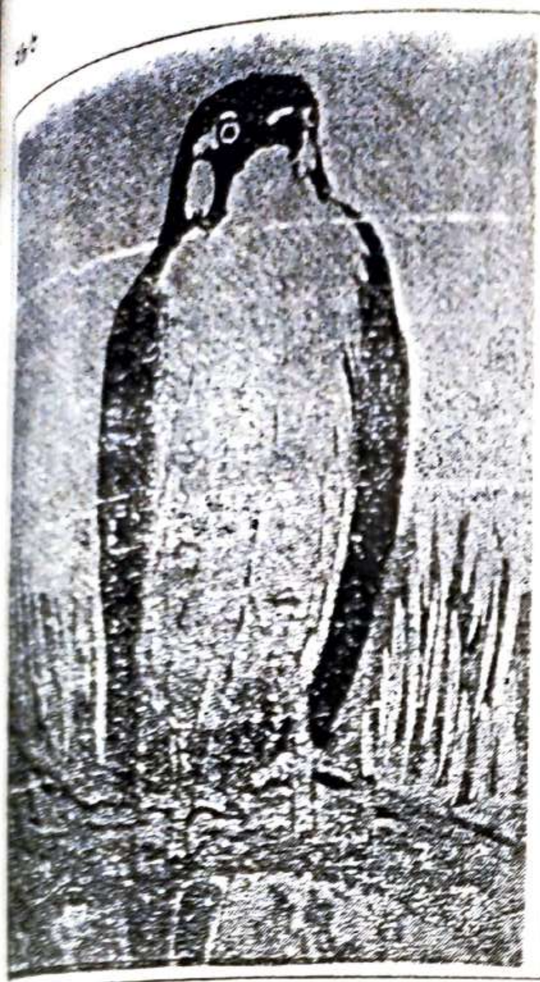
স্বভাব— বাসা বাঁধে মানুষের অগম্য স্থানে পাহাড়ের শিখর দেশে, খাঁজে কাঠকুটো দিয়ে সুন্দর করে গুছিয়ে পশম ও ঘাসের লাইনিং দিয়ে। প্রায়ই দেখা যায় ডিম পেড়েছে জমির উপরেই পাথরের খাঁজে, যার ধারে অল্পস্বল্প ঘাস আছে। ডিম পাড়ে 3-4টি, পাথুরে বা ময়লা ইট-রঙা তার উপর নানা ছাঁদের লালচে-পাটকিলের ছিট ও ছোপ। স্ত্রী-পাখিই ডিমে তা' দেয়। রোদের তাপ থেকে ডিমকে বাঁচাবার জন্যে বহেরি ডিমকে মাঝে রেখে দাঁড়িয়ে অর্ধেক পাখা ছড়িয়ে দিয়ে রোদকে আড়াল করে। ডিম ফোটে 25-27 দিনে।

লগ্গর (Loggor)

আছি ওড়িশার সিমলিপালের জঙ্গলের বড়োহপানিতে। তারিখ 16-5-84। বারান্দায় বসে জলপ্রপাতটার দিকে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ একজোড়া শ্যেন বংশের (ফালকোনিদি) পাখি এসে হাজির হল। বহুদিন বাদে দেখলাম। একসময় ক্রিকেটার কার্তিক বসু এদের শিক্ষা দিয়ে শিকার ধরাতেন। এদের বড়ভাই চেরাগ বা স্যাকার-এর (ফালকে বিয়ারমিকাস চেররাগ) মতো অত এক্সপার্ট এরা নয়। শিকার-খেলায় বাজ (গোশক) ও বহেরির (পেরিগ্রিন ফকন) পর চেরাগের স্থান। এদের স্থান তার নিচে। দূরবীন দিয়ে দেখছি। মনে পড়ছে নানা কথা। একজোড়া একবার বাসা বেঁধেছিল হোয়াইটওয়ে লেড-ল, বর্তমান USIS-এর উপরে ঘড়িটার পাশে আলসেতে। ময়দানে যখনই যেতাম, যাওয়া-আসার পথে আমরা ওদের লক্ষ্য করতাম।

ওরা যে চেরাগ নয় তা দূরবীনে লক্ষ্য করেই বুঝেছি। কারণ, এর লেজের মাঝের পালক পুরোপুরি পাটকিলে, চেরাগ হলে খানিকটা সাদা হত। আকারে যেটি বড়ো অর্থাৎ স্ত্রী-পাখিটি বংশীয় কায়দায় ডানার কাঁধ পিছন দিকে ঠেলে ঝড়ের বেগে গোঁত্তা খেয়ে আমাদের দৃষ্টিপথের বাইরে গিরিখাতের ভিতর নেমে গেল। পুরুষ তার পিছনে গেল, তবে অত বিদ্যুৎগতিতে নয়।

এরাও শ্যেন বর্গ ও বংশের *এক প্রজাতি*। নাম— স্ত্রী-লগ্গর, পুরুষ— জঙ্গর (ফালকো বিয়ারমিকাস



চি 109. লগ্গর

জগ্গর), ইংরেজি— লগ্গর ফকন। লম্বায় 43-46 সেমি. (17-18 ইঞ্চি)। উপরাংশ গাঢ় এবং ছাই-পাটকিলে। চাঁদি ও ঘাড় সাদাটে। কালো ছোপ চোখের সামনে ও তলা দিয়ে নেমে এসেছে ঠিক গালপাট্টা দাড়ির মত। নিচটা সাদা বা সাদাটে, তার উপর লম্বাটে পাটকিলে ফোঁটায় ভরা। বুকের দু'পাশ ও উরুতে ফোঁটাটা বেশি। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে, চঞ্চু নীলচে-স্লেট, নাকের উপর অনাবৃত ঝিল্লী হলুদ, পা ও আঙ্গুল হলদে, নখর কালো।

বাসস্থান— পাকিস্তান থেকে পূবে নেপাল, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মণিপুর, বাংলাদেশ, হিমালয়ের হাজার মিটার উচ্চতা থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা, যদিও দক্ষিণ ভারতে সর্বত্র নয় এবং শ্রীলঙ্কায় নেই; ভারতের বাইরে আফগানিস্তান, তুর্কিস্তানের উত্তরাংশ, তাসকেন্ট এবং দক্ষিণ তুর্কমেনিয়া।

খাদ্য— মেঠো ইঁদুর, চামচিকা, টিকটিকি, গিরগিটি, পাখিদের মধ্যে শালিক, ছাতারে, ফিঙে, বটের, তিতির ও পায়রা। এছাড়া ঘাসফড়িং ও পঙ্গপাল। সুযোগ পেলে গৃহপালিত মুরগির ছানা তুলে নিয়ে যায়। পোল্ট্রি-ফার্মের কাছাকাছি এদের আস্তানা গড়তে দেখা যায়। ডাকে তীক্ষ্ণস্বরে 'হুই-ই-ঈ'। অন্যসময়ের চেয়ে প্রজননকালে শোনা যায় বেশি।

স্বভাব— লগ্গর সাধারণত জোড়ায় থাকে। প্রতিটি জোড়ার বিচরণক্ষেত্র খুবই বড়। বসে থাকে গাছে বা মরা গাছের খুঁটির মাথায়। কাছেই চাষজমি বা মানুষের বসতি থাকাটাই পছন্দের। মানুষের বসতির কাছে কিন্তু পাতিকাকেরা খুবই বিরক্ত করে। কখনও কখনও দেখা যায় বড় শহরের জনবহুল এলাকার ভিতরে বাসা বাঁধতে। যেমন দেখেছিলাম হোয়াইটওয়ে লেড-ল'র ঘড়ির পাশে। শহরের ভিতর বাসা বাঁধার একমাত্র উদ্দেশ্য পোষা পায়রা শিকার করা। জোড়ায় ধাওয়া করে যখন শিকার ধরে তখন, দেখতে বেশ লাগে। শিকারের পর স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই শিকার বস্তুকে ভাগাভাগি করে খায়। আবার এও একসময় দেখেছি বটের, তিতির ইত্যাদি পাখিদের ঝোপের ভিতর থেকে হাঁকোয়া দিয়ে উড়িয়ে শিকারীদের গুলি ছোঁড়ার মুহূর্তে উড়ন্ত পাখিকে নিমেষের মধ্যে ছোঁ-মেরে নিয়ে যেতে। কিংবা গুলি খেয়ে পড়েছে শিকারী সেখানে পৌঁছবার আগেই এরা ছোঁ-মেরে নিয়ে গেছে। প্রজননকালে জোড়ায় আকাশের বুকে ওড়ার নানারকম কসরত দেখায়। তখন মাঝে মাঝে পোকামারার (কেস্ট্রেল) মত ডানা ঝাপটিয়ে শূন্যে স্থির হয়ে থাকে।

প্রজননকাল— জানুয়ারি থেকে এপ্রিল। 10-15মি. উঁচু পিপুল, বট বা আমগাছের মাথায় প্ল্যাটফর্ম আকারে বাসা বানায় সরু গাছের ডাল দিয়ে, লাইনিং দেয় খড় পাতা ইত্যাদির। কখনও বাসা

দেখা যায় পাহাড়ের খাড়াইয়ের খাঁজে, মন্দির, মসজিদ বা অট্টালিকার কার্নিসে। দেখা যায় যে গাছে বা যেখানে বাসা বেঁধেছে সেই গাছে বা তার কাছেপিঠে নীলকণ্ঠ, পায়রা, ঘুঘু ইত্যাদি পাখির, বাসা কিন্তু তাদের সেইসময় লগ্গর স্পর্শও করে না। ডিম পাড়ে 3-4টি, কদাচিৎ 2 বা 5টি। ডিমের রঙ হয় পাথুরে বা লালচে-পাটকিলে, তার উপর ইট-লাল বা লালচে-পাটকিলের ছোপ থাকে। স্ত্রী-পুরুষ ডিমে তা' দেওয়া থেকে সন্তান প্রতিপালনে পরস্পরকে সাহায্য করে কিন্তু কতদিনে ডিম ফোটে তা এখনও জানা যায়নি। ডিমের গড় মাপ 50·0 × 39·4 মিমি.।

ধূতার (Hobby)

1933-34 হবে। আমাদের বাজপাখি পোষা ও তাদের শিক্ষা দিয়ে শিকারের উপযুক্ত করে তোলা হচ্ছে, সেই সময় কানা সতীশ বা চারু শেখ কেউ একজন হবে একটা পাখি আনে কার্তিক বসুর কাছে। পাখিটা আকারে বেশ ছোটো। দেখতে অনেকটা শাহীন বাজের (ফালকো পেরিগ্রিনাস পেরিগ্রিনেটর) ছোটো সংস্করণ। উপরাংশ : স্লেট-ধসূর, মাথা কালচে, গোঁফের মতো কালো দাগ। নিম্নাংশ : লালচে, উরু এবং লেজের তলাও তাই। বুকে বেশ করে কালো টান উপর থেকে নিচে। কনীনিকা বাদামী-পাটকিলে থেকে প্রায় কালো। চঞ্চু নীলচে-স্লেট, গোড়াটা ফিকে, ডগা কালো, চঞ্চুর উপরে অনাবৃত ঝিল্লী ও কাক্ষিক চামড়া লেবু-হলুদ। পা ও আঙুল হলুদ বা কমলা-হলুদ, নখর কালো।



চি 110. ধূতার

পাখিটাকে প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রথম দেখি 29.3.87 তারিখে, ওড়িশার টিকরপাড়া ফরেস্ট অফিসের বাংলো ছেড়ে চলেছি সকাল 7-45 মিনিটে। ঠিক সকাল 8-50মিনিটে দেখি একটা পাখি প্রায় তলা থেকে সোজা উঠে এসে একটা গাঁয়ের পাতকুয়োর লাঠাখাম্বার উপরে বসল। আগে খুব ভালো করে কাছ থেকে দেখা ছিল বলে চিনতে অসুবিধে হল না। গাড়ি থামিয়ে আমি আর ভারতীয় পরিসংখ্যান সংস্থার কুমার চট্টোপাধ্যায় নেমে দেখতে থাকি।

পাখিটা শ্যেন বংশের অন্তর্গত শ্যেন গণের (ফালকো) এক *প্রজাতি*। নাম— স্ত্রী-ধূতার, পুরুষ ধূতি (ফালকো সেভেরাস রুফিপেডয়ডেস), ইংরেজি— *ইণ্ডিয়ান হবি*। লম্বায় 27-30 সেমি (11-12 ইঞ্চি)। শ্যেন বংশের (ফালকো) এক *প্রজাতি*।

বাসস্থান— নিম্ন হিমালয়ে 1800 থেকে 2400 মি. উচ্চতার মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান, কাশ্মীর থেকে কুমায়ুনের ভিতর দিয়ে গাড়োয়াল, নেপাল, উত্তর ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম আসাম, দক্ষিণে কেরালার পাহাড় (শীতেই দেখা যায়, বাসা বাঁধে কিনা তা সঠিক জানা যায় নি), ভারতের বাকি অংশে শীতেই দেখা যায়, শ্রীলঙ্কাতেও দেখা যায়। পর্বতের পাদদেশের ঘন জঙ্গলের বাসিন্দা।

খাদ্য— প্রধানত বড়ো পতঙ্গ, যেমন পঙ্গপাল, গুবরেজাতীয় পোকা, অন্যান্য পোকামাকড়, ঘাসফড়িং ইত্যাদি, এছাড়া ছোটো পাখি, মাঝে মাঝে টিকটিকি-গিরগিটি, চামচিকা ও নেংটি ইঁদুর। এছাড়া পার্বত্য গ্রামের মুরগীর ছানা।

স্বভাব— সকাল-সন্ধ্যের পাখি। প্রত্যুষের মৃদু আলোয় এবং সূর্যাস্তের গোধূলিতে খাদ্য সংগ্রহ করে। অনেক সময় দেখা যায় বেশ অন্ধকার হয়ে গেলে তখনও। থেকে-থেকে চক্কর দিয়ে ওড়ে। ঘুড়ি মতন কখনও উপরে উঠছে কখনও নিচে নামছে, কখনও দেখা যায় ডানা দ্রুত নেড়ে উপরে উঠেই গোঁৎ খায় ত্রিশ মিটার বা তারও বেশি, তার পরেই বিনা আয়াসেই উপরে উঠে যায়। শূন্যে যখন ঘুরপাক খায় তখন দেখা যায় ওড়ার পালক একটু নিচের দিকে বাঁকিয়ে কীটপতঙ্গের দিকে উড়ে চলেছে। মাঝে মাঝে দেয় ডানার দ্রুত ঝাপট। এই ভাবে শূন্যে 20-30 মিটার উঁচুতে উঠে পোকামাকড় ধরে গোল করে চক্কর দিতে দিতে পায়ে ধরা শিকারকে ছিঁড়ে খায়। মাঝে মাঝে দেখা যায় শূন্যে দশ-বারোটায় মিলে এইভাবে কখনও বাঁক খেয়ে কখনও বা চক্কর দিতে দিতে সাবলীল ভঙ্গিমায় পোকামাকড় ধরছে। এদের দিয়ে বিশেষ কিছু শিকার করানো যায় না বলে যাঁরা বাজপাখি পোষেন তাঁরা পছন্দ করেন না।

প্রজননকালে খুব ডাকাডাকি করে। কর্কশ লম্বা টানের ডাক দেয় 'টি-টি-টি-টি', থেকে থেকে 'পিট-পিট' বা 'চিপ-চিপ্-চিপ্'।

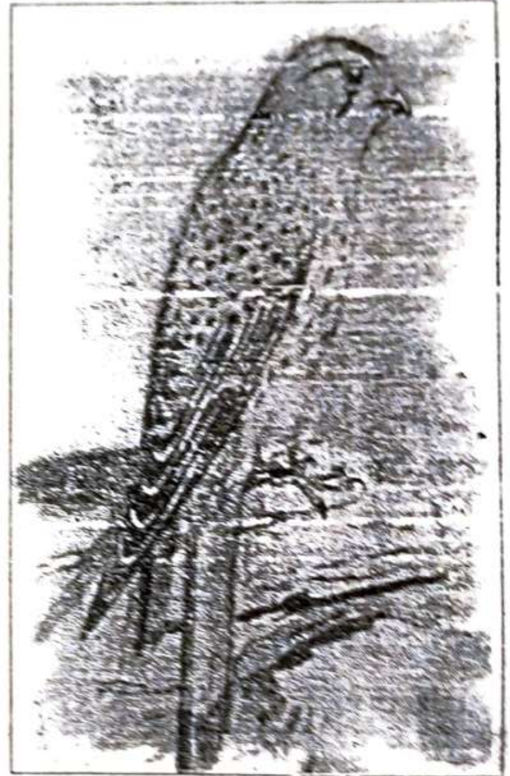
প্রজননকাল— মে থেকে জুলাই। জঙ্গলের ধারে বেশ উঁচুতে ফার, দেবদারু বা সফেদা গাছে পুরোনো কাকের বাসা মেরামত করে নেয়। ডিম পড়ে 3 বা 4টি, মলিন হলদেটে-সাদা বা ফিকে ইট-লাল, তার উপর ঘন করে ছিট ও ছোপ থাকে ইট-লাল ও পাটকিলের। এর ভিতর ছিটানো থাকে লালচে-কালোর ছোপ। ডিমের গড় মাপ 41·4 × 33·0 মিমি.। ডিম প্রধানত তা' দেয় স্ত্রী-পাখিই। ক'দিনে ফোটে তা এখনও জানা যায় নি। তা' দেবার সময় পুরুষ নিয়ে আসে ছোটো পাখি মেরে, স্ত্রী-পাখি সেইসময় বাসা ছেড়ে কাছেই একটা ডালে বসে ঐ খাদ্য গ্রহণ করে।

পোকামারা (Kestrel)

ঠিক 9-05-এ আমাদের জিপটা পাহাড়ী রাস্তা ভেঙ্গে ওড়িশার সিমলিপালের বড়েহীপানি রেস্ট হাউসের শালবল্লার খুঁটির তলায় ঢুকল। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। চওড়া গাড়ি-বারান্দা। একটা বড় টেবিল, গোটা ছয়েক চেয়ার। বারান্দা থেকে হাত ত্রিশেক দূরে গিরিখাত, তার ওপারে পাহাড়ের উপর থেকে শীর্ণ ধারায় নেমে আসছে বড়েহীপানি প্রপাত। ভারতীয় 1303 ফুট উচ্চতা থেকে পড়ছে। মাঝখানে একটা পাথরে ধাক্কা খেয়ে দুটো ধারা হয়েছে।

পরিসংখ্যান সংস্থার কুমার ও আমি ঝরনার দিকে চুপ করে বসে তাকিয়ে আছি। 10-45-এ এক জোড়া শিকরে (অ্যাকসি-পিটার বেডিয়াম) হাজির হল আমার চোখের সামনে। দশ হাত দূরেও হবে না। স্ত্রী— শিকরে, পুরুষ— চীপক, দু'জনে আমায় দেখছে ঠ্যাং দুটো নামিয়ে দিয়ে। মুখে মৃদু ডাক 'টাঁ-টাঁ-আঁ'।

এর পরেই গিরিখাতের উপর রোগাটে চেহারা, সূঁচলো ডানা, মাথা, ঘাড়, পিঠ, ডানা গাঢ় মরচে পড়া লাল, তার উপর ছোটো ছোটো কালো ফুটকি। চোখের নিচে লালচে-পাটকিলে টান গালে নেমে এসেছে। তলার দিকটাও ইট-লাল, তার উপরও কালো-ফুটকি। ডানা ঘন ঘন নাড়িয়ে এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। এটাই এই জাতের পাখির বৈশিষ্ট্য। তার পরেই 45 ডিগ্রি কোণে গোঁত্তা খেয়ে নেমে গেল গিরিখাতের তলায়, গাছ ও ঝোপের ভিতর আমাদের চোখের আড়ালে। পাখিটা স্ত্রী, পুরুষ হলে চাঁদি, গলা, ঘাড়ের দু'পাশ ছাই-ধূসর এবং আকারে কিছুটা ছোটো হতো। এই জাতের পুরুষ-স্ত্রী দুই-ই পুষেছি। এক সময় এই বংশের পাখি নিয়ে মাতামাতিও করেছি। কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু সীসে-নীল, একদম ডগা কালো, গোড়াটা হলদে, নাকের উপর উম্মুক্ত মোমের মত ঝিল্লী হলুদ, পা ও আঙুল হলদেটে-কমলা, নখর কালো। লম্বায় 36 সেমি. (14 ইঞ্চি)।


চি 111. পোকামারা

পাখিটা শ্যেন বর্গ (ফালকনিফরমেস) ও বংশের (ফালকনিদি) এক প্রজাতি। নাম— পোকামারা (ফালকো টিন্নুনকুলাস অবজুরগাটাস), ইংরেজি— *ইন্ডিয়ান কেস্ট্রেল*, হিন্দি— *পুং— খেতমৃতিয়া, নারজিনাক, স্ত্রী— নারজি।*

বাসস্থান— ওড়িশা, পূর্ব ঘাটের কিছু অংশ, পশ্চিমঘাটে খান্দেশ থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা এবং শ্রীলঙ্কা। অন্য উপজাতি (ফা টি ইন্টারস্টিক্টাস) পূর্ব হিমালয়ে। শীতে পরিযায়ী হয় আসাম, মণিপুর, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ও শ্রীলঙ্কায়।

খাদ্য— প্রধানত পোকামাকড়, ব্যাঙ, টিকটিকি, গিরিগিটি, ছোট তীক্ষ্ণদন্তী, ক্বচিৎ পাখির ছানা বা ছোট পাখি। ডাকে 'কি-কি-কি টিট উইই'।

সাধারণত পোকামারাকে একাই দেখা যায়। দিনের পর দিন একই টিবি, গাছের বা ঝোপের মাথা বা টেলিগ্রাফের পোস্টের উপর বসে মাথা উপর-নিচ করতে করতে জমিতে কি পোকা নড়াচড়া করছে তা নজর রাখার চেষ্টা করে। সেখান থেকে ছোঁ-মেরে নেমে শিকার ধরে আবার নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে খায়। 30 মিঃ বা তার উপর দিয়ে উড়তে উড়তে হঠাৎ থেমে স্থির হয়, কখনওবা ভাল করে দেখার জন্যে ঐ স্থির অবস্থা থেকে কয়েক মিটার ঝপ করে নিচে পড়ে আবার

স্থির হয়, তারপরেই গোঁত্তা খেয়ে মুহূর্তের মধ্যে নেমে শিকার ধরে ফিরে যায় নিজের জায়গায়।

প্রজননকাল— জানুয়ারি থেকে মার্চ। শুকনো ডালের টুকরো, শিকড়, ছেঁড়া ন্যাকড়া, খড় ও আবর্জনা দিয়ে পাহাড়ের খাঁজে, গায়ের গর্তে যেখানে সহজে কেউ যেতে পারে না সেইখানে বাসা বানায়। ডিম পাড়ে 3 থেকে 6টি, ফিকে গোলাপী বা হলদেটে পাথর-রঙা, তার উপর নানারকম লালের ছিট ও ছোপ থাকে। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই ডিমে তা' দিলেও স্ত্রী-ই দেয় বেশি। ডিম ফোটে 27 থেকে 29 দিনে। ডিমের গড় মাপ 38 × 30 মিমি.।

শ্যেন বর্গের অন্তর্গত বাজ ও শ্যেন বংশে আরও কয়েকটি পাখিকে পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়, তারা হল—

1. **পাটকিলে গিরগিটি-বাজ** (অভিকেদা জার্ডনি)। ইংরেজি— *ব্লাইথ'স্ বাজা, ব্রাউন লিজার্ড হক।* লম্বায় 48 সেমি. (19 ইঞ্চি)। খগ গণের (আাডিকেদা) *এক প্রজাতি।*

পাটকিলে রঙের এক বাজ, মাথা লালচে এবং কালো। মাথায় একটি কালো খাড়া পরিস্কার ঝুঁটি, ঝুঁটির প্রান্তে সাদা ছোপ। চিবুক ও গলা লালচে এবং সাদা, তার উপর ঘন করে কালো টান। বুক লালচে-পাটকিলে, বাকি তলার অংশ টানা টানা লালচে-পাটকিলে ও সাদার টান। লেজ পাটকিলে, তার উপর তিনটি কালো পটি, শেষেরটি সবচেয়ে চওড়া এবং গাঢ় বেশি। কনীনিকা সোনালি-হলুদ, চঞ্চু সীসে-কালো, গোড়াটা নীলচে-স্লেট, ডগাটা কালো, পা ও আঙুল হলদেটের উপর নীলের আভা, নখর শিঙে-কালো।

বাসস্থান— দার্জিলিং জেলা, সিকিম থেকে পূর্ব আসামে 350 থেকে 1800 মি. উচ্চতার মধ্যে। পর্বতের পাদদেশে চিরসবুজ জঙ্গলে। ভারতের বাইরে বর্মা, থাইদেশ, মালয় উপদ্বীপ ও সুমাত্রা।

খাদ্য— টিকটিকি-গিরিগিটি, ঘাসফড়িং ও অন্যান্য পতঙ্গ।

2. **কালো ঝুঁটি গিরগিটি-বাজ** (আভিকেদা লিউফোটেস), মালয়ালী— *প্রাপ্পারাণ্ডু*, কানাড়ি— *দাওকওয়া, দাওলিং*, ইংরেজি— *ব্ল্যাক-ক্রেস্টেড বাজা, লিজার্ড-হক।* লম্বায়— 33 সেমি. (13 ইঞ্চি)। এটিও খগ গণের (আভিকেদা) *এক প্রজাতি।*

সুন্দর পরিচ্ছন্ন কালো ঝুঁটি সহ কিছু অংশ সাদা এই বাজটি, নিম্নাংশ ঃ ডোরা এবং পেট কালো। কনীনিকা বেগুনি-পাটকিলে, চঞ্চু গাঢ় সীসে-শিঙেল, উপরের চঞ্চুর ডগা কালো। পা ও আঙুল মলিন-সীসে, নখর শিঙে-পাটকিলে।

বাসস্থান— উত্তরবঙ্গ, পূর্ব নেপাল, সিকিম, বাংলাদেশ থেকে পূর্ব আসামে ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে তরাই থেকে 1200 মি. উচ্চতায়।

ডাক— অনেকটা গোদা চিলের মতন।

খাদ্য— প্রধানত টিকটিকি-গিরগিটি, ব্যাঙ, বড়ো গঙ্গাফড়িং ও অন্যান্য পতঙ্গ, মাঝে মাঝে চামচিকা ও ছোটো পাখি।

3. **মৌখাকি বাজ** (পেরনিস প্টিলোরহাইঙ্কাস), হিন্দি— *শাহুচেলায় মদকারে*, তেলেগু— তেনু

গ্রেন্দু, তামিল— *তেল পারাড়ু*, ইংরেজি— *ক্রেস্টেড হানি বাজার্ড।* লম্বায়— 68 সেমি. (27 ইঞ্চি)। মধুহা গণের (পেরনিস) *এক প্রজাতি।*

উপরাংশ : ধূসরাভ-পাটকিলে, তার উপর গাঢ় ধূসর মাথা। খুব ছোটো কালচে ঝুঁটি। নিম্নাংশ : ডানার তলা রূপালি-ধূসর, তার উপর ঘন করে গাঢ় কালো টান। কালচে-ধূসরাভ গোল লেজ, তার উপর চওড়া করে কালচে পটি ও কাটাকুটি, এইগুলিকে পৃথক করা আছে চওড়া ফিকে পটি দিয়ে। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। কনীনিকা সোনালি-হলুদ, কখনও কমলা-লাল। চঞ্চু স্লেট-কালো, নিজের চঞ্চু কিছুটা সাদাটে, ডগায় কালো ছোপ, চঞ্চুর প্রান্তে মোমের ন্যায় অনাবৃত ঝিল্লী কালচে-সীসে। পা ও আঙুল হলদে, নখর কালো।

বাসস্থান— খাদ্যের উপরই নির্ভর করে এদের চলাফেরা। পাকিস্তান, সারা ভারত, 1800 মি. উচ্চতায় হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা, শ্রীলঙ্কায় শীতে কিছু অংশে, পুবে আসাম, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে, ওড়িশা, ভারতের বাইরে টঙ্কিন ও লাওস-এর, পূর্বাংশে, খুব সম্ভবত দক্ষিণ-পশ্চিম ইউনানেও কিছুটা পরিযায়ী হয়।

খাদ্য— প্রধানত মধু ও মৌমাছির শূক-কীট। এমনকি পাহাড়ী মৌমাছিদের (এপিস ডরসাটা) চাকও আক্রমণ করতে ছাড়ে না। এছাড়া বড়ো পতঙ্গ, ছোটোখাটো সরীসৃপ, নেংটি ইঁদুর এবং ছোটো পাখিও খেয়ে থাকে।

স্বভাব— সাধারণত দেখা যায় হয় একা, না হয় জোড়ায়। দাঁড়কাক বা পাতিকাকরা এদের দেখতে পেলে উত্যক্ত করে। ওড়ে পাখা বিস্তার করে, মাঝে মাঝে পাখায় ঝাপটা মারে। রাত্রি কাটায় সাধারণত ঘন পাতার শিশু (ডালবার্জিয়া) গাছে। ডাকে তীক্ষ্ণস্বরে 'হুইইউ' করে। বাসা বাঁধে বড়ো আম, বট ইত্যাদি পাতাভরা গাছে, 6 থেকে 20 মিটার উচ্চতায় এপ্রিল থেকে জুনের প্রথমার্ধে। এই বাসা প্ল্যাটফর্ম আকারে 40-45 সেমি. চওড়া এবং গভীরতা 20 সেমির। আস্তরণ বিছায় মোটা শুকনো পাতার। ডিম পাড়ে সাধারণত 2টি চওড়া উপবৃত্তাকার, প্রায় দু'মুখ সমান। ডিম দেখতে সুন্দর কিন্তু রঙে খুব তারতম্য হয়, ফিকে ঘি-রঙা, ফিকে লালচে-পাটকিলে বা বাদামী-পাটকিলের। ডিমের গড় মাপ 52˙8 × 42˙8 মিমি.। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই বাসা বাঁধে, ডিমে তা' দেয় এবং বাচ্চাদের খাওয়ানো সবই করে। প্রায় 32 দিনে ডিম ফোটে।

4. **টিকা** (বুটাস্টুর টীসা), তেলেগু— *বুড়া মানি গেড্ডা*, মালয়ালী— *পারুড়ু*, ইংরেজি— *হোয়াইট-অ্যাইড বাজার্ড-ঈগল।* লম্বায় 43 সেমি. (17 ইঞ্চি)। সরটারি গণের (বুটাস্টুর) *এক প্রজাতি।*

ছোটোখাটো ধূসরাভ-পাটকিলে বাজ। গলা সাদা, প্রতি গালে একটি করে কালো গালপট্টি, চিবুকের তলা দিয়ে আর একটি পটি নেমে এসেছে। ঘাড়ে একটি ছোট্ট সাদা ছোপ। নিম্নাংশ : পাটকিলে এবং সাদাটে। উপর চঞ্চুর প্রান্তে মোমের মতো অনাবৃত ঝিল্লী কমলা-হলুদ, সাদা বা ফিকে হলুদ চোখ। বসার সময় ডানা প্রায় লালচে ছোপের লেজ ছুঁয়ে যায়। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। কনীনিকা প্রায় সাদা বা খুব ফিকে হলুদ, চঞ্চুর ডগা কালো, তলার চঞ্চুর গোড়াও হলুদ। পা ও আঙুল কমলা-হলুদ, নখর কালো।

বাসস্থান— 1200 মি. উচ্চতার মধ্যে প্রায় সারা ভারতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত, যদিও মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণে অল্প দেখা যায়, পাকিস্তান থেকে উত্তরবঙ্গ, আসাম, বাংলাদেশ, নেপাল। শ্রীলঙ্কায় দেখা যায় না। দেখা যায় পর্ণমোচী জঙ্গল এবং সমতলে ঝোপঝাড় ও চষা জমির ধারে। ভিজে জঙ্গল একদম পছন্দ করে না। ভারতের বাইরে পশ্চিম বর্মা থেকে দক্ষিণ টেনাসেরিয়ম।

খাদ্য— নেংটি ও ধেড়ে ইঁদুর, ছোটো সাপ, টিকটিকি-গিরগিটি, ব্যাঙ, কাঁকড়া, পঙ্গপাল, ঘাসফড়িং এবং অন্যান্য বড়ো জাতের পোকা, উড়ন্ত উঁই-কখনও শূন্যে ধরতেও দেখা যায়। এছাড়া অসুস্থ তিতির জাতীয় পাখি।

স্বভাব— ধীর স্থির। একটি পাখিকেই দেখা যায় দিনের পর দিন বসে আছে একই ডালে, সেটা গাছের উপরেই হোক অথবা পছন্দসই টেলিগ্রাফের খুঁটির উপরে। সেখান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কবজা করতে পারবে এমন কোনো প্রাণীর উপর। কখনও দেখা যায় কোনো ঢিবির উপরে, সেখান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে নজর রাখে হয় কোনো টিকটিকি-গিরগিটি, না হয় কোনো ঘাসফড়িং-এর উপর। কখনও দেখা যায় মাটির উপরে হেঁটে চলেছে পথে কোনো উঁই বা ছোটো পোকা দেখতে পেলে ধরবে। ডানার ঝাপট অনেকটা শিকরে বাজ-এর মতো। ওড়ার আরম্ভটা অসম্ভব শ্লথ হলেও গতিবেগ স্থির, মাঝে মাঝে ডানার ঝাপট। প্রজননকালে এরা খুব ডাকাডাকি করে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে বেশ উঁচুতে উঠে নানারকম খেলা খেলে।

ডাকে তীক্ষ্ণস্বরে 'পিই-উইইর পিই-উইউইইর' করে, বিশেষত প্রজননকালে বাসার কাছে কিংবা দু'জনে স্বাধীনভাবে শূন্যে ঘোরার সময়।

ডিম পাড়ে ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে। বাসা কাকেদের মতো অগোছলো, 9-12 মি. উঁচুতে দুই ডালের মাঝে ঘন-পাতার আড়ালে। পছন্দ করে আম বা নিমগাছের উপরে। ডিম সাধারণত 3টি, সবজেটে-সাদা চকচকে, সাধারণত কোনো ছোপছাপ থাকে না, ক্বচিৎ ফিকে লালচে ছিট দেখা যায়। ডিমের গড় মাপ 46·4 × 38·4 মিমি.। পুরুষ-স্ত্রী দু'জনেই বাসা বাঁধে এবং সন্তান প্রতিপালনে পরস্পরকে সাহায্য করে। ডিমে তা' দেয় স্ত্রী-পাখি একাই। ডিম ফোটে 19 দিনে।

5. **সাদাল** (স্পিজাইটাস লিমনাইটাস), গাড়োয়ালী— *মরহাইটা*, ইংরেজি— *চেঞ্জেবল হক-ঈগল*। লম্বায় 70 সেমি. (28 ইঞ্চি)। পৃথুচূড় গণের (স্পিজাইটাস) *এক প্রজাতি*।

মাথায় ঝুঁটি না থাকার মধ্যেই। 3 সেমির উপর লম্বা ঝুঁটি খুব অল্পই দেখা যায়। সাধারণত উপরাংশ পাটকিলে, নিম্নাংশ সাদাটে, তার উপর লালচে-সাদা দাগ তলপেট ছাড়িয়ে পায়ুদেশ পর্যন্ত। গলায় খুব সরু লম্বা টান, বুকে খুব চওড়া করে চকোলেট রঙের ছিট, অনেক সময় দেখা যায় দেহের পুরো পালক চকোলেট-পাটকিলে প্রায় কালোর মতো। কনীনিকা ফিকে খাকি থেকে উজ্জ্বল কমলা-হলুদ হয় বয়েসের তারতম্যে। চঞ্চু শিঙেল-কালো, চঞ্চুর উন্মুক্ত অংশ ও চোখের চারপাশ স্লেট-ধূসর। পা মলিন সবজেটে-ধূসর, নখর শিঙে-কালো।

বাসস্থান— হিমালয়ের পাদদেশ তরাই অঞ্চলে গাড়োয়াল থেকে পশ্চিম বঙ্গ, বাংলাদেশ, নেপাল ও আসাম। 1900 মি. উচ্চতার মধ্যে পর্বতের পাদদেশের জঙ্গলে। ভারতের বাইরে বর্মা, থাইদেশ,

মালয় উপদ্বীপ, ইন্দোচীনীয় দেশ সমূহ, সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও, ফিলিপিনস দ্বীপপুঞ্জ।

খাদ্য— খরগোস, ময়ূরের ছানা, বুনো মুরগী, তিতির, বটের, কাঠবিড়ালী, মেঠো ইঁদুর, টিকটিকি-গিরগিটি প্রভৃতি। জঙ্গলের ধারের গাঁয়ের পোষা মুরগীর উপর খুব লোভ।

স্বভাব— একদম বুনো এবং খুবই সচকিত ভাব, কাছে গেলে উড়ে যায় একশ মিটার দূরত্বে কোনো গাছে। সেই গাছের কাছে গেলে আবার দূরে চলে যায়। এইভাবে বেশ খানিকক্ষণ অনুসরণ করলে গাছের মাথার উপর দিয়ে উড়ে দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যায়।

এমনি চুপচাপ, কেবল প্রজননের সময় উচুতে উড়তে উড়তে ডাক দেয় শিসের মতো জোরে 'কার-লিই-ই-ই' করে। অনেক সময় তিলাজ বাজের মতো 'কিট-কিট-কিট' বা 'কেক-কেক-কেক-কিউইই' হাঁক পাড়ে।

প্রজননকাল— জানুয়ারি থেকে এপ্রিল হলেও প্রধানত দেখা যায় *ফেব্রুয়ারি-মার্চেই* বেশি। বাসা বানায় বেশ বড়ো প্ল্যাটফর্ম আকারে, কাঠকুটো দিয়ে এক মিটার চওড়া এবং 35 সেমি. গভীর লাইনিং দেয় সবুজ পাতার। এই বাসা বাঁধে জঙ্গলের বড়ো গাছের মাথায়। ডিম পাড়ে একটি সাদা, তার উপর খুব ফিকে লালচে ছিট ও ছোপের। ডিমের গড় মাপ 69·8 × 51·9 মিমি.।

স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই বাসা বানাতে পরস্পরকে সাহায্য করে। স্ত্রী-পাখি ডিমে একাই তা' দেয়। ডিম ক'দিনে ফোটে তা ঠিক এখনও জানা যায় নি।

6. **ফুস** (অ্যাকুইলা হেলিয়াকা), হিন্দি— *শতঙ্গল, বড়া জুমিজ*; ইংরেজি— *ইম্পিরিয়াল ঈগল*। লম্বায় 81-90 সেমি. (32-35 ইঞ্চি)। গরুড় গণের (অ্যাকুইলা) এক *প্রজাতি।*

গাঢ় চকচকে কালচে-পাটকিলে দেহ, মাথা ও গলা ফিকে তামাটে-হলুদ থেকে সাদাটে। লেজ ধূসর ও তাতে পাটকিলের ছোপ, ডগায় সাদাটে এবং চওড়া কালচে পট্টি। পিঠের উপর যত্রতত্র সাদা ছোপ। পায়ুদেশ ও লেজের তলার আচ্ছাদক মলিন হলদেটে-সাদা। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে, তবে স্ত্রী-পাখি আকারে কিছু বড়ো।

বাসস্থান— প্রধানত শীতে পরিযায়ী হয়ে আসে পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ ও নেপাল, সেখান থেকে দক্ষিণে গুজরাটের কচ্ছ ও সৌরাস্ট্রে। পুবে ও দক্ষিণে কতদূর আসে তা এখনও সঠিক নির্ণয় হয় নি। গাছপালাহীন উন্মুক্ত প্রান্তরেই দেখা যায়। ভারতের বাইরে দক্ষিণে ইওরোপের হাঙ্গেরি থেকে দক্ষিণ রাশিয়া, সেখান থেকে পুবে বৈকাল হ্রদ ও দক্ষিণে গ্রীস, সাইপ্রাস, এশিয়া মাইনর, উত্তর ভারত এবং চীন। শীতে দক্ষিণ সুদান, সোমালিল্যাণ্ড, ভারত, দক্ষিণপূর্ব চীন।

স্বভাব— খুবই মন্থর ঈগল। সাধারণত দেখা যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাছের কোনো গুঁড়ির মাথার উপরে কিংবা উন্মুক্ত মাঝামাঝি মরুভূমি অঞ্চলে ঢিবির উপর বসে আছে। খাদ্যসংগ্রহ করে অন্যান্য ঈগল বা বাজদের বিশেষত লগ্গর বাজদের কাছ থেকে দস্যুবৃত্তি করে। এছাড়া মৃতমাংসভোজীও। দেখা যায় মৃতপশুর শবদেহের কাছে, মুনিসিপালিটির নোংরা ফেলার জায়গায় বা কসাইখানার ধারে। ওড়াটা খুব ধীরে অনেকটা শকুনির মতো।

মৃত মাংস গ্রহণ বা দস্যুবৃত্তি ছাড়া প্রায়ই মারে তীক্ষ্ণদন্তী জীব, সরীসৃপ, ভূমিজ পাখি। কচ্ছে একটার পেট থেকে বার হয়েছিল বিষাক্ত চন্দ্রবোড়া (রাসেল'স্ ভাইপার)। ভারতে ডাক শোনা যায় না। ইওরোপে খুব তাড়াতাড়ি ডাকে— 'আউক-আউক-আউক' করে।

বাসা বানায় গাছের উপর 6 থেকে 9 মি. উচ্চতায়। বাসা কাঠি এবং শুকনো সরু ডালের। ডিম পাড়ে 2টি চওড়া মলিন-সাদা গোলাকার, তার উপর এদিক-ওদিক ছড়ানো-ছিটানো লাভেন্ডার-ধূসরের ছিট ও ছোপ। ডিমের গড় মাপ 70·9 × 54·6 মিমি.।

7. **গুটিমার** (অ্যাকুইলা পামারিনা), হিন্দি— *পাহাড়ী টীসা*, ইংরেজি— *লেসার স্পটেড ঈগল।* লম্বায় 61-66 সেমি. (24-26 ইঞ্চি)। গরুড় গণের (অ্যাকুইলা) *এক প্রজাতি।*

বড়ো কালচে-পাটকিলে বা গাঢ় চকোলেট-পাটকিলে ঈগল। খোলামেলা জঙ্গলের পাখি। কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু স্লেট-নীল, গোড়াটা কালো। পা মলিন হলুদ, নখর কালো।

বাসস্থান— প্রধানত দেখা যায় গাঙ্গেয় উপত্যকা ধরে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা। দক্ষিণে আর কোথাও দেখা যায় কিনা তার সঠিক খবর এখনও জানা যায় নি। আসামেও দেখা যায় ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ও দক্ষিণে এবং মণিপুরে।

স্বভাব— শিকার করে প্রধানত মাটি থেকেই নখরে করে।

খাদ্য— ব্যাঙ, টিকটিকি-গিরগিটি, ছোটো এবং দুর্বল পাখি, মেঠো ইঁদুর ইত্যাদি। সিক্কের গুটি খায় পশ্চিমবঙ্গে। গোশালিকের গোলাকার বাসা ছিঁড়ে বাচ্চা ধরে। গোদা চিলের কাছ থেকে দস্যুবৃত্তি করে ছিনিয়ে নেওয়াটাই প্রধান কাজ।

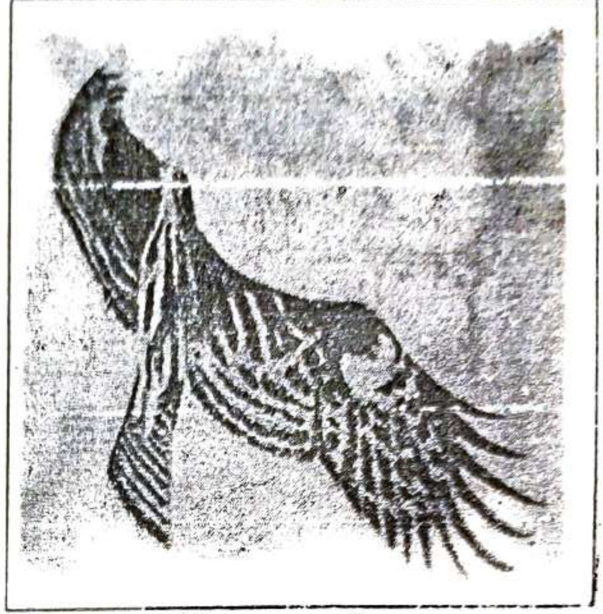
প্রজননকাল— এপ্রিল থেকে জুলাই হলেও মে মাসই প্রধান। বাসা বড়ো প্ল্যাটফর্ম আকারে কাঠি ও গাছের সরু ডাল দিয়ে. কিছু পাতাও থাকে একেবারে ঈগল ধাঁচের। বড়ো শিমূল, শাল, আম, পিপুল ইত্যাদি ধরনের গাছে গাঁয়ের ধারে বাসা বাঁধতে বেশি দেখা যায়। ডিম পাড়ে সাধারণত 1টি, কখনও 2টি, কচিৎ 3টি। ডিমের গড় মাপ 63·8 × 49·8 মিমি.। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই ঘরসংসারের কাজে পরস্পরকে সাহায্য করে। স্ত্রী একাই ডিমে তা' দেয়। ডিম ফোটে 42 - 44 দিনে।

৪. **কালো ঈগল** (ইকটিনাইটাস মালয়েনসিস), তেলেগু— *আদাভি নাল্লা গদ্দা*, তামিল— *করুগু*, কাছাড়ি— *দাও লিং গাশিম*, ইংরেজি— *ব্ল্যাক ঈগল।* লম্বায় 67-81 সেমি. (27-32 ইঞ্চি)। ভল্লুক গণের (ইকটিনাইটাস) *এক প্রজাতি।*

বড়ো কালো ঈগল, যার ডানা লেজ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। দেখে মনে হয় সাদাল-এরই কালো আকার কিন্তু এর ডানা অনেক চওড়া। ওড়া অবস্থাতেই চোখে পড়ে বেশি। তখন মনে হয় অনেক ঈগলের চেয়ে এটাই আকারে বড়ো। উজ্জ্বল হলুদ রঙের মোমের মতন চঞ্চুর গোড়ায় অনাবৃত ঝিল্লী এবং হলদে পা এদের চিনিয়ে দেয়। ডানা বেশ বড়ো এবং চওড়া, ডগাটা গোলাকার ও বেশি ছড়ানো এবং প্রাথমিক পালকগুলি উপর দিকে তোলা। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে, স্ত্রী আকারে বড়ো। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে, চঞ্চু সবজেটে বা সীসে-শিঙেল, ডগাটা কালো, চঞ্চুর প্রান্তে মোমের মতো অনাবৃত

ঝিল্লী হলদে। পা হলুদ, নখর কালো।

বাসস্থান— চিরসবুজ ও নির্দিষ্ট সময়ে ভিজে পাতাঝরা জঙ্গলে, পাহাড়ের পাদদেশ এবং হিমালয়ে 2700 মি. উচ্চতার মধ্যে। উপদ্বীপাত্মক ভারতে 2000 মি. উচ্চতার ভিতর। পাকিস্তানের মারি, রাউলপিণ্ডি জেলা থেকে হিমাচলপ্রদেশ ধরে নেপাল থেকে পূর্ব আসাম, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, অন্ধ্র ও মাদ্রাজে পূর্বঘাট, মধ্যপ্রদেশের হোসাঙ্গাবাদ ও বস্তার জেলা, শ্রীলঙ্কা, পশ্চিমঘাটে কন্যা-কুমারিকা থেকে গোয়া ও উত্তর মহীশূরে। ভারতের বাইরে বর্মা, থাইদেশ, মালয় উপদ্বীপ, জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিও, সেলিবিস ও সুলা দ্বীপপুঞ্জ।



চি 112. কালো ঈগল

খাদ্য— বড়ো পতঙ্গ, ব্যাঙ, টিকটিকি-গিরিগিটি, তীক্ষ্নদন্তী জন্তু, পাখি এমনকি জংলীমুরগী ও জীবজীব। কিন্তু প্রধানত খোঁজে পাখির ডিম ও ছানাদের।

স্বভাব— দেখা যায় বেশি পাহাড়ী জঙ্গলে। সাধারণত জোড়ায় ওড়ে ডানা মেলে দিয়ে জঙ্গলের গাছের উপর দিয়ে। ওড়ার ভঙ্গিমা এত সুন্দর যে ভাষায় বর্ণনা করা শক্ত। এইভাবে গাছের উপর দিয়ে উড়তে উড়তে। খোঁজে পাখির বাসা। সেখানে ডিম বা ছানা-পাখি তার খাদ্যের প্রধান উপকরণ। দেখা গেছে পুরো বাসাটা নিয়ে উড়ে চলেছে, আর দেখছে সেই বাসার ভিতরের বস্তুকে। এইভাবে উড়তে উড়তে ঝপ করে উপর থেকে নামে কোনো শিকার বস্তু নজরে এলে।

সাধারণত চুপচাপ। মাঝে মাঝে ওড়ার খেলার সময় একটা চিৎকার দেয়।

প্রজননকাল— দক্ষিণে নভেম্বর থেকে মার্চ, উত্তরে জানুয়ারি থেকে এপ্রিল। বাসা বেশ গোছানো কাঠি ও ডালের টুকরো দিয়ে, লাইনিং দেয় সবুজ পাতার। 300 থেকে 1200 মিটার উচ্চতায় গাছের পাতার আড়ালে বাসা বাঁধে। কাছাকাছি আর-একটি বাসা বাঁধে পরের বছরের জন্যে। ডিম পাড়ে 1টি, ক্বচিৎ 2টি চওড়া গোলাকার এবং তাতে নানা রঙের সমাবেশ। সাধারণত দেখা যায় গোলাপী জমির উপর খুব ঘন করে চিকন দাগ। ডিমের গড় মাপ 62·7 × 49·9 মিমি.। জোড় বাঁধে আজীবনের জন্য, কিন্তু দেখা গেছে একজনের হঠাৎ মৃত্যু হলে অল্প দিনের মধ্যেই অন্যজন সঙ্গী খুজে নেয়। ঘর-গেরস্তালীর সব কাজেই পরস্পরকে সাহায্য করে।

সন্তরক বর্গ

সন্তরক বর্গের (অর্ডার আনসেরিফরমেস) পাখিরা হচ্ছে সেইসব জলজ পাখি যাদের মানুষ সাধারণত শিকার করে একমাত্র খাদ্যভুক্তি করতে। শীতকালে যে কোনও জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণে এদের দেখা যায় এবং শীতের শেষে আর দেখা যায় না। অপূর্ব ওড়ার ভঙ্গিমায় এরা অদৃশ্য হয়ে যায়। এর থেকে পাখির পরিযানের একটা ধারণা পাওয়া যায়। এই পাখিদের একটি মাত্র বংশ— হংস (আনাটিদি)। ভারতে এদের 17টি প্রজাতিতে দেখা যায়। যথাক্রমে, রক্তোরস্ক (ব্রান্টা), হংস (আনসের), মহাহংস (সাইগনাম), বৃক্ষহংসক (ডনড্রসাইগনা), উপচক্র (টাডোর্না), ক্রামিক (আনাস), পাটলোওমাঙ্গ (রোডোনেম্মা), অরুণচঞ্চু (নেট্রা), উর্ধ্বব্যাসচঞ্চু (আইথিয়া), চূড়ক (এইকস্), কাণুক (নেট্রাপাস), নন্দীমুখ (সারকিডিঅরনিস), অস্থিপক্ষ (কাইরিনা), লম্বপুচ্ছ (ক্লানগুলা), অগ্ননাসা (বুকেফালা), কারশু (মারগাস) এবং সূচীগুচ্ছ (অক্সিউরিস)।

এইসব হাঁসের নানা আকার। প্রায় শকুনির আকারের মরাল (সোয়ান) থেকে পায়রার মতো ছোটো বালিহাঁস (কটন টিল) দেখি। রঙেও নানা বৈচিত্র্য। পুরোপুরি সাদা (মরাল) থেকে নানা বর্ণের মিশ্রণ, যেমন ধূসর, পাটকিলে, কালো ও সবুজ সঙ্গে ধাতব ঔজ্জ্বল্য মেশানো। বেশির ভাগ হাঁসের মধ্যে প্রকট হয়ে থাকে ধাতব মুকুর বা আয়না কিংবা ডানায় সাদা ছোপ। চঞ্চু চওড়া, চেপটা, ডগাটা একটু গোলাকার এবং চিরুণীর মতো, দাঁত থাকে জলের মধ্যে থেকে খাদ্যবস্তু ছেঁকে ফেলার জন্যে। বেশির ভাগ প্রজাতির ডানা সংকীর্ণ ও সূঁচলো যা তাদের দ্রুত এবং দূর যাত্রার জন্যে প্রশস্ত। লেজ ছোটো, পা ছোটো, আঙুল ঝিল্লীযুক্ত। আমরা যাদের দেখতে পাই তাদের বেশির ভাগই আসে হিমালয় পার হয়ে।

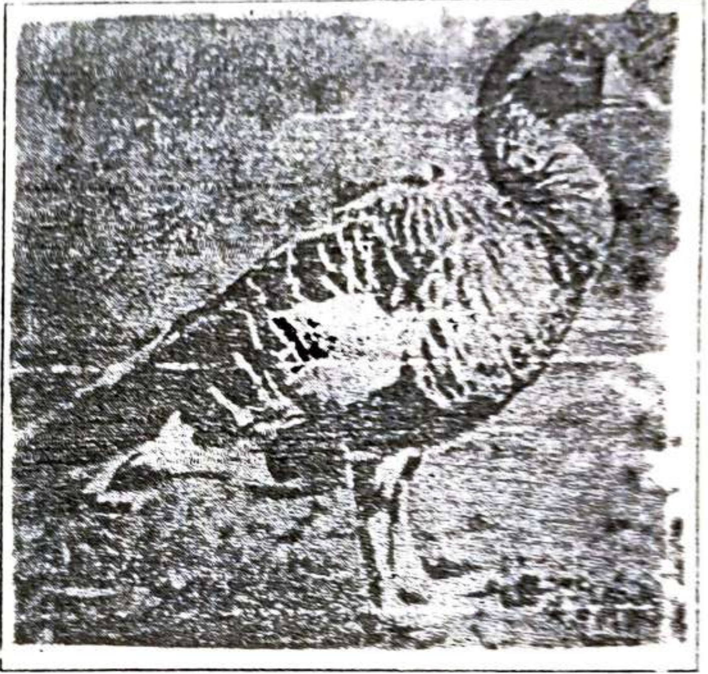
দু'একটি ছাড়া পৃথিবীর 200 প্রজাতির হাঁসের মধ্যে আছে বেশ কিছু ভালো সাঁতারু, কেউবা আবার ডুব সাঁতারে পারঙ্গম। জলের উপর থেকেই টুপ করে ডুবে যায়। গলা সোজা করে ওড়ে, বেশ দ্রুত পাখার ঝাপট মেরে। যদিও কিছু হাঁস আছে যারা খানিকটা দৌড়বার পর শূন্যে ওঠে। এক দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু ছাড়া পৃথিবীর সর্বত্র লোনা বা মিষ্টি জলে হাঁসেরা বাস করে। এদের খাদ্য হয় ছোটো প্রাণী আর না হয় উদ্ভিজ্জ। সব কিছুই সংগ্রহ করে জল থেকে, তা নদী, বাদা, জলে ডোবা মাঠ যাই হোক না কেন, হয় ডুব দিয়ে না হয় চরে।

প্রজনন করে হয় মাটিতে না হয় গাছের গায়ের গর্তে, সন্তান প্রতিপালন করে-বাসা বেঁধে।

হংস বংশ

কাদম্ব (Greylag Goose)

বহুকাল আগের এক অক্টোবরের মাঝামাঝি এলাহাবাদ থেকে ফৈজাবাদে এসেছি। সেখানে তিন-চারদিন থেকে জৌনপুরের রাস্তায় আকবরপুর স্টেশনে নেমে অন্য এক গাড়ি ধরে ঘাঘারা বা গোগরা নদীর ধারে টাণ্ডা বলে এক জায়গায় এলাম। উদ্দেশ্য কোন্ কোন্ পরিযায়ী পাখি কোন্ কোন্ পথ দিয়ে হিমালয় পার হয়ে ভারতের মধ্যে ঢোকে তার হদিস করা। ফৈজাবাদে থাকতে জেনেছি মাসের গোড়াতেই অনেক পাখি পার হয়ে গেছে। এখানে লোকজনের ভিড়ে নামে না, বহু উপর দিয়ে উড়ে যায়। আমার থাকাকালীন রাতে কোন পাখপাখালির আওয়াজ পাই নি। তখনকার দিনে একটা সুবিধে ছিল। ভারতের যে কোনও জায়গায় বিনা দ্বিধায় যাওয়া যেত এবং আন্তরিক আতিথেয়তারও কোন অভাব হত'না।



চি 113. কাদম্ব

নদীর ধার বলে টাণ্ডা অসম্ভব ঠাণ্ডা। সকাল সকাল খেয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছি। কান পেতে শুনছি এক মিষ্টি সুর, গানের মত। পরীরা যেন গান গাইতে গাইতে আসছে। বিছানায় থাকা গেল না। বাইরে বেরিয়ে এলাম। দেখলাম কিছু হাঁস নেমেছে। নদীর ধার, ধানখেত সবই তাদের উপযুক্ত বিশ্রামস্থল। জানিনা কতদূর যাবে। বেশ বড়সড় হাঁসই, কিন্তু কি হাঁস তখনও জানিনে। রাত শেষ হবার মুখে তাই কম্বলের তলায় এসে ঢুকলাম। এক সময়ে ঘুমিয়েও পড়লাম। গৃহস্বামীর ডাকে ঘুম ভাঙল। তিনি খবর দিলেন প্রচুর হাঁস পড়েছে। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে নদীর ধারে ছুটলাম।

শরতের সেই পরিষ্কার সকালে, উপরে নীল আকাশ, তলায় এই হাঁসের দল, কেউ মাটিতে পা মুড়ে বসে বুক-পেট ঠেকিয়ে রেখেছে, কেউ গোগরা নদীর বুকে মৃদু মৃদু ঢেউয়ের তালে তালে নাচছে, কেউ এক পায়ে জলের ধারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আশপাশে ধান তখনও পাকে নি, হাওয়ায় দোল খাচ্ছে, বাতাসে একটা মিষ্টি গন্ধ।

মনে পড়ে গেল কালিদাসের 'রঘুবংশে' এদের উল্লেখ আছে। এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যেখানে প্রচুর শালিধান্য রহিয়াছে, সেখানে ইহাদের উন্মুক্ত প্রলাপ শোনা যায়; যেখানে কুমুদপুষ্প বীচিবিক্ষোভিত হইয়া দুলিতে থাকে, সেখানে ইহারাও তরঙ্গবক্ষে ভাসিয়া বেড়ায়, যেখানে জলাশয় সেখানে ইহাদের কলকণ্ঠ শারদলক্ষ্মীর জয় ঘোষণা করিতে থাকে।

এদের ধূসর-পাটকিলে দেহে গোলাপী চঞ্চু, পা ও পায়ের পাতা গোলাপী, কিন্তু নখ সাদা। মলিন লালচে-ধূসর কোমর, লেজের উপরিভাগের আচ্ছাদক সাদা। গলায় ও পিঠের অর্ধেকটায় সাদা লম্বা টান। কনীনিকা পিঙ্গল।

পাখিগুলি সন্তরক বর্গের (আনসেরিফরমেস) অন্তর্গত হংস বংশে (আনাটিদি), হংস গণের (আনসের) এক প্রজাতি, নাম— কাদম্ব, রাজহাঁস (আনসের আনসের রুবরিরাস্ট্রিস), ইংরেজি— গ্রেল্যাগ গুজ। গৃহস্বামী বললেন, 'কড়িয়া 'সোনা'। লম্বায় 81 সেমি.। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান— 40° পূর্ব থেকে দক্ষিণে 60° উঃ ধরে এশিয়া মাইনর, সমগ্র মধ্য এশিয়া থেকে কামস্কাটকা। পরিযায়ী হয় পাকিস্তান, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, অল্প সংখ্যায় রাজস্থান, উত্তর গুজরাট, নেপাল তরাই, সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকা ধরে উত্তরবঙ্গ, আসাম, মণিপুর এবং বাংলাদেশে। কোনো কোনো বছরে ওড়িশার চিল্কা হ্রদ ভরে যায়। মধ্যপ্রদেশে কচিৎ। আর নিচে নামে না। মার্চের শেষ নাগাদ সবাই ফিরে যায় আপন বাসস্থানে। বাদি হাঁস বা কলহংসের (বারহেডেড গুজ, আনসের ইন্ডিকাস) সঙ্গে মিলেমিশেও পরিযায়ী হয়। হিমালয়ের 4270 মি. উচ্চতা অনায়াসেই পার হয়ে যায়।

স্বভাব— এরা পুরোপুরি নিরামিষাশী।

খাদ্য— ভারতে ঘাস, গম, বাজরা ইত্যাদি শস্যর ডগা এবং ধান কাটার পর যা পড়ে থাকে। ক্ষেতের ক্ষতি করে খুব। এছাড়া খায় জলজ আগাছা এবং তার মূল। পানিফলেরও খুব ভক্ত। দল বেঁধে খাবার সময় ডাকে 'গাগ্-গাগ্-গাগ্'। সকাল-সন্ধ্যেয় উড়তে উড়তে জোরে ভেঁপুর মত নানা স্বরগ্রামে ডাকে— আংগ-আ-আংগ্-আংগ্। পরিযায়ীর সময়েও এটা শোনা যায় বিশেষত রাত্রে, যা আমি শুনেছিলাম।

কাদম্ব রীতিমত সঙ্ঘচারী। দিনের বেলায় হয় পারিবারিক দলে, না হয় সঙ্ঘবদ্ধভাবে মাটিতে পেট ঠেকিয়ে বিশ্রাম নেয়। কখনও দেখা যায় এক পায়ে খাড়া হয়ে পলিমাটিতে দাঁড়িয়ে আছে, কখনও বা মাথাটা পিঠের মধ্যে গুঁজে দিয়ে জলের উপর ভেসে চলেছে। কিন্তু সব সময়ে সজাগ। অসতর্ক মুহূর্তে কখনও দেখা যায় না। একদম কাছে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব হয় না। রাতেই এরা বেশি কর্মঠ এবং রোদ ওঠার পরও তাদের ব্যস্ততা যায় না। ওড়ে হয় ইংরেজী V-র মতো শ্রেণীবদ্ধ হয়ে, না হয় একের পর এক ফিতের মতো লম্বা হয়ে উঁচু-নিচু হতে হতে। শূন্যমার্গে উড়তে উড়তে নানারকম খেলাতেও মত্ত হতে দেখা যায়। কখনও একপাশে হেলে উড়ে চলেছে, কখনওবা সম্পূর্ণ উল্টে যায় পিঠটাকে নিচে রেখে। আবার দেখা যায় যেন কোন অদৃশ্য শত্রু তাড়া করেছে, আর তার হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে উপর থেকে নিচে নামছে সোজা নাক বরাবর ডাইভ দিয়ে।

প্রজননকাল— সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। মনে হয় বাদি হাঁস বা কলহংসের মতই হবে।

বাদি হাঁস (Bar - headed Goose)

ভারত ভাগ হয়েছে। আসাম যেতে হলে পার্বতীপুরে গাড়ি বদল করে যাওয়া চলে না। ওটা পূর্ব পাকিস্তানের এলাকা। তখন আসাম যেতে বিহারের সাহেবগঞ্জের সকরিগলি ঘাটে এসে স্টিমারে

গঙ্গা পার হয়ে মণিহারি ঘাটে নেমে বালির উপর দিয়ে হেঁটে ট্রেনে উঠতে হত। বালির উপরেই ছিল লাইন পাতা।

বর্ষায় সেই লাইন শুকনো জায়গায় নিয়ে যেত। সেই সময় এক শীতে আসাম থেকে ফিরছি, মণিহারি ঘাটে যখন পৌছলাম তখন সবে সূর্য উঠছে। সকরিগলি ঘাট থেকে স্টিমার এপারে এসে পৌছয় নি, কি একটা যান্ত্রিক গোলযোগ হয়েছে। আসতে নাকি দেরি হবে।

এই সুযোগে আমার জিনিসপত্র একজনের জিম্মায় রেখে গঙ্গার পাড় ধরে পশ্চিমমুখো চলেছি। পরিষ্কার গঙ্গার জল। ধবধবে সাদা বালি। বেশ দূরে দেখলাম কয়েকটা রাজহাঁসজাতীয় হাঁস। গুনে দেখলাম পাঁচটা। একদম জলের কিনারায় গোটা দুই এদিক-ওদিক গজেন্দ্রগমনে ঘুরছে, মাঝে মাঝে লম্বা গলা বাড়িয়ে বালিতে যেন কি খুঁজছে। আর বাকি তিনটে চুপ করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে জলের দিকে চেয়ে। ভাল করে দেখার ও চেনার জন্যে সন্তর্পণে এগিয়ে চলি, কারণ সঙ্গে দূরবীনটা নেই। দেড়শ' কি দুশ গজ দূরত্বে পৌছতেই তারা একটু সচকিত হল, কিন্তু আমায় দেখে উড়ল না বা জলে গিয়ে পড়ল না।



চি 114. বাদি হাঁস

দেখলাম এরা রোগাটে ধরনের কালো-পাটকিলে আর সাদা মেশানো রাজহাঁস, কেননা পাতিহাঁসের (ডাক) চেয়ে বেশ বড়ো, মাথার পিছনে উপর-নিচ করে দুটো কালো টান। ওপার থেকে স্টিমার আসছে। আর ওদের ভালো করে দেখা হল না। ফিরতে হল।

দুই টানের জন্যে চিনতে ভুল হল না। ছবিতে ও আলিপুরের চিড়িয়াখানায় এদের সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছে। পাখিগুলি সন্তরক বর্গে (আনসেরিফরমেস) হংস বংশের (আনাটিদি) অন্তর্গত হংস গণের (আনসার) *এক প্রজাতি*, নাম— বাদি হাঁস, কড় হাঁস (আনসার ইন্ডিকাস), সংস্কৃতে কলহংস, ইংরেজি— *বারহেডেড গুজ।*

বাদি হাঁস বা কলহংস লম্বায় 75 সেমি.। মাথা, মুখ, গলা, চিবুক সাদা এবং ধূসর-পাটকিলে গলার দু-পাশ দিয়ে নেমে এসেছে সাদা টান। একটা কালো টান গিয়েছে এক চোখের পাশ থেকে মাথা ঘুরে অন্য চোখের পাশে। আর একটি কালো টান প্রথমটির একটু নিচে ঘাড়ের উপর দিয়ে ঘুরে এসেছে। চঞ্চু এবং জালপাদ পা হলুদ। পায়ের পাতা থেকে বেরনো নখ কালো। কনীনিকা পাটকিলে। নাসারন্ধ্র কালো। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান— একমাত্র লাডাখ অঞ্চলে, অন্যত্র শীতের অতিথি। অক্টোবর-নভেম্বর থেকে পরিযায়ী অবস্থায় দেখা যায় উত্তর ভারতের সর্বত্র, পাকিস্তান ও কাশ্মীর থেকে পাঞ্জাব, রাজস্থান, নেপাল তরাই সহ গাঙ্গেয় উপত্যকা ধরে আসাম ও বাংলাদেশ, মাঝে-মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেও। এক এক বছর

উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদে হাজারে হাজারে এসে উপস্থিত হয়। গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে কচিৎ দেখা যায়, কিন্তু দক্ষিণে মহীশূরে প্রায় প্রতি বছরই ছোট দলে আসে। শ্রীলঙ্কায় কিন্তু কখনও যায় না। হাজির হয় বড়ো বড়ো ঝিল ও নদীতে। ভারতের বাইরে মধ্য এশিয়ার হ্রদগুলি অর্থাৎ তিয়েন-শান থেকে কোকোনর এদের আবাসভূমি। কখনও-সখনও সেখান থেকে শীতে বর্মা পর্যন্ত পাড়ি দেয়। মার্চের শেষে সব জায়গা থেকেই এই পরিযায়ী হাঁসেরা ফিরে যায় নিজের আবাসভূমিতে। এদের সঙ্গে আরও একটি রাজহাঁস ভারতে আসে, তার নাম কাদম্ব (আনসার আনসার রুবরিওর স্ট্রিস), ইংরেজি— *গ্রেল্যাগ গুজ*। এদের চেয়ে আকারে একটু বড় ৪১ সেমি.। রঙেও অল্পমাত্রায় বাহার আছে।

খাদ্য— বাদি হাঁস পুরোপুরি নিরামিশাষী। ঘাস, মূল, গম, ভুট্টা, ধান এবং শীতের অন্যান্য শস্য। চরে খাবার সময় একটু গুরেলা নাকি সুরে ডাকে —'গাগ-গাগ-গাগ'। সকাল-সন্ধ্যায় যখন ওড়ে তখন খুব মিষ্টি করে উঁচু-নিচু গ্রামে ভেঁপুর মত ডাক দেয়-'আহং-আং-আং'। পরিযাত্রীর সময়েও এই ডাক ডাকে।

স্বভাব— পাঁচ-ছয়ের পারিবারিক দলেও যেমন দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় এক এক দলে একশ'রও বেশি। খাদ্য সংগ্রহ করে গোধূলিতে ও রাতে। শীতের শস্যের বেশ কিছু ক্ষতিও করে। দিনের বেলা বেশির ভাগ সময়ে বড় নদীর বালির চড়ায় বিশ্রাম করতে দেখা যায়, কিন্তু সব সময়েই সজাগ। সন্দেহজনকভাবে মানুষের বা অন্য কোনও পশু আসছে টের পেলেই নিরাপদ স্থানে উড়ে যায়। শিকারীদের বন্দুকের গুলির জন্যেই এটা হয়েছে। বোধহয় আমাকে মুক্তহস্ত দেখে অতটা সজাগ হয় নি। বইয়ে পড়েছি যেখানে ওদের উপর হামলা হয় না অর্থাৎ তিব্বতে, মানুষকে খুবই কাছে আসতে দেয়। 1945 সালে চীন সৈন্য প্রবেশের পর কী অবস্থা ওদের হয়েছে তা জানি না।

প্রজননকাল— মে-র শেষ থেকে জুন। লাডাখ অঞ্চলে 4300 মি. উচ্চতায় পাঙগংগা ৎসো মোরিরি ও ৎসোকর হ্রদে ওদের বাসা বাঁধার স্থান। বাসা বাঁধে নরম মাটির মধ্যে পা দিয়ে চেপে চেপে অল্প খোঁদল করে, তারপর ঐ খোঁদলের চারদিকে একটা আলসে বানিয়ে নেয়। এই বাসা তারা তৈরি করে হ্রদের মধ্যের ঘাসের ছোট ছোট ঢিবির উপর, অথবা জলার ধারে পাঁকের উপর। পর পর অনেকগুলি বাসা দেখা যায়। আবার পাহাড়ের খোঁদলে চকাচকির (ব্রাহ্মনি ডাক) পরিত্যক্ত বাসাতেও নিজেদের বাসা বাঁধে।

এক বার দেখা গিয়েছিল ৎসোকর হ্রদের ধারে ডোমকাকের (র‍্যাভেন) অব্যবহৃত বাসা পা দিয়ে চেপে বসিয়ে দিয়ে বাসা বেঁধেছে। ডিম পাড়ে 3 থেকে 6টি (এটাই বেশি), শক্ত খোলার গজদন্ত বা আইভরি-সাদা রঙের। তা' দেবার সময় পায়ের কাদা লেগে ডিম মলিন হয়ে ওঠে। একমাত্র স্ত্রী-পাখিই ডিমে তা' দেয়, কিন্তু 28 -30 দিনে ডিম ফুটলে পুরুষ-পাখি বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণের দিকে খুব দৃষ্টি রাখে। বাচ্চারা যখন বাপ-মার ঠিক পিছনে লাইন দিয়ে সাঁতার কেটে চলে, তখন মনে হয় বাপ-মার পিছনে যেন পশমের একটা লম্বা লেজ চলেছে।

চকা-চকি (Ruddy Shelduck)

1950 সালের শীতের এক সকালে খুড়ো অর্থাৎ খুড়ো-শ্বশুর প্রমথনাথ গুহরায়ের সঙ্গে গিয়েছি মানিকতলায় বেঙ্গল কেমিক্যালের পিছনে খাল পার হয়ে লবণ হ্রদে। যাকে চলতি কথায় বলতাম বাদা সেখানে, খালের ধারে নৌকোর পারাণীর ঘরে শহুরে জামাকাপড় ছেড়ে জলজঙ্গলের সাজ পরে নৌকোয় খাল পার হয়ে নেমেছি। আলোর উপর দিয়ে বেশ খানিকটা চলার পর নজরে এল এক জোড়া হাঁস, খোলের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। দূর থেকে দেখছি পাতিহাঁসের মতই বড়ো। কমলা-পাটকিলে দেহ, মাথা ও গলা খুবই ফিকে প্রায় সাদাটে। ডানায় বেশ উজ্জ্বল ধাতব-সবুজ আয়না। একটা সাদা ছোপ ঐ আয়নার আগে। ডানা ও লেজ কালো। আগেও এই পাখিকে কলকাতার চিড়িয়াখানায় দেখেছি। যেটির মাথা ও গলা বেশি ফিকে, সেটি স্ত্রী-পাখি।



চি 115. চকা-চকি

এই পাখি-জোড়া হংস বংশের (আনাটিদি) অন্তর্গত উপচক্র গণের (টাডোর্না) *এক প্রজাতি।* নাম— চকা (পুরুষ), চকি (স্ত্রী) (টাডোর্না ফেররুগিনি)। হিন্দি— *সুরখাব, লাল,* ওড়িয়া— *কেশর পাণ্ডিয়া, পাণ্ডা হন্‌স ;* তেলেগু— *বাপনত্ত্ব চিলুওয়া,* তামিল— *থরো,* মারাঠি — *সরজা,* ইংরেজি— *ব্রাহ্‌মিনী ডাক, রাড্ডি শেলডাক।* লম্বায় 66 সেমি. (26 ইঞ্চি)।

বাসস্থান— লাদাখ। অক্টোবর-নভেম্বরে শীতে পরিযায়ী হয় সমগ্র ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপালে (সম্ভবত এখানেও বাসা বাঁধে), মাঝে-মধ্যে শ্রীলঙ্কায়। দেখা যায় বড়ো উন্মুক্ত জলাশয়ে এবং নদীতে যার ধারে আছে কর্দমাক্ত পাড়। বাসা বাঁধে দক্ষিণ স্পেন এবং দক্ষিণপূর্ব ইউরোপ থেকে পুবে কাশ্যপ সাগর। সেখান থেকে এশিয়ার ট্রান্সবৈকালিয়া পর্যন্ত, দক্ষিণে হিমালয় এবং দক্ষিণপশ্চিম চীন, দক্ষিণপূর্ব ইরান এবং সিস্টানে। শীত কাটায় আফ্রিকার নীল উপত্যকা, ভারত এবং দক্ষিণ চীনে, মাঝে-মধ্যে ব্রিটেনেও।

স্বভাব— অন্যান্য হাঁসেদের চেয়ে এরা কম সংঘবদ্ধ হয়। সাধারণত জোড়ায় না হলে খুব ছোটো দলে ঘোরাফেরা করে। বিশ বা ত্রিশের দল খুবই কম দেখা যায়। কিন্তু ওড়িশার চিল্কা হ্রদে একবার একসঙ্গে জমায়েত হয়েছিল 15000। স্বভাবে এরা বেশ মারমুখী। নিজেদের দলের ভিতর বা অন্যান্য জাতের হাঁসের সঙ্গে খাদ্য নিয়ে লড়াই একদম পছন্দ করে না। শীতের বাসস্থানে এদের কাছে যাওয়া অসম্ভবের পর্যায়ে। কাছে যাবার চেষ্টা করলেই বিপদের আশঙ্কায় উড়ে পালায় এবং অন্যান্য

হাঁসেদের জানান দিয়ে দেয়। কিন্তু মজা এই যে নিজ প্রজননভূমি লাদাখ ও তিব্বতের নানা জায়গায়, বৌদ্ধদের কাছে কোনোরকম বিপদের আশঙ্কা না থাকার জন্যে এরা তিব্বতীদের বাড়ির ছাদে এমনকি মালগুদামের ভিতরে বাসা বাঁধে। চলা-ফেরাটা খুবই স্বচ্ছন্দের। নদীর শুকনো পাড় বা হ্রদের কূলে ঘেসো জমিতেও চরে।

খাদ্য— এরা সর্বভুক। ধান, যব, ছোটো আগাছা, কন্দ, কবচী, কম্বোজ, জলজ কীট, সরীসৃপ প্রভৃতি খেয়ে থাকে। শোনা যায়, যদিও সম্পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায় না, যে এরা সময়ে সময়ে শকুনদের সঙ্গে মৃত মাংসও ভোজন করে থাকে।

ডাকে— জোরে নাকি সুরে 'আ আংগ আ-আংগ' করে। অনেকটা দূর থেকে কাদম্বের ডাকের মতন শোনায়। মাটিতে থাকলেও যেমন এই ডাক শোনা যায়, তেমনই শোনা যায় উড়তে উড়তেও।

বাসা বাঁধে 4000 মিটার উচ্চতায় লাদাখের হ্রদ বা জলায় পাংগংগ, ৎসোকর এবং ৎসো মারিরি-তে। খুব সম্ভব নেপালের খুম্বু অঞ্চলে 5000 মি. উচ্চতাতে বাসা বাঁধে। মে-জুনেই বাঁধে পাহাড়ের চূড়ার কাছে গর্তে বা খাঁজে। বাসাতে স্ত্রী-পাখির বুকের পালকের আস্তরণ বিছায়। প্রায়ই দেখা যায় বাসা জল থেকে বেশ উঁচুতে। এইসব দুর্গম জায়গায় যখন উড়ে গিয়ে বসে বা বাসায় ঢোকে, তখন মনে হয় ঠিক যেন একটা পায়রা গিয়ে বসছে। খুবই সুন্দর দেখায়। ডিম পাড়ে 6 থেকে 10টি, হাতির দাঁতের মতো সাদা, বেশ চওড়া গোলাকার। ডিমের গড় মাপ 67·0 × 47·0 মিমি.। স্ত্রী-পাখি একাই ডিমে তা' দেয়। ডিম ফুটতে সময় নেয় 28-30 দিন। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই সন্তান প্রতিপালন করে। প্রায়ই দেখা যায় এক বারের বেশি ডিম ফুটিয়ে সন্তান প্রতিপালন করতে। বাচ্চারা টলমল করতে করতে পাহাড়ের উপর থেকে নিচে জলে এসে পড়ে।

এদের মাংস স্বাদহীন এবং ভীষণ আঁসটে গন্ধযুক্ত বলে শিকারীরা এদের মারে না।

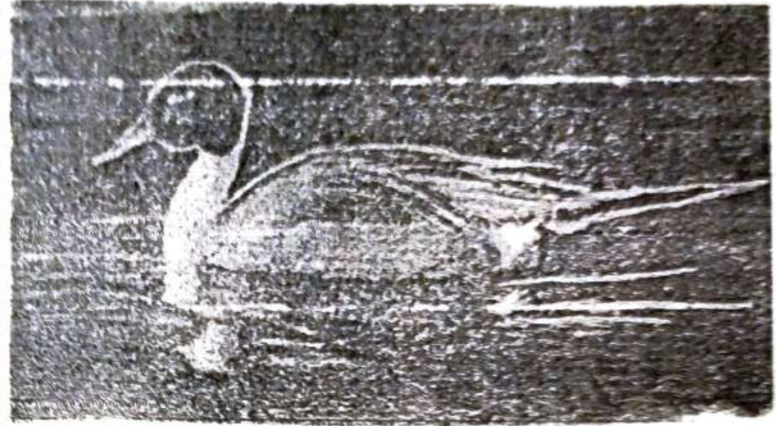
চকা-চকিকে নিয়ে অনেক উপকথা আছে। তার মধ্যে দু'জনের বিচ্ছেদের কথাও আছে। এই বিচ্ছেদের সময়ে তারা নদীর এপার থেকে ওপারে দুঃখের সঙ্গে একে অপরকে ডাকাডাকি করে।

দিগহাঁস (Northern Pintail)

শীতকালে পরিযায়ী হয়ে যেসব পাখির দল বাদায় আসত, তাদের সংগ্রহ করতাম। (চিনতে জানতে)। আভ্যন্তরীণ কলকব্জাও জানা আর আস্বাদনও ঘটত।

বুঝতে চেষ্টা করতাম এরা কেন পরিযায়ী হয়? কোন্ সুদূর দেশে এদের বাসস্থান-তা ছেড়ে কেন এবং কিসের তাগিদে এরা আসে? শুধু কি ওখানকার শীতে খাদ্যসঙ্কট সৃষ্টি হয় বলেই আসে? না সহস্র সহস্র বছর আগে হিমবাহের সময় তারা উত্তর থেকে দক্ষিণে সরেছিল, সেটা রয়ে গেছে তাদের 'জিনস্-এ, না অন্য কিছু? কিছু গ্রন্থির হেরফেরের ফলেই কি আসে? তার জন্য বিভিন্ন সময়ে একই জাতের পাখি মেরে দেখতাম। একটা জিনিস লক্ষ্য করতাম, বিদেশী বইয়ে যেসব পুরুষ-পাখির ছবি দেখতাম তার সঙ্গে আমাদের দেখা পুরুষ-পাখির চেহারা কখনই মিলত না। প্রায় স্ত্রী-পাখির মতই চেহারা দেখতাম। অনেক সময় শব-ব্যবচ্ছেদের পর জেনেছি এরা পুরুষ।

আরও পরে জেনেছি পরিযায়ী হবার আগে নিজের আবাসভূমি ছাড়ার আগে দূর দেশে পাড়ি দেবার জন্যে দেহে চর্বিসংগ্রহ করার সময় এরা দেহের রঙ পাল্টায়। নিজ রঙ চাপা দিয়ে একটা বোরখা পরে। পক্ষিতত্ত্বে তাকে বলে 'ম্যাণ্ট্‌ল' পরা।



চি 116. দিগহাঁস

একদিন দেখি দু-নম্বর খোলের মাঝখানে পাড় থেকে অনেক দূরে গোটা কয়েক হাঁস শরালের ঝাঁকের কাছাকাছি ঘুরছে। শরালদের চেয়ে অনেক বড়। লেজটা সূঁচলো এবং লম্বা। অর্ধেক দেহ জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে লেজটাকে সাবমেরিনের পেরিস্কোপের মত খাড়া করে খাদ্যসংগ্রহ করছে। দেখাচ্ছে ভারি মজার। যিনি আমার সঙ্গে বাদা পরিক্রমায় সর্বদা সঙ্গী হতেন তিনি বললেন, ওগুলো কি হাঁস? আলপিনের মত সরু লেজা হাঁসের ছবি দেখা ছিল বলে বলতে পারলাম দিগহাঁস।

বন্দুকের পাল্লার বাইরে ছিল বলে জলে নামলাম। পাল্লার মধ্যে যাওয়ার জন্যে একটা ভাসমান ঘাসের চাপড়ার উপর বন্দুক রেখে সেটাকে ঠেলে নিয়ে চললাম। খালি গা, মাথায় গামছা বাঁধা। এই পোশাকে সুবিধে এই যে হাঁসেরা শিকারী বলে বোঝে না। তারা নিশ্চিন্তে বিচরণ করে।

পাল্লার মধ্যে এসে গেলাম। কিন্তু এক লাইনে কাউকে পাচ্ছি না। শেষে দুটোকে পেলাম। গুলি ছুঁড়তেই দুটি পড়ল, বাকিগুলো উড়ল। ওড়ার মুখে দ্বিতীয় ব্যারেলের গুলি ছুঁড়লাম। গায়ে লাগল না। অসম্ভব দ্রুতবেগে বাকিরা উড়ে দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল।

হাঁস দুটোকে তুলে নিয়ে এলাম। একটা হাঁস পাটকিলে। ঈষৎ পীতাভ রঙে চিত্রবিচিত্র করা, লেজটা সরু কিন্তু আলপিনের মত সরু নয়। বুঝলাম এটা স্ত্রী-পাখি। আর একটি হুবহু তাই তবে লেজটা আলপিন সরু এবং সারাদেহে গাঢ় ছাই-ধূসরের আভা। এটা পরিযায়ীর বোরখা পরা পুরুষ।

এরা হংস বংশের (আনাটিদি) অন্তর্গত ক্রামিক (আনাস) গণের এক প্রজাতি। নাম— দিগহাঁস, বড়ো দিগর, শোলবড় (আনাস আক্যুটা), হিন্দী— *সানদ, সীনখ্‌পার*, ওড়িশী— *নানচা নানজা*, ইংরেজি— *পিনটেইল*। লম্বায় 56-72 সেমি.। পূর্ণবয়স্কের দেহ লম্বাটে, গলা সরু, লেজের মাঝের পালক সরু লম্বা আলপিনের মত। মাথা, মুখ ও গলা গাঢ় পিঙ্গল, ঘাড়ের পিছন কালো, ঘাড়ের দু'দিকে একটা সাদা পটি সরু থেকে চওড়া হয়ে নেমে বুক ও পেটের সঙ্গে মিশে গেছে। উপরের পালক এবং দেহের দু'পাশ প্রধানত ধূসর ও খুব চিকন কালো কালো টানে ছাওয়া। লেজের উপরিভাগ ও পিঠের পালকের শেষের পালকের মাঝখান কালো, ধার রূপোলি-ধূসর। ডানার ধারের পালক ধাতব তামাটে-সবুজ। কনীনিকা গাঢ় পিঙ্গল, চঞ্চু সীসে-ধূসর, তলার চঞ্চুর গোড়া একটু গাঢ়। পা এবং আঙ্গুল গাঢ় সীসে-ধূসর। ঝিল্লি ও নখর কালচে।

বাসস্থান— উত্তর ইউরোপ, উত্তর এশিয়া এবং উত্তর আমেরিকায়। শীতে পরিযায়ী হয় উত্তর আফ্রিকা, ইথিওপিয়া, পারস্য উপসাগর থেকে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, সিংহল, বর্মা, শ্যামদেশ ও দক্ষিণ চীনে। আমরা যাদের দেখি তারা সাধারণত 5 হাজার কিমি. পাড়ি দিয়ে আসে নভেম্বরের মাঝামাঝি, ক্যাসপিয়ন সাগরীয় অঞ্চল এবং সাইবেরিয়া থেকে।

মরসুমের শুরুতে স্ত্রী-হাঁসই আসে বেশি। স্বভাবে সদাই শঙ্কিত ও ব্যস্ত এবং উড়ে পালাবার জন্য প্রস্তুত। প্রয়োজনে ঘণ্টায় 104 কিমি. বেগে পর্যন্ত ওড়ে।

খাদ্য— প্রধানত ঘাস, জলজ গাছের ডগা ও বীজ এবং ধান। সেই সঙ্গে কিছু কবচী, জলজ পোকা ও তার শূক। দিনের শেষে বিশ্রামের জন্য জলা ছেড়ে চলে যায়। প্রধানত রাত্রেই খাদ্য সংগ্রহ করে, অন্য জলের ধারের ধানখেতে বা আগাছাপূর্ণ ঝিলে।

যে হাঁস দুটোকে মেরেছিলাম তার পুরুষটার ওজন ছিল এক কিলো, স্ত্রী-র 750 গ্রামের মত। তার মাংস ছিল খুবই সুস্বাদু।

নীলশির (Mallard)

পৌষ-মাঘের শীতের শেষরাতে চারটে নাগাদ বাদায় যাবার জন্য প্রস্তুত হতাম। বাসে চেপে বেঙ্গল কেমিক্যালের সামনে নেমে একটু হেঁটে পৌঁছতাম খালের ধারে। সেখানে ছিল পারানীর ঘর। সেই ঘরে সভ্যসমাজের পোশাক ছেড়ে নীল রঙের জিনের বিশেষভাবে তৈরি করা প্যান্ট পরতাম, গোড়ালির ঠিক উপরে যার দড়ি বাঁধা যেত। এভাবে তৈরি করা প্যান্ট না পরলে জলে চলতে-ফিরতে ঝাঁঝিতে পা-হাটু ছড়ে যেত। গায়ে থাকত গেঞ্জি ও পুলওভার। খালি পা, মাথায় গামছা বাঁধা, তাতে গোঁজা তিন আর চার নম্বরের টোটা, হাতে ডবল ব্যারেল বন্দুক, তাতে দুটো গুলি ভরা।



চি ।।7. নীলশির

একবার এই অপরূপ সাজে নৌকো করে খাল পার হয়েছি। পাড়ের কাছাকাছি কিছু মৎস্যজীবীর ঘর। দু'পাশে জল, মাঝখানের আল দিয়ে এসে পড়লাম প্রায় দু'মানুষ উঁচু নলখাগড়ার ঝোপের মধ্যে। এখানে আর বসতি নেই।

নলখাগড়ার আড়ালে কোরাদের (ওয়াটারকক) 'কুঁক-কঁক' আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। পুব আকাশ নীল হতে শুরু করেছে। খুব সন্তর্পণে নলখাগড়ার ঝোপের পাশ থেকে উঁকি মেরে দেখি, কোরারা ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছে। হঠাৎ নজরে পড়ল আরেকটা ঝোপের পাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে গোটা দশেক হাঁস। আকারে পাতিহাঁসের মত। কাছে বসতি নেই তাই বুনো।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি পাটকিলে আর অল্প হলদেটের উপর কালোর ছিট আর সরু সরু টান। এই সময়ে আমার সঙ্গী উত্তেজিত হয়ে দেখতে গিয়ে পা হড়কালেন। শব্দে হাঁসগুলো জল ছেড়ে সোজাসুজি উড়ল। আমি বন্দুকের সেফটি-ক্যাচ টেনেই রেখেছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে নিশানা নিয়ে দুটি ঘোড়াই টিপে দিলাম। উড়ন্ত হাঁসগুলির মধ্যে চারটে জলে পড়ল।

ডাঙ্গায় উঠে ভাল করে দেখলাম, চিবুক, গলা, ঘাড়ের উপরদিক ঈষৎ পীতাভ, চোখের উপর দিয়ে কালো রেখা গেছে কিন্তু তা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা। পা ও আঙুল কমলা, নখর কালো, কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু মলিন সবজেটে-হলুদ, গোড়া হলদেটে। এই হাঁস আগে কখনও দেখি নি।

বাড়ি ফিরে মাপলাম চঞ্চুর আগা থেকে লেজের ডগা 24 ইঞ্চি, চঞ্চু 2 ইঞ্চি, ডানা এক-একটা 11 ইঞ্চি, এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তর মাপ প্রায় 3 ফুট, লেজ 3 ইঞ্চি, লেজের চারটে পালক উপরদিকে তোলা।

বই ঘাঁটি নাম জানার জন্যে। জার্ডনের বই (1864) খুঁজে চেহারার বর্ণনা ও ছবিতে যা দেখি, তাছাড়া বাকি মাপজোক ও বৈশিষ্ট্য দি ম্যালার্ড হাঁসের সঙ্গে মেলে। তাছাড়া তিনি ফতোয়া দিয়েছেন, 'বঙ্গদেশে এখনও দেখা যায় নি'। মহা মুশকিল!

বহু পরে জেনেছি এই রূপ পরিযায়ীর বোরখার। নাম— নীলশির (আনাস প্লাটাইর হাইঙ্কস), ইংরেজি— *ম্যালার্ড।*

পূর্ণরূপে দেহের বেশির ভাগ ধূসর, তার উপর পেনসিল টানা আঁকিবুকি লাইন কালো। মাথা, গলা ও ঘাড় ধাতব উজ্জ্বল গাঢ় সবুজ, সরু কলার সাদা, তার নিচে বাদামী বুক; বস্তিপ্রদেশ, লেজের আচ্ছাদক ও মাঝের উপরদিক করা দুটি পালক কালো। ডানার মাঝে আয়নার মতো জায়গা ধাতব বেগুনি-নীল, তার চারধারে সরু কালো ও সাদা পটি।

বাসস্থান— সমগ্র ইউরোপ ও এশিয়ার উত্তর ভূখণ্ড থেকে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশসমূহে। শীতে ভারতের দিকে পরিযায়ী হয় নিম্নসিন্ধু থেকে পুবে উত্তরপ্রদেশ, নেপাল, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ থেকে আসাম, দক্ষিণে উত্তর ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট এবং উত্তর মহারাষ্ট্রে। কাশ্মীরে কিছু নীলশির পাকাপাকিভাবে বাস করেছে। কাশ্মীরে পুরুষ-পাখি প্রায় প্রথমদিকে জোরে 'কোয়াক' ডেকে তারপর পর্দা আস্তে আস্তে নামাতে থাকে। স্ত্রী-পাখি খুব দ্রুত 'টাকাটা-টাকাটা' বলে ডাকে, বিশেষত খাদ্যান্বেষণে সফলতা পেলে। ভারতে নীলশির আসে প্রধানত সাইবেরিয়া থেকে 80 কিমি. বেগে। স্বাভাবিক ওড়ার বেগ 48 কিমি.।

খাদ্য— প্রধানত জলজ আগাছার কচি ডগা, বীজ ও ধান। অল্পকিছু কবচী, ব্যাঙাচি, মাছের ছোট পোনা, পোকা ইত্যাদি।

নীলশিরই গৃহপালিত হাঁসের পূর্বপুরুষ। সেই কারণে প্রায়ই এই চেহারার পাতিহাঁস দেখা যায়। সাধারণত 10 12 আবার 40-50 -এর দলেও দেখা যায়। নিশাচর। হাঁটতে পারে বেশ। জলে ডুবে খাদ্য সংগ্রহ না করলেও আহত হলে ধরা পড়ার ভয়ে ডুব সাঁতার দিতে খুব পটু।

কাশ্মীরে ডিম পাড়ে 6-10টি, সবজেটে ধূসর। স্ত্রী-পাখিই ডিমে তা' দেয়। ডিম ফোটে 26 দিনে।

মেটে হাঁস (Spot-billed Duck)

পশ্চিমবঙ্গের নানা জলায় একটি হাঁসকে দেখতাম। হুগলী, হাওড়া, নদীয়া, চব্বিশ পরগণা, যেখানেই হোক। এরা পরিযায়ী হাঁস নয়। আমাদের দেশের স্থানীয় হাঁস। নাম— মেটে হাঁস (আনাস পোএকিলোর হাইঙ্কা) ; হিন্দি— *গুগরাল* ; ইংরেজি— *স্পটবিল ডাক*। লম্বায় 61 সেমি. (24 ইঞ্চি)।

মেটে হাঁস আমাদের পাতি হাঁসের মতই বেশ বড়োসড়ো, উপরাংশ আঁকাড়ি-বাঁকাড়ি করা জরদাভ-ধূসর এবং গাঢ় পাটকিলে। ডানায় ধাতব-সবুজ আয়না, তার উপর ও নীচে সাদা-কালো পট্টি, পিছনের দিকে চওড়া সাদা পটি, সেটা ওড়ার সময় ভালো দেখা যায়। উজ্জ্বল প্রবাল-লাল পা ; ডগায় হলুদ ছোঁওয়া কালো চঞ্চু, কপালের দু'পাশে চঞ্চুর গোড়ায় কমলা-লাল ছোপ। স্ত্রী-পাখি আকারে অল্প ছোটো এবং তার দেহের রং কিছুটা নিষ্প্রভ। কনীনিকা ফিকে থেকে গাঢ় পাটকিলে। চঞ্চু কালো, কিছুটা অংশ কমলা-হলুদ, চঞ্চু গোড়ার দু'পাশ প্রবাল-লাল ; পা ও আঙুল গাঢ় প্রবাল-লাল, নখর কালো।



চি 114. মেটে হাঁস

বাসস্থান— সব জায়গায় বেশি দেখা না গেলেও খুবই সাধারণ জাতের হাঁস। এরা স্থানীয়ভাবে পরিযায়ীও হয়। বেশ কিছুটা ছড়ানো-ছিটনো অবস্থায় এদের প্রায় সারা ভারতেই 1200 মি. উচ্চতার মধ্যে। নিম্ন সিন্ধু নদের পূর্বাংশ এবং কাশ্মীর (1800 মি. উচ্চতা) থেকে পশ্চিম আসাম ; দক্ষিণে মহীশূর, মাঝে মাঝে শ্রীলঙ্কায়। দেখা যায় যে কোনো নলখাগড়াপূর্ণ ঝিল, অগভীর আগাছাপূর্ণ পুষ্করিণী ইত্যাদিতে, কখনও-সখনও নদীতেও।

স্বভাব— প্রায় নীলশিরের মতই। দেখা যায় জোড়ায়, পারিবারিক বা ছোটো-খাটো দলে। ভালোই ওড়ে কিন্তু ওড়ার আগের ধরণটা স্বচ্ছন্দের নয়, তবে সোজাসুজি ওড়ে। জলে বিশেষ ডুব দিতে পারে না। খাদ্য সংগ্রহ করে হেঁটে-চলে, অল্প জলে বিশেষত জলজ ধান খেতে। দেখায় পিছনটা উপরে তুলে জল-কাদার মধ্যে খাদ্য খুঁজছে। মাঝে মাঝে জলের ভিতর আগাছার মধ্যে গিয়ে একেবারে দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যায়।

খাদ্য— প্রধানত উদ্ভিজ, যেমন জলজ আগাছার ডগা, বীজ, বুনো বা চষা ধান ইত্যাদি। খাওয়ার চেয়ে পায়ের চাপেই ধান খেতের বেশ ক্ষতি করে। কখনও বা জলজ পোকামাকড় ও তাদের শূক ইত্যাদি খায়। অনেক সময় পেটের মধ্যে জলজ শামুকের (ভিভিগার বেঙ্গলেনসিস ?) অংশও পাওয়া গেছে।

ডাক— নীলশিরের ডাক থেকে আলাদা করা শক্ত। পুরুষের গলায় একটা অস্পষ্ট ঘড়ঘড়ে আওয়াজ হয়। স্ত্রী-পাখি ডাকে জোরে 'কোয়াক' করে, বিশেষত আচমকা অবস্থায় এটা ডেকে থাকে। এমনিতে চুপচাপই থাকে।

প্রজননকাল— ঠিক স্থিরতা হয় নি। সবটাই নির্ভর করে জলজ অবস্থার উপরে, তবে সাধারণত দেখা যায় জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যেই। দাক্ষিণাত্যে নভেম্বর-ডিসেম্বরে। মনে হয় এরা দু'বার বাচ্চা তোলে। বাসা বাঁধে ঘাস বা আগাছার চাবড়া দিয়ে। মাঝে মাঝে অল্প কিছু পালকের লাইনিং দেয়। লুকনো বাসা জলার ধারে আগাছার মধ্যে লুকনো অবস্থায় থাকে। ডিম পাড়ে 6 থেকে 12 টা, সাধারণত 7 থেকে 9টি ধূসরাভ-জরদ বা সবুজাভ-সাদা, কিছুটা চওড়া গোলাকার প্রায় নীলশিরের ডিমের মতই দেখতে। গড় মাপ 56˙0 × 42˙3 মিমি.। ডিম ফুটতে 24 দিন সময় লাগে। পুরুষ ডিম ফোটানোতে কতটা সাহায্য করে তা এখনও জানা যায় নি' তবে সে স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ ও সন্তানদের তত্ত্বাবধানে বেশ যত্নশীল।

শরাল (Lesser Whistling-duck)

প্রায়ই শোনা যায় যাযাবার পাখির দল হাজির হয়েছে। এই পাখিরা কেউই যাযাবর নয়। কারণ এদের নির্দিষ্ট বাসস্থান আছে। 'হিমেল হাওয়া গায়ে লাগতেই' এরা ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে ছুটি কাটাতে নিম্ন পশ্চিমবঙ্গে আসে। ছুটির শেষে অর্থাৎ শীতের শেষে ফিরে যায় নিজেদের নির্দিষ্ট বাসস্থানে। যেমন আমরা ছুটিতে চেঞ্জে যাই বিভিন্ন জায়গায়, আবার ফিরে আসি নিজেদের ডেরায়, ঠিক তেমনি। অনেকের বিশ্বাস এরা সুদূর উত্তর থেকে হিমালয় পার হয়ে আসে, তা কিন্তু আসে না।

ফেলে আসা দিনের কথা মনে পড়ল। তখন আমার বয়স সাত কি আট। মাঝেমাঝে কোন পর্ব উপলক্ষে দেশ থেকে কলকাতায় আমাদের বাড়িতে আত্মীয়স্বজনরা আসতেন। একবার এসেছিলেন আমার ছোটো পিসিমা।

একদিন শেষরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল কারা যেন আকাশপথে উড়ে যাচ্ছে 'সী-সিক সী-সিক' ঘুঙুরের আওয়াজ তুলে। বিছানায় উঠে বসেছি, দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দেখব, কারা যাচ্ছে উড়ে। পাশে শুয়েথাকা পিসিমা বললেন, বাইরে যাসনা। চুপ কইরা শুইয়া থাক। একদম নড়বিনা। ও পরীরা উইরা যাইতেছে, তাগোর পায়ের ঘুঙুরের আওয়াজ। ওগোর হাওয়া লাগলে আর তুই বাঁচবিনা। দেখাও পাপ। পাগল হইয়া যাইবি।

সুখলতা রাও-এর গল্পের বই, আরও গল্প, সীতাদেবী শান্তাদেবীর হিন্দুস্থানী উপকথা ইত্যাদি যা তখন পড়েছি তাতে ত এমনকথা নেই। বরং পরীরা মানুষের ভালই করে। তবে কিছু দুষ্টু পরী আছে যারা অপকার করে।

কৌতুহল অদম্য হয়ে ওঠে। রোজই শুনি, নূপুরনিক্কণ। ছটফট করি। একদিন পিসিমার ঘুম ভাঙে না। সন্তর্পণে দরজা খুলে দেখি বেশ কয়েক ঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছে। ডানার ফটফট আওয়াজের

বড় শরাল — Fulvus Whistling-Duck



চি 119. শরাল

সঙ্গে একটা ঘুঙুরের শব্দ ভেসে আসছে। পিসিমা তবু বলেন, তরে দেইখ্যা পরীরা পাখির রূপ ধরছে।

বহু পরে জেনেছিলাম এরা বক্ষহংসক গণের (ডেন্ড্রসাইগনা) এক প্রজাতি। নাম— শরাল, সরাল (ডেনড্রসাইগনা জাভানিকা), ইংরেজি— *লেসার হুইসলিং টিল, ট্রি ডাক।*

লম্বায় 42 সেমি.। মলিন পাটকিলে এবং গাঢ় তামাটে-বাদামী রঙের পাখি। চোখের পাতা উজ্জ্বল হলুদ, কনীনিকা গাঢ় পিঙ্গল, চঞ্চু স্লেট-ধূসর, পা এবং আঙুল সীসে-ধূসর, পায়ের ঝিল্লী ও নখর কালচে। ওড়ে যখন তখন মুখে ক্রমাগত আওয়াজ করে শিস দেওয়ার মত। সেই কারণে চিনতে অসুবিধে হয় না। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। এদের আরেক প্রজাতি বড় শরাল (ডে বাইকলার), ইংরেজি— *লার্জ হুইসলিং টিল*। আকারে 51 সেমি.। চেনা যায় লেজের উপরের আচ্ছাদক পালক দেখে, শরালের বাদামীর জায়গায় এদের গৌরবর্ণ। একটা কালো লাইন ঘাড়ের পিছনে এবং গলার মাঝ বরাবর মরচেধরা সাদাটে একটা পটি।

বাসস্থান— সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, নেপালের তরাই ও শ্রীলঙ্কায়। ভারতের বাইরে বর্মা থেকে দক্ষিণ চীনের সমুদ্রের ধার, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, দক্ষিণ-পশ্চিম বোর্ণিও, সুমাত্রা, জাভায়।

খাদ্য— জলজ আগাছার কচি ডগা, ধান, গম ইত্যাদি ছোটো ছোটো মাছ, ব্যাঙ, গেঁড়ি-গুগলি ও পোকামাকড়।

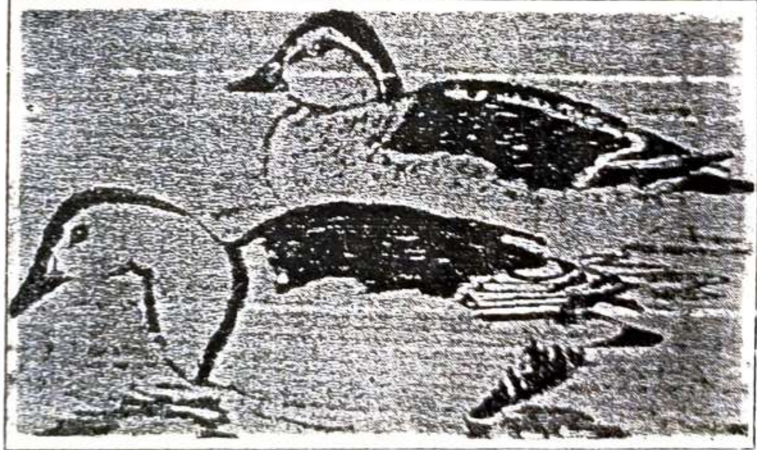
স্বভাব— দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে ভালোবাসে। ছোট 10-15-র দল থেকে শুরু করে একশ', এমনকি হাজারেরও বেশি দলে আগাছায় পূর্ণ ঝিল, বাদা বা জলেডোবা ধানখেতে এদের দেখা যায়। জলাশয়ের ধারের গাছে এরা স্বচ্ছন্দে চড়ে। উন্মুক্ত জলাশয় বা বড় নদী এড়িয়ে চলে। খাদ্যান্বেষণ করে রাতে। দিনের বেলায় যেখানে সহজে কেউ বিরক্ত করবে না, সেইরকম জায়গায় সমুদ্রের খাঁড়ি ও নদীর মোহনায় বিশ্রাম করে, সেখান থেকে জলের উপর ছোট ছোট ঝাঁকে উড়ে এদিক-ওদিকে গিয়ে বসে। সন্ধ্যের মুখে উড়ে যায় কাছে-পিঠের ধানক্ষেতে। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় উন্মুক্ত স্থানে যেভাবে দলবদ্ধ হয়ে প্রতি শীতে বছরের পর বছর দিন কাটায় তা খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এরা ডুব সাঁতারে খুব পটু। তবে ওড়াটা মোটেই দ্রুত নয়। তাই এদের শিকার করার সময় আহতদের ধরতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। এদের মাংস খেতে খুব উপাদেয় নয়, বরং বড় শরাল খেতে ভালো।

প্রজননকাল— জুন থেকে অক্টোবর। বুড়ো গাছের দুই ডালের খাঁজে বা পরিত্যক্ত চিল-কাক-বকের বাসায় বাসা বাঁধে। অনেক সময় জল থেকে অনেক দূরেও সেই বাসা দেখা যায়। জলের ধারে মাটিতে বাসা বাঁধতেও দেখা যায়। ডিম পাড়ে 7 থেকে 12 টি মসৃণ ঘি-রঙের। তা' দিতে দিতে ডিমের রং পাটকিলে হয়ে যায়। 10টি ডিমই বেশি পাড়ে। 17টি পর্যন্ত পাড়তে দেখা গেছে। ডিম ফুটতে 22 থেকে 24 দিন লাগে।

বালিহাঁস (Cotton Pygmy-goose)

শীত পড়লেই অল্প বয়েসে যখন হাঁস, কাঁক, বক, বাটান এইসব পাখি শিকার করতে বাদায় যেতাম, তখন দেখতাম নীলশির, লালশির, শরালদের সঙ্গে একটা ছোট জাতের হাঁসের কয়েকটা-মিলেমিশে বা ধারে-কাছে চরছে। ভাবতাম শীত পড়ার শুরুতে বহুদূর দেশ থেকে হিমালয় পার হয়ে এরাও বুঝি পরিযায়ী হয়ে এসেছে।

দূর থেকে পাখিগুলিকে দেখতাম হাঁসের মধ্যে আকারে সবচেয়ে ছোটো, উপরাংশের দেহের পালক চকচকে পাটকিলে, নিম্নাংশ সাদা। ওড়ার সময় ডানার ধার সাদা তা বোঝা যায়। প্রথম যেদিন গুলি করে মারতে পেরেছি, সেদিন দেখেছি চঞ্চু রাজহাঁস অর্থাৎ ইংরেজী গুজদের মতো। সাধারণ হাঁস অর্থাৎ যাদের বলা হয় 'ডাক' তাদের মত চ্যাপটা নয়, আর ডগাটা একটু বাঁকা। মৃত হাঁসগুলির মধ্যে কয়েকটার ছিল নিষ্প্রভ রঙ, আর বুকে হাল্কা পাটকিলের ছিট। বুঝলাম সে তিনটে স্ত্রী-পাখি।



চি 120. বালিহাঁস

নাম জানার জন্যে আমাদের জ্ঞানী দাদার কাছে নিয়ে গিয়ে দেখালাম। তিনি বললেন, বিদেশী কি? এরা আমাদের দেশেরই বুনো হাঁস। মোটেই হিমালয় পার হয়ে সাইবেরিয়া থেকে আসেনি। নাম— বালিহাঁস, হিন্দী— *গিরজা*, বৈজ্ঞানিক নাম 'নেট্টাপাস কোরোমানডেলিয়ানাস' ইংরেজি— *কটন টিল, কোয়াকি-ডাক, হোয়াইট বডিড্ গুজটিল।* জার্ডন ও স্টুয়ার্ট বেকারের বই খুলে দেখালেন। চেহারার সঙ্গে পক্ষিবিদদের বর্ণনা মিলে গেল।

আমাদের সেই দাদার ভারতীয় পক্ষিতত্ত্বের জনক টি সি জার্ডন-এর তিন খণ্ড 'বার্ডস অফ ইন্ডিয়া (1862) ছিল, তার প্রথম মালিক ছিলেন ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ। দাদা কি করে জানি পুরনো বইয়ের দোকানে পেয়েছিলেন। স্মিথ সাহেবের সই ও মার্জিনে মন্তব্য আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতাম।

আমিও কলেজ স্ট্রীটের পুরানো বইয়ের দোকান থেকে তিন খণ্ড কিনেছিলাম। এখন আর সেসব দোকান নেই। বাজারও কালোয়ার পট্টি হয়ে গেছে। আমারটাও কোনো সাহেবের বই, মলাট ছিল না বলে নাম জানি না. তবে স্টিল পেনে মন্তব্য লেখারধরন দেখে মনে হয় বইগুলি ছিল কোনো সাহেবের।

বালিহাঁস লম্বায় 33 সেমি.। প্রজননকালে পুরুষ-পাখি পূর্ণরূপ পায়। তখন তার মাথা ও পিঠের রঙ হয় কালচে-পাটকিলে। ওই কালচে-পাটকিলের উপর চকচকে বেগুনি আর সবুজের আভা ফুটে ওঠে। মুখ, গলা ও তলার পালক সাদা। গলার তলার অংশে একটা কালো কলার, যেন নেকলেস পরেছে। শীতে গলার কলারটা থাকে না। ছবিতে পুরুষের প্রজননকালের রূপ দেখা যাচ্ছে। স্ত্রী-পাখির ডানার সাদা টানগুলো পুরুষের মত অত প্রকট নয়।

বাসস্থান— প্রায় সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল তরাই, শ্রীলঙ্কা এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে সমতল থেকে 300 মিটার উচ্চতার মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে নদীর মুখে ব-দ্বীপ অঞ্চলের খুব সাধারণ পাখি। পাকিস্তান, পাঞ্জাব ও রাজস্থানের খরা অঞ্চলে দেখা যায় না। তবে কচিৎ কেউ কেউ দেখেছেন। কেরালাতেও দুষ্প্রাপ্য। জলের পরিস্থিতির উপর এদের ঘোরাফেরা নির্ভর করে। দেখা যায় আগাছা পূর্ণ ঝিল, দীঘি এবং অল্প জলের বদ্ধ জলায়, যেমন ছিল আগের লবণ হ্রদ। ভারতের বাইরে বর্মা থেকে দক্ষিণ চীন, দক্ষিণে মালয় এবং উত্তর পশ্চিম পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে।

বালিহাঁস সাধারণত জোড়ায় জোড়ায় 5 থেকে 15-র দলেই দেখা যায়। সময় সময় সেই দল 50 পর্যন্ত পৌঁছয়। গ্রামের আগছাপূর্ণ দীঘিতে যেখানে কেউ ওদের বিরক্ত করে না, সেখানে দেখা গেছে, মানুষজন দেখলেও ভয় পায় না। কিন্তু বন্দুক হাতে শিকারী দেখলে পাগলের মত ব্যবহার করে। তখন খুব দ্রুত ডানা ঝাপটিয়ে এঁকেবেঁকে জলের ধার ঘেঁষে উড়ে গিয়ে গাছের উঁচু ডালে বসে। খাদ্য সংগ্রহ করে জলের উপর থেকেই। উড়ন্ত অবস্থায় গুলি খেয়ে আহত হলে শিকারীর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে ডুব-সাঁতার দেয়। আর দেয় নির্মোচন কালে।

খাদ্য— জলজ গাছের নবাঙ্কুর চারা, শস্যকণা, ধান এবং কবচী, জলজ পোকামাকড় ও তাদের শূক।

ডাকে— উড়তে উড়তে মুরগীর ছানার মত, ছোট ছোট তীব্র আওয়াজ করে।

প্রজননকাল— জুন থেকে সেপ্টেম্বর, তবে জুলাই-আগস্টেই বেশি বাসা বাঁধতে দেখা যায়। জলের কিনারায় কোন গাছে স্বাভাবিক ভাবে তৈরি হয়েছে এমন গর্তে, 2 থেকে 5 মিটার উচ্চতার মধ্যে ঘাস, পালক এবং আবর্জনা বিছিয়ে বাসা বানায়। অনেক সময় দেখা গেছে বাড়ির গায়ের কোন গর্তে বাসা বাঁধতে। 1924 সালে রেঙ্গুনে লাটসাহেবের বাড়ির গায়ের গর্তে মাটি থেকে 20 মিটার উঁচুতে বাসা বাঁধার খবর নথিভুক্ত আছে।

ডিম পাড়ে 6 থেকে 14টি মুক্তোর মত সাদা। তা' দিতে দিতে সেগুলো বিবর্ণ হয়ে যায়। স্ত্রী-পাখি একাই ডিমে তা' দেয়, এবং ডিম ফুটতে 15-16 দিন লাগে। একটু বড় হলেই সাধারণত বাপ-মা বাসা থেকে বাচ্চাদের ঠেলে ফেলে দেয়। আর তারা সোজা ঢিলের মত পড়তে পড়তে ডানা মেলে উড়তে শেখে যায়। ... নিয়ে উড়ছে।

তুলসীবিগরি (Common Teal)

নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি বিকেল পাঁচটা নাগাদ দাঁড়িয়ে আছি, চারতলার উপরে পুব-দক্ষিণের বারান্দায়। পুব থেকে দক্ষিণ, পশ্চিমও কিছুটা উন্মুক্ত। কোন উঁচু বাড়ি চোখে বিশেষ ধাক্কা মারে না।

কথা বলছিলাম একটি ছেলের সঙ্গে, সে মোটামুটি কিছু পাখি চেনে। আমার কাছে আসে জানতে, শিখতে। এমন সময় দেখি একশ'-দেড়শ'র এক-একটা ঝাঁকে বা দলে হাঁস উড়ে চলেছে উত্তর-পুব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে। কম করে 15-20 টির ঝাঁকে হাঁসেরা চলেছে। ছেলেটি একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, দেখছেন হাঁসগুলি কি রকম উড়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, এরা কোন্ জাতের হাঁস? বললে, এ-ত বালিহাঁস, কটন টিল। শরাল নয়।

বেশির ভাগ লোকের কাছে হাঁসেরা আকারে ছোট হলেই হয়ে যায় বালিহাঁস। বললাম, এরা মোটেই বালিহাঁস নয়। বালিহাঁসের ওড়ার কায়দা আলাদা, এত দ্রুতও তারা ওড়েনা। তাদের দলও হয় ছোট, এক দলে খুব বেশি হাঁস কখনও দেখি নি। কালো কালো ছোট হাঁসের দল উড়ে যাচ্ছে দেখছ বটে, কিন্তু এরা মোটেই মিশকালো নয়। আলোর বিরুদ্ধে যাচ্ছে বলে দূর থেকে এমন দেখাচ্ছে। আর একটি আচরণ লক্ষ্য কর, মাঝে মাঝে দলের মধ্যে থেকে এক-একটা কেমন উড়তে উড়তে শূন্যে থেমে যাচ্ছে, আবার দ্রুত উড়ে দলকে ধরে ফেলেছে।



চি 121. তুলসীবিগরি

তবে এরা কোন্ হাঁস?

এরাও ক্রামিক(আনাস) গণের অন্তর্গত *এক প্রজাতি*। নাম— তুলসীবিগরি, নারৈব, পাতারিহাঁস (আনাস ক্রেক্কা), ইংরেজি— *কমন টিল*। লম্বায় 38 সেমি.। আমরা যেসব পুরুষ পাখিদের দেখি তাদের মাথা গাঢ় এবং হালকা পাটকিলে রঙে চিত্রবিচিত্র করা। মাথার চাঁদি ও ঘাড় কালচে-পাটকিলে, পালকগুলির ধারে খুব সরু করে অল্প হলদেটে-বাদামী রঙ। এই যে রঙ, শীতে পরিযায়ী হয়ে আসার সময় ওরা এরকম রঙের বোরখা পরে নেয়। এই রঙ তাদের পূর্ণ বয়স্কা স্ত্রী-পাখিদের। অনেক সময় ভুল হয়ে যায় স্ত্রী-গিরিয়া হাঁস (গারগেনি বা ব্লু-উইংগড্ টিল) বলে। প্রজননকালের রঙ হলো মাথা বাদামী, সঙ্গে ধূসর রঙের পেনসিলের টান, চোখের উপর থেকে ঘাড় পর্যন্ত একটা

চওড়া ধাতব-সবুজের পটি, আর এই পটির উপরে ও নিচে খুব সরু করে সাদাটে পটি। এখানে ছবিটি স্ত্রী-পাখির, তাই চোখের উপর পটিটি সরু। ডানা তিন-রঙ্গা, কালো ধাতব-সবুজ ও হলদেটে। কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু কালো, তলার চঞ্চু ফিকে এবং পাটকিলে। স্ত্রী-পাখির তলার চঞ্চু হলদেটে-পাটকিলে, কখনওবা একটু সবুজের ভাব থাকে। পা এবং আঙুল ফিকে নীলচে অথবা জলপাই ধূসর থেকে সীসে-নীল।

তুলসীবিগরি শীতে পরিযায়ী হয়ে আসে সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, আন্দামান-নিকোবর ও মালদিভ দ্বীপপুঞ্জে। ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে পড়ে দীঘি, ঝিল এবং বাদায়, প্রধানত মিঠে জলে। যেসব জলাশয়ের তলা কাদা এবং জলজ আগাছায় পূর্ণ সেসব জায়গাই ওদের পছন্দ বেশি।

বাসস্থান— ইউরোপে আইসল্যাণ্ড থেকে শুরু করে এশিয়ার চীন, মাঞ্চুরিয়া এবং জাপানে। শীতে পরিযায়ী হয় উত্তর আফ্রিকা, নীলনদের উপত্যকা, সোমালিল্যাণ্ড, পারস্য, ভারত থেকে দক্ষিণ চীন এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে।

তুলসীবিগরি পুরাপুরি শাকাশী। জলজ গাছের শীষ, কচিপাতা, জলজ আগাছার বীজ, স্ফীতকন্দ এবং ধান। প্রধানত রাতে খাদ্য গ্রহণ করলেও, দিনে জলে বা জলের ধারে ছায়ার বিশ্রাম করার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য-সংগ্রহও করে থাকে।

পুরুষ-পাখি একটু মিষ্টি করে নিম্নস্বরে ডাকে— 'ক্রিট ক্রিট'। স্ত্রী-পাখি ভয় পেলে একটা প্যাঁক বা কোয়াক-এর মত আওয়াজ করে।

ভারতে পরিযায়ী হয়ে যেসব হাঁসেরা প্রথম দিকে শীত পড়বার আগেই এসে পৌঁছয়, তাদের ভিতর তুলসীবিগরি, গিরিয়া হাঁসের সঙ্গে একযোগে এসে থাকে। অনেককে দেখা যায় শীতে ভারতে যাবার সময়েই দেশের পোশাক ছেড়ে শীতের বোরখা পরে যেতে। কোন কারণে বোরখা পরার আগেই এরা পরিযায়ী হয়। এই নির্মোচন বা কুরীচের সময় এরা উড়তে পারে না। অনেক পাখিশিকারীকে বলতে শুনেছি, কতকগুলি পাখি বন্দুকের আওয়াজে উড়ল না, ভয় পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল, আমরা হাত দিয়েই ধরে ফেললাম।

স্বদেশে ফিরে বাসা বেঁধে ডিম পাড়ে 8-12টি, কখনও কখনও 20টি ফিকে হলদেটে রঙের, কখনও দেখা যায় তাতে একটু সবুজ আভা আছে।

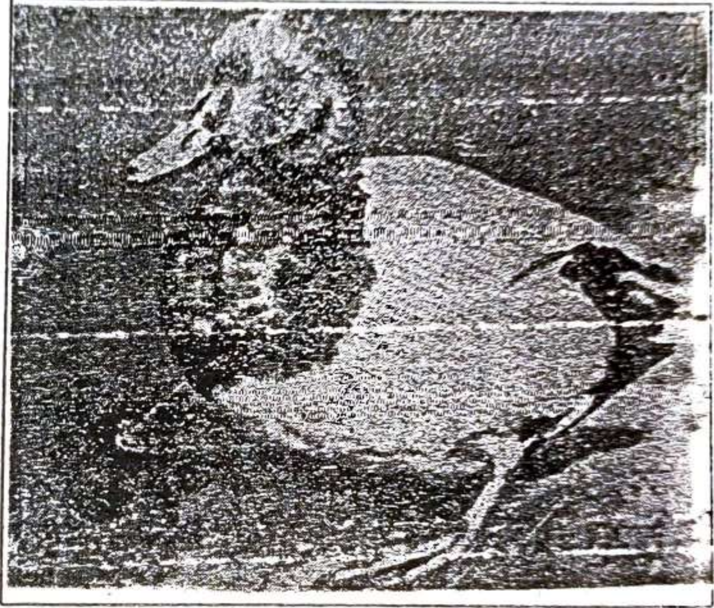
সাধারণত মার্চের শেষে চলে যায়, কিন্তু মে মাস পর্যন্তও থাকতে দেখেছি। ভেবেছি আমাদের দেশকে এই কটা পাখি বুঝি ভালবেসে ফেলেছে তাই বোধহয় রয়ে গেছে। আশা করি বাসা বাঁধবে। কিন্তু কদিন পরেই দেখি তারা আর নেই, তারা চলে গেছে।

রাঙামুড়ি (Common Pochard)

সেদিন বেশ বেলা হয়েছে। বারোটার পর বাদা থেকে ফেরার পথ ধরেছি। ঝুলির মধ্যে গোটা-চারেক শরাল দিয়ে চাপা আছে একটা রুই একটা মিরগেল। এক-একটা আধসের-তিনপো হবে।

একটু বেলা হলে মাছেরা যখন জলের উপরে এসে তাদের ঠোঁট দিয়ে হাওয়া নিতে আসে. যাকে বলে গাবানো তখন গুলি করতাম। মাছ জলের নিচে তলিয়ে যেত, যাদের মৃত্যু হত, তারা একটুবাদে ভেসে উঠত।

ফেরার পথে দেখা হল দুই হ্যাট-বুটপরা পক্ষিশিকারীর সঙ্গে। তাঁরাও সদর্পে ফিরছেন। হাতে ঝুলছে শরাল, বালিহাঁসের সঙ্গে দুটো লালমাথা হাঁস। তাদের কাছে জানলাম 3নং খোলে ওদুটোকে মেরেছেন। সঙ্গী জিজ্ঞেস করলেন, হাঁসগুলো কি ? আগে তো দেখি নি। বললাম, চল 3নং খোলে, যদি মারতে পারি তখন বলব।



চি 122. রাঙামুড়ি

3নং খোল খুবই বড়। অনেক দূরে মাঝবরাবর বেশ কিছু হাঁস দেখা যাচ্ছে। তার থেকে আরেকটু দূরে আরও কিছু। পরিষ্কার জলে মাছ খেলে বেড়াচ্ছে। পাড়ের কাছ থেকে একটা ভাসমান ঘাসের চাপড়া ধরে তার উপর বন্দুক রেখে ঠেলে ঠেলে চললাম। একশ' গজের মধ্যে আসতেই হাঁসগুলো খুব সচকিত হয়ে উঠল। আমি সময় নষ্ট না করে জলে সাঁতার-কাটা অবস্থায় একটা গুলি ছুঁড়েই ওড়ার মুখে আরেকটা ছুঁড়লাম। তিনটে জলের উপরেই শুল এবং চারটে ঝপ্‌ঝপ্ করে শূন্য থেকে পড়ল। শূন্য থেকে পড়া একটা আহত পাখি জলের তলায় এমন ডুব সাঁতার দিয়ে চলতে লাগল যে তাকে ধরতে কালঘাম ছুটে গেল।

হাঁসগুলিকে দেখিয়ে সঙ্গীকে বললাম, চিনে রাখ। এর নাম রাঙামুড়ি।

বেঙ্গল কেমিক্যালের ধারে 13 নং বাস স্ট্যাণ্ডে এলাম। বাসের ড্রাইভার-কণ্ডাকটার এবং গুমটিতে যিনি বসেন সকলের সঙ্গেই আমাদের খাতির হয়ে গিয়েছিল। প্রায়ই তাঁরা বলতেন স্যার আমাদের কিছু দিয়ে যাবেন, ভালমন্দ ত জোটেনা আমাদের। তাই কখনও কখনও দু'চারটে পাখি দিয়ে আসতাম। আজ চারটে শরালই দিয়ে দিলাম। সঙ্গী বললেন, সব শরালই দিয়ে দিলি। জবাব দিই, আজ 'পট কুকিং' নয়। অর্থাৎ সব শিকার করা পাখি একসঙ্গে রাঁধব না। আজ শুধু রাঙামুড়ি. কোন মিশাল নয়, কারণ বুনো হাঁসদের মধ্যে এরা শ্রেষ্ঠ।

হংস বংশের অন্তর্গত উর্ধ্বব্যাসচঞ্চু গণের (আইথিয়া) *এক প্রজাতি*। নাম— রাঙামুড়ি, লালমুড়ি (আইথিয়া ফেরিনা), হিন্দী— *লাল শির*, ইংরেজি— *কমন পোচার্ড*। লম্বায় 48 সেমি.। পরিযায়ী হয়ে যখন আমাদের দেশে বোরখা চাপিয়ে আসে তখন পুরুষের মাথা কেবল নিষ্প্রভ বাদামী-লাল। নিজ বাসস্থানে প্রজননকালে মাথা ও গলা গাঢ় বাদামী-লাল। পরিযায়ী অবস্থায় পিঠের উপরের

অংশ এবং বুক পাটকিলে, প্রজননকালে কুচকুচে কালো। কিন্তু উপরের বাকি অংশ ফিকে ধূসর, তার উপর কালো আঁকাবাঁকা লাইন টানা, কোমর ও লেজের উপরে নিচের আচ্ছাদক কালো, তলা ও দু'পাশে ধূসরাভ-সাদা এবং ডানার মাঝে আয়নার মত পালক নিষ্প্রভ ধূসরাভ, এসব রং কোন সময়েই বদলায় না।

দুটি স্ত্রী-পাখি ছিল। তাদের মাথা, গলা, পিঠের উপরাংশ ও বুক লালচে-পাটকিলে। পিঠের বাকি অংশ ধূসরাভ-সাদা, তার উপর অস্পষ্ট আঁকাবাঁকা কালো লাইন টানা। তলায় বেশিরভাগ অংশ ধূসরাভ-পাটকিলে, বাকি লালচে-হলুদ।

কনীনিকা হলুদ বা লালচে-হলুদ, চঞ্চুর গোড়া ও ডগা-কালো, মাঝখানটা ধূসরাভ-নীল, পা ও আঙুল স্লেট-নীল, ঝিল্লির রং গাঢ় এবং কালচে।

বাসস্থান— ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ স্ক্যান্ডিনেভিয়া, পূর্ব রাশিয়ার ভেতর দিয়ে পশ্চিম সাইবেরিয়া থেকে বৈকাল হ্রদ, দক্ষিণে হল্যান্ড, জার্মানি, বলকান দ্বীপপুঞ্জ, কৃষ্ণসাগর, কিরঘিজ স্তেপ এবং ইয়ারকন্দে। শীতে পরিযায়ী হয় সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, বর্মা থেকে দক্ষিণ চীনে। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছর দেখা যায় না।

রাঙামুড়িকে ভারতে কোন কোন জায়গায় 300 থেকে 400-র এমনকি তাঁর চেয়েও বেশি দলে দেখা যায় ঝিলের বা বাঁধের জলে, যেখানে জলমগ্ন ঝাঁঝি ও আগাছা খুব বেশি থাকে। ডুব-সাঁতারে এরা খুবই ওস্তাদ। জলের তলায় জলজ গাছপালার শিষ, কুঁড়ি ও বীজ প্রধান-খাদ্য। কখনো, জলজ পোকামাকড় ও তাদের শূক, মাঝে মাঝে ব্যাঙাচি ও ছোটো মাছও খেয়ে থাকে। ভারতে এদের ডাক কখনও শোনা যায় নি। প্রধানত নিশাচর। প্রত্যুষে ফিরে আসে রাতে চরার জায়গা থেকে বিশ্রামের জলাশয়ে। ডাঙায় হাঁটাটা সুবিধের নয়, অস্বাচ্ছন্দের। জলের উপর ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়তে শুরু করে ধীর গতিতে, তারপর উড়তে থাকে খুব দ্রুত।

ভূতিহাঁস (Baer's Pochard)

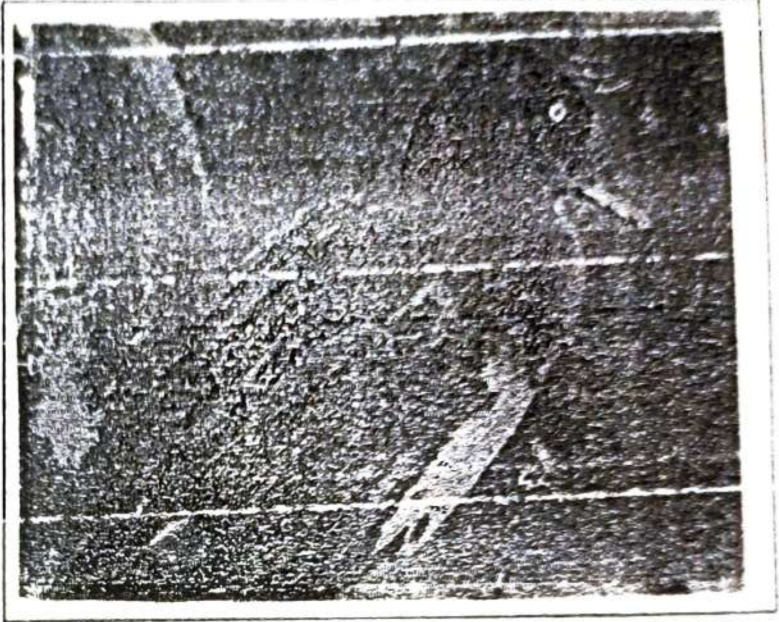
বেশ কয়েক বছর আগে জানুয়ারি মাসে এম ভি নিউ উষা লঞ্চে সুন্দরবন দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম হাওড়া লায়নস্ ক্লাবের সভ্য-সভ্যাদের। বেলা চারটে নাগাদ সজনাখালি ছেড়ে সাথীলিয়া নদী দিয়ে চলেছি রাই-মঙ্গলে পড়ব বলে। আমি সারেঙ মহম্মদ আবু জমজম সর্দারের পাশে বসে। হঠাৎ নজরে পড়ল খুব দূরে দুটো কালো বিন্দু। দূরবীন চোখে লাগিয়ে দেখে একটু অবাক হলাম। সারেঙকে বললাম, যতদূর সম্ভব কাছে নিয়ে চলুন। জবাব দিলেন, খুব কাছে যাওয়া যাবে না। ওরা লঞ্চের আওয়াজে উড়ে যাবে।

একটু কাছে আসতে চিনতে পারলাম। পাখি দুটো একটু উড়ে দূরে সরে গেল। এমন সময় আমাদের সাহায্যকারী একটি ছেলে, সে বেশ পাখি চেনে, দৌড়ে কাছে এসে বলল, ওরা ঐ পাখি না? হ্যাঁ বলার সঙ্গে সঙ্গে মন চলে গেল অতীতের একটি দিনে। [পরে ডায়রিতে সনতারিখ দেখেছি, 28 অক্টোবর, 1952।] লবণ হ্রদে গেছি। এখোল-সেখোল পার হয়ে একটা খোলে পৌঁছেছি। সেখানে

লাল বিগরি — Ferruginous Pochard

মাছ পাহারাদারদের একটা ঘর আছে। ঘরটার কাছে গোটা কতক পোষা পাতিহাঁসের সঙ্গে একজোড়া সাদা-কালো হাঁস চরছে। আকারে প্রায় একই রকম তবে একটু ছোট। বয়স্ক সঙ্গীটি বলে উঠলেন, বুনো হাঁস। আমি বলি,না। দেখছ না পোষা হাঁসগুলোর সঙ্গে চরছে, ওরাও পোষা।

একদৃষ্টিতে ও দুটোকে দেখছি। বন্দুকের সেফটি সরানর শব্দ কানে আসতেই পাশ ফিরে দেখি সঙ্গী নিশানা নিচ্ছেন। তাড়াতাড়ি বন্দুকের নল চেপে ধরে বলি, মেরো না, পোষা হাঁস। তুমি কি পাগল হলে ? শেষে পোষা হাঁস মেরে হাঙ্গামায় পড়ব ? সঙ্গে টাকাকড়ি নেই। অসম্ভব দাম হাঁকবে। তাছাড়া ওরা সদলে এসে ঠেঙিয়ে মেরে বাদায় পুঁতে দিলে কেউ কোনদিন টেরও পাবে না।



চি 123. ভূতিহাঁস

আমাদের বচসায় হাঁস দুটো জল থেকে সোজা উড়ল। ডানদিকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে এসে আমাদের চোখের সামনে দিয়ে রূপ দেখিয়ে উড়ে গেল উত্তর দিকে। দেখতে দেখতে শূন্যে উঠে বিন্দু হতে হতে মিলিয়ে গেল। আমরা বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম।

খেদোক্তি শুনলাম, হুঁঃ পোষা হাঁস ! বাড়ি চল্, তোর যত পাখির বই আছে আজ সব পোড়াব। পোড়াব সব পালক আর চামড়া। মের না পোষা হাঁস ! ইডিয়ট।

পাখি দুটি ছিল হংস বংশের অন্তর্গত উর্ধব্যাসচঞ্চু গণের (আইথিয়া) এক *প্রজাতি*। নাম— বড়ো ভূতিহাঁস (আইথিয়া বর্গের)। ইংরেজি— *বেয়ার্স পোচার্ড, ইস্টার্ন হোয়াইট আই*। লম্বায় 46 সেমি.। প্রজননকালে সমস্ত মাথা ও ঘাড় কালো, তার উপর ধাতব সবুজের আভা, বুকের কাছের কালো রংটা নেমে এসে গাঢ় লালচে-বাদামী। পেটে ডিম্বাকারে বড় করে সাদা ছোপ, লেজের তলা সাদা। পরিযানের কালে স্ত্রী-পাখিদের মত মাথা ও গলার ধাতব ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে পাটকিলে-কালো রং ধারণ করে। পুরুষের কনীনিকা সাদা, স্ত্রীর পাটকিলে। 48-50 মিমি. চঞ্চু স্লেট পাথরের মত নীল, চঞ্চুর একদম গোড়া ও ডগা কালচে। স্ত্রীর চঞ্চু 47-48 মিমি.। পা ও আঙুল ধূসর, নখ কালচে।

আর এক জাতের ভূতিহাঁস দেখা যায়, তার নামও লাল বিগরি, ছোটো ভূতিহাঁস (আইথিয়া নাইরোকা), ইংরেজি— *হোয়াইট-আইড পোচার্ড, ফেরুগিনাস ডাক*। লম্বায় 41 সেমি.। পরিযানকালে তাদের মাথা, ঘাড় ও বুক লালচে-পাটকিলে।

বাসস্থান— ট্রান্সবৈকালিয়া থেকে নিম্ন উসুরি ও আমূর নদীর উপত্যকা এবং কামচাটকায়। শীতে পরিযায়ী হয় চীন, কোরিয়া, জাপান, বর্মা, আসাম, মণিপুর, বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে। অন্যত্র

কোথাও দেখা যায় কিনা জানা যায় না, তবে বিহারে দেখতে পাওয়া সম্ভব বলেই মনে হয়। ভারতে পরিযায়ী হয়ে আসার পর এদের সঠিক আস্তানা নির্ণয় করা যায় নি। তার কারণ, ছোট ভূতি ও বড় ভূতি এক সময় খুবই শিকারীদের ঝুলি ভরত, কিন্তু তাঁরা কোনদিনই পার্থক্য ধরতে পারেন নি।

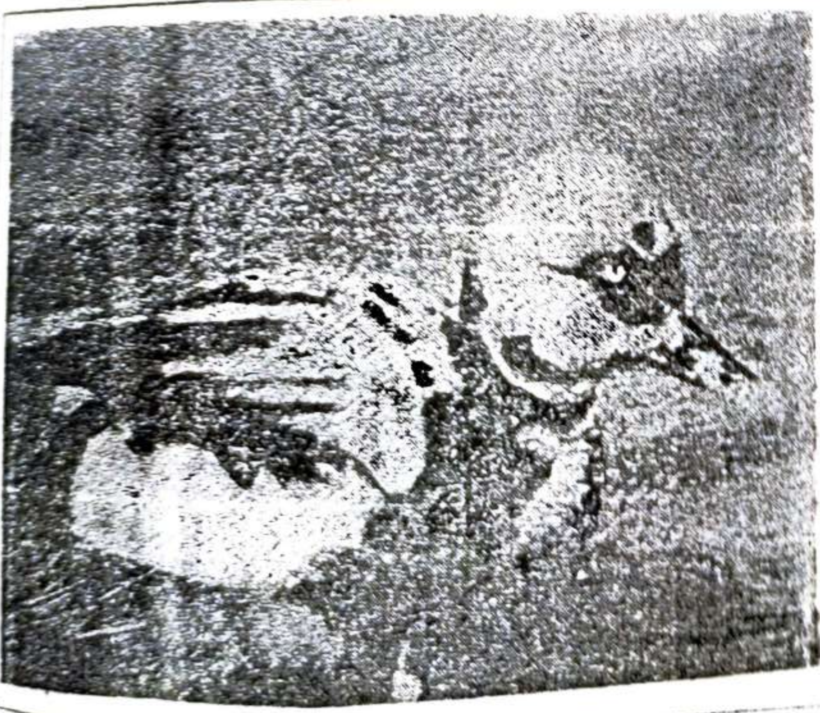
বড় ভূতির পরিযায়ী হয়ে আসা-যাওয়া সম্বন্ধেও সঠিক কোনও তথ্য লিপিবদ্ধ হয় নি। তাছাড়া আংটি পরিয়েও দেখা হয় নি তাদের পথ-পরিক্রমা। তবে এটুকু লক্ষ্য করা গেছে যে লালশির বা ছোট ভূতির চেয়ে বড় ভূতি অনেক দ্রুত ওড়ে। এদের হাব-ভাব ডিমপাড়া ইত্যাদি অনেক বিষয়েই জানার আছে যা আজও অজ্ঞাত। এইবার নিয়ে আমি তিনবার ওদের সাক্ষাৎ পেলাম কিন্তু প্রতিবারই দেখেছি জোড়ায়, কখনও দলে দেখি নি।

আমার বয়স্ক আত্মীয় বন্ধুটি কিন্তু বই-টই কিছুই পোড়ান নি।

হেরো হাঁস (Red-crested Pochard)

রাঙামুড়ি শিকারের পর লোভ বেড়ে গেল। তর সইল না, দু'দিন যেতে না যেতেই কলেজ ফাঁকি মেরে সপ্তাহের মাঝখানে গিয়ে হাজির হলাম বাদায়।

সূর্য তখনও ওঠে নি। পুব আকাশে সবে রক্তিমাভা লাগতে শুরু করেছে। পৌঁছেছি 3নং খোলে। অল্প কুয়াশা আছে জলের উপরেও। ভাল করে দেখব বলে এক জনের কাছ থেকে একটা দূরবীনও চেয়ে এনেছি। খুব সন্তর্পণে হাঁটছি। হাঁসেদের পাখার আওয়াজ পাচ্ছি। কাছ থেকে তারা দূরে চলে যাচ্ছে। কানে শুনছি চোখে দেখতে পাচ্ছি না।



চি 124. হেরো হাঁস

আকাশ একটু পরিষ্কার হল। কাছেই একটা শরালের ঝাঁক রয়েছে। তারা থেকে থেকে জল ছেড়ে উড়ছে, একটা চক্কর দিয়ে আবার জলে পড়ছে। শরালের দিকে আমাদের নজর নেই, আমরা খুঁজছি রাঙামুড়ি। চারিদিক একটু পরিষ্কার হতেই দেখি খোলের মাঝখানে চরছে রাঙামুড়ি। দূরবীন লাগিয়ে দেখছি। হঠাৎ বাঁ-দিকে ওদের থেকে আরও দূরে নজরে পড়ল কতকগুলো হাঁস, একে অপরের পিছনে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ সকলে উড়ল, আবার পরক্ষণেই জলে পড়ল। দূরবীন দিয়ে দেখলাম এরা রাঙামুড়ি নয়। এদের

মাথা গোল, পাউডার পাফ বা কদমফুলের মত খোঁচা খোঁচা পালক ফিকে পাটকিলে, ঘাড়ও তাই। বুক কালো, বাকি নিম্নাংশ পাটকিলে, সেটা উড়ন্ত অবস্থায় দেখলাম। কয়েকটার দেখলাম সাদা। পরে জেনেছি নিম্নাংশ সাদা স্ত্রী-পাখিদের।

যে রকম ছটফটে দেখছি, এদের কাছে যাওয়াই মুশকিল। রাঙামুড়ি শিকার মাথায় উঠল। এদের মারতে হবে, দেখতে হবে, জানতে হবে এরা কি পাখি। ঘাসের চাপড়ার উপর বন্দুক রেখে, কিছু ঘাসপাতা ছিঁড়ে মাথার গামছায় গুঁজে, মাথাটা যতদূর সম্ভব ভাসমান চাপড়ায় ঠেকিয়ে খুব সন্তর্পণে ঠেলে নিয়ে চললাম। দশ-বার পা যাই আর চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ি। আধঘন্টা কি তারও কিছু বেশি সময় কসরত করে বন্দুকের পাল্লা অর্থাৎ একশ' গজের মধ্যে এলাম। চিবুকটা চাপড়ার উপর ঠেকিয়ে ওদের লক্ষ্য করছি। বেশ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকার পর মনে হল ওদের সচকিত ভাবটা কম। বন্দুকটাকে ঘাসের চাপড়ার উপর রেখেই টেনে আনলাম বাহুমূলে। 'সাইট'-এ চোখ পাশিয়ে যা থাকে কুলকপালে বলে দুটো ঘোড়াই টিপে দিলাম। নিমেষের মধ্যে উড়ল সবাই, শুধু চারটে জলের উপরে। একটা খানিকটা উড়ে গিয়েই জলের উপর ঝপ করে পড়ল। বাকি 16-18টা নিমেষের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

বাড়ি ফিরে বইপত্তর ঘেঁটে জানলাম এরা হংস বংশের অন্তর্গত অরুণচঞ্চু (নেট্টা) গণের এক প্রজাতি। নাম— বড়ো রাঙামুড়ি, পুং হেরো হাঁস, স্ত্রী ছোবড়া হাঁস (নেট্টা রুফিনা), ইংরেজি— *রেডক্রেস্টেড পোচার্ড*। ওজনে পুরুষ ছিল 1200 গ্রাম, স্ত্রী 750 গ্রাম মতন। ডানা ছোট ও সুঁচলো। লম্বায় 54 সেমি.। যাদের দেখেছিলাম ও শিকার করেছিলাম তারা ছিল শীতে গ্রহণ লাগা বোরখা পরা অবস্থায়। প্রজননকালে পুরুষের কদমফুলের ঝুটিওয়ালা মাথা বাদামী ও সোনালী-কমলা, চোখ টুকটুকে উজ্জ্বল লাল। শীতে সেটা পালটায় না। পালটায় না কনীনিকা ইত্যাদিও। পুরুষের দেহের উপরাংশ ফিকে পাটকিলে, ঘাড়ে সাদা ছোপ, ডানায় আয়নার মত সাদা চৌকো। নিম্নাংশ কালো, দেহের দু'পাশ সাদা। কনীনিকা উজ্জ্বল লাল, পা ও আঙুল কমলা-হলুদ, তার উপর কালোর আভা। স্ত্রী-পাখির কনীনিকা লালচে-পাটকিলে, চোখ ধূসরাভ কালো, দু'ধারে ও ডগায় মলিন গোলাপি। পা কালো তার উপর গোলাপির আভা।

বাসস্থান— দক্ষিণ ফ্র্যান্স থেকে হল্যান্ড, ড্যানিয়ুব নদীর নিম্ন উপত্যকা ধরে দক্ষিণ রাশিয়া, সেখান থেকে কিরঘিজ, স্তেপভূমি হয়ে পশ্চিম সাইবেরিয়া এবং উত্তর আফ্রিকায়। শীতে পরিযায়ী হয় ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, পাকিস্তান, ভারত, বার্মা ও শান রাজ্য থেকে চীন দেশে। ভারতে আসে অক্টোবরে, চলে যায় মার্চের মাঝামাঝি। আসামে দেখা যায় না বললেই হয়। মাদ্রাজের দক্ষিণে কেরালা বা শ্রীলঙ্কায় যায় কিনা তা এখনও নথিভুক্ত হয় নি।

খাদ্য— প্রধানত জলজ গাছের কুঁড়ি, বীজ, সরু সরু ডগা ও ঘাস। জলজ পোকামাকড়, কবচী, কুচো চিংড়ি, ব্যাঙাচি ইত্যাদিও খেয়ে থাকে। আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের প্রবর্তক ও পক্ষিবিদ অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম, একটির পাকস্থলিতে এক ইঞ্চি মাপের কিছু কুচো মাছ পেয়েছিলেন। এই পাঁচটিতে পাই নি এবং পরেও তা দেখিনি।

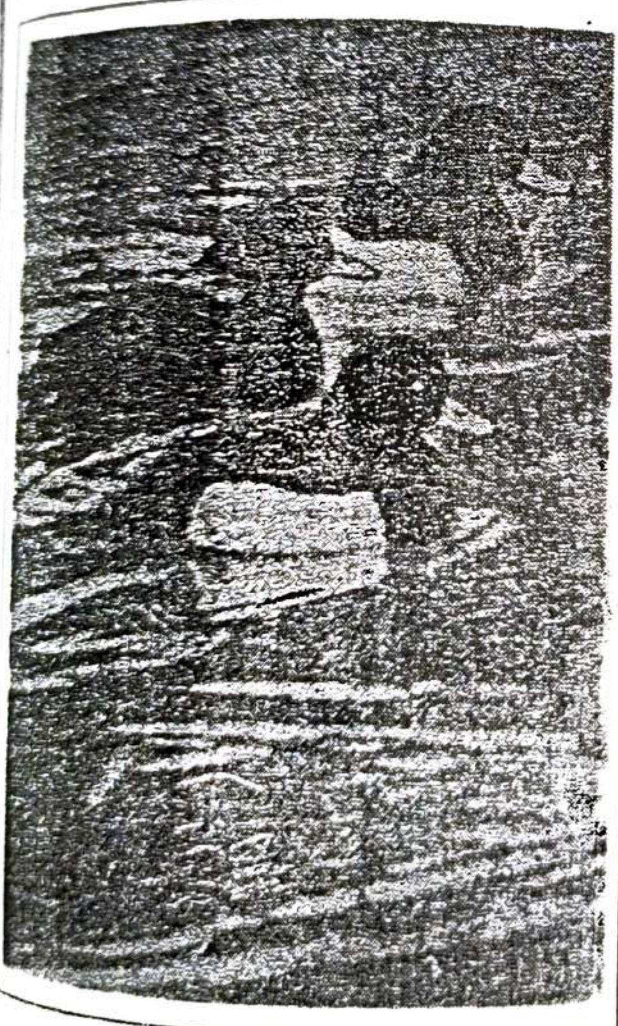
স্বভাব— বড় উন্মুক্ত ঝিল এবং জলাধারে যেখানে জলমগ্ন ঘাস ও আগাছা বেশি সেখানেই আস্তানা

... পারে। যখন ডুব দেওয়া থেকে ... তলা থেকে রবারের বল বুঁঝি লাফিয়ে উঠল। এটা লক্ষ্য করেছিলাম এবং খুবই মজা লেগেছিল।

শীতে এদেশে একদম ডাকে না। অত্যন্ত লাজুক ও ভীরু। একটুতেই খুব দ্রুত উঁচুতে উঠে চলে যায় বন্দুকের পাল্লার বাইরে। গুলি করা তখন শক্ত হয়ে পড়ে। খেয়ে দেখলাম রাঙামুড়ির মতই, তবে খুব নরম এবং সুস্বাদু। দেখেছি, যাদের পাকস্থলিতে কুচো চিংড়ি বেশি, তাদের মাংস একটু আঁশটে গন্ধ হয়।

কালীহাঁস (Greater Scaup)

1983-র 18 ফেব্রুয়ারির সকাল। দার্জিলিঙের চিড়িয়াখানায় ঘুরে বেঙ্গল ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটির মিউজিয়মে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়েছে। যখনই দার্জিলিঙে যাই তখনই এই দুটো জায়গায় দর্শন না দিলে মন ভরে না। মিউজিয়মে কিছু খড়পোরা প্রদর্শিত অবিলম্বে বদলান দরকার। বহুদিন আগেকার সেই সাহেবি আমলের তৈরি সব। চেহারার জেল্লা কমে গেছে, অনেকগুলিকে ঠিকমত চেনাই যায় না। আমি যার সঙ্গী সে অল্পবয়সী, দার্জিলিং জেলার মাটিগাড়ার হিমূল ডেয়ারির জেনারেল ম্যানেজার। তার সফরের সঙ্গে জিপে করে এসেছি। তাকে একটা প্রদর্শিত পাখি দেখিয়ে বললাম, এটিকে জীবন্ত দেখেছি হাজারে হাজারে, সুন্দরবনে রায়মঙ্গল আর বড় কলাগাছিয়া নদীর উপর, নদীর মাঝে চরাতেই। ভারতীয় পক্ষিতত্ত্বে নথিভুক্ত আছে, পরিযায়ী হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল (ক্যালক্যাটা) অর্থাৎ ভূতপূর্ব লবণ হ্রদে। আমি বহু বছর সেখানে ঘুরেও দর্শন পাই নি। আর উল্লেখ আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচারবিভাগ থেকে প্রকাশিত শ্রী শচীন্দ্রনাথ মিত্র-র বাংলার শিকার প্রাণী-তে (1957)। তাতে তিনি লিখেছেন, ইহাকে শীতকালে পূর্ববঙ্গে কোন কোন স্থানে কদাচিৎ দেখা যায় ; অত্যন্ত বিরল।



চি 125. কালীহাঁস

বেলা দুটোয় দার্জিলিং ছেড়ে কার্সিয়াং বা খরসাংগ্ হয়ে মংপুতে রবীন্দ্রনাথ যে গৃহে বাস করেছিলেন, সেই তীর্থস্থান দর্শন করে রম্ভি বলে একটা গ্রামে গেলাম। সেখানে আমার সঙ্গীর কাজ সারার পর দু'জনে পাড়ি দিলাম সেবক-এর দিকে। পাশে দুই পাহাড়ের মাঝে তিস্তা চলেছে বেশ নিচু

বামুনিয়া হাঁস— Tufted Duck

দিয়ে। পাখি দেখেছি নানা, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বড় কাবাসী (লার্জ কুক্কু শ্রাইক) ও কস্তুরি (হিমালয়ান হুইস্টলিং থ্রাশ)। পথে ছানাপোনা সহ মর্কট বাঁদরও দেখলাম।

আমাদের জিপ সেবকে এসে করোনেশন ব্রিজ ছাড়িয়ে রেলওয়ে ব্রিজের দিকে যাচ্ছে. জেনারেল ম্যানেজার আমার দৃষ্টি আর্কষণ করল একটা পাখির দিকে। জলের মধ্যে স্রোতের তোড়ে ভেসে চলেছে রেল-ব্রিজের দিকে। গাড়ি থামিয়ে আমরা দু'জনে নেমে পড়লাম। পাখিটা দুশ মিটারের মত গিয়ে জল ছেড়ে ছোট পাথরের পাশে বালির পাড়ে উঠেই উড়ে ফিরে গেল করোনেশন ব্রিজের দিকে, ঠিক যেখান থেকে সে শুরু করেছিল স্রোতে ভাসা। এই যাওয়া-আসা একই দূরত্বে সমানেই করে চলল। একা-একাই এই খেলায় মেতেছে। এদের সঙ্ঘচারী বলেই জানতাম, অন্তত সুন্দরবনে তাই দেখেছি। আমরা বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। মাঝে মাঝে জলের তলায় সম্পূর্ণ ডুবে যাচ্ছে। কখনওবা পানকৌড়ির মত শুধু গলাটা তুলে শরীরটাকে ডুবিয়ে ভেসে চলেছে। পাখিটার মাথা, ঘাড়, গলা, বুক কালচে-পাটকিলে, তলাটা সাদা। উড়ছে যখন তখন দেখছি ফিকে ধূসর পিঠের উপর ঢেউ খেলান অনেকগুলো কালো লাইন।

বললাম, পাখিটা বোরখা পরে শীতের সাজে আছে, আসল রূপ এই নয়। সকালে দার্জিলিঙের মিউজিয়মে একেই দেখে এলাম, আগে দেখেছি সুন্দরবনে। বাংলা-হিন্দি কোন নামই পায় নি আমাদের দেশে। কালো মাথাটা সোজা রেখে চঞ্চু একটু নিচু করে যখন ডাঙায় দাঁড়ায় বা জলে ভাসে, তখন একটি রূপই মনে পড়াতে নাম দিয়েছি— কালীহাঁস (আইথাইয়া মারিলা), ইংরেজি— স্কপ্ ডাক। হংস বংশের (আনাটিদি) অন্তর্গত উর্ধ্বব্যাসচঞ্চু গণের (আইথিয়া) এক প্রজাতি।

কালীহাঁস লম্বায় 46 সেমি.। প্রজননকালে পুরুষের রূপ মাথা, ঘাড়, বুক, লেজ এবং তলপেটের শেষে কুচকুচে কালোর উপর বেগুনির আভা। তলার বাকি অংশ সাদা। পিঠে ফিকে ধূসরের উপর কালো সরু সরু ঢেউখেলান লাইন। প্রায় বামুনিয়া হাঁসের (টাফটেড ডাক) মত দেখতে, শুধু মাথায় টিকি বা ঝুঁটিটা নেই। ডানার প্রান্তে আয়নার মত চৌকো জায়গা সাদা। কনীনিকা হলুদ, চঞ্চু ধূসরাভ-নীল বা মলিন স্লেট-ধূসর। পা ও আঙুল ধূসরাভ-নীল, জালপাদ ও নখর কালো। ওজনে এক কিলোর মত। স্ত্রী-পাখির উপরাংশ গাঢ়, নিম্নাংশ পাটকিলে-সাদা। চঞ্চুর গোড়ায় কপালের উপর চওড়া সাদা পটি।

বাসস্থান— উত্তর ইওরোপ ও এশিয়ার উত্তরাংশ। শীতে পরিযায়ী হয়, ব্রিটেন সমেত পশ্চিম ইওরোপ, ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চল, কৃষ্ণসাগর, পারস্য উপসাগর, উত্তর-পশ্চিম ভারতে। মাঝে মাঝে ভারতে পরিযায়ী হয়ে পাকিস্তান, কাশ্মীর, কুলু, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ থেকে নেপাল, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ (কলকাতা ?), বাংলাদেশ, আসাম, মণিপুর, দক্ষিণ গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে আসে।

এদের বাসা বাঁধা, ডিম পাড়া সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। মনে করা হয়, বামুনিয়া হাঁসের মতই আচার-ব্যবহার। ডিম পাড়ে 7 থেকে 12টি হালকা জলপাই রঙের।

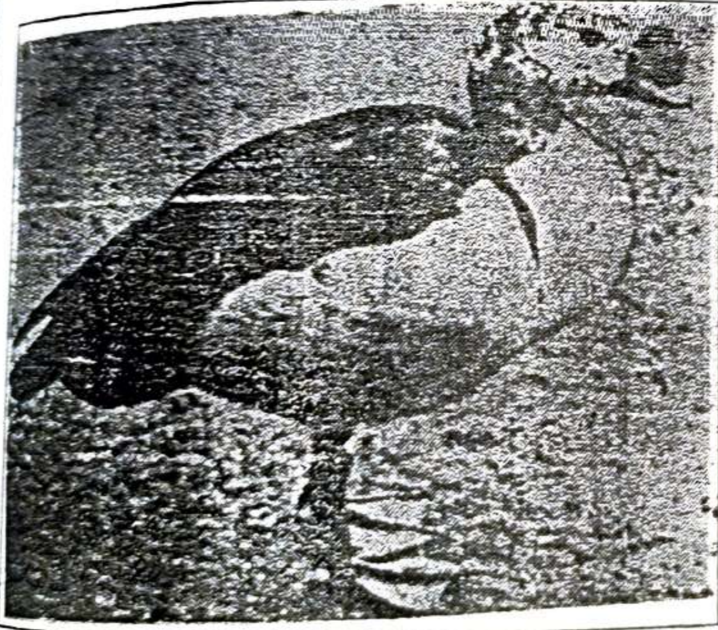
সুন্দরবনে মণিপুরের চরায় এবং রায়মঙ্গল ও বড় কলাগাছিয়া নদীর বুকে নৌকোয় 5-6 মিটারের মধ্যে গিয়ে লক্ষ্য করেছি। ঝাঁকের মধ্যে স্ত্রী-হাঁসও দেখেছি। বামুনিয়ারা ডাকে খুব আস্তে, উড়তে উড়তে 'কুরর-কুরর' করে। এদের শুনলাম আস্তে 'মিউ-মিউ' করে ডাকতে। একটা জোরে চিৎকার

করে ডাকও আছে। সেটা শুনিনি, তার থেকেই 'স্কপ' নামটা এসেছে। এদেরই অল্প তফাতে দেখেছি বড় রাঙামুড়ি (রেড-ক্রেস্টেড পোচার্ড, নেটটা রুফিনা), বামুনিয়া, গিরিয়া (গারগেনি, আনাস কিয়ের কিডুলা) ও চকা-চকিদের সঙ্গে চরতে।

1982-র শীতে সুন্দরবনে আসেনি হয়ত খরার জন্যে। তাই হঠাৎ তিস্তার বুকে একটিকে দেখে অবাক হয়েছি। কলকাতায় ফিরে দেখা হল সেবকে থাকেন এমন এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে। তিনিও কালীহাঁসের এই অপূর্ব খেলাটা দেখে থাকেন তাঁর বাড়ি থেকে।

নাকটা (Comb Duck)

সত্তর দশকের প্রায় শেষের দিকে এক শীতকালে শান্তিনিকেতন থেকে এক আত্মীয়ের চিঠি পেলাম, ওখানে লালবাঁধে বল্লভপুরের জলায় এক রকম হাঁস পড়েছে একশ'রও উপরে, যা তিনি আগে কখনও দেখেন নি। একটা স্কেচ করেও পাঠিয়েছেন। ছবিতে পাখির চঞ্চুর উপরে নাকের কাছে একটা আব। কিছু পাখির আবটা আবার নেই। রোজ সকালে-বিকেলে ওদের চলাফেরা দূরবীন দিয়ে সবই লক্ষ্য করেছেন। অনুরোধ করেছেন, আমি যেন চট করে চলে আসি। এই হাঁস সন্তরক বর্গের (আনসেরিফরমেস) অন্তর্গত হংস বংশের (আনাটিদি) এক প্রজাতি, নাম— নাকটা (সারকিডিঅরনিস মেলানোটস্), ইংরেজি— *নাকটা, কুমব্ ডাক*। পাতিহাঁসের চেয়ে কিছুটা বড়। লম্বায় 76 সেমি.।



চি 126. নাকটা

পুরুষের দেহের উপরাংশে কালোর উপরে নীলচে-সবুজ এবং বেগুনির আভা। নিম্নাংশ ধূসর, সেটা বোঝা যায় উড়লে। মাথা ও গলা সাদা, তার উপর কালো ছিট। বাকি বুক, পেট সব সাদা। একটি আধখানা কালো কলার বুকের দু'পাশ দিয়ে নেমে এসেছে। ঠিক ঐরকম আরেকটি কালো টান নেমে এসেছে লেজের আচ্ছাদকের সামনে থেকে। ডানায় দ্বিতীয় সারির পালক তামাটে। একটা কালো মাংসল আব, কালো চঞ্চুর গোড়ায়, কপালের শেষে। প্রজননকালে এই আবটা খুব বড় হয়। পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের ওজন 2 কিলো 610 গ্রাম।

স্ত্রী-পাখি পুরুষের চেয়ে আকারে কিছুটা ছোট এবং রঙও অনেক নিষ্প্রভ। আর নাকের উপর আবটাও থাকে না। দুজনেরই কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে, পা ও আঙ্গুল সীসে। স্ত্রী-পাখি ওজনে 1 কিলো 925 গ্রাম থেকে 2 কিলো 325 গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে।

বাসস্থান— ভারতের সর্বত্র। তবে জলা জায়গার আকার ও প্রকার ভেদে কিছুটা এদেশ-ওদেশ

করে বেড়ায়। একমাত্র পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশে ক্বচিৎ দেখা যায়। পাকিস্তানের অন্যত্র কোথাও দেখা যায় না। বাংলাদেশ থেকে আসাম, দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত, নেপালে দেখা যায় না। ভারতের বাইরে আফ্রিকায় গাম্বিয়া, সুদান থেকে দক্ষিণে কেপ অফ গুড হোপ এবং মালাগাসি, বার্মা এবং দক্ষিণ-পূর্ব চীন। দক্ষিণ আমেরিকায় একটি উপজাতিকে (Sylvatica) দেখা যায়। আড্ডা গাড়ে নলখাগড়া ইত্যাদি জলজ ঘাসের ঝিল বা দীঘিতে, কাছেপিঠে কিন্তু কিছুটা জঙ্গল থাকা চাই।

খাদ্য— নিরামিষই প্রধান। যেমন, নানাবিধ শস্য, নবাঙ্কুর চারা, জলজ গাছের বীজ, বুনো ও চষাখেতের ধান। এছাড়া অবশ্য কিছু কিছু জলজ পোকা ও তাদের শূক এবং মাঝে মাঝে ব্যাঙ ও মাছ। *ডাক—* এমনি ডাকে না, তবে যখন দল বেঁধে খাদ্য অন্বেষণ করে তখন মুখ দিয়ে একটা অব্যক্ত কর্কশ আওয়াজ করে। একমাত্র প্রজননকালেই জোরে তীক্ষ্নসুরে একটা ডাক ডাকে।

স্বভাব— নাকটা 4 থেকে 10 এর পারিবারিক দলে বিচরণ করে। মাঝেমাঝে 25 থেকে 30- এর দলেও দেখা যায়। ক্বচিত একশ' বা তার কিছু বেশির দলে, যেমন দেখা গিয়েছিল শান্তিনিকেতনে। ওড়ে বেশ দ্রুতগতিতে। ওড়ার ভঙ্গিমায় রাজহাঁসদের (goose) ছাপ পাওয়া যায়। অন্যান্য হাঁসেদের চেয়ে এরা বেশি হাঁটতে পারে। দিনের বেলা গাছের ডালে অবলীলাক্রমে বসতে দেখা যায়। অবশ্য কাছে যদি বড় গাছ থাকে তবেই। গাছের কাণ্ড আঁকড়ে ঝুলে থাকতে কোন অসুবিধেই বোধ করে না। এটা দেখা যায় বাসায় ঢোকার মুখে। সাধারণত অন্যান্য হাঁসেদের মত খাদ্যের জন্য ডুব দেয় না, কারণ খাদ্যসংগ্রহ করে মাটির উপর চরতে চরতে। কিন্তু নির্মোচনের সময় যখন ওরা ওড়ার ক্ষমতা হারায় তখন মানুষের হাতে বন্দী হবার আশঙ্কায় ডুব দিয়ে দূরে সরে গিয়ে নিজেদের বাঁচায়। বন্দুকের গুলিতে আহত নাকটাকে দেখেছি এই রকমই। ডুব দিয়ে মানুষের হাত এড়াবার চেষ্টা করতে।

প্রজননকাল— জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর। বাসা বাঁধে মাঝামাঝি উচ্চতার পুরানো গাছের কাণ্ডে, স্বাভাবিকভাবে যে গর্তের সৃষ্টি হয় তার ভিতরে। সেটা জলের ধারেও হতে পারে, আবার জল থেকে বেশ দূরে হলেও সেখানে হতে পারে। আমগাছই ওদের বেশি পছন্দের। আবার কখনও দেখা যায় শকুনের পরিত্যক্ত বাসায় কিংবা পুরনো কেল্লার বা মাটির ঢিবির গায়ের গর্তের ভিতর। সাধারণত কিছু বিছয় না, আবার সময়ে সময়ে দেখা যায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কিছু শুকনো পাতা, ঘাস এবং পালক বিছুতে।

ডিম পাড়ে 7 থেকে 15টি মলিন ঘি-রঙের। মনে হয় পালিস করা আইভরি। ডিমের গড় মাপ লম্বায় 61˙8 চওড়ায় 43˙3 মিমি.। স্ত্রী-পাখি একাই ডিমে তা' দেয় বলে মনে হয়। ডিম ফুটে বাচ্চা বার হতে সময় নেয় 30 দিন। অনেক সময় দেখা যায় একটি বাসায় অনেকগুলি ডিম। একবার একটি বাসায় পাওয়া গিয়েছিল 47টি ডিম। এটা হতে পারে যে বড় গাছ বা পছন্দ অনুযায়ী গর্তের অভাবে একটি গর্তেই দুটি বা তিন-চারটি স্ত্রী-পাখি ডিম পেড়েছে।

আরও কিছু সন্তরক বর্গের অন্তর্গত কিছু হাঁস পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়, তারা হল

1. **বেঁটে রাজহাঁস** (আনসার এরাইথ্রপাস), ইংরেজি— *লেসার হোয়াইট ফ্রন্টেড গুজ, ডোয়ার্ফ*

 (Lesser White-fronted Goose)

গুজ। লম্বায়— 53 সেমি. (21 ইঞ্চি)। হংস গণের (আনসার) এক প্রজাতি।

গাঢ় পাটকিলে দেহ। তলায় বুকে ও পেটে কিছু কালো দাগ, মাথা প্রায় গোলাকার, ছোটো গোলাপী চঞ্চু। চঞ্চুর উপর থেকেই সাদা কপাল, সেই সাদা গিয়ে পৌঁছেছে মাথার উপরে চোখের দু'পাশে। চোখকে ঘিরে ফোলা হলদে চামড়ার আঙটি। কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু গোলাপী, পা কমলা-হলুদ। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান— খুবই দুর্লভ, ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় শীতের আগন্তুক। পাকিস্তানের সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম। দক্ষিণে মহারাষ্ট্রের পুনা জেলায়। ভারতের বাইরে নরওয়ের ল্যাপল্যাণ্ড থেকে সাইবেরিয়ার কলাইমা, মনে করা হয় আরও পুবে। শীতে কাটায় দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপ, কৃষ্ণ ও কাশ্যপ সাগর, মধ্যপ্রাচ্যের ইরাক ও ইরান, সীস্টান, তুর্কিস্তান, চীন এবং জাপান।

স্বভাব— কাশ্যপ সাগর ও উত্তর ইরাকে বেশ বড়ো দলে সাধারণত জমায়েত হয়। ভারতে দুটি বা তিনটিকেই একসঙ্গে দেখা যায় তাও একমাত্র কাদম্ব হাঁসের দলের মধ্যে। যাঁরা ডাক শুনেছেন, তাঁরা বলেন খুব জোরে তীব্রস্বরে দুই স্বরের সমন্বয়ে।

(Marbled Duck)

2. **চই** (আনাস আস্ট্রস্টিরস্ট্রিস), ইংরেজি— *মার্বলড টিল*। লম্বায় 48 সেমি. (19 ইঞ্চি)। ক্রামিক গণের (আনাস) এক প্রজাতি।

উপরাংশ : ধূসরাভ-পাটকিলে, তার উপর মার্বেল গুলির আকারে গোল গোল ধূসরাভ হলদেটে-লাল ও কালচে রঙের ছিট। ঘাড়ের কাছে খুব ছোটো ঝুঁটি। ডানার মুকুর প্রায় দেখা না যাওয়ার মতন মলিন ফিকে-পাটকিলে। নিম্নাংশ : নোংরাটে সাদা, তার উপর অল্পমাত্রায় পাটকিলের আড়াআড়ি দাগ। কনীনিকা পাটকিলে, চঞ্চু কালচে, তার উপর মলিন ধূসর-সবুজের ত্রিকোন একদম গোড়ায়। পা ও আঙুল জলপাই-পাটকিল, পায়ের ঝিল্লী কালচে। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। স্ত্রী-পাখি আকারে অল্প ছোটো।

বাসস্থান— বাসা বাঁধার খবর পাওয়া যায় পাকিস্তানের বেলুচিস্তান ও সিন্ধুপ্রদেশে। শীতে কচিৎ দেখা যায় ভারতের উত্তরাংশে, কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে নৌশেরায়, পাঞ্জাবের ভাওয়ালপুরে, মাঝে-মধ্যে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানের বিকানীর ও ভরতপুরে, গুজরাটের কচ্ছ, ভবনগর, আমেদাবাদ ও বরোদা জেলায়, মহারাষ্ট্রের আমেদনগর ও পুনায়, পশ্চিমবঙ্গ, আসামের শিবসাগরে। দেখা যায় নলখাগড়াপূর্ণ জলা, আগাছায় ভরা বিল, জলে ডোবা চিরহরিৎ ঝাউ-জঙ্গল ইত্যাদিতে। সাধারণত এরা উন্মুক্ত জারাশি এড়িয়ে চলে। ভারতের বাইরে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, স্পেন থেকে পারস্য, বেলুচিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম ভারত।

বাসা বাঁধে পাকিস্তানে কোয়েটার কাছে খুশদিল খান হ্রদ, লাস বেলার সানসিয়ানি ঝিল, সম্ভবত সিন্ধু প্রদেশের মনচার হ্রদ এবং সম্ভবত গুজরাটে, মে-জুন মাসই প্রশস্ত সময়, দেখা যায় হ্রদের ধারে বা দ্বীপের ভিতর ঝোপঝাড়ে ভিজে জমিতে।

ডিম পাড়ে 7 থেকে 12টি ফিকে হলুদ, একটু লম্বাটে উপবৃত্তাকার, উপরটা মসৃণ চকচকে।

ডিমের গড় মাপ 46.5 × 34.2 মিমি.। 25 দিনে ডিম ফোটে। স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই ডিম ফোটাতে পরস্পরকে কতটা সাহায্য করে তা এখনও জানা যায় নি।

(Baikal teal)

3. **বৈকাল টিল,** ক্লাকিং টিল, ফরমোসা টিল (আনাস ফরমোসা)। স্থানীয় ভাষায় কোনো নাম নেই, সব নামই ইংরেজি। লম্বায় 40 সেমি. (সাড়ে 15 ইঞ্চি)। ক্রামিক গণের, *এক প্রজাতি।*

এই অদ্ভুত সুন্দর পাখিটির উপরাংশ ঃ চাঁদি, ঘাড়, ঘাড়ের পিছন ও গলা কালো। মুখ, গলার দু'পাশ ও গলার তলা লালচে-হলুদ, ধারে খুব সরু করে সাদা। খুব সরু করে ফালি চাঁদের আকারে কালো পটি চোখ থেকে নেমে এসেছে গলায়। চাঁদি ও চোখের সামনে ও উপরে দু'দিকে খুব সরু সাদা পটি গোল হয়ে নেমে এসেছে কালো ঘাড়ের দু-পাশ দিয়ে, নিচে গলার হলদেটে-লালের পাশে। চওড়া চাঁদির আকারে একটা ধাতব সবুজ পটি চোখের পাশ দিয়ে মাথার দু-পাশ দিয়ে ফাঁস হয়ে লালচে-হলুদ মুখের ছোপের পাশে। অংশ-ফলকের ভিতর এবং তৃতীয় সারির পালক খুব লম্বাটে এবং বর্শা-ফলকের ভিতর কালো,সাদা এবং দারুচিনি রঙা। মুকুর কালো, ব্রোঞ্জ-সবুজ ধারের পর কালো ও সাদা। নিম্নাংশ ঃ বুক পাকা আঙুর-রঙা, তার উপর কালো ছিট, ধারটা স্লেট-রঙা, বাকি তলার বেশির ভাগ সাদা। কনীনিকা পাটকিলে, লালচে পাটকিলে বা বাদামী-পাটকিলে। চঞ্চু গাঢ় নীলচে থেকে স্লেট-কালো। পা ও আঙুল ফিকে সীসে বা স্লেট-নীল।

এই সুন্দর পাখিটিকে লবণ হ্রদে 1950 সালের শীতে এক বারই দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। শরালদের সঙ্গে একটা খোলের ভিতর চরছিল। দাঁড়িয়ে দেখছি। গুলি করব কিনা ভাবছি! এমন সময় উড়ল একটা আধা চক্কর মেরে আমাদের চোখের সামনে দিয়ে ঘুরে উত্তর দিক ধরে উপরে উঠতে উঠতে দিগন্তে মিলিয়ে গেল। আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে সেইদিকে তাকিয়ে রইলাম।

বাসস্থান— খুবই দুষ্প্রাপ্য এবং বিক্ষিপ্তভাবে শীতের আগন্তুক পাখি। দেখা যায় পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মণিপুর। বাসা বাঁধে সাইবেরিয়ার ইয়েনিস নদী থেকে কলাইমা উপত্যকা ও আনাডাইর, দক্ষিণে বৈকাল হ্রদ, উত্তর শাখালিন এবং উত্তর কামচাটকা। শীতে যায় চীন ও জাপানে। ফরমোসা এখানে দেশ নয়, লাতিন ভাষায় ফরমোশার অর্থ 'সুন্দর'।

স্বভাব— কিছু জানা যায় নি। শুধু একবার মণিপুরে 8-10টি পাখি এসেছিল। ধরা পাখির ডাক শোনা গেছে যা-খুব জোরে স্ত্রী-মুরগীর ডাকের মতন।

(Baer's Pochard)

4. **বড়ো ভূতিহাঁস** (আইথিয়া বায়েরি)। অসামিয়া— *বড় কালি মুড়ি*, ইংরেজি— *বেয়ার'স পোচার্ড, ইস্টার্ন হোয়াইট আই।* লম্বায় 46 সেমি. (18 ইঞ্চি)। উর্ধ্বব্যাসচঞ্চু গণের (আইথিয়া) *এক প্রজাতি।*

পুরো মাথা ও ঘাড় কালোর উপর চকচকে সবুজাভ, বুক উজ্জ্বল লালচে-বাদামী। পেটে বড়ো ডিম্বাকার সাদা ছোপ, মুকুর সাদা, লেজের তলার আচ্ছাদক সাদা বা সোনালি-হলুদ, স্ত্রী-পাখির পাটকিলে। চঞ্চু স্লেট-নীল, চঞ্চুর শেষাংশের কিছুটা ও ডগা কালচে। পা ও আঙুল ধূসর, নখর কালচে।

এই হাঁসটিকে লবণ হ্রদে 28.10.52 তারিখে প্রথম দেখি। খুব অল্পই দেখা যায়। শীতে আসে

মণিপুর, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে। এছাড়াও দেখা গেছে বিহারে। ভারতের বাইরে প্রজনন করে ট্রান্সবৈকালিকা থেকে নিম্ন-উসূরি ও আমূর, কামচাটকা (?)। শীতে আসে চীন, কোরিয়া, জাপান, উত্তর আসাম ও বর্মা।

পরিযায়ী হওয়ার বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। এদের ক্ষমতা বেশ এবং দ্রুতগামী, ভূতিহাঁস বা লাল বিগরির চেয়ে অনেক বেশি। এছাড়া আর কোনও খবর এদের সম্বন্ধে এখনও পাওয়া যায় নি।

(Smew)

5. **নিকেন্নে** (মেরগাস অলবেল্লাস), সিন্ধি— *ঝালি*, ইংরেজি— *স্মিউ*। লম্বায় 46 সেমি. (18 ইঞ্চি)। কারণ্ড গণের (মেরগাস) *এক প্রজাতি।*

সাদা-কালো হাঁস। সাদা দেহে একটা ধাতব কালো ছোপ মুখের উপর, একটি কালো পটি চোখের পিছন থেকে ঘাড়ের উপর, ঝুঁটি মাথার উপরে পেতে পড়া। পিঠ কালো, দুটি কালো পটি অক্ষবিমুখ হয়ে সাদা বুকের দু'পাশে নেমে এসেছে। দেহের দু'পাশ ও লেজ ধূসর। কালো লেজ, কালো-সাদা ডানা। কনীনিকা পুরুষের উজ্জ্বল লাল, স্ত্রী-পাখির লালচে-পাটকিলে। চঞ্চু পুরুষের সীসে, নখর ধূসর-সাদা, স্ত্রী-পাখির গাঢ় সীসে-ধূসর, তার উপর সবুজাভ, নখর সাদাটে। পা-ও আঙুল পুরুষের সীসে, স্ত্রী-পাখির ফিকের উপর সবুজের আভা, লিপ্তপাদ কালো।

বাসস্থান— প্রায়ই শীতে দেখা যায় বেলুচিস্তান, সিন্ধুপ্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ. উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাব, দিল্লী, ভূটান ডুয়ার্স, উত্তর-পূর্ব আসাম, দক্ষিণে উত্তর গুজরাট, বিহারের হাজারিবাগে, ওড়িশার কটক, পশ্চিমবঙ্গের রানীগঞ্জে। দেখা যায় ছোটো উন্মুক্ত ঝিল, হিমালয়ে পার্বত্য স্রোতস্বতীতে যেখানে পাহাড়ের তলা থেকে সমতলে নেমেছে। ভারতের বাইরে স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে সাইবেরিয়া, দক্ষিণে ভোলগা, তুর্কিস্তান ও আমূর। শীত কাটায় সমুদ্রের ধার ও হ্রদে— ব্রিটেন, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, পারস্য থেকে চীন ও জাপান।

স্বভাব— ছোটো দলে সাধারণত বিচরণ করে। মাঝে মাঝে বড়ো দলেও দেখা যায়। ভালো সাঁতারু এবং ডুব সাঁতারেও বেশ পারঙ্গম। স্রোতের বিপরীত দিকেই সাধারণত সাঁতার দেয় কিন্তু সামান্যতম বিপদের আশঙ্কায় জলে ডুব দেয়। সূঁচলো ডানা দিয়ে খুব দ্রুত সাবলীল গতিতে প্রায় শব্দহীনভাবে ওড়ে।

খাদ্য— প্রধানত মাছ, তাছাড়া কবচী, কম্বোজ, জলজ পোকামাকড় ও তাদের শূক ইত্যাদি. মাঝে-মধ্যে কিছু উদ্ভিজ্জ বস্তু।

বাসা বাঁধে জলের ধারে গাছের গায়ে আপনা থেকে হওয়া গর্তে। ডিম পাড়ে 6 থেকে 10টি, ফিকে নবনীর মতো লালচে-হলুদ। ডিমের গড় মাপ 52·2 × 37·5 মিমি.।

দীর্ঘজঙ্ঘ বর্গ

বক বংশ

কাঁক

লবণ হ্রদে পৌঁছবার পর গোটা চারেক খোল পার হয়ে পৌঁছতাম এক জায়গায়. সেখানে এক গাছের তলায় বনবিবির এক ছোট্ট থান ছিল। সেখানে দু'চারটে পয়সা সেই সিদুঁরলেপা মূর্তির তলায় পড়ে থাকত। তবে কাউকেই সেই পয়সা ছুঁতে দেখি নি।

একদিন সকালে পৌঁছেছি বনবিবির থানে। সূর্য সবে উঠেছে। পাড়ের লাগোয়া নলখাগড়ার দামের সামনে একটা ভাসমান ঘাসের চাপড়ার উপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, জলের দিকে চেয়ে বকের মতন একটি পাখি, তবে লম্বায় অনেক বড়। যেমন লম্বা গলা, তেমন লম্বা পা।



চি 127. কাঁক

পাখিটা যেমন নিঃশব্দে স্থির হয়ে জলের দিকে তাকিয়ে, আমরাও তেমনি বনবিবির গাছের আড়াল থেকে ওর দিকে। আমাদের থেকে হাত-পঞ্চাশেক দূরে হবে। সকালের রোদ এসে পড়েছে ওর গায়ে। পিঠ ছাই-ধূসর, ঘাড় ও মাথা সাদা, মাথা থেকে টিকির মত কালো ঝুঁটি নেমেছে। তলার দিকে গলার মাঝখান থেকে নিচে নেমেছে লাইন ধরে কালো ফুটকি, বুকে সাদা লম্বাটে পালকের উপর কালো কালো সরু টান। নিচের বাকি পালক ধূসরাভ-সাদা।

গলাটা টান করে দাঁড়িয়ে আছে যেন কিছুই দেখছে না। শুধু তাকিয়ে আছে সুদূরের পানে। তারপর গলাটা গুটিয়ে মাথাটা কাঁধের মাঝে রেখে একাগ্রচিত্তে তাকাল পায়ের কাছে জলের দিকে। এক মিনিটও হবে না, দেখি গলাটা বাড়িয়ে নিচের দিকে ঝুঁকে লম্বা সরু গাড় শিঙে-পাটকিলে চঞ্চুটিকে জলের একটু উপরে রেখে স্ট্যাচু হয়ে রইল।

চুপ করে দাঁড়িয়ে ওর রকমসকম দেখছি। হঠাৎ বিদ্যুৎগতিতে পাখিটা র ছোরা-চঞ্চু চালিয়ে দিয়ে জলের মধ্যে থেকে ধরে আনল দুই চঞ্চুর মাঝে একটা ইঞ্চি তিনেকের শোল কি ল্যাটার

খানা। উপর দিকে গলাটা তুলে ঝাঁকি দিয়ে মাছটাকে কায়দা করে বাগিয়ে মাথার দিকটাকে প্রথমে ঢুকিয়ে গলায় চালান করে দিল।

দেখে ফেলল আমাদের। সঙ্গে সঙ্গে 'কোয়ারংক' বলে ডাক দিয়ে গলাটা বাড়িয়ে বড় পাখা ঝাপটিয়ে অতি কষ্টে যেন শূন্যে উঠে পড়ল। পা দুটো ঝুলছে। লেজটা এদিক-ওদিক, উপর-নিচ করতে করতে বেশ কিছুটা উঠে, পা সোজা টান করে লেজের সঙ্গে লাগিয়ে দিল এবং পা লেজ ছাড়িয়ে গেল। গলাটা গুটিয়ে ইংরেজি 'এস'-এর মত করে চওড়া ডানা ঝাপটে প্রথমে ধীরে ধীরে তারপরে বেশ জোরে উড়ে চলল। আরেকবার নিস্তব্ধ জলাভূমি কাঁপিয়ে ডাক দিল 'কোয়ারংক'।

সঙ্গী বলল, একেই কি কাঁক বলে? বললাম হ্যাঁ। কাঁক, সাদা কাঁক, অঞ্জন, কঙ্ক (আরডিয়া কিনেরিয়া রেকটিরসট্রিস)। ইংরেজি— *গ্রে হেরন।*

লম্বায় 98 সেমি। দাঁড়ান অবস্থায় উচ্চতা 75 সেমি। কনীনিকা সোনালি-হলুদ। প্রজননকালে চঞ্চুর রং উজ্জ্বল কমলা-হলুদ, মাঝখান দিয়ে একটা পাটকিলের টান। পা ও আঙুল সবজেটে-পাটকিলে, প্রতিটি গাঁটে হলুদের ছোপ। কিন্তু প্রজননকালে রং বদলে হয় উজ্জ্বল কমলা-হলুদ, কখনও দেখা যায় তার উপর গোলাপি আভা।

বাসস্থান— সমগ্র ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, আন্দামান, ও মালডিভ দ্বীপপুঞ্জে এবং শ্রীলঙ্কার ঝিল, বাদা, নদী ও সমুদ্রের খাঁড়ি, গরান-বাইনের জলা ইত্যাদি। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্য, বার্মা, থাইদেশ, ইন্দোচীন, মালয়েশিয়া, পূর্ব সাইবেরিয়া, পূর্ব চীন, জাপান, ফরমোজা ও হাইনানে।

খাদ্য— মাছ, ব্যাঙ, কম্বোজ, কবচী, জলজ পোকামাকড়, ছোট ইঁদুর ও পাখির ছানা।

প্রজননকাল— ভারতের বিভিন্ন স্থানে মার্চ থেকে নভেম্বর। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই বাসা বাঁধতে পরস্পরকে সাহায্য করে। সুন্দরবনে সজনাখালিতে বাইন গাছের উপর শামুকখোল, ধরবক, বাচকাদের সঙ্গে বাসা বাঁধতে দেখেছি। গাছের সরু ডাল প্রধান উপকরণ, মাঝখানটা খোঁদল করা। পাতা, খড় ও জলজ আগাছা দিয়ে ভিতরে আস্তরণ দেয়।

ডিম পাড়ে সাধারণত 3-4টি, কখনও 5 টি লম্বাটে সবজেটে-নীল রঙের। ফোটে 25-26 দিনে বাচ্চাদের খাওয়ায় আধাহজমী খাদ্য। বাবা-মা কেউ বাসায় ফিরলে ছানারা তার চঞ্চু ধরে টানাটানি করে, যতক্ষণ না আধাহজমী খাদ্য কেউ একজন তাদের কারুর মুখে উগরে দেয়। একটু বড় হলে বাসার মেঝেতে থাকা ওগরান খাদ্য তুলে খায়।

কলকাতার লবণ হ্রদে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ দশকে আরেক রকমের কাঁক (আ কি কিনেরিয়া) দেখেছি, তারা পরিযায়ী হয়ে আসে। তাদের বাসস্থান ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা থেকে এশিয়া মাইনর এবং উত্তর-পশ্চিম সাইবেরিয়া। একই আকারের, তবে পিঠের ধূসর রঙটা আরও অনেক গাঢ়। তফাত ধরেছি দুই উপজাতিকে শিকার করার পর। ডাকের তফাতও একটু আছে। এই ইউরোপীয় কাঁক ডাকে একটু জোরে এবং তীক্ষ্নস্বরে 'ক্রাইয়াংক'। আচার-ব্যবহার দু'জনের এক। এরা দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত পরিযায়ী হয়। রাশিয়ার কাজাকাস্থানে আঙটি পরান একটি কাঁক ধরা পড়েছিল মহীশূরের দক্ষিণ কানাড়ায়।

কাঁক (আরডিয়া পারপরিয়া

মানিলেনসিস), হিন্দি— *লাল অঙ্গুন'* ইংরেজি— *পার্পল হেরন।* লম্বায় 97 সেমি. (38 ইঞ্চি), দাড়ানো উচ্চতায় 70 সেমি.।

বাসস্থান— সারা ভারতের সমতলে, পুবে আসাম, মণিপুর, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, শ্রীলঙ্কা। দেখা যায় ঝিল, আগাছাপূর্ণ জলায়, হ্রদ এবং নদীতে।

স্বভাব— খাদ্য গ্রহণ কাঁকের মতন। উত্তর ভারতে বাসা বাঁধে জুন থেকে অক্টোবর, দক্ষিণ ভারতে নভেম্বর থেকে মার্চ। নিজেদের ছোটো কলোনি করেই বাসা বাধে। কখনও দেখা যায় অন্যান্য বকেদের সঙ্গে, যেমন দেখি সুন্দরবনে। প্ল্যাটফর্ম আকারে কাঠি-কুটো দিয়ে বাসা বানায়।

ডিম পাড়ে 3 থেকে 5 টি, ক্বচিৎ 6টি ফিকে সামুদ্রিক-সবুজ বা সবজেটে-লাল। কিছুটা লম্বাটে আকারে। ডিমের গড় মাপ 54˙6 × 39˙7 মিমি.। দু'জনেই ডিমে তা' দেওয়া থেকে সন্তান প্রতিপালন করে।প্রতিটি ডিম পাড়ে 24 ঘণ্টা অন্তর। ডিম ফুটতে সময় নেয় 24 থেকে 26 দিন।

গো-বক

কাক, চড়াই, শালিক, চিল যেমন খাস কলকাতার পাকাপোক্ত বাসিন্দা, ঠিক তেমনি আরেকটিকে দেখি খাস কলকাতা না হলেও পোস্টাল জোনের মধ্যে। আবার গড়ের মাঠেও ভরদুপুরে দেখেছি গরুর পায়ে পায়ে চরতে। মাঝে মাঝে শহর কলকাতার বুকে উড়তে উড়তে বিশ্রাম নেবার জন্যে গাছের উপর এসেও বসে। খুব একটা নজর না দিলেও পাখিটাকে আমরা সকলেই দেখেছি। পাখিটা বক বংশের (আরডিয়িদি) অন্তর্গত, গো-বক (বুবুলকাস আইরিস), ইংরেজি— *ক্যাটাল ইগ্রেট।*



চি. 128 গো বক

লম্বায় 51 সেমি.। ছিপছিপে রোগাটে ধবধবে সাদা পাখি। চঞ্চু হলদে, চঞ্চুর গোড়া থেকে চোখের পাশ পর্যন্ত পালকহীন সবজেটে-হলুদ চামড়া। কনীনিকা সোনালী-হলুদ। পা ও আঙ্গুল কালো, জঙ্ঘাস্থির উপরাংশ ও আঙ্গুলের তলা হলদে বা সবজেটে-হলুদ। এই পালকগুলি সরু লোমের মত। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে, তবে পুরুষরা গড়ে স্ত্রী-পাখির চেয়ে কিছুটা বড় হয়।

বাসস্থান— ভারতে আসমুদ্র-হিমাচল, আন্দামান, নিকোবর, লাক্ষা ও মালডিভ দ্বীপপুঞ্জ এবং শ্রীলঙ্কা। ভারতের বাইরে বার্মা, ইন্দোচীন, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ চীন, কোরিয়া, দক্ষিণ জাপান, ফরমোসা, হাইনান, ফিলিপিনস, সুন্দা, সেলিবিস ইত্যাদি

দ্বীপপুঞ্জে। শীতে হিমালয়, ইউরোপ ও উত্তর এশিয়ার পাখিরা নেমে এলে 1500 মি. উচ্চতায় দেখা যায়, বিশেষত নেপালে। আফ্রিকার উষ্ণপ্রধান অঞ্চলেও বসবাস করে থাকে। সম্প্রতি আমেরিকাতেও উপস্থিত হয়েছে।

খাদ্য— প্রধানত পোকামাকড়, অল্পমাত্রায় ব্যাঙাচি, ব্যাঙ ও টিকটিকি-গিরিগিটি।

স্বভাব— গো-বকরা সঙ্ঘচারী। সাধারণত দেখা যায় যেখানে গাঁয়ের গরুরা চরে-পুকুর বা বিলের ধারে কিংবা জল থেকে বেশ দূরে চষা কিন্তু অনাবাদী জমিতে, অথবা জঙ্গলের ধারে উন্মুক্ত মাঠে, সেখানে গরুদের পায়ে পায়ে বা পাশে পাশে চলেছে। আসামে কাজিরাঙ্গায় দেখেছি বুনো মহিষ ও গণ্ডারের পাশে বা তাদের পিঠের উপর নির্ভয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এদের পাশে পাশেও দৌড়ে চলে, কখনওবা পেটের তলা দিয়ে এদিক থেকে ওদিক যায়, আর জন্তুদের পদচারণায় ঘাসফড়িং বা অন্যান্য পতঙ্গ উড়লেই লম্বা গলা বাড়িয়ে সূঁচলো চঞ্চুতে কপ্ করে ধরে মুখে পোরে। কখনও দেখা যায় মাটিতে গরু, মহিষ বা কাদাতে গণ্ডার, বুনো মহিষ বসে আরাম করছে, আর তাদের পিঠে বা মাথার উপর বসে কানের পাশ বা ভিতর থেকে পোকা বার করে খাচ্ছে। গা থেকে জোঁক ও এঁটুলি-পোকা খেতেও কসুর করে না। অনেক সময় শালিকও এদের সঙ্গী হয়। জমির উপরে, নিচু শাকপাতার জঙ্গলের মাঝে, নীলমাছি (ব্লুবটল ফ্ল্যাই, মুসকা ভমিটোরা) ধরার জন্যে চঞ্চু বাগিয়ে ধরে লম্বা গলাটা এমনভাবে এদিক-ওদিক, সামনে-পিছনে করতে থাকে, যেন কষে টিপ করছে। তারপর আকস্মিকভাবে মাছিটাকে চঞ্চু দিয়ে মারে এক খোঁচা।

সব সময় গরু-মহিষদের যে কাছে-পিঠেই থাকে তা কিন্তু নয়। বেশ বড় দলে কখনও কখনও জমায়েত হয় জলে ভেজা চষা জমিতে, যেখানে লাঙ্গল দেবার জন্য মাটি ওলট-পালট হয়ে আছে। তাদের খাদ্যবস্তু প্রচুর মেলে। গ্রাম বা শহরের আশপাশে গো-ভাগাড়ে যেখানে শকুনদের ভিড়, সেখানে গিয়েও হাজির হয়, কারণ সেখানে নানাজাতের কীটপতঙ্গ ও তাদের শূকের ছড়াছড়ি।

রাত্রিবাস করার জন্য যে গাছ তারা পছন্দ করে সেখানে কাক-শালিক ইত্যাদি অন্য পাখিরাও আশ্রয় নেয়। প্রতি সন্ধ্যায় সেখানেই ফিরে আসে বংশগত ওড়ার ভঙ্গিতে, অর্থাৎ গলা গুটিয়ে মাথাটা দুই কাঁধের মধ্যে গুঁজে, পা-জোড়াকে লেজের সঙ্গে সেঁটে লম্বা করে দিয়ে, আর তা নৌকো-জাহাজের হালের মত বেরিয়ে থাকে।

এমনি ডাকে না, চুপচাপ, তবে কলোনি-বাসায় কাউকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নিজের জায়গাটা পাকা করার সময় গলা দিয়ে একটা কর্কশ অব্যক্ত আওয়াজ করে। বাসায় বাচ্চারা রাতদুপুরে মাঝে মাঝে চিৎকার করে, তখন মনে হয় যেন মানবশিশু কাঁদছে।

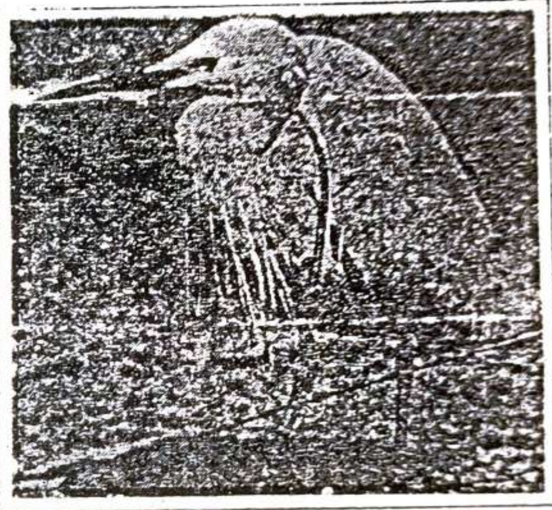
বেশ পোষ মানে। কলেজ জীবনে দেখেছি বিদ্যাসাগর কলেজের মালী নরেন্দ্র গোটা চার-পাঁচ পুষেছিল, সেগুলো মার্কাস স্কোয়ারে কুকুরের মত তার পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াত।

প্রজননকাল—জুন থেকে সেপ্টেম্বর, দক্ষিণ ভারতে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি এবং শ্রীলঙ্কায় ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই। বাসা বাঁধে বড় আম, তেঁতুল বা পিপুল গাছে। আবার হাটে-বাজারের মধ্যে, এমনকি জল থেকে বেশ দূরে শহরের বুকেও এইসব গাছে বাসা বাঁধতে দেখা গেছে। অনেক সময় দেখা যায় পানকৌড়ি, বাচক বা অন্যান্য বকজাতীয় পাখির সঙ্গে পাশাপাশি বাসা বাঁধতে।

ডিম পাড়ে 3 থেকে 5টি, খুব ফিকে প্রায় সাদা-নীলচে রঙের। স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই ঘরগেরস্তালির সব কাজ করে। আধাহজমী খাদ্য সন্তানদের মুখের মধ্যে চঞ্চু ফাঁক করে পুরে দেয়। কতদিনে যে ডিম ফোটে তা এখনও নির্ধারিত হয়নি।

ছোটো কোর্চে-বক

1980 সালের নভেম্বর মাসে কয়েকজন উৎসাহী নতুন পক্ষী পর্যবেক্ষকের সঙ্গে গড়িয়া স্টেশনে নেমে নতুন দিয়াড়ার দিকে গিয়েছিলাম। পথে নানা পাখি দেখতে দেখতে ও ছেলেদের সেইসঙ্গে চেনাতে গিয়ে নজরে পড়ল কয়েকটা পাখি। ছোট জলার ধারে ধানখেতের পাশে আট-দশটা চরছে। ছেলেরা বলে উঠল, গো-বক। বললাম, দূরবীন লাগিয়ে ভাল করে দেখ। সকলেই রায় দিল গো-বকই। শুধু একজন বলেছিল, একটু যেন বড় মনে হচ্ছে। সৌভাগ্যক্রমে কাছেই কয়েকটা গরু চরছিল। কোথা থেকে দুটো গো-বক উড়ে এসে তাদের পায়ের কাছে নামল। বললাম, দূরবীন দিয়ে ভাল করে মিলিয়ে দেখ। তখন সকলেই স্বীকার করল, এরা একটু বড়ই। বলি, এবার খুব যত্ন করে প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লক্ষ্য কর। শেষে সকলেই বলল, এদের চঞ্চু কালো, গো-বকের হলদে। এরা তবে কি বক?



চি 129. ছোটো কোর্চে-বক

এরাও বক বংশের (আরডিয়িদি) অন্তর্গত। *নাম*— ছোটো কোর্চে-বক (ইগ্রেটা গারজেটা), ইংরেজি— *লিটল ইগ্রেট*। বড় বা ধর (লার্জ ইগ্রেট) এবং কোর্চের (স্মলার বা মিডিয়াম ইগ্রেট) ছোটো সংস্করণ। প্রজননকালে এদের ঝুঁটি ও অন্যান্য সরু পালক বুক ও পিঠ থেকে ঝুলে থাকে। এই পালকগুলির ইংরেজী নাম— *ইগ্রেট*। এক সময় এই পালকের খুবই কদর ছিল। এখনও কিছু আছে। তবে যা পাওয়া যায় তার বেশির ভাগই নকল।

এক সময় মাথার ঝুঁটি ও পিঠের ঝোলা সুন্দর পালকগুলি পাখিদের বিন্দুমাত্র কষ্ট না দিয়ে তুলে ফেলা হত। সেই পালক বিদেশিনীদের টুপিতে লাগানো হত, এমনকি আমাদের দেশের কয়েকটি রেজিমেন্টের সৈন্যদের টুপিতেও ছিল, তার মধ্যে হুসার রেজিমেন্টই প্রধান। তখন এর দাম ছিল দশ থেকে পনের টাকা প্রতি তোলায়। বিদেশে এক আউন্সের (28·35 গ্রাম) দাম ছিল 15 পাউণ্ড। এর ফলে যারা এদের চাষ করত তারা যত্ন করত, কিন্তু তারা ছাড়াও অন্যেরা অবৈধভাবে বন্দুক দেগে হাজার হাজার কোর্চে, ছোটো কোর্চে, ধর বা বড় বক মেরে খতমের মুখে পৌঁছে দিয়েছে, কারণ চোরাপথে বিদেশে চালান দিতে পারলেই প্রচুর পয়সা।

গত 1982-র সেপ্টেম্বরে সুন্দরবনে প্রজননকালের পূর্ণরূপ দেখেছিলাম। তারই একটি ছবি দিলাম।

ছোটো কোর্চে-বক লম্বায় 63 সেমি.। গো-বকের মতই ছিপছিপে লম্বাটে গড়নের ধবধবে সাদা দেখতে। চঞ্চু কালো, তলার চঞ্চুর গোড়া ও চোখের চারপাশে লোমহীন চামড়া সবজেটে-হলুদ। কনীনিকা হলুদ। পা কালো, আঙুল ও গুলফের প্রান্তদেশ হলদেটে। আঙুলের তলা হলুদ।

বাসস্থান— 1400 মি. উচ্চতার মধ্যে উপদ্বীপাত্মক ভারতে সর্বত্র, আন্দামান, নিকোবর, লাক্ষা মালদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জ ও শ্রীলঙ্কা। ভারতের বাইরে দক্ষিণ ও পূর্ব ইউরোপ উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, ইরান, আফগানিস্তান, বার্মা, মালয়েশিয়া থেকে পুবে চীন, হাইনান এবং জাপান। কিছুটা পরিযায়ীও হয়।

খাদ্য— মাছ, ব্যাঙ, কবচী, টিকটিকি-গিরগিটি, ঘাসফড়িং, পঙ্গপাল, ভূমিকীট ও জলজ পোকামাকড়।

স্বভাব— সংঘচারী এই বকটিকে দেখা যায় ধানখেত, যে কোনও চষাখেত, বাদা দীঘি, পুকুর, নদী ও খালের ধারে। মাটি থেকেই খাদ্যসংগ্রহ করে। জলের কিনারায় বা অল্প জলের ভিতরেও করে থাকে।

বিশ্রাম করে হয় মাটিতে না হয় গাছের উপরে অন্যান্য বক ও শামুকখোলদের সঙ্গে। শিকার ধরে বংশগত (হেরন) ভঙ্গিমায়, নমনীয় গলাটি বাড়িয়ে ছুরিকা-সদৃশ চঞ্চুটি দিয়ে।

প্রজননকাল— জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর, দক্ষিণ ভারতে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি, শ্রীলঙ্কায় ডিসেম্বর থেকে মে মাস। কলোনি-বাসা বাঁধে অন্যান্য বকগোষ্ঠীর সঙ্গে। সেই বাসা দেখা যায় 2 থেকে 6 মিটার উঁচু কোন গাছে, পুকুর, ঝিল,, নদী বা খালের ধারে, অথবা জল থেকে বেশ দূরে গ্রাম বা শহরের বুকে। অনেক সময় সেই বাসা বেশ ঘেঁষাঘেঁষি করে আছে দেখা যায়, নিজেদের মধ্যে বা অন্য কোন জাতভাইদের সঙ্গে। সুন্দরবনেও এই দৃশ্য দেখা যায়। বাসা বাঁধে গাছের সরু শুকনো ডাল দিয়ে পেয়ালার আকারে। ঘরগেরস্থালির সব কাজই যৌথ প্রচেষ্টায় হয়।

ডিম পাড়ে 3 থেকে 5টি, মসৃণ ফিকে নীলচে-সবুজ রঙের। 21-25 দিনের মধ্যে ডিম ফোটে।

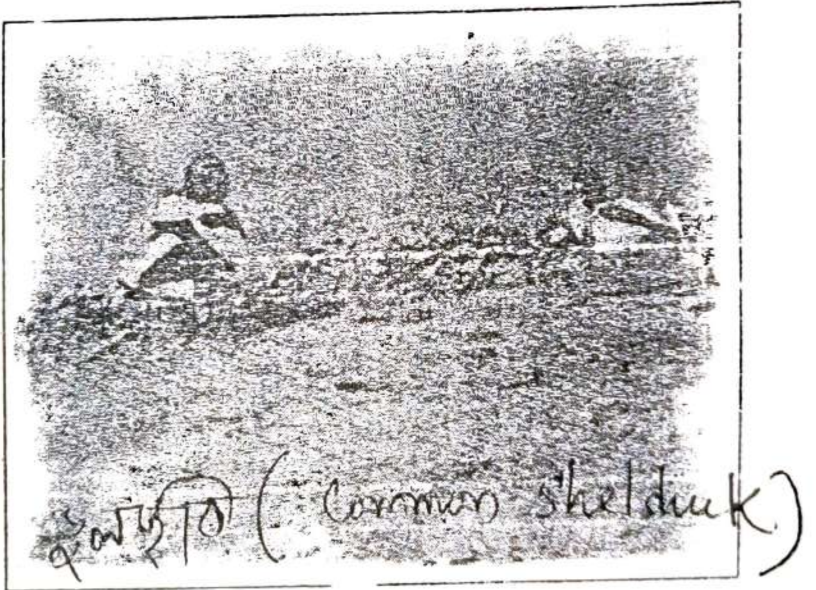
1930 সালের খবর জানি, এখনও হয় কিনা জানি না, হয়ত হয়, পাকিস্তানে সিন্ধু প্রদেশে কোর্চে-বকদের চাষ। পাখি ধরে ওড়ার ডানা কাটার পর এক-একটা খোঁয়াড়ে 50-60টি করে থাকত। তার ভিতর তারা স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াত। বেশ ভাল খাওয়া ও যত্ন পেত, আর মালিকের দেওয়া শুকনো ডালের টুকরো দিয়ে বাসা বানাত মার্চ থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে। ডিম ফুটে বাচ্চা বার হলে এক সপ্তাহ বাদে তাদের বাপ-মার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে তাদের হাতে করে খাওয়ান ও পালন করা হতো। এক বছরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে প্রজননকালীন পূর্ণরূপ পেত।

বাচ্চাদের আলাদা করার পরই কয়েক দিনের মধ্যে স্ত্রী-পাখি আবার ডিম পাড়ে। এইভাবে কখন-সখনও 4-5বার একই দম্পতি ডিম পেড়েছে।

বলকো বংশ

বাচকা

18 সেপ্টেম্বর 1982 সজনাখালি পাখিরালয়ে গিয়েছিলাম কয়েকজন, গোসাবা থেকে এম ভি মা অজন্তা চেপে, ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধিকর্তা প্রণবেশ সান্যালের সঙ্গে। বড় ওয়াচ টাওয়ারে পৌঁছবার ছোট খালটা ভাঁটা পড়ে পলি-কাদায় ভর্তি। কাদা ভেঙ্গে সেখানে যাওয়া প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে। তা সত্ত্বেও বাকি কয়েকজন চলে গেলেন কাদা ভেঙ্গে। তাদের মধ্যে ছিলেন দু'জন মেরিন বায়োলজিস্ট, আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ কৃষ্ণমূর্তি ও কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের ডঃ অমলেশ চৌধুরী। আমরা তিনজন, বিহারের ভূতপূর্ব কনজারভেটর অফ ফরেস্ট বর্তমানে দিল্লিতে অধিষ্ঠিত বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের অন্যতম সভ্য এস পি সাহী, শ্রীসান্যাল ও আমি স্টিমার থেকে নেমে একটা ছোট ডিঙিতে চাপলাম। সেটাকে বনকর্মীরা কাদার উপর দিয়ে ঘেঁষড়ে ঘেঁষড়ে পিছন দিকের ছোট ওয়াচ টাওয়ারের তলায় সিঁড়ির কাছে নিয়ে গেল। সেখানে পানকৌড়ি, ধর, বক ইত্যাদির সঙ্গে বক বংশের (আর ডি ই ডি) মধ্যেই পড়ে, রাতচরা এক বকের দল বাসা বেঁধেছে। এই জাতের বককে ছেলেবেলাতে দেখেছি, গিরিডিতে সন্ধেবেলায় মাথার উপর দিয়ে ভারী গলায় 'ওয়াক ওয়াক' করে ডাক দিয়ে উড়ে যেতে, কিন্তু কখনও বাসা বাঁধতে বা বাসায় বসে থাকতে দেখি নি। দেখলাম ডিমে তা দিচ্ছে। দূরবনী দিয়ে লক্ষ্য করছি ওদের। সাহী সাহেব তাঁর লম্বা টেলিফটো লেন্স সহ দামী ফিল্ম ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে চললেন।



চি 130. বাচকা

পাখিগুলি দীর্ঘজঙ্ঘ বর্গের (সিকোনিইফরমেস) অন্তর্গত বলকো বংশের (আরডিইদি) এক *প্রজাতি।* নাম— বাচকা (নাইকটি-কোরাকস্ নাইকটিকোরাকস্), ইংরেজি— *নাইট হেরন।* আকারে কোঁচ-বকের মত (পণ্ড হেরন), লম্বায় 58 সেমি.। উপরাংশে ছাই-ধূসরের উপর ধাতব সবুজাভ-কালো পিঠ ও অংসফলক। কপাল ও চোখের উপর সাদা টান। চাঁদি, চাঁদির পিছন দিক ও ঘাড়ের উপর কালো ঝুঁটি, শেষের দিকে দু-একটা সরু পালক সাদা। নিম্নাংশ সাদা দেহের দু-পাশ ছাই-ধূসর। চঞ্চু মোটা শক্ত ও চাপা, রঙ কালো, গোড়ায় সবজেটে-হলুদ যা গেছে তলার চঞ্চুর মাঝামাঝি পর্যন্ত। চক্ষু-

গোলকে পালক নেই, চামড়া হলদেটে-সবুজ। কনীনিকা রক্ত-লাল। পা ও আঙুল ময়লাটে-সবুজ। প্রজননকালে চঞ্চু আরও কালো এবং পা ও আঙুল লেবু-হলুদ, কমলা-লাল বা লালচে হয়। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। পূর্ণবয়স্ক হবার আগে পর্যন্ত থাকে পাটকিলে, তার উপর লালচে, ফিকে হলুদ ও গাঢ় পাটকিলের সরু টান ও ছোপ। দেখতে অনেকটা অপ্রাপ্তবয়স্ক বসে থাকা কোঁচ-বকের মত।

বাসস্থান— উপদ্বীপাত্মক ভারতে সর্বত্র, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ও শ্রীলঙ্কা। গ্রীষ্ম ও বসন্তে কাশ্মীর ও নেপালে 1900 মি. উচ্চতার মধ্যে, শীতে দক্ষিণে নেমে আসে। ভারতের বাইরে মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, বার্মা, থাইদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোচীন থেকে চীন ও জাপানে। দেখা যায় ঝিল, দীঘি, নদী, পুকুর, খাঁড়ি ও খাঁড়ির মুখের গলিঘুচিতে।

খাদ্য— মাছ, ব্যাঙ, জলজকীট, গঙ্গাফড়িং-এর শূককীট ইত্যাদি।

স্বভাব— বাচকা প্রজননকাল ছাড়া দলবদ্ধ ভাবে গোধুলি লগ্নে বা রাতে কখনও নিঃশব্দে কখনও বা ভারী গলায় 'ওয়াক' ডাকে নিজের খাদ্যভূমির দিকে উড়ে যায়। কখনও দেখা যায় দলছুট হয়ে একা একা উড়ে যেতে। দিনের বেলায় কলোনি-বাস, তা ডজন থেকে কয়েক শ'ও দেখা যায়। গরাণ-বাইন ইত্যাদি (ম্যানগ্রোভ) এবং জলের ধারে ঝুঁকে থাকা বা কাছাকাছি কোন বড় গাছে চুপচাপ বসে থাকে। আবার জলাভূমি ছাড়া গাঁয়ের ধারে শুকনো জমির গাছেও বাস করে। এরা দিনের বেলা গাছের উপর এত নিঃশব্দে থাকে যে বোঝাই যায় না যে ওরা সেই গাছে অন্যান্য পাখিদের সঙ্গে আছে। কোন কারণে উত্তেজিত হয়ে বাসা ছাড়লে ঠিক বাদুড় যেমন ওড়ে তেমনি করে উড়ে এসে আবার গাছে বসে। বাসার বাচ্চাদের জন্যে খাবার অনুসন্ধানের সময় ঠিক না থাকলেও সাধারণতঃ খুব ভোরে, গোধূলিতে ও রাত্রে খাদ্যসন্ধানে বার হয়। গোল ডানা বেশ জোরের সঙ্গে নেড়ে ধীরে ধীরে ওড়ে। গলা ও মোটা ঘাড় গুটিয়ে ছোট করে কিন্তু সাদা কাঁকের (গ্রে হেরন) মত S ধাঁচের হয় না। সন্ধের আলো-আঁধারে মনে হয় যেন বাদুড় উড়ে যাচ্ছে।

প্রজননকাল— জুন-জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর। কাশ্মীর উপত্যকায় এপ্রিল-মে। দক্ষিণ ভারতে ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি। কখনও কখনও নিজেরাই দল বেঁধে বাসা বানায়। তবে বেশি দেখা যায় অন্যান্য বক ও পানকৌড়িদের সঙ্গে পাশাপাশি বাসা বানাতে। বাসা ছিরিছাঁদহীন কাঠির টুকরোর। কাঠি এত ফাঁক ফাঁক থাকে যে তলা থেকে ডিম দেখা যায়। মলিন নীলচে-সবুজ একটু লম্বাটে ধরনের ডিম পাড়ে সাধারণত 3-4টি, ক্বচিৎ 5টি। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই ঘরগেরস্থালির সব কাজে পরস্পরকে সাহায্য করে। বাসার উপকরণ প্রধানত পুরুষটিই সংগ্রহ করে। ভারতে ডিম ফোটে ক'দিনে তা এখনও নির্ধারিত হয় নি। তবে ইউরোপীয় পাখিদের 21 দিনে ডিম ফোটে তা নথিভুক্ত আছে। ছানাদের খাওয়ায় আধা-হজমী খাদ্য উগরে দিয়ে। সেই সময় ছানারা বাপ-মায়ের চঞ্চু ধরে টেনে বাসার মধ্যে নিয়ে আসে। খাবার জন্যে তারা অনবরত 'ক্লিক ক্লিক' আওয়াজ করেই চলে।

দীর্ঘজঙ্ঘ বংশ

জাংঘিল

তখন স্কুলে পড়ি। পুজোর ছুটিতে প্রতিবারই গিরিড়ি যেতাম, সেবারেও গেছি। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর জনা তিন-চার একটা বি এস এ এয়ার রাইফেল নিয়ে রাতের খাওয়ায় একটা স্পেশাল মেনু যোগ করার জন্য এদিক-ওদিক ঘুরতাম। সেদিন গেছি উশ্রী নদী পার হয়ে শিরসের ঝিলে। পথে গোটা কয়েক কোঁচবক আর ত্রিলেঘুঘু মেরেছি।

তেষ্টা পেয়েছে খুব। একটু দূরে সাঁওতাল পল্লী। সেখানে পৌছেই দেখি এক পরিষ্কার নিকনো ঘরের সামনে আমাদের বয়সী তের-চোদ্দ বছরের এক সাঁওতাল কিশোরীর পায়ে পায়ে ঘুরছে একটা উঁচু সারস জাতীয় বক। এরকম বড় প্রায় হাড়গিলে মার্কা পাখি আমরা কেউই আগে দেখি নি। বাড়ির সামনে দাঁড়াতেই মেয়েটি আড়ালে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হাতে হাঁসুলি নিয়ে বেরিয়ে এল এক বয়স্ক সাঁওতাল। একগাল হেসে প্রশ্নসূচকভঙ্গিতে দাঁড়াতেই বললাম, তেষ্টা পেয়েছে জল খেতে চাই। সাঁওতালটি ওদের ভাষায় কি যেন বলল মুংলি মেয়েটিকে। ও ঘরের ভিতর থেকে চকচকে মাজা লোটায় জল নিয়ে এসে আমাদের হাতে ঢেলে দিল।



চি 131. জাংঘিল

আমি পাখিটার গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করতেই পাখিটা লম্বা ঠ্যাং বাড়িয়ে সরে গিয়ে মেয়েটির পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। সঙ্গীরা বলল, হাত দেবার চেষ্টা করছিস কেন ? যা লম্বা ঠোঁট চোখ খুবলে নেবে। তখনও জানি না পাখির ঠোঁট হয় না, চঞ্চু হয়।

সাঁওতালটির কাছ থেকে জানলাম পাখিটার নাম 'জাংঘিল'। ওই যে দূরে বড় ঝাঁকড়া পিপুল গাছ (ফাইকাস রেলিজিওসা) শিরসের ঝিলের ওপারে, জঙ্গলের মধ্যে সেখানে এরা প্রতিবছর বাসা বাঁধে। ওদের মারা খুব শক্ত। গাছের একটু কাছে গেলেই সবাই উড়ে চলে যায়। অনেক কষ্টে তীরধনুক দিয়ে দুটোকে মেরেছিল। গাছে চড়ে আনতে যাবার সময় বাসা থেকে আর তিনটে বাচ্চা উড়ে যায়, এটা উড়তে পারেনি, ঝটপট করতে করতে নিচে পড়ে যায়। ওরা নিয়ে আসে কিন্তু মেয়ে মারতে দেয়নি। সেই পেলেছে, ব্যাঙ, গিরগিটি, মাছ খাইয়ে। ওর খুব বাধ্য। সকালে উড়ে চলে যায়, বিকেলে আসে। আপনাদের দূর থেকে দেখতে পেয়ে চলে এসেছে, পাছে মুংলির কোন ক্ষতি হয়। পরে জেনেছি খুব ছোট থেকে পুষলে এরা কুকুরের মত বাধ্য হয়।

জাংঘিল ছাড়া বাংলায় আরও নাম আছে, সোনাজঙ্ঘা, রামঝঙ্কার (আইবিস লিউকোকেফালাস), ইংরেজি— পেইন্টেড স্টর্ক।

লম্বায় 93 সেমি.। লম্বা পা, আঙুল মাংসল-পাটকিলে, কখনওবা প্রায় লাল। লম্বা গলা, 25-27 সেমি. লম্বা, মোটা হলদে চঞ্চুর ডগা একটু ঢেউ খেলান। মোমের মত হলুদ পালকহীন মুখ। ঘাড়ের পালক সাদা, উপরে ধাতব-সবুজ কালো কালো টান, বুকের উপর দিয়ে একটা কালো পটি। ডানা ও লেজের পালক কালো। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান— সমগ্র ভারতের সমতল, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপালের তরাই অঞ্চল, শ্রীলঙ্কা, বর্মা, থাইদেশ, উত্তর মালয় ও দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের বাদা, ঝিল, জলপ্লাবিত মাঠ এবং মাঝে মাঝে নদীর তটদেশ।

খাদ্য— প্রধানত মাছ। এছাড়া নানারকম সরীসৃপ, ব্যাঙ, কবচী ও পোকামাকড়ও খায়।

স্বভাব— সাধারণত জাংঘিলকে দেখা যায় জোড়ায় বা ছোট দলে। রাজস্থানের কেওলাদেও ঘানায় দেখা যায় হাজারে হাজারে বাসা বাঁধতে। ওখানে কেউ বিরক্ত করে না বলে বছরের পর বছর বহাল-তবিয়তে আছে।

যেখানে খাদ্যসম্ভার প্রচুর সেখানে এরা দলবদ্ধ হয়েই খাদ্যসংগ্রহ করে। বেশি দেখা যায় একা একাই খুব অল্প জলে ঘাড় নিচে নামিয়ে, দু'পাটি চঞ্চু সাঁড়াশির মত ফাঁক করে, জলের মধ্যে কিছুটা ডুবিয়ে কাদা ঘেঁটে মাছ খোঁজে। কখনও দেখা যায় একটি পা জলের মধ্যে সামনে-পিছনে দোলাচ্ছে আর মাঝে মাঝে ডানা ঝাপটাচ্ছে। কাদার ভিতরে চুপটি করে থাকা মাছ তখন নড়ে উঠলেই উন্মুক্ত চঞ্চু চট করে বন্ধ করে তাকে ধরে ফেলে। আবার এও দেখা যায়, নট নড়ন-চড়ন নট কিচ্ছু হয়ে নিজেকে একটু কুঁজো করে দাঁড়িয়ে থাকতে। ওড়ে লম্বা গলাটা একদম টান করে সোজা রেখে কিন্তু পিঠের সমান্তরাল থেকে একটু নিচু করে। পা দু'টোও সোজা রাখে লেজ ছাড়িয়ে। ডানা ছড়িয়ে না নাড়িয়ে চক্কর দেয় অন্যান্য দীর্ঘজঙ্ঘ পাখিদের মত।

ডাক— মুখ দিয়ে আওয়াজই শোনা যায় না বললেই হয়। শুধু বংশগত ধারায় দুই চঞ্চু ঠোকাঠুকি করে শব্দ তোলে। বাসায় একজন বাইরে থেকে ঘুরে-ফিরে এলে অপর জন নিম্নস্বরে একটা গোঙানির আওয়াজ বের করে অভিনন্দন জানায়।

প্রজননকাল— ভারতের বিভিন্ন জায়গায় মার্চ থেকে নভেম্বরের মধ্যে। ডিম পাড়ে 2 থেকে 4টি, তবে 3-4টিই বেশি, রং ময়লাটে-সাদা। কখনও কখনও তার উপর পাটকিলের ছিট ও সরু সরু টান দেখা যায়।

শামুক-খোল

একবার এক জুলাই মাসে ঘন বর্ষার মধ্যে সজনাখালি পাখিরালয়ে গিয়েছিলাম দু'দিনের জন্য। বিকেলে গোসাবায় পৌঁছে দেখি বেশ কিছু শামুক-খোল বা শামুক ভাঙ্গা, এধার-ওধার উড়ে বেড়াচ্ছে, গাছের উপর বসছে। দূর থেকে দেখে অনেকের ভুল হয় এরা বুঝি পরিযায়ী হয়ে আসা

উজলি বা ঢাক, ইংরেজি— *হোয়াইট স্টর্ক*, (সিকোনিয়া সিকোনিয়া)। সকালে পাখি দেখার টাওয়ারে উঠে দেখি হাজারে হাজারে শামুক-খোল বাসা বেঁধেছে বাইন বা বানি গাছের (আভেসেনিয়া অফিসিনালিস) উপর। কোথায় পরিযায়ী পাখি? এতো আমাদের দেশেরই পাখি। যদিও এদের কিছুটা ঘোরাফেরা করে এবং কিছু পরিযায়ীও হয়। আর এদেরই সঙ্গে মিলেমিশে বাসা বেঁধেছে বেশ কিছু বড় বা ধর বক, কোর্চে বক, বচকা এবং সাদা কাঁক বা অঞ্জন। দেখলাম শামুক খোলরা প্রায় প্রতিটি গাছের মাথার উপর পাশাপাশি তিনটি করে বাসা বেঁধেছে, ডিম পেড়েছে, তা' দিচ্ছে, এখনও ডিম ফোটে নি। এবড়োখেবড়ো গোল বাসা এবং তা গাছের সরু ডাল দিয়ে তৈরি। মাঝখানটা একটু বসা। তার ভিতরে ও চারপাশে বাইন পাতার লাইনিং। যেসব বাসা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি তার জন্যে কিছু পুরুষ পাখি দূরে গাছ থেকে কচি পাতা ও ডাল নিয়ে আসছে। কিছু পুরুষ মিথুনের জন্য পিঠের উপর চড়ছে। স্ত্রী-পুরুষ এমনিতে একই দেখতে। গোসাবার ফিল্ড অফিসার দেখালেন, দু'জনের পায়ের পার্থক্য আছে। লক্ষ্য করে দেখলাম স্ত্রী-পাখির পায়ে অনেক নিষ্প্রভ মাংসের রঙ, সে তুলনায় পুরুষের খুবই উজ্জ্বল। জানিনা, এই রঙের পার্থক্য প্রজননকালে হয় কিনা। দেখালেন পাখির ভিড়ে কিছু পাখির পিঠ ও বুকের সাদা পালক নিষ্প্রভ ধোঁয়াটে-সাদা। ওঁর মতে ওগুলো বুড়ো পাখি। কিন্তু তা নয়, ঐ রং প্রজননকালের আগেকার রং। এই পাখিগুলি যে কোন কারণেই হোক আকারে পরিণত হলেও এখনও পর্যন্ত প্রজননকালের সাদা রং পায় নি। সেবছরে এদের প্রজননক্ষমতা না পাবারই সম্ভাবনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখলাম, কিছু কিছু পুরুষ-পাখি তাদের উপর চড়ছে। জানি ফলপ্রসূ হবে না। তাছাড়া স্ত্রী-পাখি চঞ্চু নাড়িয়ে-বাজিয়ে যেভাবে মিলনে সাড়া দেয়, তা দিচ্ছে না। একদম নিষ্ক্রিয় থাকছে। এরা অপরিণত যুবাও নয়, তাহলে তাদের গায়ের রং হত ধোঁয়াটে পাটকিলে-ধূসর এবং ডানার উপরিভাগে কাঁধের কাছে কালচে-পাটকিলে রং দেখা যেত।



চি 132. শামুক-খোল

ঠোঁট ভাঙা বা শামুক-খোল দীর্ঘজঙ্ঘ বর্গের (সিকোনিই ফরমেস) অন্তর্গত দীর্ঘজঙ্ঘ বংশের (সিকোনিইদি) শিথিলচুনু (আনাসটোমাস) গণের *এক প্রজাতি* (আনাসটোমাস আসকিটানস)। হিন্দি- *ঘোংঘিলা*, ইংরেজি— *ওপেনবিল স্টর্ক*। লম্বায় 32 ইঞ্চি, (81 সেমি)। দাঁড়ানো অবস্থায় আড়াই ফুট, (68 সেমি), চঞ্চু ঈষৎ বাঁকা এবং দুই চঞ্চুর মাঝে একটু ফাঁক। সেই ফাঁক দিয়ে কিন্তু গেঁড়ি-শামুক চাপ দিয়ে ভাঙে না। খায় কম্বোজের শক্ত খোলা ফাটিয়ে নরম অংশটুকু, কাঁকড়া ব্যাঙ এবং অন্যান্য ছোট প্রাণী। ভালবাসে বড় শামুক (পিলা গ্লোবোসা)।

প্রজননকাল— প্রধানত জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর। ডিম পাড়ে 2 থেকে 4টি, কখনও 5টি

বাসস্থান— সারা ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপালের তরাই ও শ্রীলঙ্কা। দেখা যায় ঝিল, বাদা ইত্যাদিতে। মাঝে মাঝে নদীর কূলে এবং জোয়ার-ভাঁটা খেলা কর্দমাক্ত ভূমিতে। একটা জিনিস লক্ষ্য করার ইচ্ছে আছে। শেষ বর্ষণের সময় অন্ধকার কি না।

মানিকজোড়

স্টিম এঞ্জিনের যুগ। ক্যানিং লাইনের কালিকাপুরের বাদা থেকে আমরা থ্রি মাস্কেটিয়ার্স ফিরছি। বেলা হয়েছে। পথে শুনলাম ট্রেন আসতে দেরি হবে। ঘণ্টা-দেড়েকের মধ্যে ট্রেন নেই। অগত্যা মাইল চারেক দূরে সোনারপুর স্টেশনের দিকে পাড়ি দিলাম। ও লাইনে অনেক গাড়ি।

মাঠ ভেঙ্গে চলেছি। ধান কাটা হয়ে গেছে। প্রচুর ধান ক্ষেত, কাটা ধানের গোড়াগুলি যেন দাঁত বের করে পড়ে রয়েছে। রোদের তেজ থাকলেও শীতের দিন বলে চলতে খুব-একটা কষ্ট হচ্ছে না। আকাশের বুকে শকুন উড়ছে। তার মাঝে গোটা পাঁচ-ছয় বেশ বড়সড় পাখিরা উড়ছে। শকুন নয় সেটা বুঝেছি, কিন্তু কি পাখি তা চিনতে পারছি না। শুধু ওড়া দেখে দীর্ঘজঙ্ঘ (স্টর্কস্) বর্গ বা বংশের কোনও পাখি বলে বুঝতে পারছি। হঠাৎ দেখি আমাদের সামনেই আলের উপর একটা বড় পাখি দাঁড়িয়ে আছে, একদম ধ্যানস্থ হয়ে। এই পাখি আগে দেখি নি, প্রথম দেখছি। তখন আমার দূরবীন ছিল না, খালি চোখে খুব সন্তর্পণে ওর ধ্যান না ভাঙ্গিয়ে যতদূর সম্ভব পা টিপে টিপে এগিয়ে ওকে দেখছি।



চি 133. মানিক জোড়

মাটি থেকে চাঁদি পর্যন্ত সাড়ে তিন ফুটের মত লম্বায় হবে। এখন জানি সেটা 106 সেমি.। চাঁদি কালো তার উপর সবুজের আভা। বাকি মাথা, ঘাড় ও তলপেটের শেষাংশ থেকে লেজের তলা ও ছোট চেরা লেজের শেষাংশ সব সাদা। উপরের পালক ডানা, বেঁটে লেজের গোড়ার অংশ, বুক ও পেটে কালোর উপর বেগুনি ও সবুজের আভা। কনীনিকা পাটকিলে, চোখের চার পাশ পালকহীন। চঞ্চু মোটা থেকে সরু সূঁচলো কালো, উপরেরর চঞ্চুর কিছুটা লাল। পালকহীন চোখের পাশ, চিবুক ও গলা শ্লেট-কালো, পা ও আঙুল রক্ত লাল।

ভালো করে দেখব বলে আস্তে আস্তে এগিয়েছি। শেষে পাখিটা আমার উপস্থিতি বুঝতে পেরে ডানা ঝাপটিয়ে উড়ল। দেখতে দেখতে উড়ে গিয়ে মিশল আকাশের বুকে, আরও যারা উড়ছিল তাদের সঙ্গে। তখন বুঝলাম শকুন ছাড়া আর সব পাখি এরই জাতভাই।

বাড়ি ফিরে বই দেখে জানলাম দীর্ঘজঙ্ঘ বর্গ (সিকোনিইফরমেস) ও বংশের (সিকোনিইদি) এক প্রজাতি। নাম— মানিকজোড় (সিকোনিয়া এপিসকোপাস), ইংরেজি— হোয়াইটনেকেড স্টর্ক, হিন্দি— লগলগ। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান— পাকিস্তান, ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে সমগ্র ভারত, 1200 মি. উচ্চতার মধ্যে নেপাল, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা। দেখা যায় নিচু জমিতে, জলমগ্ন মাঠ, চষাখেত, নদীর তীর, জলা, বাদা ইত্যাদিতে। ক্বচিৎ দেখা যায় জোয়ার-ভাঁটা খেলা নদীর ধারে, সেটা অবশ্যই সমুদ্র থেকে বেশ দূরে হওয়া চাই। ভারতের বাইরে বর্মা, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া।

খাদ্য— ব্যাঙ, সরীসৃপ, কাঁকড়া, কম্বোজ এবং বড় পতঙ্গ। বন্যা এবং স্রোতস্বতীর জল সরে গেলে ছোট ছোট গর্তের জলের মধ্যে আটকাপড়া মাছ, উড়ন্ত পিঁপড়ে বা উঁই উড়তে উড়তে যেমন ধরে, তেমনি ধরে মাটিতে দাঁড়িয়ে থেকেও।

ডাক— নেই। মাথা তুলে পিছন দিকে চাঁদিকে বেঁকিয়ে, ঘাড়ের পাশে রেখে দুই চঞ্চুর ঠকঠকানি ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই।

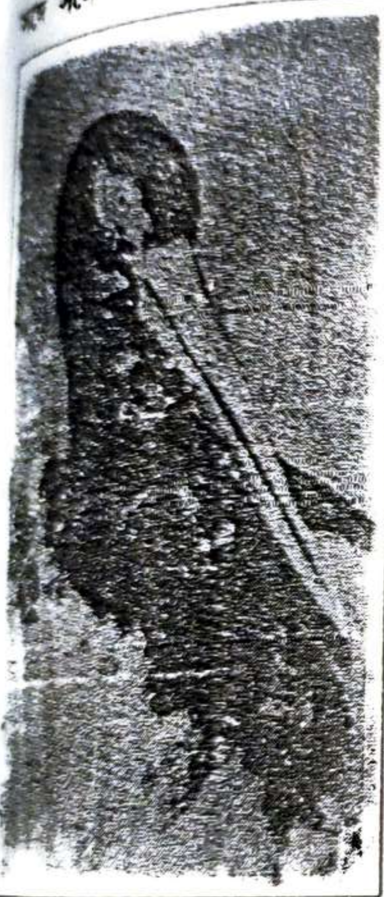
স্বভাব— সাধারণত একাই দেখা যায়, ক্বচিৎ জোড়ায়, মাঝে মাঝে ছোট দলে। জোড়ায় সবসময় থাকে বলে মানিকজোড় নামটা আসে নি। অন্তরঙ্গ দুই সুহৃদকে পাশাপাশি দেখলে আমরা বলি মানিকজোড়। নামটি এসেছে এই পাখি মানিক পীরের নিত্যসঙ্গী ছিল বলে। সে কারণে মুসলমানরা এই পাখিকে মারেন না, খানও না। শুকনো ধানখেত বা বাদায় ধীরেসুস্থে শিকার করে। খুব কমই জলের মধ্যে চঞ্চু ডুবিয়ে শিকার ধরতে দেখা যায়। সূর্যকরোজ্জ্বল পরিস্কার দিনে আকাশের বুকে অন্যান্য দীর্ঘচঞ্চু বা সমগোত্রীয় পাখি এবং শকুনদের সঙ্গে পাখা মেলে উড়তে বেশি দেখা যায়। রাত্রিবাস করে উঁচু গাছের উপর।

প্রজননকাল— কোন ঠিক নেই। তবে বেশি দেখা যায় জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে উত্তর ভারতে, ডিসেম্বর থেকে মার্চে দক্ষিণ ভারতে এবং জানুয়ারি থেকে এপ্রিলে শ্রীলঙ্কায়। কখনও কলোনি করে বাসা বাঁধে না। স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। বাসা বানায় শুকনো সরু ডাল দিয়ে এক মিটারের মতন ব্যাসের। মাঝখানটা বেশ গভীর, তাতে খড় বিছায়। জড়সড় হয়ে গুছিয়ে যখন বসে তখন বাইরে থেকে দেখা যায় না। সাধারণত মাটি থেকে কুড়ি-ত্রিশ মিটারের মতন উঁচু গাছের মাথায় বাসা বাঁধে। শিমুল গাছকেই পছন্দ করে বেশি। কখনও কখনও মাঝারি আকারের গাছেও বাসা বাঁধতে দেখা যায়। বাধা না পেলে একই গাছে বছরের পর বছর বাসা বাঁধে। সূঁচলো উপবৃত্তাকার 3-4টি ক্বচিৎ 5টি সাদা ডিম পাড়ে। তা' দেবার সময় পায়ের কাদা লেগে ডিমের রঙ পালটে পাটকিলে হয়ে যায়। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই পরস্পরকে বাসা বাঁধা থেকে সন্তান প্রতিপালন সব কাজেই সাহায্য করে। কিন্তু ডিম ক'দিনে ফোটে এবং স্ত্রী-পুরুষ দু'জনে পালা করে তা' দেয় কিনা তা এখনও জানা যায় নি। বাচ্চাদের খাওয়ায় আধা-হজমী খাদ্য উগরে দিয়ে। এইভাবে খাওয়ানর অভ্যাস সব দীর্ঘজঙ্ঘদেরই। ডিমের গড় মাপ 62·9 × 47·4 মিমি.।

কালো কাঁক

10 মার্চ 1981 এই দিনটি আমার কাছে খুবই স্মরণীয়। ইংরেজীতে যাকে বলে 'রেড লেটার ডে'। সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ এসপ্লানেড থেকে সরকারি পরিবহণে চেপে পৌঁছেছি ন্যাজাট।

সঙ্গে শ্রী পীযূষ দাশগুপ্ত ও জ্যুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ডঃ সুধীন সেনগুপ্ত। ন্যাজাটে নেমে চড়েছি একটা যাত্রীবাহী ভটভটিতে। ছোট কলাগাছিয়া নদীর উপর দিয়ে চলেছি সন্দেশখালির উদ্দেশে। বেলা তিনটে নাগাদ বেড়মজুর কাছারিঘাট ছেড়ে কাটখালি পৌঁছবার আগে পীযূষ কয়েকটা পাখিকে নদীর কিনারা ঘেঁষে বাইন বা বানি গাছের উপর আত্মগোপন করা অবস্থায় প্রথম দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আমরা সকলেই দূরবীন দিয়ে দেখতে থাকলাম। প্রতি গাছেই রয়েছে একটা-দুটো বা তিনটে করে। একটাকে দেখি একটু খোলা জায়গায় ডালের উপর বুক চিতিয়ে একটা পা তুলে ডানার ভিতর থেকে বার করে বুকের কাছে ধরে আছে। আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। যাকে শুধু ছবিতে আর খড়পোরা চেহারায় দেখেছি, তার জীবন্ত চাক্ষুষ পরিচয় লাভ করছি, সুতরাং যাঁরা প্রকৃতি প্রেমিক বা পক্ষিপর্যবেক্ষণকারী তাঁরা সহজেই আমার অবস্থাটা অনুভব করতে পারবেন।



চি 134. কালো কাঁক

আমি সজোরে বলে উঠি, ব্ল্যাক স্টর্ক। কী আশ্চর্য, এখানে? এতখানি নিচে নেমে আসার খবর কোথাও কিন্তু নথিভুক্ত হয় নি। সুন্দরবন সত্যিই বিস্ময়কর জায়গা।

আমার উত্তেজিত ভাব দেখে কয়েকজন যাত্রী, যাঁরা চলেছেন বিভিন্ন ঘাটে, তাঁরা হেসে বললেন, এত কালো কাঁক, কালো কঙ্কন (সিকোনিয়া নিগ্রা)। ওঁদের কাছে এটা একটা সাধারণ পাখি। শীতের সময় আসে এবং প্রায়ই দেখে থাকেন। হিন্দিতে বলে— *সুরমাল*। বাংলায় কোনো নাম নথিভুক্ত নেই।

দীর্ঘজঙ্ঘ বংশের (সিকোনিয়িদি) অন্তর্গত দীর্ঘজঙ্ঘ গণের এক *প্রজাতি*— কালো কাঁক। মাটি থেকে মাথার উপর পর্যন্ত উচ্চতায় 106 সেমি.। মাথা, ঘাড়সমেত গলা, বুক, লেজের উপরিভাগে চকচকে কালোর উপর সবুজ, তামাটে (ব্রোঞ্জ) ও বেগুনির আভা। বুকের তলা, পেট, ডানার নিচের দু-পাশ ও লেজের তলা সাদা। লম্বা লাল চঞ্চু, উপর পাটি ডগার কাছে এসে একটু বাঁকা। চোখের চারপাশের পালকহীন চামড়া লাল। লম্বা পা লাল। ওজনে প্রায় 3·17 কেজি।

বাসস্থান— ডেনমার্ক, সুইডেন, জার্মানি থেকে পুবে রাশিয়া হয়ে এশিয়া, সেখান থেকে উত্তর চীন। শীতে পরিযায়ী হয়ে আসে পাকিস্তান, উত্তর ভারত, বেলুচিস্তান, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, পাঞ্জাব থেকে নেপাল (900 মি. উচ্চতার মধ্যে) এবং গাঙ্গেয় উপত্যকা ধরে পুবে আসামে। দক্ষিণে রাজস্থানের কচ্ছ ও গুজরাটের উত্তরাংশেও আসে। এখন জানছি সুন্দরবনেও আসে। আফ্রিকাতেও পরিযায়ী হয়। এই শতাব্দীতে দক্ষিণ আফ্রিকায় বাসা বাঁধার খবর পাওয়া গেছে।

খাদ্য— ব্যাঙ, মাছ, কবচী, পোকামাকড়, মাঝে মাঝে বাচ্চা বা অসুস্থ তীক্ষ্ণদন্তী জীব ও পাখি ইত্যাদি।

স্বভাব— [illegible] নদীর কিনারায় বা খাঁড়ির

ধারে। ওড়ে আলস্য ভরে কয়েকটা ডানার ঝাপটা দিয়ে, তারপর খানিকটা ভেসে গিয়ে আবার ডানার ঝাপট দেয়। ওড়াটা দেখলে যদিও মনে হয় আস্তে, আসলে কিন্তু বেশ দ্রুত। বেশ উঁচুতে উঠে ডানা মেলে চক্কর দিতে থাকে। সেই সময় দেখা যায় এই চক্করের সঙ্গে থাকে অন্যান্য দীর্ঘজঙ্ঘের পাখি, বিশেষত মানিকজোড় এবং গগনবেড়। তবে মানিকজোড়দের সঙ্গেই মেলামেশাটা বেশি। কিছুটা লাজুক প্রকৃতির পাখি। সাধারণত দেখা যায় জোড়ায়, কখনও বা 10-12-র দলে। পক্ষিতত্ত্ববিদ এবং ভারতীয় কংগ্রেসের প্রবর্তক অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম তাঁর 'স্ট্রেফেদার্স' প্রথম খণ্ড পৃঃ 106 (1872)-এ উল্লেখ করেছেন, পাঞ্জাবে চন্দ্রভাগা নদীর তীরে 500 বা তারও কিছু বেশির দলে দেখেছেন।

ডাক— খুব কম লোকেই শুনতে পায়। যাঁরা শুনেছেন তাঁদের মতে প্রজননকালে উজলিদের (হোয়াইট স্টর্ক, সিকোনিয়া সিকোনিয়া) চেয়ে গলার মধ্যে অনেক বেশি আওয়াজ তোলে। কেউ কেউ বলেন, সেই আওয়াজ শ্রুতিমধুর। এদের উজলিদের মতো দুই চঞ্চুর ঠকঠকানি খুবই কম শোনা যায়।

প্রজননকাল— মধ্য ইউরোপে এপ্রিল-মে। বাসা বাঁধে খুব উঁচু পাইন, ওক বা অন্য কোনও গাছে, মাটি থেকে 10-25 মিটার উঁচুতে বড় বড় শুকনো সরু ডাল দিয়ে প্ল্যাটফর্মের মতো করে। উজলিদের মতো বাড়ির আলসে বা চিমনিতে নয়। ডিম পাড়ে 3-5টি, একটু ভোঁতা ধরনের সাদা রঙের।

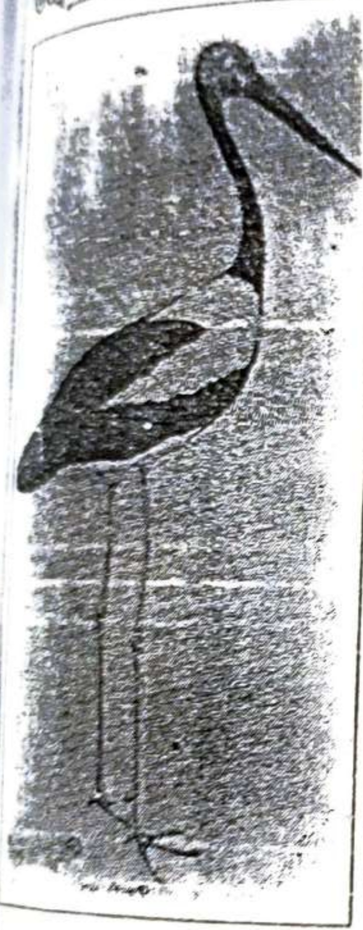
রাম-শালিক

পশ্চিমে রণ-দামামা বেজে উঠেছে। একের পর এক ইউরোপের রাজ্যগুলি হিটলার কুক্ষিগত করে চলেছে। হিট্লার বাহিনী পোলাণ্ডে ঢুকে পড়েছে। জার্মান দেশবাসীর বিরুদ্ধে নয়, হিটলারের পাগলামি ভাঙার জন্যে ব্রিটেন যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সেই 1939 সালের শীতে আমরা তিনজন কার্তিক, বাপী আর আমি এসেছি সল্টলেক বা বাদায়। ছুটির দিন নয়, কারণ ছুটির দিনে আমাদের ক্রিকেট খেলা থাকে। তাই বাদায় শিকারীর ভিড় নেই। বন্দুকের আওয়াজ নেই। শান্ত পরিবেশ। হঠাৎ এক জায়গায় দেখলাম একটা কালো গলা লম্বা পাখি জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। মানিকজোড় নয়, তার চেয়ে অনেকটা বড়। জাঙ্ঘিলের (পেইন্টেড স্টর্ক) চেয়েও বড়। দীর্ঘজঙ্ঘ নিশ্চয়ই। কিন্তু এই পাখি আগে কখনও দেখি নি। আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়েছি।পাখিটা মাথা ঘুরিয়ে আমাদের দেখে কয়েক পা জলের মধ্যে হেঁটে আবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বেশ কিছু দূরে আরেকটা এই পাখি পাড়ের উপর বিশাল জঙ্ঘা সমেত পা-টা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে চুপ করে বসে আছে। এমনিভাবে বসে থাকে হাড়গিলেরাও (অ্যাডজুটান্ট স্টর্ক)। আমরা নট নড়নচড়ন নট কিচ্ছু হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। সন্তর্পণে ঝোলা থেকে আমার মেঠো-খসড়াটাকে (ফিল্ড ডায়রি) বার করে স্কেচ করছি, চেহারার বর্ণনা লিখছি।

সুন্দর কালো-সাদা দীর্ঘজঙ্ঘ। কালো চঞ্চু বিশাল, মোটা থেকে সরু ডগাটা একটু উপর দিকে তোলা। মাথা ও ঘাড় কালো, তার উপর চক্চকে নীলচে-সবুজ, শুধু ঘাড়ের উপর দিকে চকচকে তামাটে-পাটকিলের ছোপ, ধারে একটু বেগুনির আভা। পিঠের তলার দিক ও ওড়ার পালকসহ

ডানার দু'পাশ এবং পুরো লেজটা কালো, তার উপর চকচকে ধাতব-সবুজের আভা। বাকি পিঠের উপর ও নিচে বুকের উপরাংশ থেকে লেজের তলার আচ্ছাদক পর্যন্ত সব সাদা। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে, পালকহীন চোখের দু'পাশ ও ছোট গলগণ্ড (গুলার পাউচ) মলিন বেগুনি। পা ও আঙুল প্রবাল-লাল। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। তফাতটা পরে জেনেছিলাম বই দেখে যে স্ত্রী-পাখির কনীনিকা উজ্জ্বল লেবু-হলুদ। জলে দাঁড়ান পাখিটা চঞ্চুতে একটা মাছ ধরেই গিলে ফেলল। কয়েক পা এগিয়ে আবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। পা ছড়িয়ে বসে থাকা পাখিটা দাঁড়িয়ে উঠে দুই বড় পাখা মেলে শূন্যে উড়ল। তখন দেখলাম দুই সাদা ডানার তলায় আড়াআড়িভাবে কালো পটি। হঠাৎ কার্তিকদা বলল এই পাখি চিড়িয়াখানায় দেখেছি। জলহস্তীর ঘরের পাশে বড় ঝিলটার ধারে কানঠুঁটিদের (ফ্লেমিংগো) পাশে আছে। কাল বুধবার, সবাই মিলে চল্ দুপুরে গিয়ে আরও কাছ থেকে দেখে আসি। তার আগেই বই দেখে ওর পরিচয় জেনে নিয়েছি। দীর্ঘজঙ্ঘ বংশের (সিকোনিইদি) *এক প্রজাতি*। নাম— রাম-শালিক, লোহাজঙ্ঘা বা লোহার জংঘ (জেনরহাইনচাস এসিয়াটিকা), ইংরেজি— *ব্ল্যাকনেকেড স্টর্ক*, হিন্দি— *বানারাস, লোহা সারং*। উচ্চতায় মাথার চাঁদি পর্যন্ত 135 সেমি. (সাড়ে 4 ফুট)।



চি 135. রাম-শালিক

বাসস্থান— দক্ষিণে ক্বচিৎ দেখা যায়, না হলে সমগ্র ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল তরাই, শ্রীলঙ্কা। বিচরণ করে নিচুজলা বা বাদা, ঝিল এবং বড় নদীর কিনারায়। কখনও দেখা যায় জোয়ার-ভাঁটা খেলা গরান জঙ্গলের জলাভূমিতে। যেখানেই দেখা যাক সর্বত্রই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। কোথাও প্রচুর দেখা যায় না। ভারতের বাইরে বর্মা, মালয়েশিয়া, থাইদেশ এবং ইন্দোচীনীয় দেশসমূহে, সেখান থেকে অপর একটি *উপজাতি* (জে এ অস্ট্রালিস) হয়ে অস্ট্রেলিয়া।

খাদ্য— প্রধানত মাছ কিন্তু ব্যাঙ, সরীসৃপ, কাঁকড়া এবং অন্যান্য ছোটখাট জন্তু-জানোয়ার বাগে পেলে খেয়ে থাকে।

ডাক— বয়স্কদের শোনা যায় না। বাসার ভিতরে কোন কারণে শঙ্কিত হলে বা অন্য কোনও ভাবে উত্তেজিত হলে, বিশেষত গুলি খাওয়া আহত পাখি ধরার সময় সজোরে দুই চঞ্চুর ঠকঠকানি শোনায়। শিশু অবস্থায় দেখা গেছে একটা 'চাক' আওয়াজ করার পর 'উই-উই-উই দু'বার বা তিনবার ডাক দেয়। হঠাৎ বিরক্ত হলে শিশুরা গলা বাড়িয়ে দিয়ে দুই চঞ্চুর ঠকঠকানির পর ঐ আওয়াজ করতে থাকে।

স্বভাব— বিশেষ কিছুই জানা যায় নি। একমাত্র আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা আলান অক্টাভিয়ান হিউম তাঁর বই *'নেস্টস্ অ্যাণ্ড এগস্ অফ ইণ্ডিয়ান বার্ডস'-এ* (1890) যা লিখেছেন, তার বাইরে আজও কেউ কিছু নতুন সংযোজন করতে পারেন নি। তিনি লিখেছেন, একজোড়া

খুব গম্ভীরভাবে পরস্পরের সামনে আসে। যখন প্রায় এক মিটার তফাতে আসে তখন দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়ায়। লম্বা ডানা দু'জনে ছড়িয়ে দিয়ে খুব দ্রুত ঝাপটাতে থাকে। ঝাপটাতে ঝাপটাতে ডানা ঠেকিয়ে অপরের ডানার প্রান্তদেশ ছোঁয়। মাথা বাড়িয়ে দেয়, প্রায় ঠেকাঠেকির মত হয়, তখন দু'জনের দুই চঞ্চু ঠকঠকাতে থাকে। এক মিনিট বাদে আবার তফাত হয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আবার ফিরে এসে ডানা ঝাপটায় আর চঞ্চু ঠকঠকানি শুরু করে দেয়। এই ভাবে চলে প্রায় এক ডজন বার।

বাদায় দেখার পর আর দেখা পাই নি। সুন্দরবনে এক সময় ছিল, এখনও থাকতে পারে, কিন্তু সাক্ষাৎ হয় নি।

প্রজননকাল— সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর। বর্ষার তারতম্যে কিছুটা সময়ের হেরফের হয়। চষা খেতের মাঝে একা দাঁড়িয়ে থাকা অশ্বত্থ, পিপুল গাছ বা ঐ জাতীয় কোন গাছের প্রায় মাথায় 20 থেকে 25 মিটার উঁচুতে বাসা বাঁধে বিরাট প্ল্যাটফর্ম আকারে। ব্যাস হয় 1 থেকে 2 মিটার। উপকরণ— কাঠি ও শুকনো সরু ডাল, মাঝে মাঝে কাঁটা-ডালও থাকে। মাঝখানে আস্তরণ বিছায় খড়, পাতা, ঘাস, ছেঁড়া নেকড়া, জলজ আগাছা বা ঐ জাতীয় জিনিসে। কখনও কখনও কাদার প্রলেপও থাকে। কয়েক জায়গায় দেখা গেছে বছরের পর বছর একই বাসা ব্যবহার করতে। কখনই অন্যান্য কোন দীর্ঘজঙ্ঘ, দোচরা বা কাঁক জাতীয় পাখিদের কলোনির মধ্যে বাসা বানায় না। বাসা জলের ধারে-কাছে থাকার দরকার করে না। ডিম পাড়ে 3 - 4টি, ক্বচিৎ 5টি চওড়া ভোঁতা সাদা রঙের, তার উপর মলিন সবুজের আভা। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই পরস্পরের সাহায্যে বাসা বাঁধে, ডিমে তা' দেয় এবং সন্তান প্রতিপালন করে। কিন্তু কত দিনে ডিম ফোটে তা এখনও জানা যায় নি। ডিমের গড় মাপ 71·1 × 53·4 মিমি.।

গরুড় পাখি

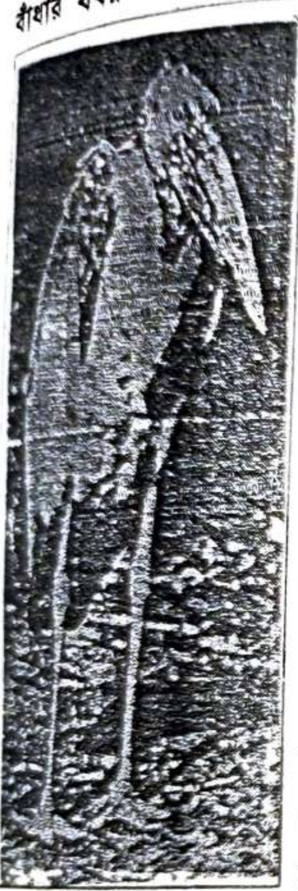
'আজকাল'- এ একবার গরুড় পাখির মাথার ভিতরের পাথর দিয়ে সাপের বিষ নামানোর সংবাদে এবং তার প্রতিবাদের চিঠি পড়ে অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, গরুড় পাখি কি ? সে রকম পাখি সত্যিই আছে কি ?

গরুড় হিন্দি নাম। বাংলায় হাড়গিলে, হাড়গিলা, ইংরাজী—অ্যাডজুটান্ট স্টর্ক (লেপটপটিলোস ডুবিয়াস)। লম্বা ঠ্যাং আর গলা নিয়ে আকারে শকুনের চেয়ে একটু বড়। দীর্ঘজঙ্ঘ পাখিদের মধ্যে হাড়গিলা সবচেয়ে কুৎসিত দেখতে। উচ্চতায় মাটি থেকে চার-পাঁচ ফুট। গায়ের রং কালো, ধূসর এবং ময়লাটে-সাদা। পা মলিন ধূসর-সাদা বা মলিন-পিঙ্গল। পালকহীন গলা লালচে, মাথা হলদে এবং বেশ বড় চারচৌকো কীলক-আকারের, হলদেটে বা সবজেটে চঞ্চু। প্রজননকালে চঞ্চুর গোড়াটা লালচে হয়। চঞ্চুর শেষে গলায় পালকহীন লালচে গলকম্বল ঝোলে। ওড়ার সময় চওড়া কালো ডানার মাঝখান দিয়ে সাদা পটি দেখা যায়।

উনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় কলকাতার মিউনিসিপ্যালিটি যখন নিম্নমানের ছিল, তখন প্রায় প্রতিটি পাকা বাড়ির ছাদে হাড়গিলে বাসা বেঁধে কলকাতার আবর্জনা সাফ করত।

সেই জন্যে কলকাতা কর্পোরেশনের প্রতীকচিহ্নে দুটি হাড়গিলে আঁকা আছে।

বাসস্থান— এই ভবঘুরে পাখির চলাফেরা ও বাসস্থান সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। প্রজননক্ষেত্র প্রধানত বার্মায়! তবে আসাম, ওড়িশা এবং বাংলাদেশের সুন্দরবন অঞ্চলেও বাসা বাঁধার খবর পাওয়া যায়। এছাড়া সিন্ধু থেকে কচ্ছ, উত্তর গুজরাট, রাজস্থান, নেপাল তরাই এবং গাঙ্গেয় উপত্যকা থেকে আসাম ও বাংলাদেশে ঘুরে বেড়ায় ঝিল, বাদা ও মানুষের বসতির একটু দূরে।



চি 136. গরুড় পাখি

স্বভাব— বাদা বা ঝিলে যখন জল কমে আসে তখন মাছ ও ব্যাঙের সন্ধানে হাড়গিলেকে দেখা যায়, একা বা ছোট দলে সৈনিক পদোচিত ভঙ্গিতে (যার থেকে ইংরেজি নামটা এসেছে) বিচরণ করছে। ক্ষেতের ধারে বা ভিতরেও এরা খাদ্য সন্ধানে ঘোরাফেরা করে। যখন খাদ্য খোঁজে না তখন দেখা যায় হয় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, না হয় পা মুড়ে পেট ঠেকিয়ে মাটিতে বসে, লম্বা গলাটা দুই কাঁধের মধ্যে দুমড়ে। কখনও দেখা যায় ওই অবস্থাতেই চঞ্চু দুটো ফাঁক করেছে। চিল ও শকুনদের সঙ্গে মিলেমিশে গাঁয়ের ধারে মৃত পশুর মাংস খায়। প্রথমে কয়েক পা দৌড়ে বিশাল দুই ডানা ঝাপটে শব্দ করে, তারপর তা মেলে দিয়ে শূন্যে ওঠে। চিল-শকুন বা অন্য দীর্ঘজঙ্ঘদের সঙ্গে যখন শূন্যে ভাসে তখন খুবই সুন্দর দেখায়। যে একবার দেখেছে সে কখনও ভোলে না, ওদের স্বচ্ছল ওড়ার গতি আর বাতাসে ভাসার ছন্দকে। গলায় যে গলকম্বলটি ঝোলে তার সার্থকতা বোঝা যায় না। অনেকে মনে করেন ওই থলিতে বুঝি খাদ্য ভরে রাখে কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।

খাদ্য— খাদ্য হিসেবে মাছ, ব্যাঙ, কবচী, সরীসৃপ— এমন কি বিষাক্ত চন্দ্রবোড়া সাপও পেটের মধ্যে পাওয়া যায়। জীবন্ত যে কোনও জীব সুযোগসুবিধে পেলে খেয়ে থাকে। এছাড়া পচা গলিত পশুদেহও প্রধান খাদ্য।

ডাকে— দুই চঞ্চু ঠুকে আওয়াজ করা ছাড়া বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া গরু যেমন তার শাবককে নিম্নস্বরে ডাকে তেমনি এক আওয়াজ করে। কি করে যে এই আওয়াজ বের করা হাড়গিলের পক্ষে সম্ভব হয় তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। কারণ ওদের কোন স্বরযন্ত্রের মাংসপেশী নেই।

প্রজননকাল— সাধারণত অক্টোবর থেকে জানুয়ারি। শিমূল গাছের উপর এক থেকে দু'মিটার চওড়া, এক মিটার গভীর বাসা বানায় গাছের শুকনো সরু ডালপালা দিয়ে। ডিম পাড়ে সাদা 3-4টি, কখনও দুটি। এই বাসা দেখা যায় বার্মার পেগু জেলার আতারণ নদীর ধারে। জানুয়ারি 1843 সালে খুলনা জেলার সুন্দরবনে বাসা বাঁধার এক সংবাদ নথিভুক্ত আছে।

মোগল সম্রাট বাবর তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন, সাধারণ মানুষের বিশ্বাস জ্যান্ত অবস্থায় এর মাথা ভাঙলে অনেক সময় বিখ্যাত জহর-মোহরা পাওয়া যায় এবং তাই দিয়ে বিষাক্ত সাপ ও যে কোন সরীসৃপের বিষকে নামানো যায়।

গণ্ডারের শিং, গরুড় পাথর ইত্যাদি নিয়ে মানুষের কত যে অন্ধবিশ্বাস আছে।

গগনভেড়

আমরা অনেকেই পেলিকানের নাম জানি। ঐ বিলিতি ইংরেজি বই আর বাণী কলম বা কালি ইত্যাদির ট্রেড মার্ক থেকে, কিন্তু বাংলা নাম জানি না।

এক সময়ে পশ্চিমবঙ্গে দেখা যেত। তারা শীতকালে পরিযায়ী হয়ে আসত হিমালয় পার হয়ে। এখন চিড়িয়াখানায় ছাড়া আর কোথাও দেখি না।



চি ১১। গগনভেড়

খানিকটা হাঁসের মত দেখতে গগনভেড়, গগনবেড় বা গুগলবেড় (পেলিকানাস ফিলিপেনসিস ক্রিসপাস), হিন্দি হাওয়াসিল, ইংরেজি - ডালমেশিয়ান পেলিকানদের মুক্ত স্বাধীন অবস্থায় প্রথম দেখি খুলনা অঞ্চলের সুন্দরবনে যমুনা ও মালঞ্চ নদীর মোহনার কাছে এক খাঁড়িতে।

সাত-আটটা গগনভেড় অর্ধবৃত্তাকারে বেড় দিয়ে ডানা ঝাপটিয়ে গভীর জল থেকে অল্প জলে মাছ তাড়িয়ে এনে তাদের চঞ্চুর নিচের থলিতে মাছ ভরছিল। আর একটা [illegible] গাছের [illegible] গাছের গুঁড়ির উপর। সেখানে [illegible] আছি। তখন বয়স অল্প, [illegible] বন্দুকের [illegible] জন্য মনটা ছটফট করত।

বন্দুকের আওয়াজে তাদের পাখিগুলো ডানা ঝাপটিয়ে জলের উপর প্রায় দৌড়ে শূন্যে উঠে গলাটা বকের মত গুটিয়ে দূরে মিলিয়ে গিয়েছিল। [illegible] পাখিটার ওজন ছিল প্রায় ৭ কিলোর মত। ১২ কিলো পর্যন্ত ওজন হয়। কিন্তু দেহের অনুপাতে হাড়ের ওজন এক কিলো হবে কিনা সন্দেহ।

এই গগনভেড়ের দৈর্ঘ্য ১৮৩ সেমি। দেহের পালক সাদা, গোলাপী গগনভেড়গুলোর মত গোলাপী আভাটি যেমন নেই। [illegible] পালকের রঙ [illegible] ধূসর, গোলাপীদের গোলাপী। এই দেহে [illegible]। [illegible] মাথার ঝুঁটিতে কিছু কোঁকড়া কোঁকড়া লম্বা পালক থাকে। [illegible] পালক কালো। পুরুষ পাখির ডানার মাপ 720/800 মিমি, [illegible] মিমি, [illegible]। [illegible] পাখির ডানা 680/720 মিমি, [illegible] মিমি। [illegible] সাদা। [illegible]। স্ত্রী পুরুষ একই রকম।

[illegible]

খাদ্য— দিনে প্রায় দু-কেজির মত মাছ।

ডাকে— না বললেই চলে, তবে বয়স্ক পুরুষ ষাঁড়ের মত একটা মৃদু আওয়াজ গলা থেকে বার করে।

আরেকটি উপজাতি— ধূসর গগনভেড় (পে ফি ফিলিপ্পেনসিস), ইংরেজি— স্পটেড বিলড বা গ্রে পেলিকান। বাসা বাঁধে আসামের কাজিরাঙ্গা, অন্ধ্রে পশ্চিম গোদাবরী জেলার কোল্লের হ্রদে, মাদ্রাজে তিন্নুনেভেলি ও চিঙ্গলিপুট জেলায় এবং শ্রীলঙ্কায়।

বাসস্থান— ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কায় বড় ঝিল, হ্রদ ও খাঁড়ির মুখে। পশ্চিমবঙ্গে কখনও দেখি নি।

ধূসর গগনভেড় লম্বায় 152 সেমি.। মাথা, ঘাড় এবং উপরের পালক ধূসর, নিচের সব পালক ধূসরাভ-সাদা, কেবল লেজের তলার পালকের উপর পাটকিলের কিছু ছোপ। শীতে পিঠের নিচের অংশ এবং বুকের দু'পাশে মদের রঙের আভা দেখা যায়। গ্রীষ্মে ডানার ও লেজের তলাতেও তাই। মাথার উপরে কিছু সরু পাটকিলে পালক, ডগায় একটু সাদা ছোপ নিয়ে চূড়োর মতন খাড়া থাকে। চঞ্চু মাংস রঙের, উপরের চঞ্চুতে তার উপর নীল ছিট, চঞ্চু-থলি মলিন বেগুনী, তার উপর কালচে-নীল ছিট। পা গাঢ় পিঙ্গল। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

প্রজননকাল— অক্টোবর থেকে মার্চ। বাসা বাঁধে আম-জাম ইত্যাদি বড় গাছে বা তাল-নারকেল গাছের মাথায়। ডিম পাড়ে 3-4টি, চূণের মত সাদা। সেগুলো তা' দিতে দিতে ময়লা হয়ে যায়। স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেই তা' দেয়। ডিম ফোটে 30 দিনে। বাচ্চারা তাদের চঞ্চু মা-বাবার থলির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করে। সেসময় আনন্দে ডানা ঝাপটাতে থাকে। ডিম পাড়া থেকে ওড়ার ক্ষমতা পেতে সময় লাগে 5 মাস।

গোলাপী গগনভেড় (পে অন ক্রোটালাস) লম্বায় 183 সেমি.। সব পালকে সাদার উপর গোলাপী আভা। ওড়ার পালক কালো। বুকে একগোছা পালক হলদেটে।

বাসস্থান— হাঙ্গেরি থেকে মধ্য এশিয়ার হ্রদসমূহে। পরিযায়ী হয়ে আসে উত্তর ভারতে পাঞ্জাব থেকে আসামে। কচ্ছর রানে, বাসা বাঁধতে প্রথম দেখেছেন ডঃ সালিম আলি 1960 সালে।

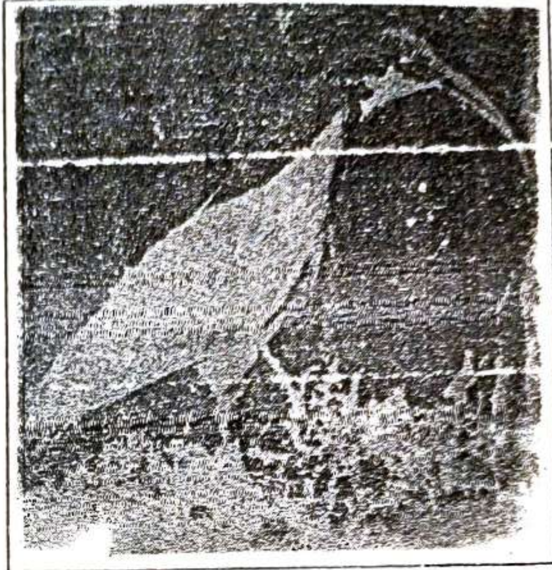
শরাটী বংশ

কাস্তেচরা

চল্লিশ দশকের আষাঢ়ে ক'দিন হল বর্ষাটা একটু ধরেছে। অদম্য বাসনা জাগল লবণ হ্রদের রূপটা দেখার।

দুই খোলের মাঝে সংকীর্ণ আলপথ অত্যন্ত পিচ্ছিল। শর, নল খাগড়া, জলজ ঘাস ও নানা জাতের গুল্ম সতেজে মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করেছে। ছাতায় ভর দিয়ে অতি সন্তর্পণে আলপথ দিয়ে চলেছি। কাছেপিঠে জনমনিষ্যি নেই। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক শোভা মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছি।

সূর্যকিরণে জলরাশি চিকচিক করছে। অল্প জোরে বওয়া জোলো বাতাস সেই জলে মৃদু মৃদু ঢেউ তুলছে। ঢেউগুলি পাড়ে আছড়ে পড়ে আওয়াজ তুলছে ছলাৎ ছলাৎ। জলার কোন পাখি চোখে পড়ছে না। তারা সবাই ব্যস্ত ডিম ফোটাতে কিংবা বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণে। কারণ, বাচ্চাদের শত্রুরা, কোড়াল বা মাছমৌরল (পালাস-এস ফিশিং ঈগল), কুররী বা উৎক্রোশ (অসপ্রে) আর শঙ্খচিল (ব্রাহ্মনি কাইট) আকাশে পক্ষ বিস্তার করে জলের উপর চক্কর মারছে। এদের মধ্যে কোন একজন মাঝে মাঝে জলের উপর ঝপাৎ করে পড়ে নখরে আঁকড়ে মাছ তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে, দূরে কোন নিভৃত স্থানে। অন্য দু'জন তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে পিছনে তাড়া করে চলেছে।



চি ।২৪ কাস্তেচরা

আলপথ শেষ হয়েছে ধানখেতের কিনারায়। অনেকগুলি খেত পাশাপাশি। সবুজ ধানের চারায় ভরা। খেতগুলোর পিছনে কয়েকটি কুঁড়ে ঘর। ফিরে যাব যে পথে এসেছি সেই পথ ধরে। একটা ধানখেতের আলের উপরে এবং ঠিক নিচে অল্প জলের ভিতরে গোটা পাঁচ-ছয় বক এদিক-ওদিক ছড়িয়ে খাদ্য খুঁজে চলেছে। খুব ধীরে-সুস্থে পা ফেলে ঘোরাফেরা করছে।

না, বকের মত সাদা দেখতে হলেও ঠিক বক নয়। চঞ্চু কালো, বকের চেয়ে অনেক বড়। কাষ্ঠচূড়া বা চোপ্পার (কারলিউ) মতো। মাথা এবং প্রায় পুরো গলাটাও কালো আর সবটাই পালকহীন, চামড়ার। আমি কি তবে মিসরের সেই পবিত্র আইবিস দেখছি? যাকে প্রাচীন মিসরীয়রা পবিত্র জ্ঞানে পুজো করত। দেবতা থথ-এর প্রতীক। থথ্ ছিলেন আমাদের চিত্রগুপ্তের মত। তিনিও প্রতিটি মানুষের জীবন ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। ফেরাওদের পিরামিড ও কবরের ভিতর এদের হাজার হাজার দেহ মমি করা। হয় একের উপর এক থাক করে সাজান, না হয় দেহাবশেষ রাখার পাত্রের মধ্যে রাখা। কিন্তু তা হতে পারে না, কারণ তাদের গলাটা এত ন্যাড়া নয়। গলার প্রায় সবটাই পালকে ঢাকা। তবে ঐ জাতেরই পাখি সেটা নিশ্চয়ই।

বাড়ি এসে বইপত্তর ঘেঁটে জানলাম পাখিগুলো দীর্ঘজঙ্ঘ বর্গের (সিকোনিয়িফরমেস) অন্তর্গত শরাটী বংশের (থ্রেসকিঅরনিথিদি) ও গণের *এক প্রজাতি*, নাম— কাস্তেচরা, সাদা দোচরা (থ্রেসকিঅরনিস মেলানোকেফালা), ইংরেজি— *হোয়াইট আইবিস।*

কাস্তেচরা লম্বায় 75 সেমি.। মাথা, ঘাড় ও গলা পালক শূন্য, চামড়ার রং নীলচে-কালো, চঞ্চু কালো, মোটা ভোঁতা এবং নিচের দিকে বাঁকান। উপরের চঞ্চুর দু'পাশে লম্বালম্বিভাবে খাঁজকাটা। সেই খাঁজকাটার গোড়ায় নাকের গর্ত। কনীনিকা লালচে-পাটকিলে বা লাল। পালকহীন জঙ্ঘাসমেত লম্বা পা ও আঙুল চকচকে কালো। বাকি দেহের উপরের পালক সাদা। লেজে 12টি পালক। প্রজননের সময় ডানার কিছু পালক সরু হয়ে গিয়ে ঝালরের মত ঝোলে। দেহের দু'পাশে তলার

দিকে অল্প লোমহীন চামড়া ও ডানার তলার গোড়া কিছুটা রক্ত-লাল। উড়লে সেটা স্পষ্ট দেখা যায়। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান— সমগ্র ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার সমতল ও মালভূমির নদী, ঝিল, বাদা, জলে ডোবা চষা জমি, ভাঁটায় কর্দমাক্ত জমি ও ঈষৎ লোনা উপহ্রদে। সুন্দরবনে বেশ দেখা যায়। ভারতের বাইরে বার্মা, চীন ও জাপান।

খাদ্য— প্রধানত আমিষ, যথা— মাছ, ব্যাঙ, কম্বোজ, কবচী, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি, সেই সঙ্গে কিছু উদ্ভিজ্জ বস্তু।

স্বভাব— কাস্তেচরা সঙ্ঘচারী। ছোট ও মাঝারি দল ছাড়াও সময়ে সময়ে বৃহৎ দলে দেখা যায়। প্রায়ই দীর্ঘজঙ্ঘ (স্টর্ক), খুন্তে বক (স্পানবিল), কালো দোচরা (ব্ল্যাক আইবিস), কাঁচিয়া তোরাদের (গ্লসি আইবিস) সঙ্গেও মিলেমিশে চরে। জলের ধারটাই এদের পছন্দ বেশি। কখনও দেখা যায় কাদার উপর অলসচরণে এদিক-ওদিক ঘুরছে, কখনওবা অল্প জলে চঞ্চু ফাঁক করে মাথাটা সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দিয়ে খাদ্য খুঁজছে। খাদ্য পেলেই চিমটের মতন ধরে চঞ্চুটা উপর দিকে তুলে ঝাঁকিয়ে মুখের মধ্যে পুরে দেয়। ওড়ে জোরে দ্রুত পাখার ঝাপট দিয়ে, থেকে থেকে অল্প ভেসে চলে, আবার ঝাপট দেয়। মাথা, গলা সোজা লম্বা করে হয় ইংরেজী V-ব্যূহরচনায় না হয় পরপর সোজা এক লাইনে, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে দূরত্ব সমান রেখে ওড়ে। সাধারণত চুপচাপ থাকে। প্রজননকালে গলা দিয়ে একটা গম্ভীর আওয়াজ করে। কলোনি-বাসায় মৃদুস্বরে বিরক্তি প্রকাশের একটা আওয়াজও শোনা যায়।

প্রজননকাল— জুন থেকে আগস্ট। নির্ভর করে বর্ষা শুরুর আগে বা পরে হওয়ার জন্যে। সেই কারণে অনেক সময় প্রজননকাল অক্টোবর পর্যন্ত গড়ায়। কলোনি-বাসা বাঁধে দীর্ঘজঙ্ঘ বক, পানকৌড়ি ইত্যাদি অন্যান্য জলার পাখিদের সঙ্গে। মাঝারি আকারের বাসা তৈরি করে 25 থেকে 30 সেমি, আড়াআড়িভাবে সরু গাছের ডাল দিয়ে পাটাতনের মত করে, জলে ডোবা বা জলের ধারে গাছের উপরে। ডিম পাড়ে 2 থেকে 4 টি, মসৃণ লম্বাটে চুন-সাদার উপর খুব ফিকে নীলচে আভার, তলার দিকে থাকে পাটকিলের ছোট ছোট ছিট ও ছোপ। ডিম ফোটে 23 থেকে 25 দিনে। ডিম আর বাচ্চার শত্রু হল পাতিকাক ও মাছমৌরল। এদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া সময়ে সময়ে শক্ত হয়ে পড়ে।

খুন্তে-বক

চব্বিশ পরগনার কালিকাপুরের জলায় কারণ্ডবের নমুনা সংগ্রহের পর ঐ মনোরম পরিবেশের এমন একটা হাতছানি ছিল যে সময়-সুবিধে পেলেই ওখানে গিয়ে হাজির হতাম। শর ও হোগলা বনের ভিতর কত রকমের যে পাখি দেখতাম তার ঠিক নেই। তাদের ডাকাডাকি শর-হোগলার শিষে দোল খাওয়া আর গান গাওয়া, দেখে-শুনে মন ভরে যেত। ওখানকার সালতিওয়ালারা সবাই আমায় চিনে গিয়েছিল। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম, স্থানীয় পোশাক পরে নিলে পাখিদের খুব কাছাকাছি যাওয়া যায়। অর্থাৎ খালি গা, পরনে লুঙ্গি, মাথায় গামছা বাঁধা, কখনও সঙ্গে


চি 139. খুন্তে-বক

একটা ছেঁড়া ছাতা। আমার সঙ্গে অতিরিক্ত থাকত একটা নোটবই।

এক শ্রাবণের মেঘে-ঢাকা আকাশের দিনে হাজির হয়েছি। সালতিওয়ালা মুনিম আলি বলল, আপনাকে আজ এক ঠাঁই নিয়ে যাব, সেখানে কতকগুলো বকের মত পাখি আছে, বাসা বাঁধছে। এখানকারই পাখি, তবে প্রতি বর্ষায় এই জায়গাটার গাছেই অন্য সব বকের সঙ্গে বাসা বাঁধে। আমরা একটা নাম বলি বটে, তবে আপনারা কি বলেন তা জানি না। এইসব কথা শুনতে শুনতে সালতি চেপে চলেছি। একটা বাঁকের কাছে আসতেই মুনিম তার হাতের লগিটা তুলে নিল। শরবনের ভিতর হাত দিয়ে শর টেনে চিরে সালতিটাকে একটা উন্মুক্ত জায়গার মুখে এনে রাখল। শরের আড়াল থেকে দশ-পনের হাত দূরে দেখি একটা দ্বীপের মত জায়গায়, বেশ কিছু বাবলা, সাঁই বা শমী এবং অন্যান্য মাঝারি আকারের গাছের মাথায় অনেক বাসা। বাসা বেঁধেছে ধর-বক (লার্জ ইগ্রেট), কোর্চে বক (মেডিয়াম ইগ্রেট), বাচকা (নাইট হেরন), কাস্তে চরা (হোয়াইট আইবিস), লাল কাঁক (পারপল হেরণ), পানকৌড়িরা (করমোরাণ্ট)। কেউ কেউ ওড়াউড়ি করছে, কেউ বাসার উপর দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে, আবার কেউ ডিমে তা দিচ্ছে।

কিছু নতুন ধরনের বক দেখলাম। কয়েকটার মাথায় কোর্চে-বকের মত ঝুটি আছে। বুঝলাম প্রজননকালে পুরুষের রূপ। কয়েকটার নেই। সেগুলো স্ত্রী-পাখি। এদের বাসা অন্যদের মত মিলেমিশে নেই, পাশের কয়েকটা গাছে আলাদাভাবে যেন জাতপাত বাঁচিয়ে বাসা বেঁধেছে। দেখলাম কিছু পাখি বাসায়, আবার কিছু জলের ধারে পাড়ের উপর। লম্বা গলা, লম্বা দুই পা, সাদা গা, লম্বা কালো চঞ্চুর উপর গভীর কালো ছোট ছোট দাগ। চঞ্চু চ্যাপটা, হলদে ডগার কাছটা গোলাকার খুঁন্তির মত। খুন্তিচঞ্চুটা অল্প ফাঁক করে জলের মধ্যে কিছুটা ডুবিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে এক-এক পা করে চলেছে। মুনিম কানের কাছে প্রায় মুখ এনে বলল,বাবু এই সেই পাখি। বললাম, একে খুন্তে-বক বলে। মুনিম বলল, আমরাও তাই বলি।

পাখিগুলো শরাটী বর্গের (থ্রেসকিঅরনিথিদি) অন্তর্গত *এক প্রজাতি*, নাম— খুন্তে-বক, চিন্তা (প্লাটানিয়া লিউকোরোডিয়া), ইংরেজি— *স্পুনবিল*, হিন্দি— *চামচ বাজা*।

দাড়ান অবস্থায় উচ্চতা মাথা পর্যন্ত 60 সেমি.। গলা পালকহীন হলুদ, গলার সামনে চঞ্চুর গোড়ায় দারচিনি-হলুদের ছোপ। কনীনিকা গাঢ় পাটকিলে বা পাটকিলে-লাল। উপরের চঞ্চু কালো, খুন্তির মত ডগাটা উজ্জ্বল হলুদ, তলার চঞ্চু স্লেট-ধূসর। মুখের উপর লোমহীন চামড়ার রং গন্ধক-হলুদ, কখনও কখনও তার উপর ও গলায় কালো ছোপ দেখা যায়। পা ও আঙুল কালো।

বাসস্থান— ভারতের ভেতরেই যাযাবরী হয়, আবার বেশ কিছু পরিযায়ী হয়েও আসে। পাকিস্তান,

বাংলাদেশ, নেপাল তরাই সহ সমগ্র ভারত এবং শ্রীলঙ্কা। দেখা যায় বাদা, ঝিল, নদীর পাড়, মাঝে মাঝে খাঁড়ি ও গরাণ-বাইনের জলায়। ভারতের বাইরে মধ্য এশিয়া, চীন, দক্ষিণ ট্রান্সকেকাশিয়া, উসুরি প্রদেশ, জাপান ও ফরমোসা, দক্ষিণে সিরিয়া, মিসর। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও পরিযায়ী হয়ে ভারতে প্রচুর আসত। এখন অত না এলেও রাশিয়ার কাশ্যপ সাগরের নিকটবর্তী স্থানের (40° উঃ ও 50° উঃ এবং 45° ও 55° পূ), আঙটি পরান বাচ্চাদের পাওয়া গেছে মহারাষ্ট্রের কোলাপুর জেলায় (17° উঃ 75° পূ) বিহারের মুঙ্গের জেলায় (25° উঃ 86° পূঃ), রাজস্থানের টঙ্কে (26° উঃ 76° পূ), মধ্যপ্রদেশের মানদ্সরে (24° উঃ 75° পূ), ঠিক দু'বছর বাদে অক্টোবর থেকে জানুয়ারির মধ্যে। একটি পাওয়া যায় জুলাই মাসে, যখন এখানে স্থানীয়দের প্রজননকাল চলছে। আজভ সাগরের ইয়ে-ইস্ক-এর কাছে 10 জুন 61তে যেটিকে আঙটি পরান হয়, তাকে পাওয়া যায় দুবছর বাদে জুন 63 সালে পাকিস্তানের হায়দ্রাবাদে (25° 35° উঃ 68° 5' পূ)।

খাদ্য— চুনো মাছ, ব্যাঙাচি, ব্যাঙ, কবচী, কম্বোজ, জলজ পোকামাকড় ও কিছু উদ্ভিদ।

ডাক— এমনি কোন আওয়াজ করে না, তবে কলোনি-বাসায় খুব নিচু স্বরে একটা ঘোঁতঘোঁতের মত শব্দ ও চঞ্চু ঠোকার আওয়াজ করতে ওদের শোনা যায়।

স্বভাব— খুন্তে-বক সঙ্ঘচারী ও বেশ মিশুকে। ছোট দলেও যেমন, তেমনি 50-60 -এর দলেও অন্যান্য বক ও বাদার পাখিদের সঙ্গে মিলে-মিশে চরে। দিনের বেলার চেয়ে প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় খাদ্য সংগ্রহ করতে বেশি দেখা যায়। আবার রাতেও করে থাকে। চঞ্চু অল্প ফাঁক করে জলের মধ্যে দুলিয়ে যেমন খাদ্য খোঁজে তেমনি কাদায় ঠেকিয়ে ও খোঁজে। হঠাৎ সবাই থেমে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যেন খাদ্যে কোন আসক্তি নেই। ওড়ে বেশ আস্তে, ধীরে-সুস্থে পাখার ঝাপট মেরে গলা ও পা সামনে-পিছনে টান টান করে। ঝাঁকে ওড়ে ফিতের মত একের সঙ্গে অপরের দূরত্ব সমান রেখে।

প্রজননকাল— জুলাই থেকে অক্টোবর, দক্ষিণ ভারতে নভেম্বর থেকে জানুয়ারি, শ্রীলঙ্কায় ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল। নানা রকম কাঠকুটো দিয়ে মোটামুটি শক্ত করে পাটাতনের মত বাসা বাঁধে। লাইনিং দেয় ঘাস ও পাতা দিয়ে। মাঝারি আকারের বাসা বানায় বাবলা, শমী, বাইন ইত্যাদি গাছের মাথায়। অনেক সময় একটা বাসার সঙ্গে অন্য বাসাটা প্রায় ছুঁয়ে থাকে।

ডিম পাড়ে একটু গোলাকার, এক দিকটা একটু সূঁচলো 3-4টি, কখনও 5টি চূণের মত সাদা, তার উপর পাটকিলের ছিট ও ছোপ। কখনও দেখা যায় দু-চারটে ফিকে ধূসর-পাটকিলে বা লালচে-ধূসরের ছিট ও ছোপ। ডিম ভারতে কতদিনে ফোটে তা নথিভুক্ত নেই। তবে মনে করা হয় 21 দিনে ফোটে।

জলকাম বংশ

পানকৌড়ি

তখন কত আর বয়েস হবে? দশ-এগার। গরমের ছুটিতে কলকাতা থেকে মজিলপুরে মামার বাড়ি গেছি। বাড়ির বাইরে মস্ত বড় এক সানবাঁধান দীঘি। রোজই বেলা বারটা নাগাদ সবাই মিলে সেখানে স্নান করতে যেতাম। জলের ভিতর তিন-চারটে ধাপ ছাড়া নামার হুকুম ছিল না; সেখানেই জল ছিটিয়ে ডুব দিয়ে ঘাটের সিঁড়ি ধরে পা ছুঁড়ে যত কিছু মনের সাধ মেটাতাম। আমরা দু-তিন জন ছাড়া ওখানকার আমাদের বয়সী বা আরও ছোট সব ছেলেমেয়েরা দিব্যি সাঁতার জানত। পাড়ের ধারের গাছ থেকে লাফিয়ে জলে পড়ত। ডুব সাঁতার দিত, সাঁতার কেটে প্রায় মাঝ-দীঘি পর্যন্ত চলে যেত।



চি 140. পানকৌড়ি

সেদিন ঐভাবে স্নান করছি, হঠাৎ দেখি কোথা থেকে একটা কাকের মত কালো রঙের পাখি এসে লেজটাকে প্রথমে জলে ডুবিয়ে পরে দেহটাকে জলে ফেলল। দেখলাম শুধু লম্বা গলাটুকু জলের উপরে, বাকি সব জলের তলায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডুবোজাহাজের ছবি দেখা ছিল। জলের উপর লম্বা ডাণ্ডা যা জেগে থাকত তাকে যে পেরিস্কোপ বলে তাও জানতাম। ঠিক ডুবোজাহাজের মত গলাটা শুধু জল থেকে উঁচু করে বের করে তরতর করে চলছে। এক-একসময় জলের তলায় নিঃশব্দে চলে যাচ্ছে। বেশ কিছু দূরে গিয়ে ভেসে উঠছে। মাঝে মাঝে ঘাড়টা এদিক-ওদিকে ঘুরিয়ে চারদিকে দেখছে। আমিও তাকিয়ে অদ্ভুত পাখিটাকে দেখছি। আগে কখনও দেখি নি।

কয়েকটি ছেলের বুঝি পাখিটার দিকে নজর পড়েছিল, তারা চিৎকার করে উঠল, 'পানকৌড়ি পানকৌড়ি, ডাঙ্গায় ওঠোসে/ তোর শাউড়ি বলে গেছে বেগুন কোটোসে'। কোথায় বেগুন কটুবে? সমস্বরে চিৎকারে পাখিটা জলের উপরে খানিকটা ঝটপট করতে করতে জল ছেড়ে উড়ে চলে গেল। যোগীন্দ্রনাথ সরকার-এর 'খুকুমণির ছড়ার' দৌলতে পানকৌড়ি নামটার সঙ্গে পরিচয় ছিল। তাই

জানলাম একেই পানকৌড়ি বলে। পরে জেনেছি আরও অন্য নাম— পানিকাক, পানিকৌয়া (ফ্যালাক্রোকোরাস নিগার), ইংরেজি— *লিটল করমোর্যান্ট*। লম্বায় 51 সেমি.। সমস্ত দেহই প্রায় কালো, তার উপর নীলচে বা সবজেটে আভা। পিঠের উপরিভাগ ও ডানার আচ্ছাদকে রূপোলি ধূসরের উপর কালোর প্রলেপ, গলাটা সাদা। প্রজননকালে দেখা যায় মাথার খুলির পশ্চাদভাগে ও ঘাড়ে খুব ছোট ঝুঁটি এবং মাথার দু'পাশে চাঁদির সামনে দু'চারটে ছড়ানো-ছিটনো রেশমি পালক। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

কনীনিকা সবুজ। শিঙে-পাটকিলে লম্বা পাতলা সূঁচলো চঞ্চুর একদম ডগাটা কালো এবং একটু বাঁকান, গোড়াটা রক্ত-বেগুনি। অক্ষিকোটরের চামড়া কালো, প্রজননকালে রক্ত-বেগুনি।পা ও আঙ্গুল কালচে, প্রজননকালে ফিকে মাংসল-বেগুনি।

আরও দু'জাতের পানকৌড়িকে পশ্চিমবঙ্গে দেখতে পাই। *প্রথমটি*— বড়ো **পানকৌড়ি** (ফা কারবো), ইংরেজি— ***লার্জ করমোর্যান্ট***, লম্বায় 80 সেমি.। *দ্বিতীয়টি*— মেজ পানকৌড়ি (ফা ফুসকিকল্লিস), ইংরেজি— ***ইন্ডিয়ান শ্যাগ***, লম্বায় 63 সেমি.। আরও একটি দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপ, রুশ-তুর্কিস্তান প্রভৃতি জায়গা থেকে মাঝে মাঝে পরিযায়ী হয়ে ভারতে আসে, বেঁটে পানকৌড়ি (ফা পাইগমাইয়ুস), ইংরেজি— *পিগমি করমোর্যান্ট*। লম্বায় 48 সেমি.।

বাসস্থান— হিমালয়, উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তান ছাড়া ভারতে সর্বত্র এবং সিংহলে। ভারতের বাইরে বার্মা, থাইদেশ, ইন্দোচীন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া থেকে পুবে বৃহত্তর সান্দা দ্বীপপুঞ্জে।

খাদ্য— মাছই প্রধান। তবে অল্পবিস্তর ব্যাঙ, ব্যাঙাচি ও কবচী খেয়ে থাকে।

স্বভাব— যে কোন জলাশয়ে একটি-দুটি পানকৌড়িকে দেখা যাবেই। বড় দলের ঝাঁক দেখা যায় রাজস্থানের কেওলাদেও, ঘানা ও মাদ্রাজের বেদান্তগাল-এ। জলে যখন থাকে না তখন জলের ধারের গাছে, পাড় বা পাথরের উপর বসে দুই ডানা ছড়িয়ে রোদ পোহায়, ডানা শুকোয়। সদলবলে যখন মাছ ধরা শুরু করে তখন ছোট মাছের ঝাঁক, তেচোকো বা ডানকুনি দেখতে পেলে নিজেদের মধ্যে ব্যস্ততায় ব্যাঙবাজি খেলার মতো একে অপরের পিঠ ডিঙ্গিয়ে জলের ভিতর ডুব দিয়ে মাছকে তাড়া করে ধরে।

প্রজননকাল— ভারতে বিভিন্ন স্থানে জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যেই। ডিম পাড়ে 3 থেকে 5টি, সবজেটে-নীল তার উপর থাকে চকখড়ির প্রলেপ। বাসা খুবই ছোটো মাত্র 25 সেমি.। কাঠি বা গাছের সরু ডালের টুকরো দিয়ে খুবই আগোছালোভাবে তৈরি। তাতে বাচ্চাসমেত সকলের ভাল করে সঙ্কুলান হয় না। গাদাগাদি করে থাকে। বাসার কাছে গেলে বড়রা উড়ে গিয়ে জলে পড়ে, আর ছোটরা ঝপাঝপ গাছ থেকে ঝোপেঝাড়ে পড়ে। পরে তীক্ষ্ণ নখ, লেজ ও চঞ্চুর বাঁকান ডগার সাহায্যে কোন রকমে গাছ বেয়ে বাসায় ওঠে। কখনও দেখি জল থেকে বেশ দূরে গাঁয়ের ধারে গোবক ও কোর্চে-বকদের সঙ্গে একই গাছে বাসা বাঁধছে।

বজ্জুল বর্গ

পশ্চিমবঙ্গের পক্ষিতত্ত্বের শেষ বর্গ— বজ্জুল বর্গের (অর্ডার পডিকিপেডিফরমেস) শেষ বংশ— বজ্জুল (পডিকিপিটিদি) এবং ঐ নামে একটিমাত্র গণ বজ্জুল (পডিকেপস্), এই বজ্জুল গণে তিনটি মাত্র প্রজাতিকেই ভারতে দেখা যায়। যার মধ্যে একটি গণকে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে। যার নাম— ডুবুরি, ডুবডুবি, পানডুবি (পডিকেপস্ রুফিকল্লিস)।

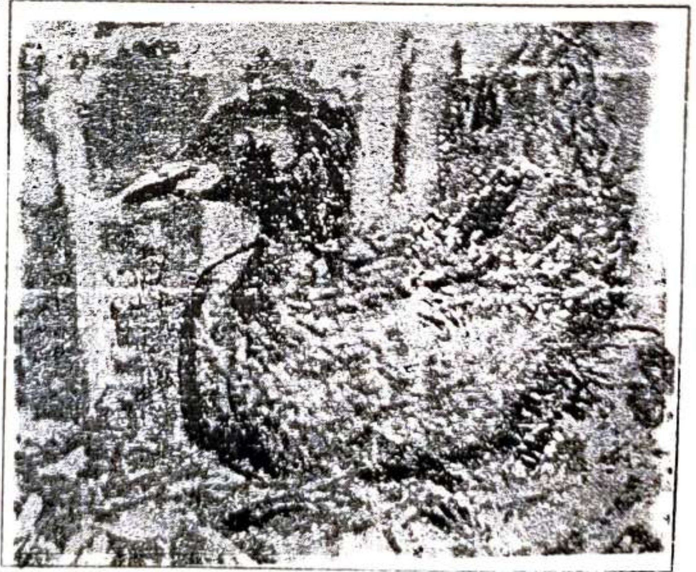
এই বংশের পাখিদের লেজ না থাকার মধ্যেই। খুব ছোটো ডানা এবং চাপা তীক্ষ্ণাগ্র চঞ্চু। পা দেহের বেশ পিছনে, যা সাঁতার ও ডুব সাঁতারের খুব উপযোগী করে তুলেছে। গুলফ্ বা গোড়ালির সামনে কাটাকুটি। সামনের পায়ে চওড়া ঝিল্লী।, পিছনের পা ছোটো এবং একটু উপরে ও ঝিল্লীযুক্ত। নখ চওড়া ও চেপটা। গায়ে পালক খুব ঘন এবং বুকের পালকও ঘন এবং সিল্কের মতো মসৃণ। বাচ্চাদের দেহে সাদা-কালো দাগে ভরা। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বজ্জুল বংশ

ডুবুরি

আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহ। অদৃশ্য এক চুম্বকের টানে বেরিয়ে পড়েছি। মানিকতলার খালের খেয়া পার হয়েই বেশ কয়েকঘর মৎস্যজীবির আস্তানা। দু'পাশে খোল, মাঝখানে সরু পিচ্ছিল আলপথ দিয়ে সন্তর্পণে হেঁটে পার হচ্ছি।

হঠাৎ ডানদিকে জলের উপর নলখাগড়া ও শর-ঘাসের মধ্যে সড়সড় শব্দ শুনে চমকে উঠলাম।



চি ।৫। ডুবুরি

ডানার ঝাপট কানে আসতে সাহস ফিরে এল। ডাকও শুনলাম 'ক্লিক ক্লিক', তারপরেই মিষ্টি 'ট্রিলিলি' আওয়াজ। জলে নেমে হাত দিয়ে দাম ঠেলে একটু এগিয়ে যেতেই, কার যেন জলে নামার আওয়াজ শুনেছিলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে সন্তর্পণে

বজ্জুল বর্গ

পশ্চিমবঙ্গের পক্ষিতত্ত্বের শেষ বর্গ— বজ্জুল বর্গের (অর্ডার পডিকিপেডিফরমেস) শেষ বংশ— বজ্জুল (পডিকিপিটিডি) এবং ঐ বংশে একটিমাত্র গণ বজ্জুল (পডিসেপস)। এই বজ্জুল গণে তিনটি মাত্র প্রজাতিকেই ভারতে দেখা যায়। যার মধ্যে একটি গণকে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে; যার নাম— ডুবুরি, ডুবডুবি, পানডুবি (পডিসেপস রুফিকলিস)।

এই বংশের পাখিদের লেজ না থাকার মতোই। খুব ছোটো ডানা এবং চাপা তীক্ষাগ্র চঞ্চু। পা দেহের বেশ পিছনে, যা সাঁতার ও ডুব সাঁতারের খুব উপযোগী করে তুলেছে। গুলফ বা গোড়ালির সামনে কাটাকুটি। সামনের পায়ে চওড়া ঝিল্লী।, পিছনের পা ছোটো এবং একটু উপরে ও ঝিল্লীযুক্ত। নখ চওড়া ও চেপটা। গায়ে পালক খুব ঘন এবং বুকের পালকও ঘন এবং সিল্কের মতো মসৃণ। বাচ্চাদের দেহে সাদা-কালো দাগে ভরা। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বজ্জুল বংশ

ডুবুরি



চি ১৪। ডুবুরি

আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহ। অদৃশ্য এক চুম্বকের টানে বেরিয়ে পড়েছি। মানিকতলার খালের খেয়া পার হয়েই বেশ কয়েকঘর মৎস্যজীবির আস্তানা। দু'পাশে খোল, মাঝখানে সরু পিচ্ছিল আলপথ দিয়ে সন্তর্পণে হেঁটে পার হচ্ছি।

হঠাৎ ডানদিকে জলের উপর নলখাগড়া ও শর-ঘাসের মধ্যে সড়সড় শব্দ শুনে চমকে উঠলাম।

ডানার ঝাপট কানে আসতে সাহস ফিরে এল। ডাকও শুনলাম 'ক্লিক ক্লিক', তারপরেই মিষ্টি 'ট্রিলিলি' আওয়াজ। জলে নেমে হাত দিয়ে দাম ঠেলে একটু এগিয়ে যেতেই, কার যেন জলে নামার আওয়াজ শুনেছিলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে সন্তর্পণে

নলখাগড়া ফাঁক করে দেখি, জলের উপরেই শর ও খাগড়া দিয়ে ছোট্ট গোল বাসা, তাতে পাঁচটি খড়াটে ছোট দু'মুখ সূঁচলো ডিম।

ওখান থেকে উঠে এসে আরও ডান দিকে সরে দাম ঠেলে জলে নামি; দশ-বারটা খুব ছোট পাখি হাঁসের মত সাঁতার কাটছে। কেউ নিঃশব্দে জল একদম না নাড়িয়ে টুপ করে ডুবে যাচ্ছে, কেউ একটু লাফিয়ে উঠে জলের তলায় চলে যাচ্ছে। হঠাৎ আমার উপস্থিতি বুঝতে পেরে, ছোট ডানা ঝাপটিয়ে, জলের উপর দিয়ে যেন খানিকটা দৌড়ে, শূন্যে উঠে একটু দূরে গিয়ে জলে পড়ল।

এত ডুবুরি, ডুবডুবি, পানডুবি (পডিসেপস্ রুফিকলিস), ইংরেজি— লিটল গ্রিব, ড্যাবচিক। শীত পড়লে দেখতে পাই শ'য়ে, শ'য়ে এসে ভিড় করে জলজ গুল্মেভরা পুকুর, বাদা এবং যে কোন জলাশয়ে। জলের অবস্থা বুঝে পরিযায়ী হয়। এর আগে বাসা বাঁধতে কখনও দেখিনি। আরও দশটা বাসার খোঁজ পেলাম। ডিম দেখলাম কোন বাসায় 3, কোনটায় 4, কোনটায় 5। পক্ষিতত্ত্বের বইতে 6টি পর্যন্ত দেয় বলা আছে। আমি এখনও দেখিনি। হয়ত অন্যত্র কোথাও, পশ্চিমবঙ্গে নয়।

যে বছর আগস্টে গিয়েছিলাম তার পরের বছর বাসা বাঁধার শুরু থেকে ডিম ফুটে বাচ্চা তোলা অবধি লক্ষ্য করেছি। বাসা বাঁধার পর স্ত্রী-পাখি বাসার মধ্যে চুপ করে বসে অপেক্ষা করে। পুরুষ এসে তার উপর চড়ে মিলনসাধন করে। 19-20 দিনে ডিম ফোটে। একসঙ্গে বা পরপর দিনে ডিম পাড়ে না। প্রতিটি ডিম পাড়ার মাঝে ফাঁক থাকে 5 থেকে 7 দিনের। শেষ ডিম যখন ফোটে, তখন প্রথম ফোটা ডিমের ছানা বেশ বড় হয়ে মার পাশে বসে থাকে, বা সাঁতার কেটে চলে-ফিরে বেড়ায়। অন্যান্য ডিম ফোটা পর্যন্ত পুরুষ-পাখি সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ বা তদারকি করে থাকে। ডিম চুন-সাদা থেকে ক্রমে ক্রমে ময়লাটে, পাটকিলে হয়ে যায়। ডিমে জল লাগে কিন্তু বাসার পচা ঘাসপাতা ও কাঠি ইত্যাদি গেঁজে গিয়ে উত্তাপ সৃষ্টি করার ফলে ডিম নষ্ট হয় না।

লেজহীন ডুবুরি লম্বায় 23 সেমি.। প্রাগৈতিহাসিক কিছু চিহ্ন এখনও বর্তমান। উপরটা গাঢ়, পাটকিলে, চাঁদি আরও গাঢ়, গলা ও ঘাড়ের দু'দিক বাদামী, তার নিচে বুকের নরম পালক লোমের মত রেশমি নরম ধোঁয়াটে-সাদা। ডানায় একটা সাদা ছোপ, সেটা ওড়ার সময় দেখা যায়। ছোট সূঁচলো 18-22 মিমি. কালো চঞ্চুর ডগাটা মলিন, এবং গোড়ার শেষটা একটু ফোলা মাংসল হলদেটে-সবুজ। কনীনিকা লালচে-পাটকিলে বা গাঢ়-লাল। জলের তলায় বা উপরে সাঁতার দেবার উপযুক্ত তলপেটের শেষে পা ও খোলা ঝিল্লিসহ আঙুল সবজেটে-কালো, নখ চওড়া ও চ্যাপটা। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান— 800 মিটার উচ্চতার মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ছাড়া ভারতে সর্বত্র। ভারতের বাইরে উত্তর আফ্রিকা, মালাগাসী, মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়।

খাদ্য— ছোট মাছ, ব্যাঙাচি, কবচী, কুচোচিংড়ি ও জলজ পোকামাকড় ইত্যাদি। সাধারণত জলের তলায় ডুব সাঁতার দিয়েই খাদ্যসংগ্রহ করে, জলের উপরেও গলা বাড়িয়ে নিঃশব্দে দ্রুত সাঁতারে খাদ্যবস্তুকে ধরে ফেলে।

চেনা-অচেনা পাখি

বর্ণানুক্রমিক সূচী